জীবন প্রবাহ বহি

শিবানীশঙ্কর

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—আষাঢ় ১৩৫৮
—জুলাই ১৯৫১

প্রকাশনা :
তুলিলিপি
৩০/১, এ-নগর
স্বামী বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৮৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিস্ময়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
শ্রীরাধানাথ দত্ত
অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫ই, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

সেইসব নির্যাতিত গৃহবধূদের উদ্দেশে যারা
অত্যাচারের প্রতিবাদে দিয়েছে আত্মাহুতি—

ত্রয়ী

ভূমিকা

মৃত্যু কী কঠিন, কত বেদনাময়, কতই করুণ। তারই রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অক্ষম লেখনী স্তব্ধ হয়ে আসে, ভাষা যায় হারিয়ে, চোখের জলে মুছে যায় লেখা ···।

তবু জীবন থেকে মরণে মহান উত্তরণের ছবি আঁকার এ এক দুর্বল প্রচেষ্টা —যদিও তা রয়ে গেল সার্থকতা থেকে বহুদূরে।

দত্ত কবির ভাষায়—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়—তাই ভাবি মনে
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায় ফিরাব কেমনে!

এই কাহিনীর মূল চরিত্র শ্রাবণী—শবু, যা এক কল্পিত প্রতীকী মাত্র, তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে তেমনি করে একদিন কাল-সিন্ধুতে বিলীন হয়ে গেল—তাকে ফেরানো গেল না।

জগৎ আজ প্রচণ্ড গতিশীল, জীবন জটিলতর। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতও আজ বিপুল—কিন্তু সবই যেন একসূত্রে গাঁথা। নারী সহনশীলতায় নাকি ধরিত্রীতুল্য। কোন বধূজীবনে যখন সেই সর্বংসহা শক্তি ভেঙে পড়ে তখনই আসে মৃত্যু। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রও তাকে রোধ করতে পারে না—শুধু হয়ত বিলম্বিতই করতে পারে।

কল্পিত চরিত্রগুলির কেন্দ্রে আছে যে প্রতীকী চরিত্র, শ্রাবণী—শবু, তার বেদনায় যদি কারো চোখে আসে দু'ফোঁটা জল তবে সেই হবে তার পরম সার্থকতা, ধন্য হবে এই অশ্রু-স্বাক্ষর।

শিবানীশঙ্কর

প্রথম পর্য্যায়

এক

ভাগ্যকে দেখা যায় না, তাই তার আর এক নাম অদৃষ্ট। নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাই সে নিয়ন্তা, অপর এক অর্থে সে শমনও বটে। দুর্ভাগ্য যাকে ভর করে সে তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না. তাকে বয়ে বেড়াতেই হয়। নিয়তি যে দিকে পরিচালনা করে কারও সাধ্য নেই তার দিক ফেরাতে পারে।

সেই ভাগ্য আর নিয়তিই সমুদ্রতীরের মন্দির শহরের মৈত্র দম্পতি গিরিন বাবু পদ্মিনীদেবীর আদরের কন্যা শ্রাবণী—শবুকে দীর্ঘ বারো বছর শিলং ও পাটনায় প্রবাসের (তার স্বামী দীননাথ লাহিড়ীর ভাষায়—বনবাস) পর টেনে নিয়ে চলেছে কলকাতার অদূরে চাঁপাতলায়—নিজেদের বাড়ীতে। সে বাড়ীতে এখন একা বিরাজ করছেন দীননাথের বিধবা মা মঙ্গলাদেবী—শবুর চোখে যিনি মায়ামমতাহীন হৃদয়হীন জাঁদরেল এক মহিলা। এই দুর্ধর্ষ শাশুড়ীর সঙ্গে বারো বছর পরে আবার তাকে ঘর করতে হবে।

'যদিদং হৃদয়ং মম—তদস্তু হৃদয়ং তব' এই পবিত্র মন্ত্রপাঠে অগ্নিসাক্ষী করে শবুর বিয়ে হয়েছিল তারপর তেইশ বছর কেটে গেছে। স্বামীর প্রতি ভালবাসায় ও একাত্মতায় সে পেয়েছে পরিপূর্ণ সুখ—যা আজও মোটামুটি বজায় আছে। কিন্তু কাঁটা বিঁধে আছে ঐ একটি জায়গায়। বিয়ের পর প্রথম দশ এগারো বছর তাকে ঐ শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে। তখন সে কারণে অকারণে পদে পদে হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত। দুর্বল মন, অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতায় সে সময় শবু সব দুর্ব্যবহার, দুর্নাম, অপমান মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। তার হাত থেকে মুক্তি চাইলেও কোন উপায় খুঁজে পায় নি।

পরে বারো বছরের প্রবাস জীবনে শবু যেন সেই মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অনেক বড় বড় আঘাতে তার মন একেবারে ভেঙে গেছে। পথের দুর্ঘটনায় হারিয়েছে নিজের বিলম্বিত সন্তান সম্ভাবনা—বিলুপ্ত হয়েছে তার নারী জীবনের একান্ত কাম্য মাতৃত্বের আশা। এ ছাড়াও মৃত্যু

এসে কেড়ে নিয়ে গেছে তার ঠাকুমা, বড় কাকা, ছোটকাকার ছেলে বাবু-লালকে। আর সব শেষে মাত্র দেড় বছর আগে শবুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে চলে গেছে মা পদ্মিনীদেবী। সব দিক থেকেই মনে প্রাণে একেবারে রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে স্বামীর সঙ্গে ফিরে চলেছে সে চাঁপাতলায় নিজেদের বাড়ীতে, একযুগ পরে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে।

কারণ তার স্বামী দীননাথ গত বারো বছর ধরে এক উপরওয়ালা চাটু-কারের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে করতে আজ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে প্রথমে সে তিনমাসের ছুটি নিয়ে নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে বসবে। তারপর অন্যায়ের প্রতিকার না হলে, কলকাতায় ফিরে বদলি না করলে, শেষ পর্যন্ত চাকরিই ছাড়বে সঙ্কল্প নিয়ে পাটনা থেকে রওনা হয়েছে। দেশে এখন এমার্জেন্সী জারী হয়েছে—জোর অনুশাসন পর্ব চলছে। যে কোন প্রতিবাদকে জেল-জরিমানা দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তাতেও দীননাথ শঙ্কিত নয়, সে নাকি নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান।

আর শবু? যেখানে সে ফিরে চলেছে সেখানে যে নিত্য নতুন আঘাত আসবে তার হাত থেকে রক্ষা পাবে কোন শক্তিতে? দুর্বল মন, মা-হারা, সব দিক থেকেই একেবারে রিক্ত শবু কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে? স্বামী কি পারবে তাকে সব আঘাত থেকে রক্ষা করতে? দীননাথ তার চাকরি ক্ষেত্রের অন্যায় ও অসম্মান থেকে মুক্তি পেতে চাকরি ছাড়তে পারে। কিন্তু শবুর জীবনে যদি আবার নতুন করে অত্যাচার ও আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে তবে তার হাত থেকে সে মুক্তি পাবে কী করে?

সব প্রশ্নেরই জবাব জমা হয়ে আছে অমোঘ নিয়তির পরিকল্পনায়—যার কোন আভাস পাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত।

দুই

চাঁপাতলার বাড়ীতে শবুরা ফিরে এসেছে দীর্ঘ বারো বছর পর।

মা মঙ্গলা দেবী জিজ্ঞেস করলেন—'তোরা ত ছুটিতে এসেছিস? পুজো পর্যন্ত আছিস ত?'

দীননাথ সুরটা না ভেঙে বলল—'আছি।'

সবাই জানল শবুরা ছুটিতে এসেছে—এ ছাড়া কি-ই বা বলতে পারে,

নির্দিষ্ট করে কি বলবে? মামীমা, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সবাইকে একই কথা বলা হল—ছুটিতে এসেছি। দীননাথ যখন আর কিছু বলছে না, শবুই বা বলে কি করে?

অফিস নেই, কাজের তাড়াও নেই। মঙ্গলা দেবী অভ্যাসমত ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটাতে সকালের পাট শুরু করে দেন। শীতের সকাল—শবু ওঠে ছটা সাড়ে ছটায়। ততক্ষণে মঙ্গলা দেবী উনুন ধরিয়ে চা খেয়ে নিরামীষ রান্না বসিয়ে দেন। এক দু পদ ডাল তরকারী রেঁধে আতপচালের ভাত উনুনে বসিয়ে দিয়ে তিনি ডাক দেন—

'নাও শ্রাবণী, তোমার আমীষ রান্নার যোগাড় করে নাও, সকালের রুটি কর।'

শবু ততক্ষণে ঘর ঝাঁট দিয়ে রাতের এঁটো বাসন পত্তর মেজে রান্নার দিকে এগিয়ে যায়—বাড়ীতে ঝি বা কাজের লোক নেই, মঙ্গলা দেবী সেটাকে বিলাসিতা মনে করেন। অতবড় রান্নাঘর থাকতেও স্থায়ী উনুন পেতে রান্না হয় ছোট্ট স্টোররুমটায় যেখানে একজন মানুষেরই নড়াচড়া কঠিন। রান্না ঘরটা পুরোনো ষ্টোভ, ভাঙা উনুন, হাঁড়ি কড়াই কৌটো সাত সতরো জিনিষে ভর্ত্তি। আর আছে অসংখ্য আরশোলা টিকটিকি মাকড়সা ও ইঁদুর। আগে ঐ ঘরে ছোট ননদ শেফালী ও ছোট দেওর সোনারা থেকেছে, নতুন ঘরগুলো হবার আগে মঙ্গলা দেবীও থাকতেন—এখন তিনি নতুন তৈরী বাইরের ঘরটায় পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। পুরোনো শোবার ঘরটা আর এক দেওর ভবর বিয়ের খাট বিছানা আলনা আলমারী দিয়ে ঠাকুর ঘরের মত ঝাড়া পোঁছা পরিপাটি। এখন সে ঘরের নাম ভবর-ঘর।

নতুন বড় শোবার ঘরটার মেঝে কাঁচা থাকতেই ভব মালতীর বিয়ের সময় এসে দীননাথ হাজারো অসুবিধের মধ্যেও নিজেদের চৌকি বিছানা এনে সে ঘরে পেতেছিল। শবু বলেছিল—

'পাকা ঘর ছেড়ে এঘরে এলে—ঘরের প্লাস্টার মেঝে কিছুই হয়নি!'

দীননাথ বলেছিল—'আগে থেকে আমার পছন্দের ঘরে না এলে পরে হয়ত অন্য কেউ সেখানে অধিষ্ঠান করবে।'

দীননাথ দূরদর্শী। না হলে দক্ষিণের ঐ কোণের বড় ঘরটা এখন ভবর ঘর হয়ে সাজানো থাকত। এখন এ ঘরটা ঐ চৌকি তার উপর একটা ছেঁড়া তোষক ও অতোধিক ছেঁড়া কম্বল চাদর সহ শোভা পাচ্ছে। বাইরের ঘর আর বড় শোবার ঘর পাশাপাশি লাগা—মাঝখানে একটা দরজা।

পুবলা অর্থাৎ পৌষ পার্বণ খুব ধুমধাম করে হচ্ছে। ছোট দুই ননদ করবী শেফালী ও দুই ননদাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছে। বড়জা বীণা তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছে—বড়দা সন্ধ্যের সময় একবার আসবে। দুই ছেলে সহ মামীমাও আছেন। তিনি থাকেন অল্প কখানা বাড়ী পরেই।

শেফালী কাঞ্চন গল্প জুড়লো পাটনার। গয়া থেকে বেড়িয়ে ফেরার সময় তাড়াতাড়িতে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে সবাই কি ঝামেলায় পড়েছিল সে কথাও হচ্ছে। শেষে কাঞ্চন বলল—

'পাটনার বড় বড় টাটকা পাবতা মাছ, চিংড়ি আর সেজবৌদির হাতের রান্নার স্বাদ আজো আমার মুখে লেগে আছে। আবার সময় সুযোগ করে যেতে হবে।'

শবু শুধু একটু হাসল। সে জানে সে সুযোগ হয়ত আর আসবে না।

করবীর ছেলে বাসু বীণার ছেলে ও মেয়ে পার্থ সুবর্ণাও পাটনার কথা বলছে।

মাঝখানে মেজ ননদাই বলল—'এই গরিব জামাইকে কেউ যেতে বলে না।'

শবু বলল—'যারা গেছে সবাই নিজে থেকেই গেছে, কাউকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

এই মেজননদাইকে শবুর মনে হয় ভীষণ কুট প্রকৃতির ও পেঁচুকে—সব কথার মধ্যেই একটু খোঁচা দেবে। মেজ ননদ করবী ত আরো এককাঠি সরেস। সে তুলনায় ছোট ননদাই কাঞ্চন অনেক ভদ্র—মার্জিত।

সন্ধ্যের পিঠেপুলি খেয়ে সবাই চলে গেল, রয়ে গেল করবীর দল, তারা কাল যাবে। সোদপুরে ফিরে যাবার আগে বীণা শবুকে আড়ালে বলল—

'দেখলে ত শ্রাবণী, করবী শেফালীদের দলকে নিয়ে কত আদর সোহাগ হল আর আমরা সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছি।'

শবু বলল—'এই ত চিরদিন দেখে আসছি, নতুন ত নয়।'

পৌষ পার্বণ মিটে গেছে এদিকে শবুর মনটাও একবার বাপের বাড়ী যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। যদিও তার মা আর নেই, তবু বাবা আছেন অসুস্থ ভাই নন্দু আছে, ছোটভাই কানাই, ভাইবৌ কাকলী দুই মেয়ে মিঠি দিঠি আছে। আর আছে ওদেরই নতুন বোন মিষ্টি, যাকে শবু এখনো দেখেনি—তাকে নাকি দেখতে ঠিক মার মত। তাকেই দেখার খুব আগ্রহ—মিষ্টির মধ্যে সে হয়ত তার হারিয়ে যাওয়া মার শিশুরূপ দেখতে পাবে।

দীননাথকে সেকথা বলতে সে-ও রাজী হল, তবে সে সেখানে বেশীদিন থাকতে পারবে না, অফিস থেকে চিঠিপত্তর আসতে পারে।

কয়েকদিন পরে দীননাথ বলল—'মা, আমরা ক'দিনের জন্ম মন্দির শহরে যাচ্ছি, আমি দিন সাতেক পরে ফিরব, শ্রাবণী মাসখানেক পরে আসবে।'

মঙ্গলা দেবী বললেন—'যা, ঘুরে আয়।'

এক বছর পর তারা এল মন্দির শহরে। শবুর মা আর নেই। তবু কানাইয়ের ছোট মেয়েটাকে দেখে শবু হেসে কেঁদে অস্থির হল। সত্যি ঠিক মায়ের মত দেখতে হয়েছে। মার মতই মিষ্টি চেহারা। শবু তাকে কোলে করে 'মা' 'মা' বলে আদর করছে।

কাকলী হেসে বলল—'আমার মিষ্টিরানীকে তবে কেউ অনাদর করছে না।'

শবু বলল—'ষাট ষাট, সে কি কথা! এ বাড়ীতে কেউ মেয়েদের অনাদর করে না। তাছাড়া এ যে আমাদের মা, এর কথাই আলাদা।'

মিঠি বলল—'মেজ পিস্ এসে থেকে শুধু বোনকেই আদর করছে।'

শবু মিঠি আর দিঠিকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল—'আগে নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করে নিই। এবার বল তোমাদের কথা।'

'জানো, বাবা ভোটে দাঁড়িয়েছিল—সূর্য্য চিহ্নকু ভোট দিয়।' মিঠি আওয়াজ তুলতে দিঠিও গলা মিলাল—'থূর্য্য তিহ্নকু ভোট দিয়।'

খবরটা আগেই জানা ছিল—কানাই পুরসভার ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গেছে।

কানাই বলল—'জানিস মেজদি, জেলেপাড়ায় কেউ আমাকে ভোট দেয়নি। শুধু মেথর পট্টিতে পার্টির ভাল সংগঠন আছে, তাইতেই জামানত বেঁচে গেছে।'

দীননাথ বলল—'কলেজের ইলেকশন আর পুরসভার ভোট এক নয়—ভাল কাজ দেখাতে হয়।'

কানাই বলল—'না জামাইবাবু. আসলে জেলেদের মনোভাব পেটি বুর্জোয়াদের মত। ওরা প্রত্যেকে স্বপ্ন দেখে অনেক লাভ করবে, বড় নৌকা বড় জাল কিনবে বড়লোক হবে। পার্টির কথা ওরা শুনতে চায় না। প্রতিপক্ষ জেনাবাবুর দল আবার ওদেরকে মদ খাওয়ার টাকা দিয়ে হাত করে নিয়েছিল। কিন্তু মেথররা সব দিক থেকেই সর্বহারা।'

কানাই এখন বুর্জোয়া—সর্বহারা এ সবও বুঝতে শিখেছে। কলকাতার জল হাওয়ার গুণই আলাদা। শবু জিজ্ঞেস করল—'কানাই, তোর ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বাবা কিছু বলেছে ?'

কানাই বলল—'বাবা এমনিতে কিছু বলেনি। আমি হেরে গেলে পরে বলেছিল—এখন আর আগেকার কাল নেই। কিন্তু মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। জেলে পাড়ার লোকদের অনেককে বাবা বিনে পয়সায় ওষুধ আগেও দিয়েছে, এখনও দেয়। ভোটের ফল বের হবার পর কিছুদিন তারা ওষুধ নিতে এলে বাবা ছেলেমানুষের মত বলত—এইঠি আসিছু কাঁহি কি, যা জেনা পাখ্ যা।

'বাবা অনেক ব্যাপারেই ছেলেমানুষের মত করে। বাবার যে সব বন্ধু ডাক্তারখানায় আসে, বসে গল্প করে তাদের সঙ্গেও সামান্য কথায় মান অভিমান করে। আবার বর্তমানের রাজনীতির কথাও বোঝে। আমার এক সোস্যালিষ্ট বন্ধু তার একখানা পত্রিকা 'সমাজবাদী' দিতে এসেছিল। আমি তখন ছিলাম না। বাবা তাকে সোজা হাঁকিয়ে দিয়েছে—নেই যা তোর সমাজবাদী, আমে পরা সাম্যবাদী।'

শুনতে শুনতে শবুর মনে হল, মা চলে গেছে, শিশুরা যেমন মাকে না পেলে কাঁদে অভিমান করে, বাবাও তেমনি অবুঝ অভিমানী হয়ে গেছে। বাবার জন্য শবুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল—যে কয়দিন আছে বাবার কাছে কাছে থাকতে হবে।

মিঠি বলল—'মেজ পিস্, জ্যেঠাকে দেখবে চল।'

হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে, এতক্ষণ মিষ্টিকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

নন্দু, মিঠিদের জ্যেঠা, এখন যেন একেবারেই অন্যমানুষ হয়ে গেছে। ডাকলে সাড়া দেয়না, ফিরে তাকায় না। প্রায় সব সময় শুয়েই থাকে, খিদে পেলেও 'মা খেতে দাও' বলে না। মা নেই সে কথা সে অন্তর দিয়ে বুঝে গেছে।

মিঠি বলল—'জানো মেজ পিস্ জ্যেঠা এক একদিন খেতে চায় না। মা তখন ভাত মেখে খাইয়ে দিলে তবে খায়।'

আহারে! যখন তার মার কথা মনে পড়ে তখনই বুঝি সে খেতে চায় না। নন্দুর কেউ অযত্ন করে না, বাবা আর কানাই তার ঘর বিছানা সব পরিষ্কার করে দেয়, কাকলী দু বেলা খাবার বেড়ে নিয়ে এসে খাইয়ে দেয়। এইভাবে মা-হারা নন্দু আর কতদিন বাঁচবে কে জানে!

আর আছেন বাবা। দুপুরে বাবার খাওয়া হলে শবু চিলে কোঠার ঘরে পানের বাটা নিয়ে গেল।

বাবা পান মুখে দিয়ে একটু করুণ হেসে বললেন—'দেখ, সব যেন ঠিক আগের মতই চলছে—একটা মানুষ যে এ সবের মূলে ছিল মনেই প্রায় পড়ে না। অথচ চারপাশে তার কত স্মৃতি পড়ে আছে।'

বাবা চুপ করে গেলেন, মেয়ের কাছে এর চাইতে বেশী বলতে বাধে। শবুর মনে মনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আবার ভালও লাগছে—বাবা মার স্মৃতি মনে রেখেছে বলে। শবু মার বাঁধানো দাঁতগুলো একটা কাঁচের কৌটোর মধ্যে যত্ন করে রাখা আছে দেখে বলল—

'বাবা, পাটনায় ডাঃ চ্যাঙের কাছ থেকে যে দাঁত মার বাঁধানো হয়েছিল এত সে গুলোই, না?'

বাবা বললেন—'হ্যাঁ। শেষ দিকে তোর মা আর ওগুলো ব্যবহার করত না। তখন তার খাওয়াই বা কি ছিল, কতটুকুই বা খেত।'

মার চশমার বাক্স, চিরুণী, চুলের ফিতে, কাঁটা, সিঁদুরের কৌটো আরো সব টুকিটাকি ব্যবহারের জিনিষগুলো নিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে শবু বলল—

'বাবা, তুমি এখন দুপুরে বা রাতে খেয়ে উঠে কি কর?'

বাবা বললেন—'কি আর করব। ঐ সব ছবিওয়ালা শিশু পত্রিকাগুলো পড়ি আর মেয়ে দুটোর কাছে বাঘ সিংহ কুমীরের গল্প করি। ওরা বাংলা পড়তে পারে না—ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্ত্তি হয়েছে।'

মিঠি আর দিঠি চিলেকোঠার ঘরে এসে ডাকল—'মেজ পিসু, খেতে এসো। বাবা মা পিসমশ্ তোমার জন্য বসে আছে।'

বাবা বললেন—'যা শবু খেয়ে নে, বিশ্রাম কর।'

দিঠি আঙুল চোষা বন্ধ করে বলল—'দাদু, আদ আমলা বেত্‌পিতের গল্প শুনবো—বাঘের গল্প পলে।'

বাবা বললেন—'হ্যাঁ, তাই কর। জানিস শবু, আমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি এ দুটো সব সময় আমার কাছে কাছে থাকে, হাতে হাতে সব জিনিষ এগিয়ে দেয়। এর মধ্যে মেজোটাই বেশী গুছিয়ে, কোনটা কোথায় আছে ঠিক ঠিক মনে করে রাখে।'

শবুও যে মেজো। মনে আছে ছোটবেলায় মা বলত—কিছুটা বড় অগো-ছালো, শবু সব জিনিষ কি সুন্দর গুছিয়ে রাখে। বংশের একটা ধারা আছে ত।

সাতদিন পরে দীননাথ কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। কানাই বলল—

'জামাইবাবু, আপনার তিন মাস ছুটি। এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন কেন?'

দীননাথ বলল—'ওখানে আমার কিছু কাজ আছে। তা ছাড়া অফিস থেকে চিঠি পত্র আসতে পারে।'

দীননাথকে ট্রেনে তুলে দিতে শবু, কানাই, মিঠি দিঠি চারজনেই এসেছে। গাড়ীটা ছেড়ে দিতে শবুর চোখে জল নেমে এল—স্বামী দূরে চলে গেল, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

মিঠি জিজ্ঞেস করল—'মেজপিস্, তুমি কাঁদছ কেন?'

শবু বলল—'তোমাদের পিস্‌মিশ চলে গেল ত, তাই।'

দিঠি বলল—'দাদুও দিদার দস্ত কাঁদে।'

'তাই নাকি? তোরা দেখেছিস?'

মিঠি বলল—'হ্যাঁ। দাদু বলে, আকাশের দিদার সঙ্গে কথা বলে।'

বাবা বুঝি এই নাতনী দুটোর কাছে মার গল্প করে, আপন মনে মার সঙ্গে কথা বলে, মার জন্য কাঁদে। শবুর মা সত্যিই ভাগ্যবতী।

বাবার বয়স হয়েছে, দাদুর মত হাঁটুতে বাত, কথায় কথায় ঠাণ্ডা লাগে, কমোড ব্যবহার করতে হয়, বাবার জন্যই বাড়ীতে ডাইনিং টেবিলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শবু কানাই কাকলীরা তাঁর সেবাই করতে পারে কিন্তু মার অভাব পূরণ করতে পারে না। আর সব কিছু হলেও বাবা-মার যে ছিল অফুরন্ত গল্প করা অভ্যাস—সে অভাব পূরণ হবে কিসে?

সব কিছুর মধ্যেও শবু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কানাই লক্ষ্য করে একদিন বলল—

'মেজদি, তোর আর জামাইবাবুর আজকাল কি হয়েছে রে? জামাইবাবু দেখলাম গোপালবাবুর দোকান ছাড়া আর কোথাও এমন কি দুর্গাবাড়িতে-ও আড্ডা দিতে গেল না। তুইও মাঝে মাঝে কি যেন ভাবিস। কি হয়েছে আমাকে বলবি না, আমি তোর ছোট ভাই।'

শবু একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল। এমন করে বললে না বলে কি পারা যায়? কাউকে বলতে না পারলে যে নিজের মনেও শান্তি পাওয়া যায় না। ওবাড়ীতে ত কিছু বলাই দায়, সঙ্গে সঙ্গে তিলকে তাল করে তুলবে। এখানে বলা যায়। ভেবে বলল—

'শোন কানাই, মিতুর বিয়ের সময়ই তোর জামাইবাবুর অফিসে কিছু

গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঠে আর তোর জামাইবাবুও অকারণ তাতে জড়িয়ে পড়ে। মানুষটা আবার ভীষণ বোকা আছে ত? পরে অন্য সবাই সরে পড়ে আর ওদের এক উপরওয়ালা চোপদার না চাটুকার দিল্লীতে লিখে ওকে শিলংয়ে বদলি করিয়ে দিল। বিনা দোষে এতবড় শাস্তিতে ও-ত পাগলের মত হয়ে গেছিল। তারপর থেকে গত বারো বছরে না হোক বারোবার কলকাতায় বদলির জন্য দরখাস্ত করেছে আর প্রত্যেকবারেই ঐ চাটুকার লোকটা নানা কারসাজি করে কলকাতায় বদলি হতে দেয়নি। একবার ত দিল্লী থেকে ওকে কলকাতায় বদলির অর্ডার দিয়েই ছিল; চাটুকার সেটাকেও রদ করিয়েছে। এখন তোর জামাইবাবু বলে—রামায়ণ মহাভারতেও বারো-চৌদ্দ বছরে বনবাস শেষ হয়েছে, আমার বনবাস কি বারো বছরেও শেষ হবে না? তাই একেবারে কলকাতায় চলে এসেছে, বদলি না করলে চাকরিই ছেড়ে দেবে বলেছে।'

কাকলী বলল—'এত সুন্দর চাকরি জামাইবাবু ছেড়ে দেবেন? কী ভাল মাইনে, কত সুযোগ-সুবিধে!'

'বদলি না করলে হয়ত তাই দেবে।'—শবু বলতে লাগল। 'এসব কথা যখন ভাবি ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। চাকরি ছাড়লে খাব কি, সংসার চলবে কি করে? শুধু ত বাড়ীটাই আছে আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কটি টাকা। তার উপর আছেন ঐ শাশুড়ী ঠাকরুন, ছেলে চাকরি ছাড়লে আমাকে দুপায়ে খুঁচবেন না? এমনিতেই ত কত দুর্মুখ দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়। ছেলের চাকরি গেলে বলবেন না—এই বৌয়ের জন্যই আমার চাকুরে ছেলে রাজার চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে বসল—ঘরে কি মধু আছে, খাবি কি? ভেবে ভেবে আমি মনে শান্তি পাই না, রাতে ঘুমোতে পারি না। যাক, বাবাকে এখন তোরা জানাসনা, বাবার চিন্তা বাড়বে।'

কানাই বলল—'এত বড় একটা ব্যাপার আর জামাইবাবু আমাকে কিছু বলল না?'

শবু বলল—'তোদের জামাইবাবু অনেক ব্যাপারে খুব সরল, কিন্তু দু একটা বিষয়ে ভীষণ চাপা। এত বছর একসঙ্গে ঘর করে আমি ওর মুখ দেখে কিছুটা বুঝতে পারি। আরো একটা ব্যাপার আছে। বারো বছর ধরে ঐ চাটুকারটা ওর নামে মিথ্যা রিপোর্ট লিখে, দিল্লীতে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ওকে প্রোমোশনও পেতে দেয়নি, অথচ ওর ব্যাচের সবাই উপরে উঠে গেছে। এমন কি ওর নীচে যারা ছিল, এক দুবার পরীক্ষায় ফেলও করেছিল তারাই

এখন উপরওয়ালাদের সুনজরে এসে দুটো তিনটে প্রোমোশন পেয়ে ওর উপরে উঠে গেছে। এটা যে কত বড় অপমানের, অসম্মানজনক অবস্থা, আমরা চাকরি করি না তাই বুঝতে পারি না।'

বলতে বলতে শবুর চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে ; একান্ত আপন মানুষটির এত বড মর্মবেদনা দেখেও সে কিছু করতে পারে না। স্বামীর প্রতি দুঃখে সমবেদনায় তার মন ভরে ওঠে। এক এক সময় মনে হয় স্বামীর ঐসব তোষামুদে সহকর্মীদের বা ঐ শয়তান চাটুকারকে সামনে পেলে ··। পেলে কি করবে তা সে জানে না, কোন উপায়ও তার জানা নেই। এত অন্যায় অবিচার সত্বেও তার স্বামী কারো কাছে মাথা নত করেনি, নীতির প্রশ্নে কোন আপোস করেনি—সেইটাই শবুর গর্ব। অফিসের অনেকেই এজন্য তার স্বামীকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আবার যারা মতলববাজ তারা সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। তবু যখন অফিসে আসা এক একটি অন্যায় অবিচারের খবরে তার স্বামী দুঃখে বেদনায় মুষড়ে পরে তখন শবুর মন করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, গভীর মমতায় স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে, সান্ত্বনা দেয়। দেখে শুনে তার চাকরি জিনিষটার উপর ঘেন্না ধরে গেছে—হোক সে প্রাইভেট বা সরকারী চাকরি আর নিজের দেশের সরকার। চাকরি চাকরি-ই—পরের গোলামী গোলামীই। বাবা বা কানাই যে চাকরি করে না সেইটিই ভাল।

কিছুক্ষণ ভেবে কানাই বলল 'যাই হোক মেজদি, আমি তোকে বলে রাখছি, যখনই অসুবিধে হবে, যদি টাকা পয়সার দরকার হয়, আমি তোর ছোট ভাই—আমাকে অবশ্যই জানাবি, কোন সঙ্কোচ করবি না। মনে রাখবি তো?'

শবু কথা দিল।

কানাই অকৃতজ্ঞ নয়। মা চলে গেলে বাবা শবুকে সেবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোর মার গয়না শাড়ী এ সবের কি করি বলত? শবু নির্দ্বিধায় বলেছিল—ওগুলো সব কানাই কাকলীর, তবে মার ব্যবহার করা একটা শাড়ী আমি নেব মার স্মৃতি হিসেবে।

বাবা বলেছিলেন—মিতু যে অন্য কথা বলে, মেয়েরাও মার গয়না পাবে। শবু বলেছে—বাবা, তোমরা আমাদের যথাসাধ্য দিয়েছ, ওগুলো এ সংসারেরই সম্পত্তি। পরের বোন মিতু তখন এবাড়ীতে ছিল—স্বামীর সঙ্গে থাকেনা।

তবু কোন আপত্তি করেনি, দিদি কিছুক্ষণ পরে শুনে কিছু বলেনি।

শেষ পর্যন্ত মায় আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। মা চলে গেলে মিতু বেশীদিন এ বাড়ীতে টিকতে পারেনি। শবু প্রথমে কানাইকেই দোষী করেছিল। একটা লম্বা চিঠি লিখেছিল কানাইকে দীননাথের সঙ্গে পরামর্শ করে—জানতে চেয়েছিল, কেন মিতুদের ওদের বাড়ীতে ঠাঁই হল না? তার জবাবে আর একটা লম্বা চিঠিতে কানাই যা জানিয়েছিল সে সব জেনেশুনে শবু তার মত পাল্টেছে।

অবশ্য কানাই মিতু ও তার দুই ছেলেকে জলে ফেলে দেয়নি। তাদের জন্য আলাদা বাসা ভাড়া করে দিয়েছে। বাড়ী-ভাড়া জামা কাপড় ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ সব দেয়, এ ছাড়াও মাসে একশ টাকা করে দেয় সংসার খরচের জন্য। মিতু সেলাই মেশিনের সাহায্যেও বেশ কিছু রোজগার করে। বাবা মিতুর নামে দশ হাজার টাকার যে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দিয়েছে তাতেও কানাই বাধা দেয়নি। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই ব্যবস্থাই ভাল হয়েছে, মিতু তার চরিত্রের জন্য স্বামীর ঘর করতে পারে না, অন্য কোথাও শান্তিতে থাকতে পারবে না।

স্বভাবতই বাবার দুশ্চিন্তা এখন মিতুদেরকে নিয়েই। সেবার দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পথে মিতুদের অবস্থা দেখে শবু বাবাকে বলেছিল—আমরাও না হয় মাসে মাসে কিছু টাকা মিতুর জন্য পাঠাব। বাবা রাজী হওয়াতে শবু ত্রিশ টাকা করে পাঠাচ্ছে। গত এক বছর এই ব্যবস্থা চলছে। এখন শবুদের সামনে দুর্দিন—মিতুদের জন্য টাকা দেওয়া আর হয়ত সম্ভব হবে না।

২

মিতু, বড় কাকীমা ও মার বন্ধুস্থানীয়া মহিলাদের আর বান্ধবী হীরার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে একটা মাস কেটে গেছে। মা থাকতে যতটা ভাল লাগত এখন আর শহরটা তত ভাল লাগে না, ঠিক আগের মত আর নেই। বড়মার স্কুলটা আছে ঠিকই কিন্তু সেই বাঙালী পরিবেশ সেখানে নেই। তারই জন্য কানাই মেয়ে দুটিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছে।

একমাস ধরে নন্দুর দেখা শোনা করে, অবসর সময় বাবার সঙ্গে গল্প করে মিঠি দিঠিদের নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে শবু এবার ফিরে যাবে কলকাতায়। রওনা হবার আগে সে তার শিশু-মা মিষ্টিকে কোলে নিয়ে আদর করে বলল—

'মাগো, যাচ্ছি আমি, আসি আমি?'

শিশু মিষ্টি তার ছোট ডান হাতখানি আলতোভাবে শবুর মুখে গালে

বুলিয়ে দিল—ঠিক যেমন মা যাবার আগে চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ জানাত। শবু আনন্দে শিহরিত হয়ে বারবার মিষ্টিকে চুমু খেয়ে বলল—

'দেখলি কানাই, ঠিক যেন মায়ের মত আদর করল। আমার মাকে রেখে আমি যাব কি করে?'

বাবাকে প্রণাম করে এক সময় শবু রওনা হল। কানাই মিঠি দিঠিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে আবার স্মরণ করিয়ে দিল—

'মেজদি, তোকে যা বলেছি মনে আছে ত? টাকার দরকার হলেই আমাকে জানাবি।'

শবু বলল—'নিশ্চয়ই জানাব।'

মিঠি বলল—'মেজ-পিস্ টা টা –'

দিঠিও সুর মিলালো—'মেত্ পিত্ তা তা।'

তিন

হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শবু দীননাথকে খুঁজছে। একটা বাচ্চা কুলি মাল বইবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে করতে এক সুযোগে শবুর বটুয়া ব্যাগ থেকে ট্রেনের টিকিট ও দশটা টাকা চুরি করে পালিয়ে গেল। দীননাথের সঙ্গে একমাস পরে দেখা দুজনেই খুশি হয়ে হেসে একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত তখন। পরে শবু ব্যাগ থেকে টিকিট বের করে দীননাথের হাতে দিতে গিয়ে দেখে টিকিটও নেই টাকাও নেই।

অবস্থা দেখে দীননাথ বলল—'তোমার নামে রিজার্ভেশন ছিল ত? আমার প্ল্যাটফরম টিকিট আছে। চল আমরা বীরের মত গেট পার হয়ে যাই—নেহাৎ যদি ধরে তবে অফিসের নামেই কাজ হবে।'

সেবার গয়া থেকে ফেরার পথে গয়া ষ্টেশনে কেনা পাঁচখানা প্ল্যাটফরম টিকিট ও অফিসের নাম ওদের জেল জরিমানার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, শুধু ন্যায্য ভাড়াটাই দিতে হয়েছিল।

এবারেও দুজনে গেট পার হয়ে গেল। শবু খালি বটুয়া মাত্র হাতে করে বীরের মত আগে পার হল। দীননাথ একটু পরে দু তিনজনের পিছনে স্যুটকেশ বেডিং নিয়ে টিকিট কালেক্টরের হাতে প্ল্যাটফরম টিকিট ধরিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে এল।

চাঁপাতলায় এসে অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় দিন কাটছে। দীননাথ হাট বাজার করা, বাড়ীতে সারাদিন নানা খুটখাট কাজ ও নতুন করে পাড়ার পরিচিতদের সঙ্গে গল্প আড্ডা নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করছে। শবু সারাদিন ঘরের কাজ রান্নাবান্না মামীমা ও পুরোনো প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাচ্ছে। তিন ঘর নতুন প্রতিবেশিনী এসেছে—তন্বী, এক ছেলে স্বামী ও শাশুড়ী, শোভাদের একটা বড়সড় পরিবার আর বাঁকা দাসের মা, বৌ ও কটি ছেলে মেয়ে। সকলের সঙ্গেই শবুর আলাপ হয়েছে। এদের মধ্যে তন্বীর বিধবা শাশুড়ীকেই শবুর সব থেকে ভাল লাগে। মঙ্গলাদেবীও ঘরের কাজ, রান্না, পাড়ার এক দুজন বৃদ্ধার কাছে যাতায়াত করে কাল কাটাচ্ছেন।

এবার ছুটিতে এসেই শবুরা বরানগর-ষষ্ঠীতলায় গিয়ে ছোটকাকা-কাকীমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। উপরের তিন মেয়ে শ্রীলা এলা নীলার বিয়ে হয়ে গেছে, বাবুলাল চলে গেছে, এখন আছে শুধু ছোট দু ভাই বোন—পুটু আর বেলা॥

প্রায় দুবছর আগে বিয়ে হওয়া ছোট বোন তপু আর তার বর অমল এখন বেলুড়ে থাকে ছোট্ট একখানি ভাড়া বাড়ীতে—দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যাবার আগে ও পরে শবুরা বেলুড়ে গিয়ে তপুদের ঘরকন্না দেখে এসেছে। এবারো ছুটিতে এসে বেলুড়ে তপুদের সঙ্গে একবার দেখা করে এসেছে।

একমাস মন্দির শহরে থেকে ফিরে তপু ও অমলকে একদিন নেমন্তন্ন করে এনেছে আর তখনই শবু ব্যাপারটা জানতে পারল।

দুপুরে খেয়ে উঠে তপু বলল—'চল মেজদি, তোর মামী-শাশুড়ীদের বাড়ী থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

পথে যেতে শবু জিজ্ঞেস করল—'হঠাৎ তুই মামীমার বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলি যে?'

তপু একটু অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল—'তুই বলছিলি না, দুলুদার বৌয়ের বাচ্চা হবে? চল যাই দুলুদার বৌ এর কেমন চেহারা হয়েছে দেখে আসি।'

শুনে ত শবু অবাক, সেদিনকার মেয়ে তপু বলে কি! তবে কি⋯ ⋅! জিজ্ঞেস করল—'এই তপু, তোর খবর কি?'

তপু রাগের ভান করে বলল—'তুই দেখছি আমার শাশুড়ীর মত হলি। আমার বিয়ের মাসখানেক পরেই ত আমার দেওরের বিয়ে হয়েছিল, এখন তাদের একটি মেয়েও হয়েছে। শাশুড়ী বলে—ছোট বৌমার ত হল, বড় বৌমার কবে হবে?'

'আসল কথাটা বল, লুকোচ্ছিস কেন?'

তপু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে।

শবু আনন্দ আর চেপে রাখতে পারেনি, পথের মাঝেই তপুকে জড়িয়ে ধরে বলল—'ওমা, তাই নাকি? আমাদের সেই ছোট্ট তপুদিদি এবার তবে মা হবে। মা তো নেই, সে সময় কি শ্বশুর বাড়ী যাবি?

'না এখানেই থাকব, বালীর হাসপাতালে কার্ড করিয়েছি। সেখানে বলেছে—শ্রাবণ মাস নাগাদ হবে।'

শবু বলেছে—'আমি কালই বাবা কানাই কাকাদের চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব।'

সন্ধ্যের সময় তপু ও অমল রওনা হবার সময় শবুরা পাড়ার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছে। সে সময় অমল বলল—

'মাঐমা দেখলুম বেশী কথা বললেন না, উনি বুঝি কথা কম বলেন?'

শবু আর কি বলবে, সংক্ষেপে উত্তর দিল—'উনি ঐ রকমই।'

এক এক সময় শবু ভাবে—তার মা পদ্মিনীদেবীও মা ছিলেন আর মঙ্গলাদেবীও আর এক মা। মা পদ্মিনীদেবী তাঁর সম্পর্কে বেয়ান করবীর শাশুড়ীকে আদর আপ্যায়ন করতে সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে নিজে পা ভেঙে বাড়ী ফিরেছিল। আর মঙ্গলাদেবী তাঁর বেয়ান শবুর মাকে ঘরের দরজা আগলে ধুলোপায়ে বিদেয় করতে চেয়েছিলেন আর তপু—অমল এলে তাদের সঙ্গে কথাটিও বলেন না।

মঙ্গলাদেবীর এইরকম সব অসামাজিক ব্যবহার দেখলে শবুর নিজের মা-র কথা বেশী করে মনে পড়ে। কিন্তু তার মা যে আর নেই। ভাবতে গেলে মন আরো খারাপ লাগে।

তাই দোল চলে যেতে একদিন দীননাথকে সে বলল—

'শুনছো, কানাইয়ের কাছ থেকে ছোট মামার ঠিকানা এনেছি, তারা এখন রাণাঘাটে আছে। আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে? মা আর ছোটমামাতে খুব মিল ছিল—মামাকে দেখলে আমি মনে অনেক শান্তি পাব।'

দীননাথ বলল—'রাণাঘাট দৈত নয়, এ আর বেশী কি কথা। আমি ত এখন বেকার মানুষ—চল দুজনে একদিন ঘুরে আসি।'

মা মঙ্গলাদেবীকে বলে একদিন সকালে দুজনে রাণাঘাট গিয়ে আবার রাতেই বাড়ী ফিরে এল। আশ্চর্য্য কথা! মামা নাকি একবারও শবুদের সঙ্গে

দেখা করতে এসে বাড়ীতে তালা বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন।

মামা বলেছিলেন—'আমি ঠিকানা যোগাড় করে অনেক কষ্টে ঠিক দুপুর নাগাদ তোদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি ঘরে তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ীতে জিজ্ঞেস করতে তারা বলল, তোরা নাকি সে দিনই শিলং চলে গেছিস। আমার কপাল খারাপ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, সে বাড়ী থেকে একগ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে দু মাইল দূরে শীলার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম : যাদের হাতে জল খেলাম তারা কি জাত কে জানে।'

শবু শুনে বুঝতে পেরেছে সেটা হায়ানীদিদের বাড়ী, বলেছে—'না মামা, ওরা মালাকার।'

'মালাকার? তাহলে ঠিক আছে—কুম্ভকার, কর্মকার, মালাকার এরা সব জল চল। যে ত সব কালো কুচ্ছিত চেহারা দেখলাম, আমি কই বুঝি কোন ছোট জাত হবে।'

শবু জানতে চেয়েছে—'সেবারে কানাইয়ের বিয়ের সময় দেখা হল তখন ত কিছু বলেন নি মামা?'

'ভুলে গিয়েছিলাম, বুড়ো হয়েছি ত।'

মামার এক ছেলে অধীর বানাঘাটে চুর্নিনদীর ধারে কাঠা পাঁচেক জমি সহ একটা টালির ছাওয়া ছোট বাড়ী কিনেছে, মামা এখন সেখানেই আছেন। টালিগঞ্জে বড় ছেলে অজয় সরকারী কোয়ার্টারে থাকে কিন্তু মামা এই টালিছাওয়া ঘরেই থাকতে ভালবাসেন—এটা যে তাঁর ছেলের নিজের বাড়ী। মামাকে ঐ পরিবেশে দেখে শবুর একই সঙ্গে শ্বশুরমশাই কালীনাথবাবু ও মা পদ্মিনীদেবীর স্মৃতি মনে পড়ে গেছে।

অধীরের বৌ বাড়ীতে ছিল না, কদিনের জন্য বাপের বাড়ী গেছে। একটু বেলায় পৌছলেও শবু সুযোগ পেয়ে নিজে হাতে রান্না করে মামাকে খাইয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছে। দীননাথ খেয়া পার হয়ে বাজার থেকে দই মিষ্টি মাছ এনে দিয়েছে। মামাও খুব আগ্রহ করে বাড়ীর উঠোন থেকে শান্তির শাক তুলে দিয়েছেন—এ শাক শবুর মার খুব প্রিয় ছিল, এবং শবুরও। মামা বলেছিলেন চাল কুমড়ো দিয়ে মটর ডাল রাঁধতে। পরে বলেছেন—

'ডালে কি ফোড়ন দিবি বলতো? মেথি আর কালোজিরে—বুঝলি? মটর ডাল আছে, আবার চাল কুমড়ো তাই, ঐ দুটোই লাগবে।'

মামা রান্নাও ভাল বোঝেন, এমন শ্বশুর পেলে নতুন বিয়ে হয়ে আসা বৌদের রান্না শিখতে বেশ সুবিধে।

মামার কাছে শুনে এসেছে বড়মামা এখনো বহরমপুরে মাষ্টারী করছেন। মা চলে গেলে এই বড় মামা বাবাকে দুঃখ করে চিঠি দিয়েছিলেন—আমরা বড় বড় দাদা দিদিরা বেঁচে থাকতে খুকী আমাদের আগে চলে গেল—তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারি গিরিন, আমি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই দুঃখ ভোগ করছি। শুভদাদাদার যৌতুকে পাওয়া বাড়ী ছাড়া বড়মামাদের আজো কোন বাড়ী হয়নি।

শুভেন্দুদার বাবা, শবুর বড় মেসোমশাই আর বেঁচে নেই। শুভেন্দুদারা সাত ভাই সাত জায়গায় থাকে। বড় মাসীমার নাকি বড় কষ্ট—কোন ছেলে তাঁকে ভাল মুখে কাছে রাখতে চায় না। শেষে ছোট একজন তাঁকে রেখেছে কারণ তার বৌ নাকি খুবই রুগ্ন।

ছোটমামার দুই ছেলে অধীর আর অনিত্যর সঙ্গে দেখা হল। অনিত্য আবার দীননাথ চাকরি ছেড়ে দেবে শুনে তাকে তাঁতের ব্যবসা করার পরামর্শ দিচ্ছিল। পাশেই ৩৪নং জাতীয় সড়ক শান্তিপুর কৃষ্ণনগরের দিকে চলে গেছে। রাস্তার ও পাশে বেশ কয়েকটা তাঁতকলে সারাদিন মাকুর খটখট আওয়াজ উঠছে।

অনিত্য বলেছে—'জামাইবাবু, আপনি যদি তাঁতের ব্যবসায় নামেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

অনিত্য ছেলেটাকে শবুর পছন্দ হয়নি। কানাইয়ের কাছে আগেই শোনা ছিল এখন দেখছে সত্যিই তাই—এক নম্বরের বেকার আর ধান্দাবাজ। আবার স্থানীয় একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বসে আছে, লেখাপড়াও স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত। মেয়েটি নাকি আবার জাতিতে তেলী—এদিকে মামা কে 'জলচল' তাই মেনে চলতে অভ্যস্ত।

অধীরের বৌ ছেলের সঙ্গে দেখা হল না। কাছাকাছি শীলা-শীতল ও তাদের এক মেয়ে এক ছেলে আছে শুনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে কথা দিয়ে শবুরা মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে। এই শীলার বিয়েতেই মা সেবার এসে শবুদের বাড়ীতে সাতদিন ছিলেন।

মা চলে যাবার পরে অনেকদিন বাদে ছোট মামাকে দেখে, তাঁকে নিজে হাতে রেঁধে খাইয়ে শবু খুব তৃপ্তি পেয়েছে। মা নেই, মামার মধ্যেই সে পেয়েছে মার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা। ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে শবু একান্তে দীননাথকে বলেছে—

ওগো 'ব' (বর), শুনছোরে, তুমি আমাকে আজ অনেক শান্তি, অনেক তৃপ্তি

দিয়েছ। তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে ইচ্ছে করছে।'

দীননাথ হেসে তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল শবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, শবুও কড়ে আঙুলটা ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়েছে হ্যাণ্ডশেকের কায়দায় —এটাই ওদের আদর আর কৃতজ্ঞতা জানাবার নিজস্ব ভঙ্গী।

চৈত্র মাস গিয়ে বৈশাখ এসেছে। মাঝখানে দীননাথ একদিনের জন্য পাটনা গিয়ে বদলির কিছু হয়নি জেনে আরো তিনমাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এসেছে। কারণ দেখিয়েছে—এখন আমার পক্ষে কলকাতা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঐ টুকুতেই হবে? না, তার ঐ এক কথা, এখন যা পারে করুক শা···।

কী সঙ্কট যে সামনে আসছে ভেবে শবু কোন কূল-কিনারা পায় না।

সুমনজীকে বাকি দুমাসের ভাড়া দিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছে, সুমন মনের আনন্দে তিনশ টাকার কিরদার খুঁজতে লেগে গেছে। শীলুয়ার মাকে টুল বেঞ্চ চৌকি ইত্যাদি দিয়ে এসেছে—সেও মাইজী ও বাবুজীর নামে রামজীর কাছে অনেক প্রার্থনা জানিয়েছে। সোম, চন্দ্র, গোকুলবাবু ও সুষমা-দিদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। গোকুলবাবু এক বছর পরেই রিটায়ার করবে। সুষমার মেয়ে জামাইরা শিগগীরই কলকাতায় বেড়াতে আসবে, এসে উঠবে এই বাড়ীতেই। সান্যাল মেসো রিটায়ার করে কলকাতায় কোথায় যেন চলে এসেছেন। রবি মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়নি।

দীননাথের মুখে পাটনার বর্ণনা শুনেছে আর সেখানকার আটবছরের, বিশেষ করে মার সেখানে থাকার স্মৃতি মনে পড়ে শবুর দুচোখে নেমে এসেছে জলের ধারা—আর সে হয়ত কোনদিন পাটনায় যাবে না। ফিরে দেখবে না মার স্মৃতিধন্য সে শহরটিকে।

এখন এই বৈশাখে এদিকে বাড়ীতে জলের সমস্যা প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। কবছর আগে বাড়ীতে জলের পাইপ নেয়া হয়েছে, এক বছর বাদে টিউবওয়েলটা উঠিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে—অব্যবহারে অকেজো হয়ে পড়ছিল। মঙ্গলা দেবীর একার কতটুকু জলই বা লাগে।

তখন কলে বেশ ভাল জলই আসত, বাথরুমে একটা শাওয়ার লাগানো হয়েছিল সেটা দিয়ে জোরে না হলেও ঝির ঝির করে জল পড়ত। শোভারা নতুন বাড়ী করে এসে দুবছর শবুদের পাইপের জল দিয়েই আটদশ জনের সংসারের সব প্রয়োজন মিটিয়েছে। এখন শাওয়ার ত দূরের কথা, নীচের কলেই সুতোর মত জল পড়ে।

গ্রীষ্মকাল, এত জলের কষ্ট দেখে শবু আর দীননাথ ঠায় কলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এক বালতি এক বালতি করে জল ধরে চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করে। তার পরে সব কটা বালতি ভরে রেখে দুপুরে খেয়ে দুজনে একটু শুয়ে বিশ্রাম করে।

সেই সময় মঙ্গলা দেবী গিয়ে পাটনা থেকে আনা শবুদের বালতিটা ছাড়া আর সব বালতির জল ড্রেনে ঢেলে দিয়ে বালতিগুলো উবুড় করে রাখেন আর গজগজ করেন—

'সব সময় জল রেখে রেখে আমার বালতিগুলো ফুটো করে ফেলবে। জল জল করে সব হেদিয়ে মরছে। আসছে বর্ষা—তখন দেখে যেন কত জল—ঘরে জল বাইরে জল।'

কবে বর্ষা আসবে আর এই গরমে এত কষ্ট করে ধরা জল সব ঢেলে দেন। রোজ শবুরা জল ধরে রাখে আর পরে মঙ্গলা দেবী সব ঢেলে দিয়ে বালতি উবুড় করে রাখেন। কি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ!

এরই মধ্যে সুষমাদি ও তার ছোট বোন সুচিরাদির দুই মেয়ে দু জামাই ছেলে-মেয়ে সহ দশজনের দল এসে তিন দিন থেকে বেড়িয়ে গেল। বাড়ীতে নাই জল, দুটো মাত্র টেবিল ফ্যান—দুর্ভোগের চূড়ান্ত। বাড়ীর জলে কোন রকমে রান্না খাওয়া চলে—আর সব কাজের জন্য আশপাশের বাড়ীর টিউবওয়েল আর কুয়ো পুকুরের জল সম্বল।

সুষমারা দীননাথদের গ্রামের মেয়ে, দশ রাত্রির জ্ঞাতি। মঙ্গলা দেবী তার মেয়ে জামাইদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করেছেন। একদিন তারা সবাই মিলে চিড়িয়াখানা বেড়িয়ে এসে জানাল—সুষমার মেয়ের ব্যাগ থেকে তিনশ টাকা হারিয়েছে। যাবার সময়ই ষ্টেশনে রিক্সা ভাড়া দিতে গিয়ে দেখে টাকা নেই ব্যাগে।

ওরা খুব ভদ্র। বলল—না, না, বাড়ীতে বোধ হয় হারায়নি, পথেই হয়ত পড়ে গেছে অজান্তে। কি করে এতগুলো টাকা চুরি গেল ভাবতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। শবু ও দীননাথ তাদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার—সামনে অভাব দুর্দিন আসছে তবু এমন কাজ তারা করেনি। বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি মঙ্গলা দেবী। তাঁর স্বভাবে আর যা দোষ গুণই থাক—অন্যের টাকায় তিনি হাত দেবেন শবু তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে না। এক শবুদের বদনাম করার জন্য যদি কোথাও সরিয়ে রাখেন তবে সে কথা আলাদা। কিম্বা বড় বোনের টাকা ছোট বোনের কেউ কিছু করেছে কিনা

বলা যায় না—তাদের সংসার ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন হতে পারে।

তবু যাবার সময় মেয়ে জামাইরা খুব ভাল ব্যবহার করে গেল। বড়জামাই বলল—

'মামা, আপনারা ত আর পাটনায় যাবেন না ঠিক করেছেন। যদি কখনো বেড়াতে যান, আমাদের বাড়ীতে অবশ্যই উঠবেন।'

ওরা চলে গেল।

বড় জামাইয়ের কথা মঙ্গলা দেবীও শুনেছেন। তাঁর মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে এল। দিনে দিনে যে তাতে শ্রাবণ আকাশের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তাও জানা।

অনেকদিন পরে বেহালায় দিদিদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারল জামাইবাবু সুশীল কমাস হল রিটায়ার করেছে। জামাইবাবুর শরীরও ভাল থাকেনা—এদিকে তার পেনশন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়নি। দিদিরা খুব কষ্টে আছে, বাবুলের চাকরি বাকরি কিছু হয়নি, বুলার বিয়েরও কোন চেষ্টা হচ্ছে না। এদিকে শবুদের সামনেও দুর্দিন।

বেহালাতেই এখন থাকে দীননাথের অফিস-বন্ধু সুবীর বাবুরা। সেখানে যেতে সুবীরের বৌ মালা বলল—

'চাটুকারটা দাদাকে কি ঘুরিয়েই মারছে ভাই। সেবারে দাদার কলকাতা বদলির অর্ডার এল, চাটুকার কারসাজি করে তা ভেস্তে দিলে।'

সুবীর বলল—'লাহিড়ী বাবু আসেননি ভালই হয়েছে। এলে আপনি টিকতে পারবেন না। চাটুকার তার কর্তাভজা লোকদের নিয়ে অফিস ভরে ফেলেছে। আর দেবেশ ত এখন প্রমোশন পেয়ে চুটিয়ে চাটুকারকে তেল দিচ্ছে। নিজের ভাই যোগেশকেও এ অফিসে চাকরিতে ঢোকালে।'

দীননাথ বলল—'আমি ওসব কিছু গ্রাহ্য করিনা। আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে—বারো বছরের উপর বাইরে আছি, এখন চলছে অজ্ঞাতবাস। ছুটির পর ছুটি নিয়ে বসে থাকব যতদিন কলকাতায় বদলি না করছে। একবার বদলি হয়ে এলে চাটুকার আমার কি করবে? কিছুদিন আগে চাটুকার পাটনায় গেছিল, পাঁচটার পরে কনফারেন্স ডেকেছিল—আমি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি, পাঁচটার পর এ-শর্মা কারো কেনা গোলাম নয়। দেবেশ যোগেশকেই বা ভয় কিসের?'

চাটুকারের নাম শুনলেই দীননাথের মাথা গরম হয়ে যায়।

মেয়ে মণীষা বলল—'জ্যোঠিমা, ভাল সময় এসেছেন, কদিন পরে ভাইয়ের পৈতে হবে বাসনায়। আপনাদের যেতে হবে।'

সুবীর বলল—'হ্যাঁ লাহিড়ীবাবু বৌদিকে নিয়ে আপনিও চলুন না কেন?'

খোকা বলল—'জ্যেঠু, আপনি মোটর বাইক নিয়ে চলুন—বেশ মজা হবে, আমি আপনার পিছনে বসে যাব।'

দীননাথ মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে নেচে উঠল—'গেলে মোটর বাইকেই যাব। জি. টি, রোড ধরে সোজা বর্ধমান, পরে ভাতার হয়ে বাসনা গ্রাম।'

মালা বলল—'খোকার মোটর বাইকে যাওয়া হবে না, রক্তপাত হলে পৈতে আটকে যাবে।'

সুবীর বলল—'আমিই যেতুম, কিন্তু আমাদের সবাইকে কদিন আগে যেতে হবে, সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

দীননাথ বলল—'তবে আমরা দুজনেই মোটর বাইকে পাড়ি দেব।'

বছর তিনেক আগে দেড়টাকার পেট্রোল তিনটাকা হতে প্রথম ধাক্কাতে অনেকেই নিজেদের গাড়ী বিক্রি করে দিয়েছিল, এখন ত বুঝি আরো বেশী। শবুদের সামনে দুর্দিন। তবু হুজুগ পেলে দীননাথকে আর ঠেকায় কে?

শবু বলল—'যখন হুজুগ চেপেছে, তখন যেতেই হবে।'

চার

এদিকে বাড়ীতে একটু একটু করে মেঘ জমে উঠছে।

মাস পয়লায় দীননাথের পরের ভাই মহী এসেছে মার জন্য একগাদা ফল মিষ্টি নিয়ে। কিছুক্ষণ মার সঙ্গে কথা বলে মহী এসে দীননাথকে বলল—

'সেজদা, মার রেডিও শোনা বন্ধ করেছিস কেন?'

দীননাথ বলল—'সে কী কথা! বাড়ীতে রেডিও প্রায় সব সময় বাজে। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত কোন খবর ত বাদ যায় না!'

মহী বলল—'না, তুই মার রেডিওর তার খুলে দিয়েছিস। মা সন্ধ্যের বাজারদর পল্লীমঙ্গল শুনতে পায়না।'

দীননাথ বলল—'তার খোলার কথা বলছিস? এই নতুন ট্যাজিসটার সেটে এখন এলিমিনেটর লাগিয়েছি। কাছাকাছি প্লাগ পয়েন্ট ঐ একটাই। এটা নতুন রেডিও, সাউণ্ড কত ভাল—আর সব সময় কলকাতা 'ক' এর অনুষ্ঠানই

বাজানো হয়, পল্লীমঙ্গলও অনেক সময় বাজাই। বাজায়দার ত বাজারে গেলেই টের পাওয়া যায়।'

মহী বলল—'অন্য ঘরে রেডিও বাজলে মায় শুনতে অসুবিধে হয়।'

দীননাথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—'এ ঘর ও ঘর কি বলছিস? তুই এইখানে দাঁড়িয়েই দুদিকে হাত বাড়িয়ে দুই রেডিও ছুঁতে পারিস, মাঝখানে এই দরজা সব সময় এবং অনেক রাত অবধি খোলা থাকে। অসুবিধে হবে কেন?'

মহী আবার বলল—'না, মা তার রেডিওই বাজাবে।'

দীননাথ বলল—'ঠিক আছে, একটা মাল্টিপ্লায়ার প্লাগ লাগিয়ে দেব, তখন দুটোই ইচ্ছেমত বাজানো যাবে।'

রেডিও বাজানো নিয়েই কত ঝামেলা। শবু নিজে হাতে কখনো রেডিও বাজায় না বললে চলে। দীননাথ ছয়শ টাকা দিয়ে নতুন রেডিও কিনলেও শবু তাতে হাত দেয়না। নেহাৎ দীননাথ বাড়ীতে না থাকলে দুপুরে রবীন্দ্র সংগীত বা রাতে শুক্রবারের নাটকটা শোনে। তাও শুধু সুইচ অন্ করা আর অফ্ করা—কাঁটা ঘোরাবার ব্যাপার সে বোঝেই না।

শবু ভাবছে—এই কি সেই পাটনায় দেখা মহী। ট্যুরে গিয়ে উঠত রেষ্ট হাউসে কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে 'বৌদি' 'বৌদি' বলে কথা বলত, শবুর কাঁচা হাতের গীটার বাজনা শুনে তারিফ করত, বড় ভাসুরঝি সুরমা থাকা কালে এক দিন মুরগীর মাংস কিনে শবুকে দিয়ে রাঁধিয়ে সবাই মিলে খেল।

নাকি সেই বি. টি. রোডের বাড়ীর মহী আবার স্বরূপে হাজির হয়েছে! একান্নবর্তী সংসারের স্বপ্ন ভেঙে গেল, মেজদা বিশ্বনাথ মারা গেল, মেজবৌদি রেখা বিধবা হল, দীননাথের টি. বি. হল—আবার কি সেই···।

মঙ্গলা দেবীই বা কেন রেডিওর কথাটা নিজে দীননাথকে না বলে মহীর কাছে বললেন? তাঁর কাছে কি মহী আপন আর দীনু পর?

দুদিন পরেই এল করবী মহীর কিনে দেয়া ফল মিষ্টির ছাদা বাঁধতে। বাড়ীতে দাদা বৌদিকে দেখে মাকে জিজ্ঞেস করল—

'মা, সেজদারা এখনো পাটনায় যায় নি?'

করবী আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেও মঙ্গলা দেবী চড়া গলায় জবাব দিলেন—

'যাবে কি? ছেলে আমার বদলি বদলি করে হেদিয়ে মরছে। বাড়ীতে কি মধু না ধন সম্পত্তি লুকানো আছে, সবাই লুটেপুটে খাচ্ছে। তাই সে

এখানে টানা নিয়ে পড়ে আছে। আরে বাবা, অফিসে কি কুকীর্তি করে গেছে তাই ওকে আর এখানে বদলি করবে না। ওদিকে ভবাটার কিছুতে কলকাতায় বদলি হচ্ছে না, অথচ একটু চেষ্টা করলেই ওর বদলি হয়।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

করবী এক সময় দেঁতো হাসি হেসে শবুকে জিজ্ঞেস করল—

'বৌদি, তোমরা পাটনায় কবে যাবে?'

বিতৃষ্ণায় শবুর মন ভরে উঠল, বলল—

'আপনার দাদা গেলে আজই যাই।' যদিও করবী দীননাথের অনেক ছোট তবু শেফালীর মত শবুও তাকে ছোড়দি বলে, আপনিও বলে।

করবী চলে গেলে শবু দীননাথকে বলল—

'তুমি যে আর পাটনায় ফিরে যেতে চাওনা, সে কথা মাকে সোজাসুজি বলনা কেন?'

দীননাথ বলল—'কি বলব? শুনলে ত মার উক্তিগুলো! মনে নেই, সেবারে আমার বদলির অর্ডার হয়েছে শুনে বলেছিল—কেন, কলকাতায় বদলি হল কেন? হয়ত মা-ই অফিসে চিঠি লিখে আমার বদলি আটকে রেখেছে—চাটুকারও একটা জোরালো পয়েন্ট পেয়ে গেছে। মা সব পারে।'

অদ্ভুত কথা! মা ছেলেতে ত এই সম্পর্ক। তবু যদি খোলামেলা কথা হ'ত তবে এত কথার সৃষ্টি হয়না। তা কেউ বলবে না। আর মাঝখানে যাঁতাকলে পড়ে শবু পিষ্ট হচ্ছে।

আবার কথা শুনতে হল। রাতে শবুর শরীরটা খারাপ ছিল। সকালে ঘুম ভাঙতেই দীননাথ বলল—

'তুমি এখন শুয়ে থাক। অফিস নেই, তাড়াহুড়োর কি আছে?'

শবুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দীননাথ উঠে দরজা খুলে ঘরের বাইরে গেল। মঙ্গলা দেবীর ততক্ষণে একবেলার কাজ প্রায় সারা। দীননাথ তাঁকে বলল—

'মা, শ্রাবণীর শরীরটা খারাপ, আপনি ওর চা এখন করবেন না।'

মঙ্গলা দেবী সাত সকালেই ফুঁসে উঠলেন—

'সে কথা আগে বললেই হত, তৈরী চা ফেলা যেত না।'

দীননাথ নিজে থেকেই বলল—'আমরা ত আজকাল দেরী করে উঠি। সে যখন উঠে চা খায় তখন নিশ্চয়ই তা জল হয়ে যায়। যখন উঠবে সুবিধে মত চা করে নিয়েই খেতে পারে।'

মঙ্গলা দেবী প্রচণ্ড রেগে গেলেন—'খুব দাসী বাঁদী পাচ্ছিস না? যা হুকুম করছিস তাই করতে হবে? আমার হাতের চা খেতে তোদের বৌদের ভাল লাগে না বলে দিলেই হয়। আমি কারো ধার ধারি না।'

দীননাথ কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে চলে গেল।

শবুর খারাপ শরীর কথার ঝাঁঝে মুহূর্তের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠল। কি কথা থেকে কি কথা শুনতে হল। সকালের চা মঙ্গলা দেবী করলেও বিকেলের চা শবুই করে, মাকেও দেয়। ঘরের কাজ, রান্নার যোগান দেয়া, বাসনপত্র মাজা সব কাজেই সে হাত লাগায়। অনেক সময় শবু নিজের পান সাজার সময় আলাদা করে পান সেজে দোক্তা দিয়ে হামাল দিস্তায় থেতো করে মঙ্গলা দেবীকে দেয়। কথা বার্তাও হয়। মন্দির শহর থেকে ঘুরে এলে মা জিজ্ঞেস করেন—বাবা কেমন আছে? শবু বাবার কথা বলে। ভাই নন্দু কেমন আছে? কানাইয়ের বৌ শ্বশুর ভাসুরের সেবা করে কিনা? মেয়েগুলো কত বড় হয়েছে? আজ কি কি রান্না হবে? দীনুকে বলে দি আর যেন সজনে না আনে—দানা পটপটে হয়ে গেছে।

উপর উপর মোটামুটি সব ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত বিষ! শবু ত রোজ সকালে ঠাণ্ডা চা খায় তাই নিয়ে সে কোন দিন কিছু বলেনি। চিরদিনই অফিস স্কুল কলেজের জন্য সে ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় উঠেছে। এখনই কদিন তাড়া নেই বলে ছটায় উঠছে। মা ত সন্ধ্যে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়েন ওঠেনও সেই পাঁচটায়। শবুদের শুতে শুতে রাত দশটা সাড়ে দশটা বাজে। দীননাথের খাওয়া টাইম বাঁধা—বেলা একটা আর রাত নটা। সব মিটিয়ে শুতে শুতে সেই রাত সাড়ে দশটা।

কি দরকার ছিল দীননাথের চায়ের কথাটা বলার, সে না হয় ঠাণ্ডা চা-ই খেত।

সামনে দুর্দিন, পিছনে বাড়ীতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে এই অবস্থায় শবু ও দীননাথ মঙ্গলা দেবীকে বলে এক সকালে রওনা হল সুবীরের ছেলের পৈতেতে।

ভ্রমণ মানেই মুক্তি। বেড়াতে বের হলে সাময়িকভাবে দুঃখ দুর্দশা দুর্যোগের কথা ভুলে থাকা যায়। অন্ততঃ তিনটে দিনের মুক্তি।

সকাল ছটায় মোটর বাইকে বসে বেলুড়ে তপুদের বাড়ীতে একটা চক্কর দিয়ে চা জলখাবার খেয়ে দুজনে এগিয়ে চলল সোজা জি. টি. রোড ধরে।

বালি উত্তরপাড়া কোন্নগর রিষড়া হয়ে একসময় শ্রীরামপুরে থেমে আবার চা খাওয়া। আবার পাণ্ডুয়ায় চা খেয়ে যখন বর্ধমানে পৌঁছল তখন বেলা দশটা। সেখানে এক পেট মিহিদানা সীতাভোগ মিষ্টি ও চা খেয়ে ধরল কাটোয়ার পথ। কর্জনায় চটি পার হয়ে ভাতারে সুবীরের দাদা অধীর ডাক্তারের বাড়ীতে পথঘাট জেনে নিয়ে আবার পথ চলা। এবারে অচেনা রাস্তা ধরে সাঁওতালপাড়ার মোড়ে এসে পাকা সড়ক ছেড়ে গাড়ী চলল গরুর গাড়ী চলা কাঁচা রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে। আরো দু মাইল গিয়ে বাসনা গ্রাম, সুবীরদের বাড়ী—বেলা বারোটা। পথে আসতে সেই নদীটা আর চোখে পড়ল না যেটাতে সেবারে ওরা গরুর গাড়ীসুদ্ধ নেমে পার হয়েছিল। দীননাথ বলল ওরা নাকি একটানা সোয়া শ কিলোমিটার পথ এসেছে।

তখন ঘড়িতেও বারোটা বাজে, শবুর শরীরেরও বারোটা বেজেছে—মেয়ে মানুষ হয়ে ক্রমাগত ছ ঘণ্টা ধরে ঠায় গাড়ীর পিছনে বসে থাকা কত কষ্টকর। তবু সে দীননাথকে একা গাড়ী নিয়ে দূর পথে যেতে দেবে না—পথে যদি কিছু হয় দুজনেরই হোক। এতদূর পথ শবু আর একবারই মাত্র গিয়েছিল পাটনা থেকে রাজগীর—একশ কিলোমিটার।

বাড়ীতে পৌঁছতে মালা মণীষা খোকা সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সুবীর বর্ধমানে বাজার করতে গেছিল—ফিরল ঘণ্টা দুই পরে। মণীষা গ্রামে সে সময় চব্বিশ প্রহর নাম-কীর্ত্তন শুরু হয়েছে খবর জানিয়ে শবুকে একবার তাম্বুলীর পুকুরে ঘুরিয়ে আনল। সেখানে গাছপালা ঘেরা ভাবটা যেন কমে এসেছে, গ্রামের মেয়েদের আনাগোনাও কমেছে, অনেকের বাড়ীতেই বোধ হয় বাথরুমের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিকেল পড়ে আসছে এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে একটি গরুর গাড়ী সুবীরের বাড়ীর সামনে থামল। গাড়ী থেকে নামল মালার মা, ভাই, ভাই বৌ ও দুটি বাচ্চা—একটি কোলে ও একটি হাতধরা। আর নামল এক বস্তা ভাল চাল, বস্তা ভর্ত্তি চিড়ে মুড়ি ও হাঁড়ি ভর্ত্তি গুড়—নাতীর পৈতেতে দিদিমার ভেট। গাড়ীর গাড়োয়ান মিঞাজান বলদ দুটোর খিদমতে লেগে গেল—আর মালার ভাই মিঞাজানের। এতক্ষণে বাড়ীটাকে উৎসবের বাড়ী মনে হচ্ছে।

তার কারণও আছে। সুবীরের ডাক্তার বাবা অনেক বছর হল মারা গেছেন, তাঁর ডাক্তারখানা ঘরটা প্রায় ভেঙে পড়েছে। সুবীরের মা-ও বছর দুই আগে মারা গেছেন। বাড়ীটা সারা বছর তালাবন্ধ পড়ে থাকে প্রতি-

বেশী গণেশ মাষ্টারের ভরসায়। সুবীররা গ্রামে এলে তবে এ বাড়ীতে সাড়া জাগে।

সন্ধ্যের পর একদিকে পরদিনের পৈতের প্রস্তুতি চলছে উঠোনে হ্যাজাক জ্বালিয়ে—আর একদিকে ডাকে আসা তিনদিনের বাসি খবরের কাগজ নিয়ে জটলা জমেছে। এসেছে গণেশ, গাঁয়ের জামাই অনন্ত ঘোষাল ও গ্রামের মুরুব্বি মাঝ বয়সী শিশির চাটুয্যে—সুবীর পরিচয় করিয়ে দিল সে নাকি ভাতারে ভোলাবাবুর দক্ষিণ হস্ত।

লেগে গেল দীননাথ ও শিশিরে তর্ক—এমার্জেন্সী ভাল কি মন্দ। সুবীর ও গণেশ শিশিরের পোঁ ধরল, জামাই অনন্তর কলকাতায় ফুটপাথে বই-পত্রিকার দোকান আছে—সে নিরপেক্ষ রইল। দীননাথ একা তিনজনের সঙ্গে লড়ছে। হঠাৎ প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেল মালার ভাইয়ের—সে এমার্জেন্সী সমর্থন করে না, শোষণও পছন্দ করে না। মালার ভাইটিকে হঠাৎই শবুর ভাল লেগে গেল—ঠিক যেন কানাইয়ের মত, বয়সও কানাইয়ের সমান বোধ হয়।

একটু রাত করে গ্রামের বারোয়ারী তলায় সবাই গিয়ে একটু নাম কীর্ত্তন শুনে এল—সেটা নাকি একটানা চব্বিশ প্রহর ধরে চলবে অর্থাৎ তিনদিন তিন রাত। দূর দূর গ্রাম থেকে আউল বাউলের দল এসেছে। একটি ছোট খাট মেলাও বসেছে প্লাষ্টিকের নানান জিনিষ ও খেলনা আর পাঁপড় জিলিপির দোকান দিয়ে।

খুব সকালে মালার ভাই রাখালের 'গুড্ মর্ণিং বৌদি' সম্বোধন শুনে শবুর ঘুম ভাঙল। কাল তাকে মিঞাজানের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করতে দেখে শবু তাকে ওদের মতই মুখ্যুসুখ্যু ভেবেছিল। রাখালের মুখেই শুনল—সে ওভারসীয়ারী পাশ করে গ্রামেই জমিজমা দেখে কারণ সে বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, আর গ্রামের গরিবদের উন্নতির জন্য কাজ করে। শুনে শবুর আরো ভাল লাগল—ঠিক যেন ভাই কানাই।

পৈতের কাজ কাম শুরু হয়ে গেছে। ভাতার থেকে এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাতার দাদা এসেছে—সে-ই হবে খোকার আচার্য্য গুরু। পুকুরে জাল ফেলে কিছু রুই কাতলা ও আধমণটাক মৌরলা মাছ তোলা হয়েছে। বড় মাছগুলো সবাই মিলে হৈ হৈ করে কাটল। তারপর মৌরলা মাছগুলো কুটতে গিয়ে কাজের বাড়ীতে আর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। শবু মণীষা ও রাখালের বৌ ছবি বসেছে মাছ কুটতে। মণীষা কাজের অজুহাতে একসময়

উঠে গেল। কিছু পরে কোলের ছেলেটাকে হাগাতে, বুকের দুধ খাওয়াতে ছবিকেও উঠতে হল। শবু একা আধমণ মৌরলার পেট কেটে চলেছে। অবস্থা দেখে সুবীর দীননাথকে ধরে আনল, বলল—

'মিছিমিছি শিশিরের এমার্জেন্সীর পিছু না লেগে আমার এই মাছের এমার্জেন্সী সামাল দিন দিকি।'

আধমণ মৌরলা মাছ কুটে শবু আর দীননাথ যখন উঠল তখন আর তারা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। এতকষ্টে কোটা মাছগুলোকে কার্পণ্য করে নাম-মাত্র তেল হলুদ দিয়ে যখন কড়াইতে ছ্যাচড়া পোড়া করল মালারা তখন কাঁচা মাছ পোড়া দুর্গন্ধে শবুর গা গুলোতে লাগল।

পৈতে, খাওয়া দাওয়া মিটতে দীননাথ ডাক্তার ও তার ছেলে—দুজনকে গাড়ীর পিছনে বসিয়ে ভাতারে পৌছতে গেল—ফিরল একটু রাত করে বর্ধমান থেকে পেট্রোল নিয়ে ও ডাক্তারের আর এক ছেলেকে পিছনে বসিয়ে। খোকার দুঃখ সে এখন ঘর-বন্দী, বারোয়ারী তলায় যেতে পারবে না, মোটর বাইকেও চড়া হচ্ছেনা।

আবার সকালে উঠে বাউলের দল যখন বাড়ী বাড়ী নামগান করে যাচ্ছে তখন শবুরা রওনার জন্য প্রস্তুত হল। সুবীর মালা মণীষা এমন কি রাখাল ও ছবি কত করে আর একটা দিন, না হলে অন্তত দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যেতে বলল। দীননাথের এক কথা—তিনদিনের প্রোগ্রাম করে এসেছে আজই ফিরতে হবে, বিকেলে যাওয়া যাবে না গরম লাগবে, এতদূরের পথ, আবার সন্ধ্যের দিকে কালবৈশেখী উঠে আসতে পারে। কালবৈশেখীর কথাটা মালার মাও সমর্থন করল। চা জলখাবার খেয়ে শবুরা বেরিয়ে পড়ল গ্রামের পথে গাড়ীর চাকায় ধুলো উড়িয়ে।

ভাতারে ডাক্তারের বাড়ীতে একবার নামতে হল, সুবীরের বৌদি কাল নাকি দীননাথকে বারবার বলে দিয়েছে। সুবীরের বৌদি শবুকে চা বিস্কুট খাওয়াল, দীননাথকে দিল একগ্লাস বাড়ীর গরুর দুধ। আবার পথে বেরিয়ে দীননাথ শবুকে বলল—

'কাল বাপ-বেটাকে গাড়ীতে করে পৌছে দিয়েছি ত, তারই প্রতিদান দিল। না হলে সুবীরদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ভাল নেই।'

শবুও সে কথা মালার মুখে শুনেছে।

এবার চোখ কান বুজে সোজা কলকাতার দিকে এগিয়ে চলা। বর্ধমান

ছাড়িয়ে মেমারীতে এসে শবুর পেটের ভিতর ভীষণভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। তিনদিনের ধকলে, প্রচণ্ড গরমে আর নাকে লেগে থাকা পোড়া মাছের দুর্গন্ধে গা গুলোচ্ছে। গাড়ীটা টলে উঠতে দীননাথ একটা গাছের ছায়ায় গাড়ী দাঁড় করাল, জিজ্ঞেস করল—

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে, নাকি ঘুম পেয়ে গেছিল?'

শবু কি বলবে, মাঝপথে কীই বা করার আছে? বলল—'না, ঠিক আছে চল।'

তবু দশ মিনিট গাছের নীচে জিরিয়ে নিয়ে আবার গাড়ী চলতে শুরু করল। ব্যাণ্ডেলের মোড়ে পৌছে দীননাথ দেবানন্দপুরের দিকে গাড়ী ঘোরাল, যেতে যেতে বলল—

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে, চল শিলং এর পরিচিত শিবেশ্বরবাবুর বাড়ীতে যাই—সেখানে তোমার বিশ্রাম হবে, পারলে দুপুরে ওখানেই দুটি খেয়ে নেয়া যাবে। বেলা এগারোটা—চাঁপাতলা এখনো অনেক দূর।'

খবর দেয়া নেই, আচমকা গিয়ে পৌছা। শিবেশ্বর বাবুর স্ত্রী পাঁচ মাইল দূরে এক বিয়ে বাড়ীতে গেছে। শিবেশ্বরবাবু তার ভাইবৌদের সাহায্যে খুব খাতির করল, অবেলায় ডিমের ঝোল ডাল ভাত রেঁধে সঙ্গে আম দুধ খেতে দিল। খেয়ে উঠে শবুকে মেয়ে মহলে খোঁজ করে বাথরুমে ছুটতে হল একেবারে রক্ত আমাশা। শিবেশ্বরবাবু ঘর থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিল। দু ঘণ্টা মড়ার মত শুয়ে থেকে একটু বেলা পড়লে শবুরা রওনা হল। শিবেশ্বর বাবু সঙ্গে এসে শরৎচন্দ্রের বাড়ী দেখাল, শোনাল তার নিজের শরৎবাবু সম্বন্ধে ছোট বেলার স্মৃতি। শিবেশ্বর বাবুকে চাঁপাতলায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আবার রওনা হল।

আবার বেলুড়ে তপুদের সঙ্গে দেখা করে আর একবার বাথরুম ঘুরে ওরা যখন বালী ব্রিজে উঠেছে তখন কালবৈশেখীর মেঘে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। আধঘণ্টা বাদে যখন গাড়ীটা বাড়ীতে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় আছড়ে পড়ল। শবু কোন রকমে হাত মুখ ধুয়ে শাড়ীটা পাল্টে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। মামীমার ছোট ছেলে ভুলু এসে খবর দিল—

'কাল রাতে বৌদির একটি মেয়ে হয়েছে।'

পাঁচ

বাইরের ঝড় বৃষ্টি এক ঘণ্টাতেই থেমে গেছে। পরদিন সকাল থেকে বাড়ীতে একটু একটু করে ঝড়ের আভাস দেখা দিতে লাগল।

কথার ভয়ে, শরীর খারাপ থাকলেও শবু সকাল সকাল উঠে পড়েছে। দীননাথ হাত মুখ ধুয়ে অন্যদিনের মত জিজ্ঞেস করল—

'মা, বাজার থেকে কি কি আনতে হবে ?'

মঙ্গলা দেবী 'যা হয় আন' বলে অন্য কাজে চলে গেলেন।

দীননাথ বাজার থেকে নিরামিষ বাজার করে নিয়ে এল, মাছের উপর এখন ঘেন্না ধরে গেছে।

মঙ্গলা দেবী নিজের রান্না সেরে শবুর জন্য উনুন ছেড়ে দিয়ে থলে হাতে বাইরে গেলেন আর কিছু পরে আর একপ্রস্থ বাজার করে নিয়ে এলেন।

কি হল! শবু আর দীননাথ মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

পরপর রোজই এই অবস্থা চলতে লাগল। একই বাড়ী থেকে দুই প্রস্থে হাট বাজার হচ্ছে—যদিও হেঁসেল একই আছে। বাইরের লোকে ত তা বুঝবে না, তারা দেখবে বাইরেটা। এতে শবুরই বদনাম হবে, লোকে বলবে বৌ এসে শাশুড়ীকে আলাদা করে দিয়েছে।

দীননাথ গ্রাহ্য করল না, বলল—'দেখাই যাক কতদিন এরকম চলে।'

হঠাৎ একদিন মঙ্গলা দেবী ভালমানুষের মত বললেন—'দীনু, রিফিউজী কলোনীর বাড়ীতে দাদার বড় ছেলে ঘেটু এসে গেড়ে বসেছে, ঝণ্টু যা দূরে চাকরির জায়গায় থাকে। তুমি আর তুই মিলে ঘেটুকে ও বাড়ী থেকে তোল ত।'

দীননাথ বলল—'সেটা ওদের বাপের বাড়ী, আমি তাকে তুলব কি করে ?'

'না, ও বাড়ী আমার নামে, এ বাড়ীর টাকায় তৈরী হয়েছে। দাদা মারা যাবার আগে ঘেটুকে মৌখিক ভাবে ত্যাজ্যপুত্তুর করে গেছে।'

'তবে সে ঝণ্টু বুঝুকগে, তার দাদার সঙ্গে লাঠালাঠি করুক।'

'ওবাড়ী আমার, আমি সেখানে ঝণ্টুকে ছাড়া আর কাউকে থাকতে দেব না। দরকার হলে মিশনকে দান করে দেব। তোরা ঘেটুকে ওঠা।'

দীননাথ বলল—'ভাল মুশকিল, এতদিন জানলাম ওবাড়ী মাতুলের—এখন শুনছি আমাদের। কবে আমরা সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে বাড়ী তুললাম তাও ত জানিনা। যদি হয়ও, আমরা সব যে যার মত বাড়ী করেছি অন্য বাড়ীর প্রতি আমাদের কোন লোভ নেই।'

মঙ্গলা দেবী রেগে উঠলেন—'তোদের দ্বারা আমার কোন উপকার হয় না। দেখি আমি নিজেই যা পারি করে আমার সম্পত্তি রক্ষা করব।'

দীননাথ চুপ করে রইল। বাড়ীতে সবাই জানে সেই জবর দখল করা জমিটা যদিও মা মঙ্গলা দেবীর নামে কিন্তু সেখানে যা কিছু হয়েছে মাতুলের জমিদারীর টাকা থেকেই নাকি হয়েছে। সে জমি বাড়ী কার টাকায় কতটা হয়েছে সে রহস্য জানতেন বাবা কালীনাথ ও মেজদা বিশ্বনাথ। ঐ বাড়ী এ সংসারের টাকায় হয়েছে—মঙ্গলা দেবীর এই স্বীকারোক্তি শোনার জন্য তাঁরা আর বেঁচে নেই।

এভাবে প্রায় দু'সপ্তাহ চলার পরে একদিন মঙ্গলা দেবী বললেন—

'দীনু, কাল আমি দু তিন মাসের জন্য এলাহাবাদে সোনার কাছে যাচ্ছি।'

দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'কার সঙ্গে যাবেন?'

মঙ্গলা দেবী বললেন—'কার সঙ্গে আবার? আমি দু জায়গায় চিঠি লিখে দিয়েছি। কাল করবীর এক ছেলে এসে হাওড়ায় আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে—ওখানে সোনা আমাকে নামিয়ে নেবে। সোনা ত রেলের কোয়ার্টারে থাকে, আমার চেনা। সোনা না এলেও আমি যেতে পারব অনায়াসে।' দীননাথের কোন সাহায্যের তাঁর দরকার নেই।

পরদিন মঙ্গলা দেবী করবীর বড় ছেলে দাদুর সঙ্গে রওনা হয়ে যাচ্ছেন এলাহাবাদে ছোট ছেলের কাছে খবর পেয়ে মামীমাও এসেছেন। মামীমা ও শবু তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করল। মঙ্গলা দেবী নিস্পৃহভাবে রিক্সায় উঠে বসলেন। দীননাথ ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে শবু মামীমাকে জিজ্ঞেস করল—

'আচ্ছা মামীমা, কলোনীর বাড়ী থেকে মা ঝণ্টুর দাদা ঘেটুকে উঠাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন কিছু জানেন?'

মামীমা বললেন—'কি জানি শ্রাবণী। তবে তোমরা যখন বর্ধমানে গেছিলে সে সময় বড় ভাগ্নে এ বাড়ীতে এসেছিল, তার সঙ্গেও সে বাড়ী নিয়ে কথা হতে শুনেছি। করবী শেফালীরাও এসে ঘুরে গেছে। মনে হচ্ছে বড়দি ঘেটুকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বাস করতে চান।'

'তার মানে আমরা মাকে ঘর ছাড়া করছি কিম্বা মা আমাদের সঙ্গে বাস করতে চান না?'

'আমার মনে হয় তোমার পরের কথাটাই ঠিক।'

ভয়ে শবুর বুক কাঁপছে। দীননাথ বাড়ী ফিরতে শবু ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল—'মা চলে গেলেন, এখন কি হবে?'

দীননাথ বিরক্তভাবে বলল—'আমি মরছি নিজের জ্বালায়, ও সব ঘোঁট পাকানো নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজী নই। যা হয় হবে।'

শবুর মনে হচ্ছে—ব্যাপারটা এইখানেই থেমে থাকবে না, জল অনেকদূর গড়াবে······কতদূর তা সে জানে না।

মঙ্গলা দেবী গেলেন আর তার মাত্র কদিন পরে পাড়ায় একটা অঘটন ঘটল। এক মাঝ বয়সী বৌ খাবার খেয়ে ফুড্ পয়জন হয়ে মারা গেল। বৌটি প্রায় শবুর বয়সী, খুব নরম ও শান্ত প্রকৃতির ছিল।

একদিন সকাল নটা দশটা নাগাদ সে বাড়ীতে হঠাৎ কান্নার রোল উঠতে আর সব প্রতিবেশীর মত শবুও ছুটে গেল। বৌটি খাবার খেয়ে বার কয় বমি করে প্রায় নেতিয়ে পড়েছে, কিন্তু জ্ঞান আছে। স্বামী অফিসে গেছে। ষোল আঠারো বছরের দুই ছেলে তাড়াতাড়ি রিক্সা ডেকে মাকে হাসপাতালে নিয়ে চলল। যাবার সময় বৌটি কি করুণ চোখে শবুদের দিকে তাকাতে লাগল—যেন চোখের ভাষায় বলছে—আমি চললাম, আমার সংসার ও ছেলেমেয়েদের তোমরা একটু দেখো। শাশুড়ী কেঁদে বুক চাপড়াচ্ছে, মেয়েগুলো কেঁদে ধুলোয় গড়াচ্ছে।

পরদিন দুপুরে হাসপাতাল থেকে ফিরে বড় ছেলে ডুকরে কাঁদতে লাগল—

'আমার মা নেই, ও জ্যেঠিমা আমার মাকে বাঁচাতে পারলুম না, ও মাসীমা আমাদের মা চলে গেল।'

কান্নার বন্যায় বাড়ীটা বুঝি ভেসে যায়। প্রত্যেক প্রতিবেশিনীও কাঁদছে।

শবু ভাবছে—মঙ্গলা দেবী গেলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিকট প্রতিবেশী একটি বৌ মারা গেল। এ দুয়ের কি কোন যোগাযোগ আছে, নাকি এটা নেহাৎই কাকতালীয় ব্যাপার!

ওদিকে ছেলে-মেয়েগুলো পাড়ার মধ্যে মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। বেশী কষ্ট লাগে কচি নামে সব থেকে ছোট মেয়েটিকে দেখে—তাকে দেখতে ঠিক তার মায়ের মত—বয়স বছর পাঁচেক। আরও বেশী কষ্ট লাগে তারও

ছোট বছর তিনেকের ছেলেটির জন্য। মাঠে মাঠে ফড়িং এর পেছনে ছোটে আর একটিকেও ধরতে না পেরে কেঁদে বলে—

'যা ফড়িং বাড়ী যা, মায়ের কাছে যা। আমার ত মা নেই, আমি বাড়ী যাব না।' ছেলেটার নামও নাকি ফড়িং।

কচি, ফড়িং দুজনেই মাঝে মাঝে আসে, 'জ্যেঠীমা' 'জ্যেঠিমা' বলে শবুর পায়ে পায়ে ঘোরে। করুণায় তার মন ভরে ওঠে—সে-ও যে মা-হারা।

শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে গেছে। কচি, ফড়িং দুই নাতি নাতনীর হাত ধরে ঠাকুমা শবুর কাছে আসে, শবুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কেঁদে বলে—

'মা গো, তুমি বামুনের মেয়ে বামুনের ঘরের সধবা বৌ—তোমার কাছে মিছে বলবো নি। রাতের কিছু বাসি খাবার বৌতে আমাতে মিলে খেলুম। তার পরেই বৌমার ভেদবমি শুরু হল। বড় নাতি আমায় তেড়ে দুবেলা মারতে আসে, বলে—এই বুড়ী আমার মাকে খেয়েছে। বল মাগো, তাই কি কখনো হয়? একই খাবার দুজনে খেলুম, আমার কিছু হ'ল নি আর ওদিকে জলজ্যান্ত বৌমা আমার চলে গেল। · ···

'অল্প বয়েসে এক ছেলে নিয়ে বিধবা হলুম। লোকের বাড়ী চেয়ে-চিন্তে কত কষ্ট করে ছেলেকে বড় করলুম। ছেলে রোজগেরে হতে দশ বছরের কচি বৌ ঘরে আনলুম, গড়ে পিটে মানুষ করলুম। আমাকে কি ভক্তি ছেদ্দাটাই না করত, মুখে তার কথাটি ছেল না। আমিও যে তাকে কি ভালবাসতুম কি করে বোঝাবো? যখনই বৌ এর মুখখানি মনে পড়ে আমার বুকের ভেতরটা হুহু করতে থাকে।·····

'এই বয়সে বৌ আমাকে কি দাগাটাই দিয়ে গেল। বৌমা আমার সতী লক্ষী ছেল, সধবা গেল। সে ত পুণ্যবতী, কিন্তু তার এই পেটেরগুলিকে এখন সামলায় কে?'

ঠাকুমা এক নাগাড়ে বলে আর কেঁদে চলে। ছোট নাতিনাতনী দুটো করুণমুখে শোনে আর ফ্যাল ফ্যাল করে শবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যেন অদ্ভুত সব যোগাযোগ ঘটে চলেছে।

দীননাথের বড়কাকীমা বঙ্গবাসিনী দেবী প্রায় চার যুগ আগে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তাঁর স্বামীর চোখের সামনে। আধপাগলা স্বামী হরনাথ তাঁকে বাধা ত দেনইনি, কোলের ছেলেটিকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছেন।

সেই ছেলেটি দীননাথের থেকে মাত্র কয়েক মাসের ছোট, নাম টিপু। তার মা ও পরে ঠাকুর্দা মারা গেলে মামারা তাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে থাকে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের পর টিপু এখন বহরমপুরে থেকে সরকারী চাকরি করে।

নতুন করে যোগসূত্র গড়ে তুলতেই বুঝি টিপুর এক ছেলে তনু মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে একা একাই দীনুজ্যেঠা ও হুদিজ্যেঠার বাড়ী বেড়াতে এসেছে। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান, হাসিখুশি ও আমুদে। সাতদিন ধরে দুই জ্যেঠার বাড়ী নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়িয়ে তনু ফিরে গেল।

তনুকে শিয়ালদায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে দীননাথ বলল—'ভারী ভাল ছেলেটি। দেখতে ঠিক টিপুর মত হয়েছে। ওর চোখদুটো কি সুন্দর টানাটানা আর মায়াভরা, ঠিক বড়কাকীমা ও টিপুর চোখগুলোর মত।'

ছেলেটির প্রতি শবুরও খুব মায়া পড়ে গেছে। ওর বাবা টিপুও নিশ্চয় ছোটবেলায় এমনই সুন্দর স্বভাবের ছিল। অথচ মঙ্গলাদেবী তার বড়মা হয়েও তাকে নিজের কাছে টেনে নেননি, মামাদের কাছে সে মানুষ হয়েছে।

শবু আরো ভাবছে—কদিন আগে মঙ্গলাদেবী বাড়ীতে একটা অশান্তির আবহাওয়া গড়ে তুলে কিছুদিনের জন্য ছোটছেলের কাছে গেলেন। তার পর পরই প্রতিবেশী বৌটি মারা গেল। আর তনু এসে বড়কাকীমা বঙ্গবাসিনী দেবীর বিস্মৃতপ্রায় আত্মহত্যার ঘটনাকে নতুন করে তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল।

এ সবের মধ্যে সত্যিই কি কোন যোগাযোগ আছে?



দ্বিতীয় পর্য্যায়

এক

পুরুষ মানুষ ঘরে বসে থাকলে, হাতে কাজ কাম না থাকলে যা হয়। একদিন দীননাথ বলল—

'ঘরগুলো সব আবর্জনায় ভর্ত্তি হয়ে আছে, এগুলো পরিষ্কার করা দরকার।'

যেই বলা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু। প্রথমেই বড় রান্নাঘর থেকে আবর্জনার পাহাড় টেনে টেনে বার করে ঘরটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করল—শবুও তাতে হাত লাগাল। শবুদের বিয়ের পর কেনা মীটসেফটা আর একটা কাঠের সেল্‌ফ স্টোররুম থেকে এনে বড় রান্নাঘরে রেখে দীননাথ বলল—

'এখন থেকে এই ঘরে রান্না খাওয়া হবে।'

শবুর তাতে কোন আপত্তি নেই। বড় রান্না ঘরে জলের পাইপও লাগানো আছে, রান্না বান্নার কাজে খুবই সুবিধে। বলল—

'একা একা বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা, এত বড় বাড়ী রোজ ঝাঁট দেয়া মোছা বড় কষ্টকর কাজ। একটা কাজের লোক রাখ না—মাত্র ত দশ পনরো টাকা মাসে।'

'ঠিক আছে, রাখ।'

শবু কুমার মাকে বলতে কুমার মা একটি কাজের মেয়ের খোঁজ দিল—সন্ধ্যা পাল, বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ। সভ্য জয়বাংলা থেকে এসেছে।

দীননাথ বসে নেই। রান্নাঘর পরিষ্কার করে সে লেগেছে পুরোনো শোবার ঘর নিয়ে। শুবর বিয়ের খাট বিছানা আলনা একপাশে টেনে সরিয়ে খাটের তলায় রাখা গাছের ত্রিশ চল্লিশটা নারকেল আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের বিলিয়ে ঘরের অর্ধেকটা খালি করে ফেলল। এবার বাইরের ঘর থেকে মা মঙ্গলা দেবীর চৌকি বিছানা ও টুকিটাকি তাঁর ব্যবহারের জিনিষ পত্র পুরোনো শোবার ঘরের অপর অংশে সাজিয়ে রাখল। তারপর বছর সাতেক আগে দুশ টাকায় কেনা বেত বুনোনো কাঠের সোফা সেট ও মেজদার সখের কাঠের আলমারী দিয়ে বাইরের ঘরটা সাজিয়ে দীননাথ বলল—

'এই হল আমাদের ড্রয়িংরুম। কেমন ভাল লাগছে না?'

শবু বলল—'মাকে জিজ্ঞেস না করে সব ওলটপালট করলে, তারপর?'

'তারপর আবার কি? যে ঘর যে জন্য তৈরী সেই ভাবে ব্যবহার হবে তাতে জিজ্ঞেস করার কি আছে? বাইরের লোকজন এলে বসতে দেয়া যায় না, বন্ধু বান্ধব এলে, একটু তাসটাস খেলা গল্প করার জন্য জায়গা পাওয়া যায় না তার চাইতে এটা ভাল নয় কি। আমরাও দুবেলা অবসর সময় বসতে পারব।' দীননাথের সাফ কথা।

কথা ত ঠিকই, দেখতেও ভাল লাগছে। শবুরা সাধারণত এসে দুচার দশদিন থাকে। যখন দু তিন মাস থাকে তখনই মঙ্গলা দেবী ভব সোনার কাছে বেড়াতে যান। এবারে এক নাগাড়ে চারমাস মত থাকাতে অসুবিধে বোঝা গেছে। একেবারে লাগা দুটো ঘর, একটিতে শাশুড়ী থাকেন আরেক-টিতে তারা স্বামী-স্ত্রীতে থাকে। একটু মন খুলে দুজনে কথা বলতে পারে না, কেমন যেন দমবন্ধ লাগে, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তাও বুঝি রক্ষা হয়না।

কিন্তু মঙ্গলা দেবী মানুষ ত সহজ নন। এদিকে এলাহাবাদ যাবার আগ দিয়ে তিনি জেনে গেছেন দীননাথ আর পাটনায় যেতে চায় না, আবার শেষ দিকে আলাদা হাট-বাজার করাও শুরু করেছিলেন। ফিরে এসে এই ঘর বদল করা দেখেই হয়ত তিনি ঘোর অনর্থ বাধাবেন।

দীননাথ সে কথায় কোন আমল দিলনা। যে জিনিষগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে সেগুলো স্টোররুম আর সিঁড়িঘরে রেখে দিল। অপ্রয়োজনীয়গুলো টেনে টেনে বাইরে ফেলতে লাগল। বিশ্বনাথের বিয়ে থেকে বাড়ীতে যত বিয়ে শাদি পৈতে বৌভাত মুখেভাত হয়েছে তার নিদর্শন স্নো পাউডার জরির আর কাঁচের নানা প্রসাধন দ্রব্যের খালি পাত্র, তেল সিঁদুর আলতার শিশি কৌটো সব ফেলা গেল।

কচি আর ফড়িংরা তার মধ্য থেকে নানা মূল্যবান খেলার সামগ্রী পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে গিয়ে তাদের খেলাঘরের সম্পত্তি বাড়াতে লাগল মনের আনন্দে।

সাতদিন ধরে ঘরদোর পরিষ্কার ফিটফাট করে দীননাথ দাড়ি কামাতে বসেছে।

হঠাৎ প্রায় ভর দুপুরে পথ্য এসে উপস্থিত—

'জামাইবাবু কেমন আছেন, মেজদি কেমন আছিস?'

শবু বলল—'আয় শঙ্খ, তোর ত দেখাই পাওয়া যায় না। দুপুরে খাবি ত?'

'হ্যা খাব' বলে শঙ্খ বাড়ীর দুই গেটের দরজা, তার ছিটকিনি লাগাবার বন্দোবস্ত পরীক্ষা করতে লাগল।

শবুর খুড়তুতো ভাই, বড কাকার বড় ছেলে শঙ্খ এখন তপুদের বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকে। কিন্তু শবুরা যে কবার সেখানে গেছে শঙ্খর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে একটা কোম্পানীতে ভাল চাকরি করে, বেশীর ভাগ সময় ট্যুরেই থাকে, আসামে আর কোথায় কোথায় প্লেনে যাতায়াত করে। অনেক দিন পরে শঙ্খকে দেখে শবু জিজ্ঞেস করল—

'বড কাকীমা কেমন আছে? সঞ্জয়ের খবর কি?'

'ঐ একরকম'—শঙ্খ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

দীননাথ দাড়ি কামাতে কামাতে জিজ্ঞেস করল—'তুই এসে থেকে দরজা ধরে টানাটানি করছিস কেন?'

শঙ্খ বলল—'দেখলাম বাড়ীর সেফ্‌টি ঠিক আছে কিনা। ঠিকই আছে। ও কি জামাইবাবু, আপনি দাড়ি কামাচ্ছেন কেন? তপুদি (দেড়মাসের বড) আর অমলদার কাছে শুনলাম আপনি হো-চি-মিনের মত দাড়ি রেখেছেন, আবার কাটছেন যে?'

দীননাথ বলল—'কাটছি না ত, ছাটছি অনেকটা ফ্রেঞ্চকাটের কায়দায়।'

দীননাথ দাড়ি রাখার রহস্য শুধু শবুকে বলেছে। যতদিন তার বদলির ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত না হচ্ছে ততদিন সে দাড়ি কামাবে না—এটা তার সঙ্কল্পের স্বাক্ষর। আর ছোট ছোট ছুঁচোলো দাড়ির জন্য পাড়ায় লোকে আড়ালে বলে হো-চি-মিন। দীননাথ শুনে খুশি হয়না—হো-চি-মিন কত বড় জগৎ বিখ্যাত বিপ্লবী, তাঁর সঙ্গে তুলনা!

শঙ্খ বলল—'তার চাইতে জামাইবাবু আপনি কাটা ছাটা একেবারে বন্ধ করে রবিঠাকুরের মত দাড়ি রাখুন না?'

'তাতে তোর কি সুবিধে হবে?'

'তা হলে আপনার ঐ সুন্দর সেফটি রেজার আমি দখল করব।'

'এতক্ষণ বাড়ীর সেফ্‌টি দেখতে দেখতে আমার সেফটি রেজার ধরে টান মারছিস? হুঁ হুঁ বাবা, এ হল বিলিতি মাল, প্রথম গোঁফ দাড়ি গজানো থেকে রেগুলার ব্যবহার করছি।' দীননাথ হেসে জবাব দিল।

হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে দুপুরে তিনজন খেতে বসেছে। খেতে খেতে হঠাৎ দীননাথ বলল—

'শঙ্খ, তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারিস ?'

শবু অবাক হয়ে তুজনের মুখের দিকে তাকাল। শঙ্খর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, জিজ্ঞেস করল—

'কত টাকা ?'

'এই ধর শ পাঁচেক। এখনই নয়, মাসখানেক পরে।'

শঙ্খ ভ্রু তুটো কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল—'আচ্ছা, দেব।'

তারপর থেকে বিকেলে শঙ্খ চলে যাওয়া পর্যন্ত শবু ভেবে চলল। শঙ্খ চলে যাবার সময় অভ্যাসমত বলেও ফেলল – শঙ্খ, আবার আসিস।'

কিন্তু এ কি করল দীননাথ। শঙ্খ থাকাতে শবু কিছু বলতেও পারেনি। শঙ্খকে আবার আসতে বলেও মনে মনে জিভ কাটল—শঙ্খটা কি ভাবল ? টাকার দরকার পড়েছে বলেই বুঝি সে তাকে আবার আসতে বলল।

বাড়ীঘর পরিষ্কার করার দিনগুলোতে শবুরা লক্ষ্য করেছিল রান্নাঘরের বারান্দার উপরে তুটো কোটরে একজোড়া চড়ুই পাখী বাস করতে শুরু করেছে। শবু বলেছিল -আবার যেন ওগুলোকে তাড়িয়ো না—ওরা লক্ষ্মীমন্ত। দীননাথ ক্ষোভের হাসি হেসে বলেছিল—লক্ষ্মীর অভাব কি, সামনের মাস থেকে হাফপে পাব, আর মাস তুতিন পরে বিনে মাইনেয় কাটাতে হবে।

তাই বলে কুটুম মানুষ, শবুর খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে হাত পাতল। অভাবে স্বভাব নষ্ট বুঝি একেই বলে। এখনই এই, সামনের বড় তুর্দিন ত পড়েই আছে। সেবারে ভবর শ্বশুর বাড়ীতে ভাড়া থাকার সময় পাড়ার লোক ডেকে শবুকে মাষ্টারীর চাকরি দিতে চেয়েছিল—এখন যদি সে রকম কিছু পেত। তাতে আবার বুঝি বাবুর মানে লাগবে—বৌ-এর রোজগারে বসে খাবে! প্রয়োজন—সেটা বুঝবে না—মানটাই বড়। এখন মানটা রইল কোথায় ? কানাই নয়, শঙ্খর কাছে হাত পেতে বসল!

শঙ্খ চলে গেলে শবু অভিমানের সুরে বলল—

'তুমি শঙ্খর কাছে হাত পাতলে ? কানাই নিজে থেকে টাকা দিতে চেয়েছে তোমাকে বলেছি তবু তুমি শঙ্খর কাছে হাত পাতলে! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

দীননাথ বলল—'এতে লজ্জার কি আছে ? আমি কি সাহায্য চেয়েছি ? এটা হল ধার—লেনদেনের কথা। এখন আমার অভাব তাই ধার নিচ্ছি, আবার হাতে টাকা এলে শোধ দিয়ে দেব। কানাইয়ের টাকা কি নেব না

বলেছি? নিতেই হবে। শঙ্খ হাতের কাছে আছে তাই আগে থেকে বলে রাখলাম যাতে হঠাৎ দরকার হলে পাওয়া যায়।'

যে যেমন বোঝে। কানাই দেবে বলেছে তবু শঙ্খর কাছ থেকে টাকা নিলে কানাইয়ের সদিচ্ছাকেই অপমান করা হবে, তেমনটা না হওয়াই ভাল।

ক'দিন পরেই কানাই এল মিঠি আর দিঠিকে নিয়ে। ওদের স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হয়েছে।

শবু আনন্দে মিঠি দিঠিকে জড়িয়ে ধরে বলল—'কানাই, কাকলীকে নিয়ে এলিনা?'

কানাই বলল—'কাকলী এলে বাবা দাদাকে কে দেখবে?'

'বাবা, নন্দু কেমন আছে?'

'বাবা ভাল আছে, দাদা ঐ রকমই।'

শবু মিঠিকে জিজ্ঞেস করল—'মিঠি, তুমি এখানে কি কি দেখবে?'

মিঠি বলল—'কলকাতায় টিভি এসেছে, আমরা টিভি দেখব, মোটর বাইকে চড়ে কলকাতায় বেড়াব, চিড়িয়াখানা দেখব।'

শবু বলল—'আমার এক বন্ধু হারাণীদির বাড়ীতে টিভি আছে তোমাদের দেখাব। দিঠি তুমি কি দেখবে?'

দিঠি আঙুল চোষা বন্ধ রেখে বলল—'এখানে ত সমুদ্র নেই, আমরা গঙ্গা দেখব।'

খুব বেড়ানো, টিভি দেখা চলতে লাগল। একদিন শবু মেয়ে দুটোকে জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কলকাতায় আসছ শুনে দাদু কি বলল?'

দিঠি বলল—'ওপলেল দাদু বলেখে কলকাতা দেয়ো না, হালিয়ে দাবে।'

মিঠি বলল—'দাদু বলেছে কলকাতায় নিঃশ্বাস নেয়া যায় না, দম বন্ধ হয়ে যায়। আমার ত কিছু হচ্ছে না।'

শবু বলল—'বাবা ঠিকই বলেছে। এটা ত গ্রাম, কলকাতায় সত্যিই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।'

ফিরে যাবার আগের দিন কানাই জিজ্ঞেস করল—

'জামাইবাবু, আপনার বদলির কি হল?'

'কিছুই হয়নি, আবার তিনমাস ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি।'

'মাইনে পত্তর ঠিকমত পাচ্ছেন?'

দীননাথ বলল—'তা পাচ্ছি, তবে সামনের মাস থেকে হাফপে হবে, আরো পরে—নো পে।'

কানাই ব্যাগ থেকে পাঁচশ টাকা বের করে বলল - 'জামাইবাবু, আপনি এই টাকাগুলো রাখুন।'

'এখন ত চলে যাচ্ছে'—দীননাথ ইতস্তত করল।

কানাই বলল—'আপনি পুটুর চাকরির ব্যাপারে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন। পুটু ত আমাদের ভাই, আমি তার হয়ে দিচ্ছি।'

দীননাথের তাতে আপত্তি নেই, টাকাটা রেখে দিল। সুযোগ পেয়ে শবু বলল—

'জানিস কানাই, তোর জামাইবাবু শম্ভুর কাছে টাকা ধার চেয়েছে।'

'সে কি? মেজদি আপনাকে কিছু বলেনি?'

দীননাথ বলল—'বলেছে। এখনও নিই নি, দরকারে পাওয়া যাবে কিনা জেনে রেখেছি।

কানাই বলল—'না জামাইবাবু, আপনি শম্ভুর কাছ থেকে টাকা নেবেন না—এতে বাবার অপমান হবে। যখন যা দরকার হবে আমাকে জানাবেন।'

দীননাথ বলল—'আচ্ছা তাই হবে।'

কানাইরা চলে গেছে। যাবার আগে শবু বলে দিয়েছে—এই রকম বড় ছুটিছাটায় ওদেরকে নিয়ে আসিস। কানাই কথা দিয়েছে। ওরা ষষ্ঠীতলায় ও বেলুড়েও এক দুদিন করে থেকে গেছে।

মাসখানেক পরে বর্ষা এসে গেছে, মাঝখানে শম্ভুও এসে ঘুরে গেছে। শম্ভু সঙ্গে করে পাঁচশ টাকা এনেছিল। দীননাথ বলে দিয়েছে—অফিস থেকে কিছু টাকা পেয়েছি, এখন টাকা লাগবে না। শম্ভু টাকাগুলো নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বলেছে—দরকার হলে নিতে পারেন। কিন্তু ওর মুখ দেখে শবুর মনে হয়েছে, টাকাগুলো যে দিতে হয়নি তাতে সে বেঁচেছে। শবুও একটা অপমানের হাত থেকে বেঁচেছে।

রথ এসে গেছে, আর কদিন পরেই আসবে শ্রাবণ মাস—শবুর জন্মমাস। তার আগ দিয়ে এসে গেল সেই দুঃসংবাদ, যে আশঙ্কা মনের গোপনে এতদিন লুকোনো ছিল তাই সত্যি হয়ে দেখা দিল। রথের মধ্যেই বাবা আর কানাইয়ের চিঠি এল—নন্দু সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে প্রথম রথের দিনেই।

মা-হারা নন্দু ধুঁকে ধুঁকে কোন রকমে দুটো বছর কাটিয়ে মার কোলে

ফিরে গেল। একটি সম্ভাবনাময় দরদী জীবনের কি করুণ অকাল পরিণতি! শবু চোখের জলে ভাসে আর ভাবে। মা বলতেন—নন্দুর কথা ভেবে আমি যে মরেও শান্তি পাব না। এখন নন্দু মার কাছে চলে গেছে—মা আর নন্দু দুজনেই এখন শান্তি পেয়েছে। মা না থাকলেও বাড়ীতে ওর কোন অযত্ন হয়নি—তবু বুঝি এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে। বহু বছর বোধশূন্য অবস্থায় কাটিয়ে এখন সে সকল বোধশক্তির ঊর্ধে চলে গেছে। দুঃখ এই, শবু যখন আবার মন্দির শহরে যাবে দেখবে নন্দুর ঘরটা শূন্য পড়ে আছে, শুনতে পাবে না নন্দুর সেই ডাক—'মা খেতে দাও।' খিদে পেলে সে এক নাগাড়ে ডেকেই চলত।

হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা, একটা ব্যাপারে যেন অদ্ভুত মিল আছে। ঠাকুমা, মা, বাবুলাল, নন্দু সবাই হয় রথের মধ্যে বা এক দুদিন আগে পরে চলে গেল। শবুর বাপের বাড়ীর সঙ্গে রথের যেন কি একটা যোগাযোগ আছে। তার যখন কিছু হবে তখনও কি চলবে রথ! রথের পরপরই আসে শবুর জন্মমাস, কিন্তু তার জীবনকালের রথের চাকা কি তার আর একটি আবর্ত পূর্ণ করতে পারবে না?

মনের দুঃখে শবু ছুটে যায় কাকীমার কাছে, তপুর কাছে—সবাই মিলে কেঁদে মন হাল্কা করে। মন্দির শহরে যাওয়া সম্ভব হয়না, বাড়ীতে কাকে রেখে যাবে। এখন আর গিয়েই বা কি হবে, নন্দুকে—স্নেহের ভাইটিকে ত আর দেখতে পাবে না।

দুই

বড় বিচিত্র এই দুনিয়া! দুঃখ কষ্ট অপমান কোনটা কখন কোন দিক থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না। নন্দুর বিচ্ছেদের দুঃখের জন্য মন আগে থেকেই কিছুটা প্রস্তুত ছিল—অপেক্ষা ছিল শুধু সময়ের। আর্থিক কষ্ট এত দিন ছিলনা, দীননাথ ছুটি নিয়ে বসে থেকে সে কষ্টকেও ডেকে আনছে। আত্মীয় কুটুম্বদের কাছে হাত পাতার মত অপমানজনক পরিস্থিতিও প্রায় এসে গেছে।

তবু অন্যদিক থেকে এভাবে যে যেচে অপমান মাথা পেতে নিতে হবে তা ভাবা যায়নি।

অনেকদিন পরে দীননাথের কথামত দুজনে বেড়াতে গেছে ছোটননদ শেফালীদের বাড়ী। শেফালীর শ্বশুর বাড়ী সেই রিফিউজী কলোনীতে যেখানে মাতুলের বাড়ীও আছে। মা মঙ্গলাদেবীর এক পাতানো দাদা সেই মাতুল কবছর আগে মারা গেছে, তাকে নিয়ে এককালে এ সংসারে নানা কেলেঙ্কারী আর অশান্তি হয়েছে।

কলোনীতে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল কান্তর সঙ্গে। কান্ত কানাইয়ের ছোটবেলার বন্ধু, শবু ও দীননাথের পরিচিত। যখন সে বুরলায় ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে শুরু করেছিল তখন থেকেই হঠাৎ তার মধ্যে সাহেবীয়ানার ভূত বাসা বাঁধে। মুখের মাতৃভাষাকে প্রায় বিদায় দিয়ে সাহেবী ভাষা ও আদব কায়দা রপ্ত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—যদিও সাহেবদের দেশে যাবার সৌভাগ্য তার হয়নি।

সেই হাফ্-সাহেব কান্ত মুকুর্জীকে ঐ কলোনীর মত জায়গায় দেখতে পেয়ে শবু আশ্চর্য্য হয়ে তাকে ডেকেই ফেলল—

'এই কান্ত, তুই এখানে কি করছিস?'

ছুটির বিকেলে কান্ত দোকান থেকে সিগারেট কিনে ঠোঁটে চেপে সাহেবী কায়দায় ধরাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদেরকে দেখে সিগারেটটা লুকিয়ে (ছোট বেলার পুরোনো সংস্কারটা একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি) বলে উঠল—

'আরে শবুদি? হ্যাল্লো জামাইবাবু, হা ডু ডু!! হাউ ডু উ কম্ হিয়া?'

দীননাথ হেসে বলল—'এখানে আমার বোনের শ্বশুর বাড়ী। তুমি এখানে কি করে এলে?'

কান্ত বলল—'এখানে আমার শ্বশুর বাড়ী। চলুন শবুদি, জামাইবাবু—আমার মিসেস্-এর সঙ্গে আলাপ করবেন। উ উইল সী মাই বেবী অল্‌সো।'

সামান্য দূরেই তার শ্বশুর বাড়ী। গ্রাম্য মজলিসের মত কজন বৃদ্ধ কয়েকটা টুল মোড়া আর ভাঙা চেয়ারে বসে টালির ঘরের সামনের বারান্দায় গল্প গুজব করছিল। কান্ত বারান্দায় উঠে সাহেবী কায়দায় ইণ্ট্রোডিউস করল—

'মাই ফাদার-ইন-ল মিঃ টারাপড ড্যাশ্ এণ্ড হিজ ফ্রেণ্ডস্—মিঃ এণ্ড মিসেস লাহিড়ী, আমার দিদি জামাইবাবু।'

মিঃ টারাপড ড্যাশ অর্থাৎ তারাপদ দাস জিজ্ঞেস করল—'কোথায় থাকা হয়, এখানে কার বাড়ীতে যাওয়া হবে?'

দীননাথ সরলভাবে বলল—'থাকি চাঁপা-নিমপুরে, এখানে কাঞ্চন আমার ভগ্নীপতি।'

দাস মশাইয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল—'অ। আপনাদের মা ত এখানে ঘেটু ঝন্টুদের বাবার সঙ্গে থাকত, তাই না?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে বয়স্কদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারাও অনুরূপ দৃষ্টি বিনিময় করল।

দীননাথের মুখটা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল।

কান্ত স্থানীয় লোক নয়, এ সব ব্যাপার জানে না। সে শবুকে ঝুলোঝুলি করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে সে বৌ দেখল কি মেয়ে দেখল জানে না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দীননাথের সঙ্গে শেফালীদের বাড়ীর দিকে রওনা হল। অনেক কষ্টে চা খাওয়াটা যে এড়াতে পেরেছে এই টুকুই শুধু সান্ত্বনা। শেফালীদের বাড়ীতেও মাত্র ঘণ্টাখানেক থেকে ফিরে চলল চাঁপাতলায়।

পথে বেরিয়ে দীননাথ ক্ষোভে ফেটে পড়ল—

'বেটা দাসের পো ঘুরিয়ে বলেই দিল আপনার মা অমুকের রক্ষিতা ছিল! কান্তটাও একটা অপদার্থ—এক দাসের মেয়েকে বিয়ে করে ঘর জামাই হয়ে আছে—জবর দখল করা কলোনীর টালির ঘরে বসে সাহেবীয়ানা দেখাচ্ছে। যত সব আনকালচার্ড বীষ্টস্।'

মা মঙ্গলাদেবী ও তাঁর পাতানো দাদার (মাতুলের) সম্পর্ক নিয়ে যে কথা বলার অধিকার ছিল একমাত্র বাবা কালীনাথ লাহিড়ীর, যে প্রসঙ্গ ছেলেরা মনের সংগোপনে ঢেকে রেখেছে, যে বিষয় মনে আনাও বাড়ীর বৌদের পক্ষে অনধিকার চর্চার সামিল—সেই কথাটাই আজ তাদের শুনতে হল সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু লোকের কাছে। শবুর নিজেকেই এখন অপরাধী মনে হচ্ছে সে যদি ডেকে কান্তর সঙ্গে কথা না বলত তবে এত বড় অপমান যেচে মাথা পেতে নিতে হত না। আর শেফালীটাই বা কি সুখে এখানে ঘর সংসার করছে যেখানে পাড়াতেই তার পরিচয় অমুকের অমুকের মেয়ে বলে!

বাড়ী ফিরে সে রাতে শবু আর দীননাথ যেন একে অপরকে মুখ দেখাতে পারছে না—বেশী কথা বলা ত দূরের কথা। এমন অপমান এতই গ্লানিকর যে নিজেই নিজের মুখ দেখতে লজ্জা হয়। এ অপমান ভোলা যায় না, আমরণ মনে থাকবে দুজনের।

সেই অপমানের বিষজ্বালা যখন মনের উপর চেপে আছে সে সময় এলাহাবাদ থেকে মা মঙ্গলা দেবীর একখানা চিঠি এল। তাতে এক অদ্ভুত খবর।

মঙ্গলাদেবী দীননাথকে লিখেছেন যে সোনা নাকি তাদের বড়কাকা হরনাথের মত পাগল হয়ে গেছে, বাড়ীতে কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনা, প্রায় সারারাত ঘুমায় না, চোখ দুটো সব সময় জবা ফুলের মত লাল—থেকে থেকে বৌকে গলা টিপে মারতে যায়। অতএব দীনু যেন হৃদির সঙ্গে আলোচনা করে সোনার চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করে।

বাড়ীতে যা চিঠি আসে ওরা দুজনেই পড়ে। চিঠিখানা পড়ে শবু জিজ্ঞেস করল— কি করবে?'

দীননাথ বলল—'কি আবার করব। ওসব কিছুই হয়নি, মা গিয়ে তিন-মাসের মধ্যে এমন অবস্থা করে তুলেছে যে সোনা বৌকে মারতে যাচ্ছে আর বৌ হয়ত পালাতে চাইছে সংসার ছেড়ে।'

হ্যাঁ দীননাথও তার মায়ের চরিত্র জানে। তিনমাসেই এই অবস্থা, তিন বছর হলে বুঝি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে। সোনা আর গোপার জন্য শবুর এখন কষ্ট হচ্ছে। ভবটাই মাঝখান থেকে পাঁকাল মাছের মত পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

এ'বছর হল বিয়ে হয়ে এসে নানাজনের কাছে নানাভাবে খুড়ী শাশুড়ীর মারা যাবার কথা শবুর কানে এসেছে। আগে সে শুধু শুনেছিল খুড়ী-শাশুড়ী বঙ্গবাসিনী দেবী স্বামীর ব্যবহারে মনের দুঃখে গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছিলেন। আরো খুঁটিয়ে দেখলে ব্যাপারটা বুঝি এই রকম দাঁড়ায়—

মঙ্গলা দেবীর বড় দেওর হরনাথ আধপাগলা ছিলেন ঠিকই। তার উপরে কোন কাজ কর্ম্ম করেন না। ছোট দেওর ত্রিনাথ ক'বছর আগে মারা গেছেন, মারা গেছেন শাশুড়ীও। বাড়ীর তিন বৌএর মধ্যে মঙ্গলা দেবীই বড—তাঁর স্বামীও ওকালতি করেন শহরে থেকে, রোজগার তাঁর যাই হোক। সুতরাং বড বৌ এর অখণ্ড প্রতাপ। তিনি আবার দেওয়ানের মেয়ে।

শ্বশুর হরিনাথের প্রতাপও কম নয়, তিনি তখনো বেঁচে। কিন্তু তিনি থাকেন বাইরে পুরুষ মহলে। মেয়ে মহলের খবর আর তিনি কতটুকু রাখেন। মঙ্গলা দেবী কোর্ট কাছারীর লম্বা ছুটিতে বছরে দু তিনবার করে গ্রামের বাড়ীতে আসেন। তখন তিনি দুই জা এর উপর দাপট দেখান। ছোটবৌ বিধবা, নিঃসন্তান—সুতরাং তিনি ত মরেই আছেন।

কিন্তু মেজবৌ বঙ্গবাসিনী? তাঁর স্বামী আছে, একটি ছেলেও আছে। তবু তাঁর কিছু নেই—স্বামী বে-রোজগার আধা পাগল। তিনি কিছু কইতে পারেন না সইতেও পারেন না—তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি মনের

আগুনে জলতে থাকেন। বড়জা শহরে যখন থাকে তখন মেজবৌ পাড়া প্রতিবেশিনীদের কাছে তাঁর মনের দুঃখের কথা বলেন।

শেষটায় তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। সামনের পূজোর ছুটিতে বড়জা আবার গ্রামে আসছেন। সেই আতঙ্কে এতদিন যা তুষের আগুন হয়ে মনের মধ্যে জলছিল সেইটাই বাইরের আগুন হয়ে তাঁকে গ্রাস করল। স্বামীর প্রতি তাঁর শেষ অনুরোধ ছিল—তুমি কথা বল, মানুষের মত ব্যবহার কর, আমাকে—আমাদের ছেলেকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাও। পূজোর ছুটিতে বড়জা এসে পৌঁছবার আগের দিনই সব শেষ। সেবছর ও বাড়ীতে দুর্গা পূজাও হয়নি।

এরপর আরো আছে। শ্বশুর মারা যেতে ছোটজা তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এখনও তিনি ভাইয়ের সংসারে পড়ে আছেন। আর শ্বশুরের শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যেতে বঙ্গবাসিনীর দাদারা তাদের বোনপোকে সেই যে নিয়ে গেল আর ফিরতে দিলনা। সে ছেলেত অর্ধেক সম্পত্তির মালিক। মঙ্গলা দেবী যদি ভালই হবেন তবে নিজের পাঁচটির সঙ্গে সেটিকে কি মানুষ করতে পারতেন না? মা-মরা ছেলেটির প্রতি সেটুকু দরদও তিনি দেখাতে পারেন নি। বড় দেওর হরনাথ আরো আট দশটা বছর জীবনের ভোগ পূর্ণ করে একসময় মারা গেলেন। তাঁরই ছেলে টিপু—যার ছেলে তন্ময় মাস দুই আগে এসে বেড়িয়ে গেছে।

শ্বশুর ডাকাতের হাতে খুন হলে কিছু প্রতিবেশী বড় বৌ এর হাতে হাত-কড়ি পরাতে চেয়েছিল—কারণ বাড়ীতে একটা খুন হয়ে গেল আর পাশের ঘর থেকে তিনি নাকি কিছুই জানতে পারলেন না—স্পষ্ট যোগসাজসের ঘটনা। গ্রামের ছোট তরফের জমিদার হিরণ্ময় বাবুর চেষ্টায় সে যাত্রায় তাঁর হাজত বাস আটকান গেছিল। ঘটনার রাতে কালীনাথবাবু জরুরী কাজে নাটোরে ছিলেন।

শবু দীননাথের কাছে ঘটনার অন্য বিবরণ শুনেছে। সে তখন শিশু—জানবার বোঝবার মত বয়স তার হয়নি। পরে জ্ঞান হয়ে মার কাছে যা শুনেছে তাই সে বিশ্বাস করে—মার কথা কোন শিশুই বা অবিশ্বাস করে? অন্যলোকের কথায় কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে। কিছু ঘটনা ঘটে গেলে বাড়ীর লোকদের নিজস্ব বক্তব্য থাকতেই পারে। কিন্তু প্রতিবেশীদের সব কথা, সকল ধারণাই যে অলীক কল্পনা তাই কি বলা যায়? তারাই ত সমাজের চোখ কান। তাদের চোখে মঙ্গলা দেবীর কি রূপ?

সেই মঙ্গলা দেবীর সংসারে বৌরা তিষ্ঠতে পারবে না, স্বামী অনাদরে অবহেলায় চলে যাবেন, ছেলেরা এক অন্নে থাকতে পারে না, তিনমাসে ছেলে পাগল হয়ে বৌএর গলা টিপতে যাবে—এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

এসব কথা শবু শুধু ভেবেই চলে--কাউকে বলতে পারে না।

তিন

সোনা গোপার সমস্যা মনকে নাড়া দিলেও করার কিছু নেই। কিন্তু আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

চলছে শ্রাবণ মাস। পেটে ব্যথা উঠে তপু দুদিন হল বালী হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। গত দু দিনের মত আজ তৃতীয় দিনেও শবু দীননাথ অমল তার এক মাসতুতো ভাই এসে হাসপাতালে বসে আছে। সামনের জি টি রোড দিয়ে তারকেশ্বরের পুণ্যার্থী যাত্রীরা বাঁক কাঁধে কোমরে গামছা বেঁধে দলে দলে চলেছে—মুখে তাদের বোল 'ভোলা বাবা পার করে গা, বোলো ব্যোম তারক ব্যোম।' এদিকে তপু বিছানায় পড়ে ব্যথায় ছটফট করছে। শেষে নার্স জানাল—আজ রাতে সীজারিয়ান অপারেশন করে পেটের বাচ্চা বের করা হবে। অমল আর তার ভাইকে হাসপাতালে রেখে শবুরা বাড়ী ফিরে এল।

পরদিন দুপুরের পর গিয়ে শবুরা শুনল অপারেশন করে ফুটফুটে সুন্দর একটি জীবন্ত মেয়েকে বের করেছে। শুনে শবুর আনন্দ আর ধরে না। বিকেল হতেই ছুটে গেল মা ও মেয়েকে দেখতে। তপুর জ্ঞান ফিরেছে। তবে পেটে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। মেজদিকে দেখে ক্লিষ্ট মধুর হাসি হাসল। পাশের বেবী ঘরে গিয়ে শবু দেখল আরো কতগুলি শিশুর মধ্যে হাতে টিকিট বাঁধা ফুটফুটে ফর্সা একটা মোমের পুতুলের মত তপুর মেয়ে শুয়ে আছে।

আরো কটা দিন তপুকে হাসপাতালে থাকতে হল। শেষে একদিন মুখে আনন্দের হাসি নিয়ে তপু মেয়েকে নিয়ে অমলের সঙ্গে তাদের ঘরে ফিরল আর শবুরাও তাদেরকে পৌঁছে দিয়ে খুশী মনে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এল।

মাঝখানে পাটনা থেকে সুষমাদির দাদা সুনন্দদা এসে শবুদের বাড়ীতে থেকে মেয়ে দেখিয়ে বড়জা বীণার দাদার ছেলে নেপালের সঙ্গে সুলেখার

বিয়ে ঠিক করে গেছিল। পাটনায় থাকতে সুলেখার বিয়ের ব্যাপারে বীণাদির মেয়ে সুবর্ণা ও ছেলে পার্থ তাদের বড়মামার ছেলের কথা জানিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধই ঠিক হয়েছে। তপু হাসপাতাল থেকে ফিরেছে আর এদিকে সেই বিয়ে ও বৌভাতের দিন পড়েছে। শবুরা বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী। কিন্তু আর্থিক কারণে বিয়েতে পাটনায় যাওয়া হলনা। তবে একদিন হুগলীঘাটে বীণার বড়দার বাড়ীতে গিয়ে বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসতে হল। আর্থিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন, সামাজিকতা ত রক্ষা করতেই হবে।

মেয়ে জন্মাতেই তিন দিন লাগিয়ে দিয়েছে, তার উপর আবার সীজারিয়ান কেস। বড় বৌমার বাচ্চা হবে তাই অমলের মাও এসেছেন, তিনি ঘর সংসার চালাচ্ছেন। বাইরে বেশী ঘোরাফেরা করার মত তাঁর শরীরের অবস্থা নয়। বাতে তিনি এত পঙ্গু যে একধাপ সিঁড়ি ওঠাই কষ্টকর তাঁর পক্ষে।

বিয়ে বাড়ী থেকে ফেরার দুদিন পর বিকেলে শবু ও দীননাথ তপুদের খোঁজ করতে যেতে অমলের মা বললেন—

'শুনেছো শ্রাবণী, বড় বৌমাকে নাকি আবার হাসপাতালে ভর্তি করবে।'

তপু বলল—'হ্যাঁরে মেজদি, আমার অপারেশনের সেলাই পেকে গিয়ে নাকি সেপ্টিক হয়ে গেছে, আবার অপারেশন করবে বলেছে।'

শবু বলল—'ওমা সে কি? আবার ঐ হাসপাতালে ভর্ত্তি হবি? মেয়েটা কোথায় থাকবে?'

অমল বলল—'না, হাসপাতালে নয়, এবারে ডাঃ বটব্যালের নার্সিং হোমে—কাছেই। এখান থেকে জিটি রোড ধরে তিনটে স্টপ গিয়ে বড় কারখানার সামনে গলিতে সে নার্সিং হোম। মেয়েটি বাড়ীতেই থাকবে।'

দীননাথ বলল—'এ ত বড় ঝামেলা হল। মাঐমা কি একা অমলের অফিস, বাচ্চা দেখা সবদিক সামলাতে পারবেন? যে ক'দিন তপু সুস্থ হয়ে নার্সিং হোম থেকে না ফিরছে সে কদিন তুমি এখানে থেকে মাঐমাকে সাহায্য কর।'

দীননাথের এত বিবেচনাজ্ঞান দেখে শবু খুশি হল, আবার চিন্তিতও হল, জিজ্ঞেস করল—

'তুমি একা একা বাড়ীতে থাকতে পারবে? ভয় করবে না ত? খাওয়া দাওয়ার কি হবে?'

'নিজেদের বাড়ী ত, ভয় আবার কি? পাশে মামীমারা আছেন খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।'

তপুও খুশি হল, বলল—'তুই থাক মেজদি, আবার পেট কাটবে, আমার ভয় করছে।'

শবু এক কাপড়ে এসেছিল, এক কাপড়েই রয়ে গেল। কাল সকালেই তপুকে নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করবে। কাপড় না হয় তপুর শাড়ী পরে চালিয়ে দেবে, কিন্তু অন্য সব? কথা হল দীননাথ রোজ বিকেলে একবার করে আসবে আর কালই অন্য যা যা লাগে বাড়ী থেকে এনে দিয়ে যাবে।

দশদিন ধরে নার্সিং হোমের পালা চলল। মাঐমা ও শবু মিলে দশদিনের মেয়েটিকে দেখা শোনা করে কুড়ি দিনেরটি করে তুলল। সব থেকে পরিশ্রম চলছে অমলের—সে অফিস করছে, হাটবাজার করছে, নার্সিং হোমে যাচ্ছে আবার যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে যতটা সম্ভব মেয়েটিকেও দেখে।

শবু সকাল থেকে মেয়েকে দেখা শোনা, রান্না করা, খেতে দেওয়া সেরে রোজ বিকেলে জি. টি রোড ধরে তিন চারটে স্টপ হেঁটে গিয়ে তপুকে দেখে আসে। যেদিন দুপুরে তপুকে আবার অজ্ঞান করে পেটে অপারেশন করল সেদিন বিকেলে তপুর প্রায় অজ্ঞান অবস্থা দেখে শবুর কান্না পেয়ে গেল—এত আদরের ছোট্ট বোনটিকে আর কত কাটা-ছেঁড়া করবে! তপু বিছানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে আর শবুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে।

শেষে তপু দ্বিতীয় অপারেশনের ধাক্কাও কাটিয়ে উঠল। মেজদির সঙ্গে কথা বলতে লাগল, মেয়েটা বাড়ীতে কি করছে মেজদি ও অমলের মুখ থেকে শুনতে লাগল। একটু সুস্থ দেখে শবু জিজ্ঞেস করল—

'অপারেশনের আগে খুব ভয় পেয়েছিলি না রে তপু?'

তপু বলল—'ভয় ত করছিল, কিন্তু কি করব বল। ওদিকে ডাক্তারবাবু বা কেউ বলছে না কবে আবার অপারেশন করবে। পরে হঠাৎই একদিন অপারেশন টেবিলে ওঠালো।'

শবু বলল—'সেদিন বিকেলে এসে তোকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমার সে কি কষ্ট হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে তোর যেন নবজন্ম হল।'

মেয়ের জন্ম, মেয়ের মায়ের নবজন্ম, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আসা সুলেখার বিয়ে এই সব নিয়ে একটি মাস প্রায় কেটে গেছে। শবু বাড়ী ফিরে এসেছে। এদিকে শবুর জন্মমাস শ্রাবণ মাস চলে গিয়ে এসেছে ভাদ্র মাস।

তিন মাস তিন মাস করে ছয় মাস ছুটি শেষ হয়ে গিয়ে আরো তিন মাসের

ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে দীননাথ-সেও প্রায় দেড় মাস হয়ে গেছে। মাইনের টাকা পয়সা আসা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কানাইয়ের পুটুর দায়-শোধ-করা পাঁচশ টাকা দিয়ে এতদিন কোন রকমে চলেছে। আর চলছে না। কানাইকে টাকার কথা লিখতে সে তিনশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। মাঝখানে একদিন শবুরা সোদপুরে গেছিল। সেখানে ওদের অবস্থার কথা শুনে বড়বৌদি ও স্বর্ণা প্রায় জোর করে দীননাথের হাতে দুই শ টাকা গুঁজে দিয়েছে। অতএব কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত।

পাটনার অফিস থেকে হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম এল—দীননাথকে অস্থায়ী প্রোমোশন দিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যেতে চাইছে সে রাজী কি না জানাক।

দীননাথ বলল—'এ সব চাটুকারের উর্বর মস্তিষ্কের চাল, আমি ওতে ধরা দিচ্ছিনা।'

পরের ডাকেই টেলিগ্রামে জবাব চলে গেল—প্রোমোশন চাই না, কলকাতায় বদলি চাই।

শবু বলল—'প্রোমোশন দিতে চাইল তাও নিলে না?'

দীননাথ বলল—'দেখই না কি হয়। চাটুকার প্যাঁচে পড়ে গেছে—তাই ছুটির পর ছুটি নিয়ে চলেছি তবু পানিশ্‌মেন্টের কথা না বলে প্রোমোশনের কথা বলছে।'

এমন মাটি কামড়ে পড়ে থাকা শবুর ভাল লাগছে না। তবু যদি বাড়ীর পরিবেশ ভাল হত। সেখানে মা মঙ্গলাদেবীর অশান্তি মাথার উপর ঝুলছে। এদিকে ধার দেনায় ডুবে যেতে বসেছে।

কদিন পরে অফিসের কাজে পাটনা ঘুরে এসে মহীও সে কথা বলল—

'সেজদা, মিশ্রা সাহেবের কাছে খবর নিয়ে জানলাম তুই নাকি দিল্লীতে প্রোমোশনের অফার এ্যাক্সেপ্ট করিস নি?'

দীননাথ বলল—'বুঝলি না, এসবই হল চাল। আমি দিল্লীতে যেতে রাজী হলেই চার্জসীট ধরাবে, বলবে—তুমি কলকাতা ছেড়ে পাটনা যেতে পারছ না আর প্রোমোশনের কথায় দিল্লী ছুটে যেতে চাইছ? হয়ত এমার্জেন্সীতে জেলেই পুরে দেবে।'

এতটা তলিয়ে শবু ভাবেনি। সে ভেবেছিল, বেশ ত প্রোমোশন হবে, রাজধানী শহর দিল্লীতে চাকরি করবে, কি সুন্দর বেড়িয়ে বেড়াবে। তলায় তলায় যে এত প্যাঁচ থাকতে পারে তা কে জানে। সত্যি শবু ভীষণ বোকা। যদি জেলে পুরে দেয়?

দেবানন্দপুর থেকে সস্ত্রীক শিবেশ্বর বাবু এসে একদিন দুপুরে থেকে খাওয়া দাওয়া করে ঘুরে গেল, শিলং এর অনেক গল্প হল। সেদিন শবুরা গিয়েছিল, মমতাদি বাড়ীতে ছিল না সেজন্য খুব দুঃখ করল, আর একদিন যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। শিবেশ্বর বাবু সামনের জানুয়ারীতে রিটায়ার করছে।

আবার টেলিগ্রাম, কানাই পাঠিয়েছে—কাকলী হসপিটালাইজ্‌ড্‌ সেণ্ড মেজদি।

তপু অমলকে জানাতে অমল বলল—'মেজদি, আপনারা দুজনেই যান, সে ক'দিন আমরা আপনাদের বাড়ীতে থাকব।'

অমলের কর্তব্য জ্ঞান দেখে শবু মুগ্ধ। দেড়মাসের মেয়েকে নিয়ে তপু আর অমল এসে গেল, তপুর শাশুড়ী আগেই নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গেছেন। শবু দীননাথ চলল মন্দির শহরে।

কাকলী আবার সন্তান-সম্ভবা হয়েছিল। কিছুদিন আগে নন্দু চলে গেছে সে স্মৃতি তখন সবার মনে টাটকা। এক সন্ধ্যেয় কাকলী একা একা নীচে কুয়োতলায় গিয়ে কি দেখে যেন ভয় পায়। সেই থেকেই গর্ভপাত ও হাসপাতাল-ডাক্তার-নার্স। শবুর মনে পড়ে যায় নিজের জীবনের সেই দুর্ঘটনার কথা। বিপদ কত দিক থেকে আসে তার ঠিক নেই। কানাই কাকলীর মন খারাপ, মন খারাপ মিঠি দিঠিরও। মিষ্টি মায়ের সে সব বোধ নেই, সে শবুর কোলে উঠে হেসেই অস্থির।

বাবা নন্দুর কথা বলে দুঃখ করলেন—'এতদিন কষ্ট পাচ্ছিল, এখন সে তার মায়ের কাছে গিয়ে ভালই আছে।·· ··শবু, তুই একবার মিতুর সঙ্গে দেখা করিস, ওদের কেমন চলছে দেখে আসিস।'

মিতুর সঙ্গে দেখা করতে মিতু তার কষ্টের ফিরিস্তি দিল। কষ্ট এখন শবুদেরও—করার কিছু নেই। কথার মাঝখানে মিতু একবার বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস করল—

'কানাই এর বৌ কাকলীর এবারে কি হল—ছেলে না মেয়ে?'

মিতুর কথাবার্তা শবুর ভাল লাগে না। কানাই কাকলীর প্রতি আক্রোশে তার পেট ভরা। অথচ কানাইয়ের টাকা না হলে তাদের চলে না। কেন যে সে স্বামীর ঘর করতে চায় না তাও শবু বুঝতে পারে না।

চলছে না শবুদেরও। প্রোমোশন পেয়েও দিল্লী যেতে রাজী হয়নি শুনে কানাই সন্দেহ প্রকাশ করল—এটা কি ভাল হল? শেষে দীননাথের যুক্তি

মেনে নিয়েছে।' আসার সময় আবার পাঁচশ টাকা দিল কানাই।

শবুরা কলকাতায় ফিরে এসেছে। পুজোও এসে গেছে। পুজোর দিন গুলোতে তপু অমলদের নেমন্তন্ন করে আদর আপ্যায়ন করল। অমলের বিয়ের পরই মা চলে গেছেন—শ্বশুর বাড়ীতে শাশুড়ীর আদর যত্ন তার ভাগ্যে জোটেনি। শবু ত তপুর থেকে অনেক বড়, সে-ই তাদের মায়ের আদর যত্ন দেবে যতটা পারে—আর্থিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন।

পুজোর আগেই সে দীননাথকে বলেছিল—'শুনছো, পুজোতে তপুকে একটা নতুন শাড়ী কিনে দেবে ?'

দীননাথ বলেছে—'দিও—কানাইয়ের টাকাতে সংসার চলছে, তার বোনদের ত শাড়ী দিতেই হয়।'

নতুন শাড়ী পেয়ে খুশী হয়েও তপু বলেছে—

'মেজদি, তোদের এখন এই অবস্থা, এর মধ্যে আবার শাড়ী কেন ?'

'তোর গিন্নীপনা রাখ'ত' বলে শবু তাকে থামিয়েছে।

পুজো চলে গেছে। কাকীমা তাঁর বিয়ে হওয়া তিন মেয়ের সঙ্গে শবু তপুকেও সিঁদুর আলতা দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। পূর্ণিমার লক্ষ্মীপুজো গিয়ে অমাবস্যার লক্ষ্মীপুজার ভাবনা শুরু হয়েছে।

চার

দীননাথের শেষ টেলিগ্রামের জবাব এসেছে দিল্লী থেকে। ন' মাস ধরে দরখাস্ত করে ছুটি নিয়ে নিয়ে এতদিনে জবাব এসেছে, সেও আর এক দফা তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত পাঠাবার বেশ কিছুদিন পর।

এবারও সেই মামুলি জবাব, বাঁধা গৎ—কলকাতার অফিসে কোন পদ খালি নেই, যদি কখনো খালি হয় তখন বিবেচনা করা হবে।

ন' মাস পরে বদলির দরখাস্তের এই জবাব পেয়ে দীননাথ ক্ষেপে উঠেছে। সে ঠিক করেছে আর অপেক্ষা করা নয়, এবার সে চাকরি ছাড়ার তিন মাসের নোটিশ দেবে। এই নিয়ে সে প্রায় রোজই বড়দার অফিসে বা সোদপুরে যাতায়াত করছে।

ভাবনায় চিন্তায় শবুর আর কিছু ভাল লাগে না। রাতে সে ভাল করে ঘুমোতে পারে না। এক এক রাতে তার এক এক ভাবনা।......

প্রথমেই মনে আসে পাশে শুয়ে থাকা মানুষটার স্বাস্থ্যের কথা। শিলং এ যাবার আগে কি সুন্দর তার স্বাস্থ্য করে তুলেছিল আদর যত্নে খাইয়ে দাইয়ে—ঠিক যেন পুঁটিমণি গাইটি। শিলংএর চার বছরে তার অনেকটাই ঝরে গেছিল। পাটনায় গিয়ে আবার কি সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল, বোধহয় আগের চাইতেও ভাল। সেই আট বছরে একটু একটু করে গড়ে তোলা স্বাস্থ্য মাত্র ন' মাসে একেবারে ভেঙে পড়েছে—চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, পাঁজরার হাড় গোনা যাচ্ছে, অকালে মাথার অর্ধেক চুলে পাক ধরেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভাবনা-চিন্তায় অভাবে মানুষটা আর কতদিন বাঁচবে! শেষে কি শবুর কপাল ……

চাকরি ত ছাড়বে বলছে। কিন্তু কি করবে? কখনো বলছে পেট্রোল পাম্প ইজারা নেওয়া যায় কিনা দেখছি। কিন্তু তার জন্য যে টাকা লাগে তার যোগাড় নেই, সঞ্চয় ত এক পয়সাও নেই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ছাড়া। বলছে—তাঁতের ব্যবসা করবে, সেবার ছোটমামার ছেলে অনিত্য কথাটা মাথায় ঢুকিয়েছিল। সে কাজের নেই কোন অভিজ্ঞতা, অনিত্যর বুদ্ধিতে ব্যবসা করতে গিয়ে একেবারেই ডুববে। বাড়ীতে দুধেল গাই রেখে দুধের ব্যবসা করবে—এও আর এক উদ্ভট চিন্তা তার। যে মানুষের মতিরই স্থির নেই, জীবনে যে চাকরি ছাড়া আর কিছু করেনি, সে কিনা করবে ব্যবসা! বাজারের অবস্থা দেখে স্কুল মাষ্টারী করার ভূত তার মাথা থেকে নেমে গেছে।……

কোনরাতে ভাবে—কানাই কতদিন টাকা দিতে পারবে? মিতুদের সংসারও সে টানছে। এরপরে আর কার কাছে হাত পাতবে? মহী ভব সোনা শেফালীর কাছে? মহী ছাড়া বাকি তিনজনকে দীননাথ লেখাপড়া করিয়েছে ঠিকই—চাইলে না করতে পারবে না। এতদিন দীননাথ তাদের দেখেছে—এখন তারা দেখবে। কিন্তু এককালের দাতা যদি অবস্থা বিপাকে গ্রহীতা হয় তার চেয়ে অসম্মানের আর কিছু নেই। তা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সংসার আছে—কতদিন দাদা বৌদির সংসার তারা টানবে? ·····

আবার মনে পড়ে মঙ্গলা দেবীর কথা। যখন তিনি দেখবেন তাঁর রোজগেরে ছেলে বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে তখন তিনি দুবেলা উঠতে বসতে কথা শোনাবেন। যদি ভব সোনার টাকা নিতে হয় তবে ত তিনি রোজ দুপায়ে খুঁচবেন। বলবেন—ক্যান, এখন ভবা সোনার টাকা নিতে হয় ক্যান—ভবা সোনা টাকা না পাঠালে দুবেলা মুখের গ্রাস উঠবে কি করে?

তারপরই ছুটবে তাঁর মুখ, শবুর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।......

শবু তার এত ভাবনা চিন্তার কথা কাকে জানাবে? জানাতে পারত মাকে—কিন্তু তার যে মা নেই। মা নেই—মনের কথা জানাবার মত মানুষও নেই। এখন পড়ে পড়ে ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মা-র কথা মনে পড়তে চোখে নেমে আসে জল। অনেক কেঁদে, কাঁদতে কাঁদতে অনেক রাতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ সকাল থেকে দীননাথ চাকরি ছাড়ার পাকা নোটিশ লিখছে—পয়লা নভেম্বর থেকে তিন মাসের নোটিশ, পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে আর চাকরি করবে না। কারণ উপরওয়ালারা তাকে কলকাতায় বদলি করছে না, তার পক্ষেও আর বাইরে থেকে চাকরি করা সম্ভব হচ্ছেনা। সঙ্গে যাচ্ছে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে হাজার পনরো টাকার লোনের দরখাস্ত। ঘটনাক্রমে ঐ পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে বড়দা হৃদিনাথও রিটায়ার করছে।

শবুর বলার কিছু নেই শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া। আপাততঃ সে দিনের রান্না নিয়ে ব্যস্ত। কি আর রাঁধবে, রেশনের মোটা আধপচা চাল, ডাল আর সামান্য শাক পাতা। বেলা দশটা বাজে। সঙ্কল্প স্থির করে দীননাথ তার দশমাসের ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি গোঁফ নির্মূল করে দরখাস্ত লিখতে বসেছে।

হঠাৎ পোটলা পুঁটলি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন মা মঙ্গলা দেবী, সঙ্গে মেজ মেয়ে করবী। দীননাথ বাইরের ঘরে বসে লিখছিল, আর সেটা ছিল মঙ্গলা দেবীর শোবার ঘর। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন—

'এ কি, আমার বিছানা কই?'

দীননাথ বলল—'ঐ ত পুরোনো শোবার ঘরে পাতা আছে। আপনি কি এলাহাবাদ থেকে আসছেন? করবীর সঙ্গে দেখা হল কোথায়?'

সে কথার জবাব না দিয়ে মঙ্গলাদেবী একবার পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন—'ভবার ঘরে তার বিয়ের খাট বিছানার পাশে আমার বিছানা?'

দীননাথ বলল—'ভবর খাটটা শুধু পাতাই আছে, খুলে ফেললেই হবে। এখন আমি অফিসে চিঠি লিখতে ব্যস্ত, পরে দেখব।'

মঙ্গলাদেবী করবীকে নিয়ে তাঁর বিছানায় গিয়ে বসলেন।

শাশুড়ীর গলার আওয়াজ পেয়ে রান্না ফেলে দুরু দুরু বুকে এসে শবু তাঁকে প্রণাম করল, জিজ্ঞেস করল—'কেমন আছেন, আপনার রান্না বসাব ত?'

মঙ্গলা দেবী কোন জবাব দিলেন না। করবী বলল—

'মা শেফালীদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শবু উনুনের রান্না দেখতে গেল। মা মেয়ের নীচু গলায় কিছু কথা কানে আসছে।

দীননাথের লেখার কাজ শেষ হয়েছে। সে গেল স্নান করতে—এখনই খেয়ে বড়দার অফিসে গিয়ে দেখিয়ে নোটিশটা ডাকে পাঠাবে।

করবী রান্না ঘরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল—

'সেজবৌদি, মা-র ষ্টোভ কোথায়?'

দীননাথ ততক্ষণে স্নান করে বেরিয়েছে, করবীর প্রশ্ন শুনে নিজেই জবাব দিল—'ষ্টোভ দিয়ে কি করবি?'

'জল গরম করব, মা চা খাবে।'

দীননাথ বলল—'রান্না ত হয়ে গেছে, উনুনেই জল গরম করতে পারিস। না হলে ঐ যে ষ্টোভ আছে, সেটাই এখন ব্যবহার হয়, সেটাতেও জল গরম করতে পারিস।'

করবী বলল—'না, মার ষ্টোভ চাই।'

দীননাথ খেঁকিয়ে উঠল—'মা-র ষ্টোভ, আমার ষ্টোভ এসব কথা কি বলছিস? দেখ গিয়ে সিঁড়ি ঘরে সে অচল স্টোভটা রাখা আছে। এখন ঘোঁট পাকাসনে, আমার মন মেজাজ ভাল নেই, অফিসে একটা চিঠি পাঠাতে যেতে হবে।'

মঙ্গলাদেবী ঘর থেকে ডাকলেন—'এই করবী, থাক। স্টোভের দরকার নেই, তুই চলে আয়।'

করবী পাশের ঘরে চলে গেল। দীননাথ তাড়াতাড়ি খেয়ে—'বড়দার অফিসে যাচ্ছি' বলে রওনা হয়ে গেল। এমন অবস্থায় এরকম একটা গুরুত্ব-পূর্ণ কাজে সে গাড়ী নিয়ে রওনা হল অথচ শবু তাকে এগিয়ে দিতে, বরাবরের অভ্যাসমত 'যাওন নাই আহ গিয়া' মন্ত্রটাও পড়তে পারল না।

দীননাথ চলে গেল। মা মঙ্গলা দেবী ও মেজ ননদ করবীর মত দুই বাঘিনীর মুখে পড়ে তার কি দুরবস্থা হয় ভেবে দুর্গানাম জপ করতে করতে শবু এঁটো পরিষ্কার করতে লাগল।

একটু পরেই করবী রুদ্র মূর্তিতে এসে সামনে দাঁড়াল, বলল—

'সেজবৌদি, ভবর শোবার ঘরে মা থাকবে এটা তোমাদের কি ব্যবস্থা?' সেদিন শবু ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল—ঘর বদল নিয়েই ঘোর অশান্তি হবে। দীননাথ তার কথায় আমল দেয়নি। বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল—

'আমার ব্যবস্থা নয় ছোড়দি। এটা আপনার সেজদার ব্যবস্থা।'

'তুমি বারণ করনি কেন?'

'আপনার ভাইরা কি কারো কথা শুনে চলে? আপনি তাদের চেনেন না? আজ যে চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিতে গেল সে কি আমার কথা শুনে?'

করবী এবার অন্য কথা তুলল—'তুমি নাকি মাকে রান্না করে দাওনা?'

শবু বলল—'বাড়ীর সব কাজই করি, রান্না করতে দিলে তাও করি। বহু-বছর ত রান্না করেছি একসঙ্গে দশ বারোজনের হাঁড়িও ঠেলেছি। আমার রান্না খেতে ঘেন্না করে সেও শুনেছি, আমি যে নোংরা কাপড়ে রান্না করি।'

'তোমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে।'

'কর্ত্তব্য ভালবাসা একতরফা হয়না। আমি কোন দিন কোন কাজে না করিনি।'

'তুমি মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কর।'

'কবে কখন কোন খারাপ ব্যবহার করেছি, বলে দিন।'

পাশের ঘর থেকে মঙ্গলাদেবী চেঁচিয়ে বললেন—'তুই চলে আয় করবী, আমি ঝগড়া করাকে ঘেন্না করি। আমি শান্তিতে থাকতে চাই, আমার পাঁচ দুয়ার খোলা আছে। জিনিষ পত্তর সব গুছিয়ে নে, চল আবার শেফালীর বাড়ীতে চল। এখানে জলস্পর্শ করাও দরকার নেই।'

'দেখব তুমি কি সুখে এ বাড়ীতে বাস কর'—বলে করবী গিয়ে আবার পোঁটলা পুঁটলী গুছিয়ে নিল।

তারপর ভর দুপুর বেলায় জলস্পর্শও না করে মা ও মেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যায় ও মিথ্যা দোষারোপে শবু এতক্ষণ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, মুখে মুখে দুচার কথার জবাবও দিয়েছে। এতক্ষণ চোখে তার জল আসে নি। কিন্তু ভর দুপুরে জলস্পর্শও না করে ছেলের মঙ্গল অমঙ্গল বিবেচনা না করে মা চলে গেলেন এমন দিনে যখন ওদের জীবনে নেমে আসছে ঘোর অনিশ্চয়তা—সেই কথা ভেবে এখন শবুর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মা চলে যাবার আগে শবু কী করতে পারত, ছুটে গিয়ে পথেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে একটা নাটক করলে ঠিক হ'ত কি? এ বাড়ীতে অনেক নাটক নভেল ত হয়েছে, আর কেন?

কাঁদতে কাঁদতে শবু এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল, দুপুরে খাবার কথাও তার মনে রইল না। ঘুম ভাঙল দীননাথের ফিরে আসার মোটর বাইকের আওয়াজে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

দীননাথ বিষণ্ণভাবে বলল—'চাকরি ছাড়ার নোটিশ পাঠিয়ে দিলাম। এ কি—মা, করবী এরা সব কোথায় গেল ?'

শবু বলল—'শেফালীদের বাড়ী।'

'কেন ? কখন গেল ? কি বলে গেল ? কবে আসবে ?' একগুচ্ছ প্রশ্ন দীননাথের।

শবু যা যা ঘটেছিল একে একে বলে গেল। দীননাথ সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

'যার যা খুশি করুক, আমি আর ভাবতে পারিনা। কেনই বা এল, কেনই বা রাগ দেখিয়ে গেল! সোনার খবরই বা কি, তার মাথাটা কি পুরোই খারাপ করে দিয়ে এসেছে ? আমি যেতেও বলিনি, পায়ে ধরে সাধতেও যাব না। নিজেদের বাড়ীতে না থেকে মেয়ের শশুরবাড়ীতে থাকবে—থাক। ওখানেই আবার মাতুলের বাড়ী, সুনামের ত অন্ত নাই !'

দীননাথের মন মেজাজ ভাল না, চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে এসেছে। তাই শবুর যে সেদিন নাওয়া খাওয়াও হয়নি সে দিকে তার নজরই পড়ল না।

একদিন পরে শেফালী এল স্কুল ফেরৎ। দীননাথ তাকে বলল—'শেফালী, মা সেদিন ওরকম ব্যবহার করে গেল কেন ? করবীও শুনলাম কোমর বেঁধে ঝগড়া করে গেল।'

শেফালী বলল—'তুই যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে আছিস, তোদের চলবে কি করে সেই সব ভেবে মার মনে শান্তি নেই।'

দীননাথ ব্যঙ্গ করে বলল—'আমার জন্য চিন্তা করার এই নমুনা !'

শেফালী শিক্ষিত, তাই সে শবুর সঙ্গে ঝগড়া করল না। শুধু কথায় বুঝিয়ে গেল সে তার মা আর শাশুড়ীকে সমান ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

তা করুক। শবু নিজের শাশুড়ীকেও চেনে আবার শেফালীর শাশুড়ীকেও অনেকবার দেখেছে। দু'জনের চরিত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

একটা কথা শবু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। দীননাথ এত কষ্ট, ধার কর্জ খরচ পত্র করে বারবার গয়না বন্ধক দিয়ে বাড়ীটা তৈরী করল, প্রতিবার বাড়ীর কাজের সব ঝামেলা শবুকেও পোহাতে হয়েছে—সেখানে কি তাদের বাস করাও চলবে না ? শবু ত বদলি না হতে জোর করে পাটনা থেকে চলে আসতে চায় নি। বাধ্য হয়েই এসেছে। আর ওদের এখানে থাকাকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলা দেবী ঘোর অশান্তি সৃষ্টি করছেন !

আরো দুটোদিন যেতে আবার সেই বেলা দশটায় এলেন মঙ্গলাদেবী—এবার সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ের জবার ছেলে হাবলু। হাবলু এ বাড়ীতে থেকেই খেয়ে পরে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। এখন সে এক অন্যজাতের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী দমদমে থাকে আর সেখানকার একটি কারখানায় কাজ করে।

মঙ্গলাদেবী বাড়ীতে ঢুকেই বললেন—'আজ আমার একাদশী, খাওয়া দাওয়ার বালাই নাই। সোনা মেদিনীপুরে বাড়ী করে এলাহাবাদে চাকরি করছে, এদিকে তার বাড়ীটা সাতভূতে লুটে খাচ্ছে, ভেঙে চুরমার করছে। আমি গিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করি।

'আর চারদিন পরেই অমাবস্যার লক্ষ্মীপূজা। দেখি, লক্ষ্মীর কাঠাটা সাজিয়ে রেখে যাই। সেজ বৌমা ছেলেমানুষ, সে হয়ত ঠিকমত সব পারবে না।'

দীননাথ বাড়ীতেই ছিল, কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না। শবু রান্না ফেলে সাহায্য করতে গেল। মঙ্গলাদেবী বললেন—

'না শ্রাবণী, তুমি বরং রান্নার দিকটা দেখ, দীনুর ত আবার টাইম বাঁধা খাওয়া। আমার অভ্যাস আছে, একাই কাঠা সাজাতে পারব। এই হাবলু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে এখানে আমার কিছু বাসন কোসন আছে সেগুলো এই থলেগুলোতে ভরে ফেল ততক্ষণ।'

শবু গিয়ে রান্নায় মন দিল।

ঘণ্টা দুই ধরে পুরোনো শোবার ঘরে খুটখাট করে বেলা বারোটা নাগাদ মঙ্গলাদেবী বললেন—

'দীনু, শ্রাবণী—লক্ষ্মীর কাঠা সাজিয়ে রেখে গেলাম। আমি কালই মেদিনীপুর যাচ্ছি। পূজার মধ্যে আসতে পারব কিনা জানিনা। আমার কিছু বাসন পত্র এই থলে তিনটেতে করে নিয়ে যাচ্ছি। চল হাবলু।'

দীননাথ মার হাতের থলেটা নিজের হাতে নিয়ে বলল—'চলুন, আপনাদের রিক্সায় তুলে দিয়ে আসি।'

শবু মঙ্গলাদেবীকে প্রণাম করল। দীননাথ তাঁকে লক্ষ্মীপূজো পর্য্যন্ত থেকে যাবার কথা বললনা। বললেও হয়ত কোন ফল হত না—কারণ তাঁর সব সিদ্ধান্তই অপরিবর্ত্তনীয়।

স্বয়ং লক্ষ্মীর বাহন এসে বসেছে বাড়ীতে। পেঁচা সাধারণতঃ কালোই হয়।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! একটা সাদা পেঁচা আজ দুদিন হল বাড়ীর নারকেল গাছে বসে আছে। কোথাও উড়েও যাচ্ছে না। ওটা কি সত্যিই পেঁচা—পেঁচা কি সাদা হয়? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না—তবে প্রতিবেশীরা যারা দেখল তারা একমত যে ওটা পেঁচা-ই।

বাড়ীর গাছে পেঁচা বসে আছে দেখে প্রথম দিনেই দীননাথ বলেছে—

'দেখ লক্ষ্মীর কাঠা সাজানো হয়ে আছে, আবার লক্ষ্মীর বাহনও সশরীরে উপস্থিত। এবার লক্ষ্মীপূজো খুব জমজমাট হবে মনে হচ্ছে।'

আবার দুদিন পরে অর্থাৎ লক্ষ্মীপূজোর আগের দিন সকালে দীননাথ বলল—

'লক্ষ্মীর কাঠা মা সাজিয়ে রেখে গেল, কিন্তু আমার হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই, পূজো করব কি দিয়ে? মা যখন থাকছে না পূজোর সময়, আর বড়দা ত ভাইদের মধ্যে বড—পূজোটা তবে বড়দার বাড়ীতে হোক। আমিও কিছু টাকা দেব। চল আজ বিকেলে আমরা পূজোর সব বাসন পত্র লক্ষ্মীর কাঠা বড়দার বাড়ীতে নিয়ে যাই।'

আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে শবুও কোন কূল কিনারা পাচ্ছিল না। বলল—'সেই ভাল, চল।'

দুপুরে খেয়ে উঠে লক্ষ্মীর কাঠা একটা থলেতে পুরবে বলে কাঠার উপরের লাল চেলির ঢাকনাটা তুলতেই শবুর চক্ষুস্থির, তার হাত পা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল। ডাকল—

'শুনছো—শিগগীর দেখে যাও।'

দীননাথ পাশের ঘর থেকে ছুটে এল—

'কী হল, অমন করছ কেন?'

ভয়ে শবুর গলা শুকিয়ে এসেছে, কোনরকমে বলল—'লক্ষ্মী ত নেই।'

দীননাথ এক নজর দেখে বলল—'ঐ ত কাঠের তৈরী লক্ষ্মীর পেঁচা, পুরোনো কড়ি, সিঁদুরের কৌটো আরো সব কি কি আছে। প্রায় কাঠা ভর্ত্তি ধানও আছে।'

শবু বলল—'কিন্তু আসল লক্ষ্মীই ত নেই। আমিও কত বছর কাঠা সাজিয়ে পূজোর যোগাড় করেছি আমি জানি। একটা কাঠের চূড়ার মত জিনিষ ছিল তাকে বলা হয় লক্ষ্মী। বড় বড় আরো কটা পেঁচা, সিঁদুরের কৌটো, কড়ি, সধবার শাঁখা আর সব জিনিষ ছিল তাও নেই। এ ত লক্ষ্মী নয়—তার কঙ্কাল মাত্র আর খোলসটা।'

দীননাথ অসহায় ও বিব্রত বোধ করল। একটু ভেবে বলল—'মা যখন বলে গেছে, লক্ষ্মীর কাঠা সাজিয়ে রেখে গেলাম, তখন যা আছে তাই লক্ষ্মী। ঐ সব নিয়েই চল বড়দার ওখানে।'

দুজনে পুজোর সরঞ্জাম নিয়ে সোদপুর রওনা হল। হায়রে অবোধ দীননাথ! সে বুঝল না মা হয়ে ছেলের সঙ্গে মঙ্গলা দেবী কী প্রবঞ্চনাই করে গেছেন, লক্ষ্মী বলে শুধু তার খোলসটাই রেখে গেছেন। হয়ত যে থলেটা দীননাথ নিজে হাতে করে গিয়ে মার সঙ্গে রিক্সায় তুলে দিয়েছে তাতেই ছিল লক্ষ্মী অথচ সে তা জানতেও পারেনি। মা হয়ে ছেলের সঙ্গে তিনি কী শত্রুতাই করে গেছেন! কার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা—দীননাথ, শবু, না কি দুজনের সঙ্গেই?

জীবনে এমন এক একটি ঘটনা ঘটে যা কারো কারো ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়ে যায়। যেদিন দীননাথ চাকরি ছাড়ার নোটিশ পাঠাচ্ছিল সেদিন সেই সময়েই মা মঙ্গলা দেবী এসে আবার ভর দুপুরে জলস্পর্শ না করে চলে গেলেন। আবার কটা দিন পরে এসে তিনি ছেলের সঙ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে ভর দুপুরে বাড়ীর লক্ষ্মী নিয়ে চলে গেলেন। মনে হচ্ছে এ সবের মধ্যে একটা অশুভ ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সেটা যে কি শবু তা জানে না।

সোদপুরে সব দেখে বড়বৌদি বীণা বলল—

'ঠাকুর পো, শ্রাবণী ঠিকই বলেছে, কাঠায় লক্ষ্মী নেই।'

দীননাথের তখন কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। কথা বলতে পারছে না। হতাশায় ভেঙে পড়ে কোনরকমে সে বলতে লাগল—'সেদিন অফিসে নোটিশ পাঠাবার সময় এসে মা একদফা অশান্তি করে গেল। এবার লক্ষ্মী সাজিয়ে রেখে গেলাম বলে আসল লক্ষ্মী নিয়েই চলে গেল। সামনে আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এদিকে মা হয়ে আমাকে প্রতারণা করে গেল! বড়দা, এখন আমি কি করব, পুজোই-বা হবে কি করে?……'

দীননাথের এমন অসহায় অবস্থা শবু কখনো দেখেনি—

বড়দা হৃদিনাথ সব শুনে বলল—'কাঠা পুজোই আমাদের লক্ষ্মীপুজো। কাঠা যখন আছে ঐতেই পুজো হবে। দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে যা যা লাগে দেখেশুনে কিনে নাও।'

নির্দিষ্ট দিনে পুরোনো কাঠায় নতুন লক্ষ্মীর পুজো হল সোদপুরের বাড়ীতে। করবী শেফালীদের সময় মতই খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ এলনা।

পরদিন সকালে দীননাথ বাজার থেকে ফিরে বলল—'শুনছো, সেই সাদা

পেঁচাটা দেখলাম রায়বাবুদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় মরে পড়ে আছে। ওটা হয়ত অসুস্থ ছিল।'

শুনে শবুর মন খারাপ হয়ে গেল। লক্ষ্মীপুজো নিয়ে যা কেলেঙ্কারী হল তার উপর মারা যাবার আগে ঐ লক্ষ্মীর বাহনটি কদিন এবাড়ীরই একটি গাছকে আশ্রয় করে ছিল। কেন? একি কোন অমঙ্গলের পূর্বাভাষ!

লক্ষ্মীপুজো নিয়ে যাই হোক, আগে থেকেই ঠিক ছিল খুড়তুতো বোন শ্রীলারা চারজন মিলে তাদের ভাই পুটুকে ভাইফোঁটা দেবে নৈহাটিতে শ্রীলাদের বাড়ীতে। জামাই অপূর্ব সেখানকার কলেজের প্রফেসর। ওরা দিদি-জামাইবাবু হিসেবে শবু দীননাথকেও সেখানে যেতে বলেছে, একটা হুজুগ পেয়ে দীননাথও রাজী হয়ে গেছে।

এদিকে ওদের আর্থিক দুরবস্থা চরমে। পাটনায় থাকতে শবু ভাই-ফোঁটাতে নন্দু কানাইকে একশ টাকা করে পাঠিয়েছে। এবার নন্দু নেই, তবু কানাইকে কিছু পাঠাতে হয়। দীননাথকে সে কথা বলতে সে বলেছে—দিচ্ছি পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে, এখন ত কানাইয়ের টাকাতেই সংসার চলছে, আমরাও গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো করি।

সে ত গেল একদিক। ওদিকে শেফালী দীননাথকে ভাই ফোঁটাতে নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে একই দিনে শেফালী ও শ্রীলাদের বাড়ী কি করে যাওয়া যাবে?

দীননাথ বলল—'আমি খুব সকালে শেফালীর বাড়ী গিয়ে ফোঁটা নিয়ে এসে তুমি আমি দুজনে গাড়ীতে নৈহাটি রওনা হব। তুমি সেজে গুজে রেডি হয়ে থাকবে।'

সকালে উঠে দীননাথ গেছে ফোঁটা নিতে, শবুও তৈরী হয়ে নিচ্ছে নৈহাটি যাবে বলে। এমন সময় পুটু এসে উপস্থিত হল।

শবু ত অবাক! বলল—'কিরে পুটু, তোকে ফোঁটা দিতে আমরা নৈহাটি যাচ্ছি, আর তুই এখানে! তোর জামাইবাবু আদরিণীকে নিয়ে ফিরলে আমরা সেই গাড়ী......'গাড়িটার 'আদরিণী' নাম শবুরই দেওয়া।

পুটু ধমক দিল—'তুই মেয়েমানুষ গাড়ীর পিছনে বসে এতদূর যাবি কিরে—মেজদি, তুই বরং ট্রেনে চলে যাস, আমি আর জামাইবাবু গাড়ীতে যাব। একটু দূরের পথ গাড়ীতে যাবার আনন্দই আলাদা।'

দীননাথ ফোঁটা ও শেফালীর দেওয়া নতুন একখানি ধুতি নিয়ে ফিরে

বলল—'ওখানে শুনলাম মেদিনীপুরে সোনার বাড়ীতে মা খুব ধুমধাম করে লক্ষ্মীপুজো করেছে—শেফালী করবীরাও সেখানে গেছিল। কি অদ্ভুত চরিত্র!'

শুনে শবুর মনে হচ্ছে সবাই মিলে যেন ওদেরকে জব্দ করার মতলব এঁটেছে। কিন্তু কি যে তাদের দোষ সেটাই বুঝতে পারছে না।

এদিকে পুটু গাড়ীতে যেতে চায় শুনে দীননাথ বলল শবুকে—'তুমি তা হলে ট্রেনেই যাও। তোমাকে আমরা ট্রেনে তুলে দিচ্ছি, নৈহাটিতে নেমে বাস ধরে শ্রীলাদের বাড়ীর সামনে নামবে। পারবে না? একবার ত আমরা সেই ভাবে গেছিলাম, মনে আছে?'

অভিমানে শবুর চোখদুটো ছলছল করে উঠল। একা সে কোথাও যায় না, পথঘাটও কিছু চেনে না। একবার কবে শ্রীলাদের বাড়ী গেছিল, এখন কি সে পথ চিনে যেতে পারবে? ওদিকে ছোট ভাইটা পুটুর আব্দারও ফেলতে পারে না। আগের দিন নীলা-বেলাদের সঙ্গে গেলেই ভাল করত।

অভিমানী শবু বলল—'তাই চল।'

কিন্তু একা ট্রেনে উঠে তার ভীষণ ভয় করছে, একটি করে স্টেশন যায় আর সে লোককে জিজ্ঞেস করতে থাকে—এবার কি নৈহাটি আসছে? আশ্চর্য্য, এমনি করে ট্রেন বাস ঠেঙিয়ে সে যখন যাত্রা পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শ্রীলাদের বাড়ীর দিকে হাঁটছে ঠিক তখনই দীননাথ ও পুটু গাড়ীতে তার পাশে এসে উপস্থিত হল। বাকি কয়েক পা রাস্তা গাড়ীতে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল দীননাথ। কিন্তু অভিমানী শবু যায় নি।

শবু একা একা ট্রেনে বাসে করে এসেছে শুনে শ্রীলা, এলা, নীলা, বেলা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল— ,

'সে কি রে মেজদি, তুই একা একা এলি! আসতে পারলি?'

শবু মুখে একটু গর্বের হাসি ফুটিয়ে তুলল—ভাবখানা এই যেন—যতটা বোকা ভাবিস আমি তত বোকা নই। এদিকে মনের অভিমান তার মনেই চাপা রইল।

শেষে ফেরার সময় দীননাথ শুধু শবুকে আদরিণীর পিছনে বসিয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে বড়জাগুলি, জীরাট, বারাসত হয়ে বাড়ী ফিরে এলে তবে শবুর অভিমান ভাঙল।

বেচারী অপূর্ব! শালা শালীদের ভাইফোঁটার বন্দোবস্ত করার জন্য নিজে ভাইফোঁটা নিতে টালিগঞ্জে বোনদের কাছে যেতে পারল না।

পাঁচ

'বৌদি, বৌদি' বলে ডাকতে ডাকতে সোনা এসে উপস্থিত অনেকদিন পর। তাকে সুস্থ স্বাভাবিক দেখে শবুর ভাল লাগছে। হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল—

'আরে এস, এস সোনা। অনেকদিন পরে এলে, কোথা থেকে আসছ? তারপর তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! গোপা ও ছেলে মেয়ে দুটো কোথায়?'

সোনা খুব সরলভাবে সব জানাল, বলল—

'সত্যি বুঝি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। মা গিয়ে কি সব করতে লাগল, আমি আর গোপা কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আমরা একে অপরকে অবিশ্বাস করতে লাগলাম। শেষে পুজোর ছুটিতে দিদি (শেফালী) গিয়ে মাকে নিয়ে এলে আমরা আবার স্বাভাবিক হলাম।

'স্বাভাবিক হতেই মনে পড়ল সেজদা বদলির জন্য বিনা মাইনেতে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। সেজদা ও তুমি আমাদেরকে লেখাপড়া করালে তোমাদের ঋণ জীবনে ভুলব না। তুমি আমার বৌদি শুধু নও, একরকম মায়ের মত। দুশ্চিন্তায় ছিলাম, মা হয়ত এখানেও অশান্তি করছে।

'দীওয়ালীর ছুটিতে মেদিনীপুরে এসে দেখি মা সেখানে লক্ষ্মী পুজোর উৎসব শুরু করেছে। শুনলাম মা এখানে এসে যথারীতি গণ্ডগোল করে গেছে। তাই ঠিক করেছি মা ওখানেই থাকবে, ছেলে মেয়ে দুটোকে তাদের মামাবাড়ীতে রেখে বাংলা লেখাপড়া শেখাব ভেবেছিলাম, তার বদলে মার কাছে কড়া শাসনে থাকবে। ওরা ত শিশু, ওদের সঙ্গে মা আর কি খারাপ ব্যবহার করবে? কেমন ঠিক হবে না?'

শবু বলল—'কিন্তু তোমার, বিশেষ করে গোপার ছেলে মেয়ে দুটোকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না কি?'

সোনা বলল—'তা একটু হবে। লম্বা ছুটিতে তারা আমাদের কাছে যাবে, আমরাও ছুটিছাটা নিয়ে আসব।'

অভিভাবক হিসেবে মা মঙ্গলা দেবী বেশ কড়া ঠিকই, কিন্তু শবু ভাবছে, ছেলে মেয়ে দুটোকে গিনিপিগে পরিণত করা হল অন্যদের সুখ শান্তির বিনিময়ে।

সোনা দীননাথের সঙ্গে তার চাকরির ব্যাপারে অনেক কথা বলল। চেয়ারের বুনোনো বেতগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে দেখে বাড়ীতে বসে নিজে নিজেই কি ভাবে বুনে নেয়া যায় তা দেখিয়ে দিল। সোনার স্বাভাবিক ব্যবহার ও কর্তব্য জ্ঞান দেখে শবু মুগ্ধ। এই ছেলেকেই মঙ্গলা দেবী পাগল আখ্যা দিয়েছিলেন।

শবুদেরকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করে সোনা ফিরে গেল। দেখা যাক, কতদিন নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

বড়দা হৃদিনাথের ছোট মেয়ে সুরমার অনেক দিন হল বিয়ে হয়েছে, তাদের একটি ছেলেও হয়েছে। সুরমা একদিন সেজকাকু ও সেজকাকীকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে। পরিবর্তে একদিন তারা সুরমা, জামাই কমল ও ছেলেটিকে আমন্ত্রণ করে এনেছে।

শবু দীননাথকে বলল—'মেয়ে জামাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেই শুধু হয় না, তুমি ত সুরমাকে সম্প্রদানও করেছ। জামাইকে কিছু একটা দিতে হয়।'

একটু ভেবে দীননাথ বলল 'ভাইফোঁটাতে শেফালী আমাকে যে ধুতিটা দিয়েছে তাই দিয়ে নিয়মরক্ষা কর।'

তখনকার মত মান রক্ষা হল। কিন্তু আর্থিক দুর্গতিতে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর কাছে সম্মান রাখা দায় হয়ে পড়েছে।

দীননাথের মামাতো ভাই তুলুর বিয়ের বৌভাত এ বাড়ীতে হয়েছিল, সে সময় শবু তপুর বিয়েতে মন্দির শহরে ছিল। এবার তুলুর মেয়ের মুখেভাতও এবাড়ীতে হল। সব কর্তৃত্ব তুলু আর রত্নার—মামীমাকে কেউ আমল দিচ্ছে না। রাতেই ব্যাপার মিটে গেলে মাছ দই মিষ্টি যা বেঁচেছিল রত্না সে সব তার ভাইদের সাহায্যে নিজেদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল। শরীরটা খারাপ ছিল বলে শবু খাটাখাটনি সবই করেছে কিন্তু কিছু খেতে পারেনি। পরদিনও তার খাবার ইচ্ছেই নেই।

মামীমা এক সময় এসে বললেন—

'জানো শ্রাবণী কি হয়েছে? কাল রাতে ত সর্দারী করে রত্না সব খাবার ও বাড়ীতে পার করল। তুলু বন্ধুদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বৌয়ের কাণ্ড দেখে কি গালাগালি করল—ছোটলোক, কি বলে খাবারগুলো রাতারাতি নিয়ে এলে, সেজবৌদিরা কি সব খেয়ে ফেলত, দেখনি সেজবৌদি নিজে না

খেয়ে সারাদিন কি খাটুনিটা খাটল, এখন না হয় দাদা বৌদির দুর্দিন চলেছে তবু আমরা তাদের কাছে অনেক ব্যাপারে ঋণী—তুমি আজ তাদের যা অপমান করলে, তোমার উচিৎ এখনই গিয়ে তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে রত্নার ফিট হল। শেষে মাথায় জল ঢেলে বাতাস করে তাকে সুস্থ করা হল।'

আগে শবুর কিছু মনে হয়নি, মামীমার কথা শুনে মনে হল, সত্যিই ত শবুরা কি সব খেয়ে ফেলত? রাতেই সব ও বাড়ী নিয়ে যাবার কি দরকার ছিল?

আর্থিক অনটনের জন্ম ঘরে পরে নানা বাঁকা কথা শুনতে হচ্ছে, কত অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দীননাথ তার ভাইবোনদের কাছে কোন সাহায্যের কথা বলেনি। যখন যা দরকার কানাইকে লিখেছে এবং সেও চুপ তিনশ যা দরকার পাঠিয়েছে।

বড়ই অভাব আর দুর্দিনের মধ্যে আর একটি বিবাহ বার্ষিকী এল আর গেল। নিয়ম মত রাতে শবু তার স্বামীকে প্রণাম করল, দীননাথও তাকে আদর করল। কিন্তু জীবনে সুখ আনন্দ সব যেন শুকিয়ে গেছে।

মামীমার কপালে সুখ শান্তি নেই। স্বামী নিরুদ্দেশ, এক ছেলে চিন্ন নক্সালী করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, বৌ যেমনই হোক, একটি নাতনী হয়েছে, ছোট ছেলে একটি ভাল টেকনিক্যাল কলেজে পড়ে। সেই ছেলে এখন এক সমস্যা।

ছোট ছেলে ভুলু কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, পরীক্ষায় বসে না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় ভাল পড়াশুনা হয়নি বলে সে এক বছর ড্রপ দিতে চেয়েছিল। জোর করে পরীক্ষা দেয়ানো হয়েছিল। পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন না পেয়ে সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়ে সে পাগলের মত হয়ে গেছে, বলে—আমার কেরিয়ার ভুমড়্ হয়ে গেল, আর পড়ে কি হবে? কিছুদিন এক কলেজে পড়ে, ছেড়ে দেয়, আবার অন্য কলেজে ভর্তি করা হয়। এই নিয়েই ছুলু ও ভুলুতে একদিন বচসা থেকে সামান্য হাতাহাতি হয়ে গেল। ভুলু মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে শবুদের সংসারে ভর্তি হল।

একদিকে নিজেদের দিন চলে না, অন্যদিকে ভুলুর উদ্ভট কাণ্ড কারখানায় অসহ্য লাগে। সকালে ঘুম থেকে উঠবে বেলা দশটায়—ঘরটা সকালে ঝাড় পোঁছও করা যায় না। দুপুরে খাবার সময়ের ঠিক নেই, বেলা দুটো তিনটে

যখন খুশি বাইরে থেকে ঘুরে আসে। স্নান করেনা, গায়ের দুর্গন্ধে কাছে এগোন যায় না। রাত এগারোটা বারোটা একটায়ও বাড়ী ফেরে, বলে রাতে তার ঘুম আসেনা, এদিকে কোন কোনদিন দুপুরে খেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুরতে বের হয়। মামীমা অন্ধ সন্তান-স্নেহে এসব জিনিষ এতদিন সহ্য করেছেন, লুকিয়েও রেখেছেন—কিন্তু বৌ রত্না ব্যাপারটা দুলুর নজরে এনে যত গণ্ডগোল করে দিয়েছে।

মামীমা এসে শবুর কাছে দুঃখ করে বলেন—'ঘরে একটা মেয়ে নেই, দুলুর বিয়ে দিয়ে বউ এনে মেয়ের অভাব ভুলেছিলাম। কিন্তু রত্না এসে দুদিন যেতেই বলতে আরম্ভ করল—যার যার, তার তার। সে-ই ভুলুর নামে লাগিয়ে লাগিয়ে দুলুর কান ভারী করল। এদিকে তার নাকি বারোমাস শরীর খারাপ থাকে—রত্নার সেবা-যত্ন সব আমাকেই করতে হয়। কোলের নাতনীটার একটু দেখাশোনা করতে গেলে রত্না বলে—মা, তুমি ওর কিছু করবে না, তুমি ছেলেমেয়ে মানুষ করতে জাননা। কি আশ্চর্য্য কথা!'

কদিন যেতে দীননাথ ভুলুকে বোঝাতে লেগেছে—'দেখ ভুলু, পড়াশুনা যে ছেড়ে দিলি, চাকরি বাকরি পাবি কি করে?'

ভুলু বলে—'চাকরি করা আমার দ্বারা হবে না।'

'তুই বাড়ীতে যাচ্ছিস না কেন?'

'আমি দাদার গায়ে হাত তুলে অন্যায় করেছি, দাদার কাছে মুখ দেখাবার উপায় নাই।'

'চাকরি করবি না, বাড়ী ফিরবি না—তবে তোর চলবে কি করে?'

'একটা মানুষের পেট ভরাতে কি লাগে? দুটো ট্যুইশানি করলেই চলে যায়।'

'অতরাত পর্য্যন্ত কোথায় থাকিস?'

'আমার কয়েকজন বন্ধু, বাজারের পাহারাদার—সব আছে তাদের সঙ্গে অনেক তত্ত্বকথা আলোচনা হয়।'

'ওদের মধ্যে কজন স্মাগলার বা ওয়াগন ব্রেকার আছে, তুই জানিস?'

'না, সে রকম কেউ নেই। তাছাড়া মানুষ সবাই সমান।'

ভুলুর জ্ঞানের পরিধি বিশাল, যে কোন বিষয় নিয়ে সে অনর্গল বকে যেতে পারে। অসংলগ্ন কোন কথা বলে না—অথচ সে স্বাভাবিক মানুষও নয়।

দীননাথ দিনে দিনে বিরক্ত হয়ে উঠল। অন্তত যদি দুবেলা সময়মত খাওয়া শোয়া করত তবে ভুলুর অন্য সব ব্যাপার সে সহ্য করত এই দুরবস্থার মধ্যেও। কিন্তু ঐ টিই ত ভুলুর রোগ, অনিয়মই তার নিয়ম।

বিরক্ত দীননাথ আবার একদিন বলল—'ভুলু, কেন তুই এমন ভাবে নিজেকে নষ্ট করছিস ? ঠিকমত পড়াশুনা কর, চাকরির চেষ্টা কর, সময়ে স্নান খাওয়া শোয়া কর।'

ভুলু বলল—'এ সবের কোনটাই আমার দ্বারা হবে না। আমার কিছুই লাগেনা।'

অধৈর্য্য দীননাথ বলল—'তোর কিছুই লাগেনা ? তবে ত তুই মুক্ত পুরুষ। তোর কাছে খাওয়া না খাওয়া, বাড়ী বা গাছতলা কিম্বা স্টেশনের প্ল্যাটফরম সবই সমান তাহলে।'

কথাটার ইঙ্গিত ভুলু সহজেই বুঝতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে—'মা আমি চললাম, সেজদার বাড়ীতে আর থাকতে আসব না। এ কদিন যে থাকতে দিল সেজন্য সেজদা সেজবৌদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ'—বলে বাড়ী থেকে বেলা এগারোটা নাগাদ না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল।

মামীমা রোজ দিনের মত ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন, তিনি কো'ন কথা না বলে বৎস-ছাড়া গাভীর মত ছেলের পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

তখন সবে কদিন হল পৌষমাস পড়েছে। মাত্র পনরো দিন আগে ভুলু দাদার সঙ্গে মারামারি করে এ বাড়ীতে এসেছিল। মামীমা এ ক'দিন একবারও ভুলুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। আবার যে ভুলু ঘর ছাড়ল এজন্য মামীমা হয়ত শবুদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ওর এত অনিয়মই বা কতদিন সহ্য করা যায়। রত্না নতুন বিয়ে হয়ে এসেছে সেই বা কি করে সহ্য করবে ?

ভাদ্র বা পৌষ মাসে মানুষ নাকি বাড়ী থেকে কুকুর বেড়ালটাকেও তাড়ায় না। আর ভুলু সেই ভরা পৌষে দুপুর বেলা না খেয়ে বাড়ী ছাড়ল। একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটছে যে গৃহস্থের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কারো মনে পড়ছে না।

ছয়

নতুন এক খবর শোনাল সুবীর বাবু। নোটিশের মেয়াদ শেষ হতে আর দেড় মাসও নেই। এক ছুটির দিন সকালে সুবীর মালা মণীষা খোকা বেড়াতে এল, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যাবে। ওরা আসাতে বাসনা গ্রাম

পৈতে, চব্বিশ-পহর আর তাম্বুলীর পুকুরের গল্প চলছে।

হঠাৎ সুবীর বলল—'লাহিড়ীবাবু, একটা সুখবর আছে। নানা দুর্নীতির দায়ে চাটুকারকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে সরকারের তেলের ডিপার্টমেন্টে বদলি করেছে, এখন সে সেখানেই ওপরওয়ালাদের তেল দিচ্ছে।'

মালা শবুকে বলল—'হ্যাঁ ভাই, খপরটা শুনে আমার যা আনন্দ হ'ল। এতদিনে দাদার হয়ত কিছু ভাল হতে পারে।'

দীননাথ বলল—'আমার আর কি ভাল হবে? আমি ত চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়েই দিয়েছি। এখন চাটুকার থাকল কি গেল তাতে কিছু যায় আসেনা। তবে খবরটা সুখবর সন্দেহ নেই, ব্যাটা চৌদ্দ বছর ধরে আমাকে জ্বালিয়েছে, এবার দুর্নীতির দায়ে পচে মরুক।'

শবুর মনে হচ্ছে, হয়ত এবার সত্যি কিছু হবে। চৌদ্দ বছর বনবাসের পর রামচন্দ্র নিজের রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। শবুদেরও বারো বছর বনবাসের পর প্রায় একবছর ধরে অজ্ঞাতবাস চলছে। নিশ্চয়ই এবার একটা কিছু হবে। কিন্তু রাজ্যে ফিরে এলেও রাম শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। লোকনিন্দার ভয়ে সতী সাধ্বী স্ত্রী সীতাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর দুঃখিনী সীতা! স্বামী পরিত্যক্তা সীতাকে বারবার অগ্নিপরীক্ষার অপমান এড়াতে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। রামচন্দ্রকেও বাকি জীবন 'হা সীতা' 'হা সীতা' বলে কেঁদে বুক ভাসাতে হয়েছে। শবুর ভাগ্যে কী আছে?

জানুয়ারী পড়তে আর দুটো দিন বাকি। সকাল নটা দশটা নাগাদ আবার এল বড় ননদ জবার ছেলে হাবলু, এবার তার সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক। পরিচয় দিল—

'মামা, এর নাম চিন্ময়, আমার কাকার মেয়ে মীরার বর।'

দীননাথ বলল—'হ্যাঁ, তোর কাকার বিয়েতে আমি বরযাত্রী গেছিলাম। তা কি মনে করে?'

দীননাথ হাবলুর প্রতি প্রসন্ন নয়, কখন কি ধান্দায় আসে ঠিক নেই।

চিন্ময় দীননাথ ও শবুকে প্রণাম করে বলল—'মামা, আমি কলকাতার সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি। কলকাতার কাছাকাছি একটা ভাল বাসা খুঁজছি। নৈহাটিতে বাট টাকা ভাড়ায় যে বাসায় আছি তাতে অনেক অসুবিধে। যদি আপনাদের বাড়ীতে থাকতে দেন বড় উপকার হয়। খুব শিগগীরই কোয়ার্টার পাব, তখন সেখানে চলে যাব।'

হ্যাঁ, হাবলু ঠিকই একটা ধান্দায় এসেছে। তবু চিন্ময়ের সরল সাদাসিধে ভদ্র ব্যবহারে দীননাথ বুঝি খুশি হয়েছে, বলল—

'এক্সট্রা একটি ঘর ও রান্নাঘর অবশ্য আছে কিন্তু জল, পায়খানা, বাথরুম সব কমন। ঘরকা মালকীন কা বালতী হ্যায়?'

শবুরও ছেলেটির ব্যবহার ভাল লাগছে, বলল—'দিতে চাও, দাও।'

চিন্ময় ঘরদোর দেখে খুশি হয়ে বলল—'আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মামা আর মামীমা মাথার উপরে থাকবেন অভিভাবকের মত। মাসে কত ভাড়া দেব, মামা?'

দীননাথ বলল—'পঞ্চাশ ষাট যা হয় দিয়ো। ঠিক ভাড়াটে হিসেবে ত দিচ্ছিনা, কোনদিন ভাড়াটে রাখিওনি। ঘর আছে, তোমাদের দরকার তাই দিচ্ছি।'

চিন্ময় আরো খুশি হয়ে মামা মামীকে আর একবার প্রণাম করে পয়লা জানুয়ারীতে আসবে বলে হাবলুর সঙ্গে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে দীননাথ বলল—'মার একটা হিল্লে হয়ে গেছে, আর বোধহয় শিগগীর এখানে আসছে না। ভবরাও আসবে বলে মনে হয় না। চিন্ময়রা থাকলে আমরা ইচ্ছেমত দু দশ দিনের জন্য কোথাও যেতে পারব।'

শবু বলল—'হাঁ, জামাইটিকে ত ভালই মনে হল। কিছু টাকাও পাওয়া যাবে অভাবের সংসারে। কিন্তু ওরা যেখানে ষাট টাকা ভাড়ায় অসুবিধেয় আছে বলল তুমি সেখানে ভাল ঘর পঞ্চাশ ষাট বললে কেন? পঞ্চাশ বললে কি কেউ ষাট দেয়? এই ত পাড়ায় রায়বাবুরা কত ছোট ঘর কাঁচা রান্নাঘর একশ টাকা ভাড়া নেয়।'

দীননাথ বলল—'নিক। আমার চাকরিটা থাকলে ঐ পঞ্চাশটা টাকার জন্যও ভাবতে হ'ত না।'

আর সেদিনই দুপুরে এল একখানি সরকারী চিঠি। অন্যদিনের মত রান্না সেরে স্নান করে এসে শবু তাগাদা দিয়ে দীননাথকে স্নান করতে পাঠিয়েছে।

তারপর ভিজে চুল একটু আঁচড়ে কপালে সিঁথিতে ও শাঁখা নোয়ায় সিঁদুর লাগিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে দিনের কাগজটা একটু উল্টে পাল্টে দেখতে যাবে, বাইরে জানালার পাশ দিয়ে পিওন হেঁকে গেল—

'চিঠি।'

দীননাথ স্নান করে এলে শবু বলল—'এই দেখ তোমার নামে একটা

দরকারী চিঠি এসেছে।'

'দেখি শালারা কি লিখেছে' বলে দীননাথ খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল। বাপের বাড়ীর চিঠি ছাড়া খামের চিঠি হলে শবু কখনো আগে থেকে খুলে পড়ে না। অফিসের ইংরেজী ছাপা চিঠি হলে ত নয়ই। চিঠি পড়ার সময় দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শবু দেখল তার মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

চিঠি পড়া শেষ করে দীননাথ বলল—'সত্যিই একখানা ভাল চিঠি দিয়েছে। কি লিখেছে জান? লিখেছে—তোমার চাকরি ছাড়ার নোটিশ গ্রাহ্য হল না, কলকাতায় বদলির ব্যাপার বিশেষভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। চাটুকার চলে গেছে আর দেখ অফিসের চিঠির বয়ান বদলে গেছে। সেদিন সুবীর চাটুকারের খবর দিলেও আমার কিছুই করার ছিল না, একবার নোটিশ দিয়ে তাকে ফেরাবো কি করে? অফিসই দেখ নোটিশটা ফিরিয়ে দিল এখন। মনে হচ্ছে, এবারে সত্যিই কিছু সুবিচার হবে।'

শুনে শবুর মন খুশিতে ভরে উঠল। পুরো একটি বছর পরে বুঝি একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। আজকেই চিন্ময় বাসা ভাড়ার কথা বলে গেল আর আজই এমন সুখবর এল—ছেলেটা পয়মন্ত আছে মনে হয়। বলল—

'আমি খাবার জায়গা করছি তুমি তাড়াতাড়ি এস।'

দীননাথ ওদিকে বলে চলেছে—'চিঠিটা পাটনা ঘুরে এসেছে, না হলে আরো দু সপ্তাহ আগে জানা যেত।'

শবু খাবার জায়গা করতে করতে শুনছে আর ভাবছে—এতদিনে বুঝি দুর্ভোগের দিন শেষ হতে চলেছে। অভাব অনটন যেমন চারদিক থেকে গ্রাস করছিল তেমনি ঘরে পরে নানা অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। গতবারেও দীননাথ যে টাকা চেয়েছিল ঠিক সেই পরিমাণ টাকা পাঠিয়েও কানাই মানি অর্ডারের কুপনে এক কলম লিখেছিল—জামাইবাবু আমার মনে হয় আপনার পাটনায় ফিরে যাওয়া উচিৎ।

কুপনের লেখাটা পড়ে বাবুর সে কি রাগ! বলেছে—'কি উচিৎ কি অনুচিৎ সে কথা ঐ সেদিনের ছোকরা কানাইয়ের কাছ থেকে শিখতে হবে?'

শবু যত বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে কানাই কথাটা ভাল মনে লিখেছে, তবু দীননাথকে সে শান্ত করতে পারেনি।

আর সেই অবস্থাতেই চিন্ময়রা আসাতে বাড়ীর একটি অংশ ভাড়া দিতে এক কথাতেই সে রাজী হয়ে গেছে।

কানাইয়ের কথাটা মনে লাগে। কিন্তু শুধু কানাই-ই একমাত্র নিজে থেকে ওদের দুর্দিনে টাকা দিতে চেয়েছে। যখন যা চেয়েছে দিয়েছে। বড়বৌদি ও সুপর্ণাও নিজে থেকে কিছু দিয়েছে। কিন্তু দীননাথের সম্পর্কের আর কেউ এই দুর্দিনে তাদের দিকে ফিরেও তাকায় নি। সে সব কথা বিবেচনা করে ঐ একটি কথায় যদি দীননাথ কানাইয়ের উপর রাগ করে তবে তার সদিচ্ছার প্রতি অবিচার করা হবে। বিশেষ করে এবারে যদি তাদের সুদিন আসে তবে সে কথাটা দীননাথের মনে রাখা উচিৎ নয়।

অনেকদিন পরে দুপুরে খেতে বসে শবু দীননাথের হাসি মুখ দেখতে পেল। আগের মত অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল।

ভুলুর ঘর-ছাড়ার ব্যাপারে মামীমা মনঃক্ষুণ্ণ। তবু বিকেলে খবর শুনে তিনি রীতিমত খুশি। দুলুও চিঠি পড়ে আনন্দে বলতে লাগল—

'শুনুন বৌদি, লিখেছে—হিজ ট্রান্সফার ইজ আণ্ডার এ স্ট্রিক্ট কন্সিডারেশন—অর্থাৎ কলকাতায় বদলি এবার হবেই। আপনাদের দুঃখের রজনী শেষ হবে।'

সে রাতে শুতে যাবার আগে শবু ক্যালেণ্ডার কেটে বাঁধিয়ে আনা দুর্গার পটে গভীর ভক্তিতে প্রণাম জানাল—মাগো, তুমি আমাদের রক্ষা করেছ, আর যেন কোন অমঙ্গল না হয়, আমাদের নিজেদের বাড়ীতে আমরা যেন শান্তিতে থাকতে পারি। শবুর কাছে তার মা আর মা দুর্গা অভিন্ন। তাই উভয়ের কাছে শবুর অন্তরের প্রার্থনা—তুমি আমাদের দেখো।



তৃতীয় পর্য্যায়

এক

পয়লা জানুয়ারী চিন্ময় মীরা ও দু বছরের ছেলে মৃন্ময় বা মনু এসেছে। ছেলেটিকে ভারি সুন্দর দেখতে—পাড়ার সবাই তাকে আদর করছে। কচি কুড়িংদের দিদিরা তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে। আর দ্বিতীয় দিনেই কচিদের বাড়ীতে খেলতে গিয়ে মনুকে ওদের বাড়ীর কুকুরে কামড়াল, হাতে কুকুরের একটা দাঁত বসে গিয়ে রক্ত পড়ছে। দেখে মীরা কাঁদছে, চিন্ময় চিন্তিত।

তাদের আশ্বস্ত করতে শবু বলল—'বাড়ীর কুকুরে কামড়ালে কিছু হয় না, আমাকেও কামড়েছিল, কিন্তু ডাক্তাররা আমাকে ইঞ্জেকশন দিল না।'

চিন্ময় মীরা সে কথা মানতে পারল না, মনুকে নিয়ে গেল বেলেঘাটার হাসপাতালে। সেখানেও তারা ইঞ্জেকশন দিতে চায়নি। শেষে চিন্ময়ের বিশেষ অনুরোধে ডাক্তাররা রাজী হয়েছে, ছেলেকে নিয়ে গিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়া চলছে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! দীননাথের প্রথম শিলংএ বদলির সময় শবুকে কুকুরে কামড়েছিল—আবার যখন তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন বাড়ীরই একজন-মনুকে কুকুরে কামড়াল।

অবশেষে দীননাথের বদলির অর্ডার এল—কলকাতায় দেবেশ যাবে পাটনায় আর দীননাথ কলকাতায়। চিন্ময়ও খুশি হয়ে বলল—

'মামা, মামীমা—আমরা এলাম আর আপনাদের বদলির অর্ডারও এল। ভালই হল।'

হ্যাঁ, সব ভাল যার শেষ ভাল। পরদিনই দীননাথ মোটর বাইকে চেপে কলকাতায় অফিসে গিয়ে চার্জ বুঝে নিল আর সন্ধ্যে ঠিক ছটায় বিজয়ীর মত বাড়ী ফিরে এল। বলল—

'দেবেশ ছিল আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা। আমাকে দেখে তার মুখটা চুপসে গেল, বাইরে গেলে নিজের কত অসুবিধে হবে তার কাঁদুনী গাইল। পরে আমার চোখে চোখ পড়তে বলল—না, আপনার প্রতিও এত বছর ধরে

অনেক অন্যায় অবিচার হয়েছে। আমি তার কথায় ভুলিনি, একটু সহানুভূতিও জানাইনি। তবে সুবীর সেদিন ঠিকই বলেছিল, চাটুকার তার অনেক চেলাকে এখানে বসিয়ে গেছে আমি আসাতে তারা খুশি হয়নি।'

রাতে স্বামীর বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে শবু তার নিজের ভাবনা ভাবছে। মানুষটা এক বছরে কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। রোজ আধসের করে দুধ রাখতে হবে, খাইয়ে দাইয়ে আদর যত্ন করে তার স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে। এটাই তার এখন প্রথম ও প্রধান কাজ।

দীননাথের ভাবনা অন্য। সে বলে যেতে লাগল—

'কানাই আর সুপর্ণার টাকা মিলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ধার দেনা হয়েছে, সেগুলো একে একে শোধ করতে হবে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে লোনটা পেলে সব টাকা এক সঙ্গেই দিতে পারব।

'অনেক বছর বাড়ীটার ভাল করে মেরামত করা হয়নি, সেখানেও হাত লাগাতে হবে। সিমেণ্টের পারমিটের জন্য দরখাস্ত দিতে হবে।

'এখন থেকে লোক লৌকিকতা করতেও কোন অসুবিধে হবে না। চিন্ময়রা যতদিন থাকে থাক, না থাকলেও কোন অসুবিধে নেই—আমরা দুজনে মনের সুখে শান্তিতে বাড়ীতে বাস করব। তবে চিন্ময়রা থাকতে থাকতে আমরা একবার আগ্রা, জয়পুর, অজন্তা ইলোরা বোম্বে পর্যন্ত বেড়াতে যাব।

'এত বছর আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কত কষ্ট করলে। এবার আর আমাদের কোন কষ্ট হবে না। তোমারও নিশ্চয় আনন্দ হচ্ছে?'

আনন্দেও শবুর দুঃখের কথা মনে হয়। বলল—

'হ্যাঁ, খুব আনন্দ হচ্ছে। আমার 'ব' বীরের মত লড়াই করে জয়ী হয়েছে। আমার কি মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে এমনি আনন্দের মধ্যে যদি তোমার কোলে মাথা রেখে মার কাছে যেতে পারি সেই হবে আমার সব থেকে আনন্দের। ঠিক যেমন রঘুবংশে রাজা অজএর কোলে মাথা রেখে ইন্দুমতী গিয়েছিল।'

দীননাথ শবুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল—'আজকে আমাদের জীবনে একটি বিশেষ দিন, আর আজ তোমার ঐ কথা মনে পড়ল? তুমি আমার কথাটা ভাবলে না? তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচব? তুমি ছাড়া এই ঘর বাড়ী আমার কাছে শূন্য।'

শবু আদুরে গলায় বলল—'মা বলত, আমার এই বছর না সামনের বছর

একটা ফাঁড়া আছে। আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুমি আমার জন্ম কাঁদবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে তুমি আমার জন্ম কাঁদছ।'

দীননাথ অভিমানী কণ্ঠে বলল—'এরকম কথা বললে কি বলব বল? ফাঁড়ার কথা বলছ, যেবারে ট্রেন এ্যাক্সিডেণ্ট হ'ল সেখানে তোমার যদি ফাঁড়া থেকে থাকে তবে আমারও ছিল। তোমাকে আমি যেতে দেবই না। আমরা দুজনে ইংরেজী দু হাজার সালের কিম্বা অন্ততঃ বাংলা চৌদ্দশ সালের নতুন সূর্য্যকে দেখব, নতুন শতাব্দীকে অভ্যর্থনা জানাব। তার চাইতে বল এই আনন্দের দিনে তুমি কি চাও?'

খানিক ভেবে শবু বলল—'আমার একটা ভাল সিল্কের শাড়ী কেনার খুব ইচ্ছে। আর শুনছো, তপুর মেয়ের মুখে ভাতে মেয়েটিকে একটা সোনার আংটি দেবে?'

দীননাথ আদর করে শবুর নাকটা টিপে দিয়ে বলল—'তথাস্তু, আমার খেঁদির প্রার্থনা মঞ্জুর।'

এখন আর শবু খেঁদি বললে রাগে না। মনের সুখে স্বামীর বুকে মুখ রাখল। সামনের পয়লা বৈশাখে সে নতুন সিল্কের শাড়ীটা পরবে।

নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। কদিন পরেই এল পৌষ সংক্রান্তি, এল সরস্বতী পূজো। ঐ দুদিনেই তপুরা এসেছিল। শবু মনের আনন্দে দুটো অনুষ্ঠানই পার দিল। শবুদের বদলির খবরে তপুরা খুশি, খুশি বরানগরে কাকা কাকীমারাও। সোদপুরে বড়বৌদি, সুপর্ণারাও খুশি। কিন্তু বড়বৌদি বীণার মনে সুখ নেই, পয়লা ফেব্রুয়ারীতে বড়দা হৃদিনাথ রিটায়ার করেছে, রোজগার অর্ধেকের নীচে নেমে গেছে, এখনো স্বর্ণার বিয়ে বাকি, পার্থর পড়া শেষ হয়নি—এবার সে ওভারসীয়ারী পরীক্ষা দেবে। ছেলে পাশ করে চাকরি পেলে আবার যদি অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। ওদিকে ছেলে নাকি যে সাহার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল তার সঙ্গে আঠার মত লেগে রয়েছে, মা, দিদিরা হাজার বলেও তাকে সেখান থেকে ছাড়াতে পারছে না।

সব চেয়ে খুশি হয়েছে বুঝি কানাই। চিঠিতে আগেই সব কথা জানান হয়েছিল। প্রথম সুযোগেই সে মন্দির শহর থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছে। বলল—

'জামাইবাবু বাহাদুর বটে, লড়ে দেখিয়ে দিল। বদলি নিয়ে তবে ছাড়ল।'

দীননাথ মিটিমিটি হাসছে। শবু বলল—

'জানিস কানাই, তোর জামাইবাবু তোর উপর রেগে গেছে তুই আমাদের পাটনায় যেতে লিখেছিলি বলে। বলছিল—সেদিনের ছেলে হয়ে আমাকে ভালমন্দ জ্ঞান দিতে আসে?'

কানাই বলল—'সত্যি জামাইবাবু, আমি ত কোনদিন চাকরি করিনি তাই আপনার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

দীননাথ বলল—'ইংরেজীতে একটা কথা আছে—দি ওয়্যারার নোজ হয়্যার দি শু পিঞ্চেজ—যার ব্যথা সেই বোঝে।'

শবু বলল—'মনে রেখো, কথাটা সবার পক্ষেই খাটে, আমাদেরও কম সহ্য করতে হয় না।'

কানাই বলল—'মেজদি, জামাইবাবুকে এই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো ছাড়াও আমার আসার আরো দুটো উদ্দেশ্য আছে। শালীর বিয়ের বাজার করা আর একটা মোটর বাইক কিনে সেটা এখানে রেখে জামাইবাবুরটা নিয়ে যাব। হাতে মাত্র তিন দিন সময়, আমি না থাকাতে বাবার ওদিকে একা একা বাড়ী, ডাক্তারখানা একসঙ্গে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'কানাই, বাবা কেমন আছেরে?'

কানাই বলল—'আর বলিস না, বাবাকে নিয়ে পারা যায় না। বাজারে গেলেই দোকানীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে—কথ, গোটিএ পয়সার জিনিষ দশ পয়সা মাগুছ? দোকানী বলে—ডাক্তারবাবু, আপন ষ্টিক্সার ইঞ্জেকশনটাকু চারি টঙ্কা কাঁহিকি কলে? ডাক্তারখানায় ফিরে বাবা আমাকে বলে—কানাই, দোকানীগুলো সব ডাকাত, আটগুণ দশগুণ দর হাঁকছে। আমি বলি—সত্যি বাবা, সব জিনিষেরই দাম বেড়েছে, আমাদের চার টাকার ইঞ্জেকশন এখন আট টাকা করা দরকার। বাবা কিছুতেই তা করবে না আর ওদিকে রেগে-মেগে দোকানে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। হাট বাজার সব আমিই করি।'

বাবা আগের দিনের মানুষ, এখনকার বাজারদর তাঁর পক্ষে মেনে নেয়া সত্যিই কষ্টকর।

দীননাথ বলল—'তুই যে গাড়ী কিনবি বলছিস, আমি যখন কিনেছিলাম তখন প্রায় পাঁচ হাজার লেগেছিল, এখন সব মিলিয়ে হাজার সাতেক পড়ে যাবে। আমি ত এখনই তোর হাজার দুয়েক টাকা দিতে পারব না।'

কানাই বলল—'আমি এজন্য আলাদা করে দশ হাজার টাকা এনেছি

সবটাই আপনার ও আমার জয়েন্ট এ্যাকাউন্টে রেখে দিচ্ছি। গাড়ী কিনে যা বাঁচে ও আপনার টাকা পরে প্রয়োজন মত তুলে নেব।'

কানাই এসেছে খবর পেয়ে তপুরাও এল। কানাই তার শালীর বিয়ের বাজার করে করে আনছে আর তাই দেখে তপু লাফাচ্ছে—

'দেখ দাদা, এই মেয়ের বিয়েতে যতীনকাকা কত কি দিচ্ছে আর তোর বিয়েতে কি দিয়েছে ?'

কানাই বলল—'চেপে যা তপু, এ জামাই হল ইঞ্জিনীয়ার, সরকারী চাকুরে।'

শবু বলল—'জামাই হিসেবে তুই কম কিসে ? বড়কাকা ছোটকাকা ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার—সরকারী চাকুরেও ছিল। কিন্তু ঠাকুমা বলত—হেম অবিনাশের চেয়ে গিরিনের রোজগার অনেক বেশী।'

গাড়ী কিন্তু তখনই পাওয়া গেলনা তার জন্য এড্ভান্স করে দীননাথের গাড়ীটা হাওড়া ষ্টেশনে বুক করতে নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশের টিকিটও কেটে নিয়ে আসবে। বিয়ের অনেক জিনিষ পত্র সঙ্গে যাচ্ছে ত।

আদরিণী চলে যাচ্ছে, শবু গাড়ীটাকে আদর করে বার বার চুমু খাচ্ছে। শেষে কানাই আর দীননাথ যখন গাড়ীটা নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হয়ে গেল তখন শবুর চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। পাশ থেকে তপু বলল—

'দেখ মেজদি, তুই বড় ছিঁচকাঁদুনে হয়েছিস। ওটা ত একটা গাড়ী, আবার আর একটা গাড়ী ত আসবেই। তোর দেখি সবই বেশী বেশী।'

শবু বলল—'না রে, অমন করে বলিস না, আদরিণী আমাদের কত আদরের, আজ পর্য্যন্ত কোন এ্যাক্সিডেণ্ট করেনি। সাত বছর ধরে সঙ্গে আছে কত সেবা যত্ন করা হয়েছে, কত কাজেও দিয়েছে। তুই ত সেবারে পাটনায় গিয়ে গাড়ী ছাড়া পথে প্রায় বেরই হতিস না। সাত বছর এক সঙ্গে থাকলে জন্তু জানোয়ার হোক আর যন্ত্রই হোক, একটা মায়া পড়ে যায় কিনা বল ? তোর এই সাত আট মাসের মেয়েটার জন্যও কি কম মায়া হয় আমার। নতুনটা এলে সে নতুনই হবে, আদরিণী ত হবে না।'

শবুর বেশী মমতা তাদের জন্য যারা মূক, নীরব, কথা বলতে পারে না— সে যে নিজেও বেশী কথা বলতে পারে না।

তপু আফশোষ করে বলল—'দাদা এই এসে ঘুরে যাচ্ছে। কদিন বাদেই আমরা মেয়ের মুখে ভাত দেব, দাদা হয়ত তখন আর আসতে পারবে না।'

দোলের রং খেলা যেমন তেমন, রাতে শুতে যাবার আগে শবু দীননাথের

পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করবেই আর দীননাথও শবুর কপালে আবীর ছুঁইয়ে আদর আর আশীর্ব্বাদ দুই-ই করবে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলনা, বরং এক বছরের টানাটানি অভাব অনটনের পর তা যেন একটু বেশী করেই হল।

সেই রাতে দীননাথ শবুকে বলল—

'তপুর মেয়ের কি নাম রেখেছে যেন? ও হ্যাঁ, পুতুল। পুতুলের মুখে ভাত হয়ে গেছে। সিমেণ্টের পারমিট পেয়ে বাড়ীর মেরামতের কাজ আরম্ভ হতে দেরী আছে। ভাবছি এই ফাঁকে তুমি একবার বাপের বাড়ী ঘুরে আসতে পার। আমি দু তিন দিনের জন্ম গিয়ে তোমাকে রেখে আসব। কিন্তু বেশীদিন বোধ হয় তোমার সেখানে থাকা হবে না। এমার্জেন্সী উঠে গেছে, সামনে আবার ভোট আসছে। ভোটের দুদিন আগে চলে আসবে। যাবে?'

বাপের বাড়ীর নামে শবু এক পায়ে খাড়া। মা নেই, তবু বাপের বাড়ী ত, বাবা আছে। তপুর মেয়ে পুতুলের মুখে ভাত মিটে গেছে, শবু মেয়েকে একটি সোনার আংটি দিয়েছে। তপুও মেজদিকে এক জোড়া রূপো বাঁধানো পলার চুড়ি দিয়েছে। বাড়ীতে চিন্ময় মীরারা আছে, এখন যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীননাথের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে। এতদিন মামীমারা কাছে ছিল কিন্তু দুলুর অফিস বেহালায় উঠে গেছে। এতদূর থেকে রোজ যাতায়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে বলে সরস্বতী পূজোর পরপরই দুলু বেহালাতে কোয়ার্টার নিয়ে মা বৌ ও মেয়েকে নিয়ে সেখানে উঠেছে। অনেক সাধ্য—সাধনার পর দুলু এখানে ওখানে থাকা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ীতে থাকছে, হোটেল মোটেলে থাচ্ছে।

শবু ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করল—'তুমি খাওয়া দাওয়া করবে কোথায়? মামীমারা এখানে নেই।'

দীননাথ বলল—'রোজ দুপুরের খাওয়াটা অফিস পাড়ায় হোটেলে খেয়ে নেব। রাতে ভাতে ভাত আর দুধভাত। মাত্র কটা দিন ত।

'আর একটা কথা। নতুন মোটর বাইক ত পুতুলের মুখে ভাতের আগেই এসে গেছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে পনরো হাজার টাকা লোনও পেয়ে গেছি। এবার ভাবছি একটা টিভি কিনব—হাজার চার পাঁচ পড়বে নগদে। আমি অফিস করি, সন্ধ্যের ফিরে চিন্ময়, শশধরবাবু, সমীরবাবু, নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে বসে বসে তাস খেলি, আড্ডা দি। তুমি একা একা ঘরে বসে থাকো আমার খারাপ লাগে। টিভি থাকলে তোমাকে আর অন্ত বাড়ীতে টিভি

দেখতে যেতে হবে না, বাড়ীতে বসেই দেখতে পাবে, আমরাও মাঝে মাঝে ভাল অনুষ্ঠান হলে দেখব।'

টিভি বলে নয়, দীননাথ তার জন্য এত ভাবে দেখে শবুর আনন্দ লাগছে। এতদিন যখন দীননাথ ছুটিতে ছিল, শবু মাঝে মাঝে সন্ধ্যের অন্য বাড়ীতে গিয়ে টিভি দেখত, কিন্তু অনেক সময় ফিরে এসে দেখত দীননাথ একা একা মুখ শুকনো করে বাইরের ঘরে বা ছাদে বসে আছে, সব দিন ত তাস খেলার বন্ধু জোটে না। দেখে বেদনায় শবুর মন ভরে উঠত। দীননাথের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলত—হ্যাগো, তুমি আমার উপর রাগ করেছো? দীননাথ বলত--না রাগ করব কেন, তবে কোন কিছু করার নেই বলে খারাপ লাগে। নানা কারণে শবু টিভি দেখতে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন অবস্থা পালটে গেছে। এখন দীননাথের অনেক কাজ আর শবুর বিকেলের দিকে লম্বা অবসর। তবে কাজ থাক আর টিভিই থাক, অবসর সময় দীননাথকে কাছে পেলে তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। ঘরে টিভি থাকলে টিভি দেখাও হবে গল্প করাও হবে।

শবু খুশি হয়ে বলল—'খুব ভাল হবে। তোমার তাসের বন্ধুরা না এলে আমরা দুজনে বসে বসে টিভি দেখব।'

টিভির কথা ভাবলে শবুর মনে বেদনার তন্ত্রীতেও ঘা লাগে। অনেক বছর আগে দিল্লী বোম্বেতে টিভি হয়েছে শুনে কানাই মাকে বলেছিল—মা, মেজদিরা যখন কলকাতায় ফিরে আসবে ততদিনে সেখানেও টিভি এসে যাবে, মেজদিরা মজা করে দেখবে। মা জিজ্ঞেস করেছিল—টিভি আবার কি? কানাই বুঝিয়েছিল—অনেকটা এই রেডিওর মত, তুমি ঘরে বসে সুইচ টিপে দিলে আর দেখতে পেলে কলকাতায় তোমার আদরের শবু গান গাইছে টিভির পর্দায় সেই ছবি ফুটে উঠেছে। শবুর গানের কথায় সবাই মন খুলে হেসেছে, কাঁচা হাতে গীটার বাজাচ্ছে বললেও না হয় কথা ছিল। এত বছর পরে সত্যিই হয়ত শবুরা টিভি কিনবে—কিন্তু রাজগীরে গিয়ে রোপওয়েতে না চড়তে পারা, দক্ষিণ ভারত বেড়াতে না যাওয়ার মত মার টিভিটাও না দেখা থেকে যাবে।

সকালে শবুর মুখে টিভি কেনা হবে শুনে মীরা ত আনন্দে নেচে উঠল—'খুব ভাল হবে মামীমা, কিনে ফেলুন।' সে রোজ হারাণীদের বাড়ীতে টিভি দেখতে যায়, সুতরাং তার আগ্রহটাই যেন বেশী। আর মন্টুটা দুষ্টু হলে কি হবে সেও মার সঙ্গে গিয়ে খুব মনযোগ দিয়ে টিভি দেখে।

হারাণীদিকে কথাটা বলতেই বলে উঠল—'ক্যান, আপনারা টিভি কিনবেন ক্যান ?' পরে একটা ঢোক গিলে বলল—'আর আপনি ত আমাদের বাড়ী টিভি দেখতে আসা ছেড়েই দিয়েছেন।'

হারাণীদির কথা বলার ধরন শবুর ভাল লাগেনি। খুব একটা বড়লোকি ভাব এখন তার কথাবার্তায়, তারা ছাড়া আর কেউ যেন ওসব কিনতে পারে না। ওদের বাড়িতে টিভি দেখতে গেলে কথা শোনায়—আর কারো বাড়ীতে কি টিভি নেই—সব এখানে এসে ভিড় করে। বিশেষ করে সেই দুঃখেই শবু ওখানে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।

আরও কারণ আছে। গত বছরেক বছরে হারাণীদিরা কুঁড়ে ঘরের জায়গায় পাকা বাড়ী হাঁকিয়েছে, টিভি কিনেছে স্বামী ছেলের হাঁ হাতের রোজগারে। ওদিকে মেয়েটার বিয়ের কিছু করতে পারে নি। শেষে গত অঘ্রানে কায়স্থ পাত্র জোটাতে না পেরে স্বজাতি মালীর ঘরেই মেয়ের বিয়ে দিল। বরযাত্রীদের থাকার জন্য শবুদের একটা ঘরও চেয়ে নিল। একই দিনে বিয়ে হল রায়বাবুর মেয়েরও। দু বাড়ীতেই নেমন্তন্ন বলে শবু গেল রায়দের বাড়ীতে আর দীননাথ হরিদাস-হারাণীদের বাড়ীতে। সেখানে দীননাথকে বাড়ীর কর্তা বা ছেলে কেউ যেন চিনতেই পারেনি—অনাহুত অপাংক্তেয়র মত সে ফিরে এসেছে। সে সময় দীননাথ প্রায় এগারো মাস ছুটি নিয়ে বসেছিল, বড়ই দুর্যোগ চলছিল—আর তাইতেই বুঝি নিমন্ত্রণ করেও অবজ্ঞা দেখিয়েছে। অথচ একই সময়ে রায়দের বাড়ীতে শবু যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। এখন আবার হারাণীদি সুযোগ পেলেই শবুর কাছে কাঁদুনি গায়—আগের স্বজাতির ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার তখন বিয়ে দিলাম না, এখন সে ছেলে নাকি প্রোমোশন পেয়ে চেয়ারে বসছে—আর যার সঙ্গে বিয়ে হল সে ত হাতের কাজ করে, পুজোর মূর্তিতে সাজ লাগায়, বছরে তিন চার মাস কাজ।

ঘরে পরে এমনি কত অপমান, অবহেলা গত এক বছরে সহ্য করতে হয়েছে—শবু কিছু তোলে না। তবু হারাণীদির কথায় ভদ্রতা করে বলল—

'বাড়ীর কাজ কাম ফেলে সবদিন ত আর যাওয়া যায় না, তাই।'

দীননাথের খাবার ব্যাপারে আধাআধি ব্যবস্থা হল, রাতে মীরারা এক দু পদ ভাল তরকারি দেবে। দেবে না-ই বা কেন ? দীননাথ অফিস যাওয়া শুরু করা থেকে সে সকালে খেতে বসলেই মন্টু এসে হানা দেয়—দাদাই, কি খাচ্ছিস ? ফলে রোজ তাকেও এক প্রস্থ খাবার সাজিয়ে শবু খাওয়ায়, মীরা ছেলেটাকে বকে টানাটানি করেও সরাতে পারে নি।' অতএব চক্ষুলজ্জায়

খাতিরেই মামাকে মীরা ডাল তরকারী দেবে বলেছে। অফিসের ভাতও দিতে চাইল কিন্তু দীননাথ রাজী হলনা।

মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে শবু আর দীননাথ চলল মন্দির শহরে, দীননাথ ফিরবে তিন দিন পরে, আর শবু ভোটের আগে।

দুই

এবারে বাপের বাড়ী গিয়ে বেশী দিন থাকা হলনা। তবু তারই মধ্যে যতটা সম্ভব বাবাকে দেখাশোনা করে আর কানাইয়ের ছোট মেয়ে মিষ্টিমায়ের হাসি দেখে মায়ের অভাব ভুলেছে। বাবা বলছিলেন—

'জিনিষ পত্রের দাম এত বেড়ে গেছে যে শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই বাজারে মিতুদের কি করে চলছে একটু খোঁজ খবর করিস ত।'

মা নেই, মায়ের ভাবনা এখন বাবার মাথায়। শবু মিতুর সঙ্গে দেখা করে এখন থেকে তাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবে বলেছে, শুনে বাবাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বাবা হাঁটুতে বাতের জন্য চলতে ফিরতে কষ্ট পান বলে শবু বলেছিল—

'বাবা তুমি ডাক্তারখানায় আর যেয়ো না, কানাইত সব দেখছে।'

বাবা বলেছেন—'না, না, ওখানে গিয়ে বসলে তবু কিছুটা সময় অন্যমনস্ক থাকি। তোদের ধীরেন কাকা, নৃপেন কাকা চলে গেছে, রাধাহরিবাবুও নেই, ব্রজ, স্থানীয় এক উকিল, জটায়ুবাবু, নীলু—এরা সব ধুঁকছে, কার আগে কে যায়। হিমু, ব্যারিষ্টার, হিতেনবাবু আর আমিই তার মধ্যে তবু কিছুটা সচল আছি। সবাই চলে যাচ্ছে একে একে—তারই মধ্যে আমরা কজন পুরোনো স্মৃতি আগলে নিয়ে পড়ে থাকি। চারদিকে সবই ত বদলে যাচ্ছে।'

হ্যাঁ বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে—চারদিকে ভাঙনের দৃশ্য শবুরও চোখে পড়ে। এত ভাঙনের চিহ্ন সত্ত্বেও জীবনের ধারা ঠিকই বয়ে চলেছে। এখনও শিশুরা জন্মাচ্ছে, এখন যাদের পাঁচ দশ পনরো বছর বয়স তারা ত এই ভাঙনের মধ্য থেকেও জীবনের রস ঠিকই পাচ্ছে। শুধু শবুই তার মার স্মৃতিকে আর আগের মত খুঁজে পায় না।

দীননাথ থাকতে একদিন শবুকে কোনারক ঘুরিয়ে এনেছিল মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে। সেই বিয়ের প্রথম বছর শবুরা সেখানে গিয়েছিল

সঙ্গে ছিল মা, মিতু নন্দু কানাই তপু শ্রীলা। এখন রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে, কত রকম ট্যুরিষ্ট বাস যাতায়াত করে। পরদিন মিঠি দিঠির আগ্রহে তাদেরকে গাড়ীতে দুয়া নদী পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছে দীননাথ তবু তাদের অভিযোগ থেকে গেছে—পিস্‌মশ্‌ আমাদের ফরেস্ট দেখালো না কিছুতেই—সেখানে ত শুধু ভীমার আর সম্বর থাকে কোন ওয়াইল্ড এনিমেল থাকেনা।

মিঠি দিঠি ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়ে, তাদের মুখে অনেক ইংরেজী কথা শোনা যায়। দিঠিকে তার স্কুলের নাম জিজ্ঞেস করলে বলে—দেম্‌স্‌ থ্যাকরা-মেণ্ট। শুনতে অনেকটা মনে হয় জেম্‌স্‌এর ছ্যাকরা গাড়ী। তবে মেজ-পিস্‌এর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়ানোটা তাদের প্রায় রোজই হয়েছে, মিষ্টি মা গেছে শবুর কোলে চড়ে।

আজকাল ছেলেমেয়েদের খুব কম বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। আগেকার দিনে পাঁচ সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত তারা খেলে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিত। শবুর কথা আলাদা, সে গিয়েছিল দিদি কিস্কুর স্কুলে ভর্তি হওয়া দেখতে আর 'বড়মা'র আগ্রহে সেদিন তাকেও ভর্ত্তি করা হল। তখন তার বয়স চার বছরও হয়নি।

মন্দির শহরে থাকতে আর একটা কাজ হয়েছে। পথে একদিন বাবুলকে দেখতে পেয়ে দীননাথ তাকে ধরে এনেছিল। দিদির ছেলে বাবুল বেচারামের (সেলস্‌ম্যান) কাজ নিয়ে নাকি প্রায়ই সেখানে আসে আর ওঠে বড় কাকীমার বাড়ীতে—কারণ সেই যে দেড়শ না দুশ টাকা বন্ধুর জন্য নিয়ে সময়মত দিতে পারেনি। পরে অবশ্য দিদি টাকাটা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তার ছেলে এবাড়ীতে আসেনা।

তাকে দেখে শবু যখন বলল—দেখ বাবুল এটা মোটেই ভাল হচ্ছে না, আমি দিদিকে গিয়ে সব বলে দেব—তখন এক কথাতেই সে মেজদিদিমণির বাড়ী থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এবাড়ীতে চলে এল।

দুপুরে খেতে বসে বাবুলকে দেখে বাবা বললেন—

'ওটা কে, কিস্কুর ছেলে বাবুল না? ও এবাড়ীতে এসেছে কেন, ওর কাছে ত মেজদিদিমণির বাড়ীই আপন।'

কত দুঃখে বাবা যে কথাটা বলেছেন সেটুকু বোঝার ক্ষমতা বাবুলের নেই। সে শুধু লজ্জিতভাবে ঘাড় চুলকে বলেছিল—'আর যাব না দাদু।' সঙ্গে সঙ্গে বাবার রাগ জল হয়ে গেছে।

কানাই শুধু ঠাট্টা করে বলেছে—'বড় কাকীমার রোজ এক তরকারি ভাত

খেয়ে বুঝি অরুচি ধরেছে ?'

এ সব ছেড়ে আসতে মন চায়না, আবার দীননাথের কথা ভেবে থাকতেও পারে না। এখানে সবাই তার আপন, কিন্তু তবু যেন মনে হয় এটা তার আসল জায়গা নয়—দীননাথের হাসি মুখ দেখলে তবে মনে আসে শান্তি। তাই রওনা হবার মুখে বাবা যখন বলেন—তোরা একবার করে এসে চলে যাস্ আর মনটা খারাপ হয়ে যায়—তখন বাবার মুখে মার কথারই প্রতিধ্বনি শুনে শবুর চোখে জল আসে। এযে মেয়েদের জীবনের চিরন্তনী কান্না।

সব পিছনে ফেলে রেখে শবু আবার ফিরে আসে স্বামীর ঘরে—দীননাথ হাসিমুখে তাকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা জানায়।

আর দুদিন পরেই ভোট।

পাটনায় রবি মাষ্টার দীননাথকে ঠাট্টা করে বলত—'ওহে লাহিড়ী, যাও কলকাতায় গিয়ে ভোট-বিপ্লব করে এসো। যত্তো সব সংশোধনবাদী !'

এবারে সত্যিই বুঝি একটা ভোট বিপ্লব হচ্ছে। মন্দির শহরে সহজে কোন আলোড়ন জাগে না, সেখানে শুধু সমুদ্র তরঙ্গের অবিরাম আলোড়নই চিরন্তন। তবু কানাইয়ের মুখে সেখানকার জীবনেও যে জোয়ার আসছে তার কিছু কিছু বর্ণনা শুনতে পেত।

কিন্তু ভোটের দুদিন আগে কলকাতায় এসে দীননাথের মুখে শবু অনেক কথা শুনছে। বাড়ীতে এখন তিন চারখানা কাগজ রাখা হচ্ছে, চিন্ময় রাখে রাজার কাগজ স্টেটসম্যান। সব কটা কাগজই এমার্জেন্সী ও তার জনক জননীদের বিরুদ্ধে কষে কলম ধরেছে। বাংলা কাগজগুলোর পাতা উল্টে দেখে শবুও আশ্চর্য্য হচ্ছে—এই সব কাগজেও এত কথা লিখেছে! দীননাথ আর তার বন্ধুর দল শশধর বাবুরা সবাই একমত, একটা গণ জাগরণ বুঝি দেখা যাচ্ছে।

চিন্ময় সে কথা মানতে রাজী নয়, বলে—'ওরা ছাড়া দেশ চলবে না। আমরা যে ওদেরই রাজত্বে বাস করি।'

দীননাথেরা বলে—'আর আমরা বেশীর ভাগ খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে কাজ করি। আমাদের ওদের উপর ভরসা নেই।'

এ সব আলোচনা শুধু ঘরের মধ্যে। বাইরে লোকে আশ্চর্য্য রকমের নীরব—যেন নিস্তরঙ্গ পুকুরের জল। প্রাণোচ্ছল কলকাতায় এ নীরবতা এক দিনে আসেনি, অনেক নকশাল কংশাল এমার্জেন্সীর আঘাতে মানুষ সব বোবা

হয়ে গেছে—বাইরে থেকে দেখলে অন্তত তাই মনে হয়।

ভোটের আগে দুপক্ষ থেকে ভোটের স্লিপ দিয়ে গেল শুধু মা মঙ্গলা দেবীর নামে। দীননাথ বোধন বোসের দলকে জিজ্ঞেস করল—

'কি ব্যাপার, আমাদের দুজনের নাম নেই কেন? এর আগে কতবার এসে আমরা ভোট দিয়ে গেছি। আমার নামে বাড়ী, আমারও ভোট নেই? বাইরে থাকি বলে কি আমরা এখানকার নাগরিক নই? ছ সাত মাস আগে রেশন কার্ডও করেছি এখানে।'

বোধন বোস বলল—'শুধু আপনারা কেন, বেছে বেছে বহুলোকের নাম কেটে বাদ দিয়েছে। আমরা ত এখানেই থাকি, স্থানীয় ভাবে আমার একটা বিশেষ পরিচিতিও আছে—তবু আমাদের বাড়ীর বারো চৌদ্দটা ভোট বাতিল, ভোটার লিষ্টে নাম নেই।'

আশ্চর্য্য কথা! অতএব এবারকার ভোটে শবুরা শুধুই দর্শক। পাশের বাড়ীর তন্বীদি ও তার স্বামী ফ্রন্টের আমলে খুব বোধনদের সঙ্গে দহরম মহরম করত, এখন যেন কিছুটা এড়িয়ে চলে। হারাণীদিরা নিরপেক্ষ থাকার সুবিধাজনক পথ বেছে নিয়েছে। এ ছাড়া পাড়ার আর সবার মতিগতি, পক্ষ বিপক্ষভাব সবারই মোটামুটি জানা।

ভোট গণনা শুরু হতে সবাই ঘরে ঘরে রেডিওতে কান পেতে আছে—বাইরে চুপচাপ, একটা থমথমে ভাব। রাত জেগে দীননাথ খবরের কাগজের নামের লিষ্টি সামনে পেতে নিয়ে খবর শুনছে আর তার পছন্দের নামগুলোর পাশে জয়ের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। শুনতে শুনতে শবুরও উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে পাহাড় ধসে যাচ্ছে আর একদিকে জনতার জয়জয়কার। রাতের প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকার মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় জয় পরাজয়ের ঘোষণা শোনা যাচ্ছে রেডিওতে। আর মোক্ষম খবরটি শোনা গেল রাতের প্রায় শেষ প্রহরে—প্রধানমন্ত্রী পরাজিত। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত হঠাৎ যেন কলরব করে জেগে উঠল, দূরে কারা যেন আনন্দে পটকা ফাটাতে লাগল, ঘরে ঘরে আনন্দ উল্লাসের সরব আলোচনা শোনা যাচ্ছে।

জনতার হয়েছে বিপুল জয়। সেবারে পাটনায় গান্ধী ময়দানে শবু জেপির মিটিং এ গিয়ে রাজবাবুর বক্তৃতা শুনেছিল—দেবীজী যাইহে কাঁহা? হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট এমন কি জনতার আদালতেও রাজ দেবীজীকে তাড়া করে ফিরেছে—কোথায় যাবে? আর সব কিছুর মূলে পাটনার পথে মৌন মিছিলে আর ময়দানের মিটিংএ দেখা সেই আশ্চর্য্য মানুষটি—জেপি। সত্যিই

যেন ভোট বিপ্লব ঘটে গেল সারা দেশে।

দীননাথ বলল—'এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, আমাদের যেতে হবে আরো অনেকদূর।'

শবুও সেকথা বোঝে, বিশ্বাস করে। দীননাথের সঙ্গে থেকে, গল্প উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও, হো-চি মিন, কাস্ত্রো, চেগুয়েভারার জীবনী পড়ে পড়ে শবু এখন অনেক কিছু বোঝে। সে বিশ্বাস করে—এই বৈষম্য ও অসাম্য থেকে মুক্তি পেতে হলে অনেক সংগ্রাম করা দরকার, হঠাৎ একদিনেই কিছু আসবে না—তার জন্য চাই প্রস্তুতি, চাই সংগঠন।

দিল্লীতে যেদিন জনতার অভিষেক হল তার পরদিন দীননাথ গেল দিল্লীতে সরকারী কাজে। ফিরল পাঁচ দিন পরে।

চিন্ময় বলল—'দিল্লী থেকে আমাদের জন্য দিল্লীকা লাড্ডু আনলেন না মামা?'

দীননাথ বলল—'সেখানে রাজবাবুরা লাড্ডু দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছে, আমাদের ভাগে কিছুই জুটল না। ওঃ, সেখানে লোকের উৎসাহ কত, চারদিকে উৎসব যেন লেগেই আছে।'

পরে শবু দীননাথকে জিজ্ঞেস করল—'দিল্লীতে কার কার সঙ্গে দেখা হল সেখানে কোথায় উঠেছিলে, যাতায়াতের পথে পাটনায় নেমেছিলে?'

দীননাথ বলল—'না, পাটনায় নামা হয়নি। দিল্লীতে গিয়ে উঠেছিলাম ক্যাবলবাগ থানার পাশে সেই চ্যাটার্জি বাবুর হোটেলে যেখানে সেবারে তুমি আর আমি উঠেছিলাম। দোতলায় তিন বেডের একখানা ঘর দিয়েছিল আমাদেরকে, পাশেই ছিল সেই ডবল বেডের ঘর যে ঘরে সেবারে আমরা ছিলাম।'

শবুর সেবারের দিল্লী বেড়ানোর কথা সব মনে আছে। লালকেল্লা দেখে কাছাকাছি চাঁদনী চকে বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে তারা একটা বাসে উঠতে গেছিল কুতুব মিনার দেখতে যাবে বলে। বাসটা খালি হতেই অনেক মেয়ে পুরুষের সঙ্গে শবুও উঠে পড়েছে। দীননাথ ও রামবাবু তখনো উঠতে পারেনি, এদিকে গাড়ীর ভিতরে ঠাসাঠাসি ভিড়। নীচ থেকে দীননাথ ডাকল—নীচে নেমে এস, আমরা বরং ফট্‌ফটিয়াতে যাব। সেকি শবু ভিড় ঠেলে সহজে নামতে পারে? এক সময় ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিল—হামকো উতার দো।

শুনে বাস সুদ্ধ মেয়ে মন্দ দাঁত বের করে হেসেছিল। পরে নীচে এসে রামবাবু হাসির কারণ বুঝিয়েছিল—অপ কেয়া বউয়া হ্যায় যো অপকো গোদমে উঠাকে উতার দেগা—ইস লিয়ে সব আদমী হস্‌নে লাগা। হ্যাঁ, শবু হাসির সঙ্গে ওদের বলতেও শুনেছে আরে শুন শুন, বাঙালীন বিবিজী কা বোলতী হ্যায়। তখন শবুরা মাত্র মাস ছ সাত হল পাটনায় এসেছে, হিন্দী ভাষার পুঁজি বহুৎ কম। তাই এমন কথা হিন্দীতে বলেছিল যার অর্থ নাকি হয়—আমাকে কোলে করে নামিয়ে দাও। সবার হাসির খোরাক হয়েছিল।

শবু জিজ্ঞেস করল—'অফিসে কি হল?'

দীননাথ বলল—'দু চারজন যারা কলকাতা থেকে বদলি হয়ে দিল্লীতে আছে তাদের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল শেষাদ্রি আর রঘুবীরের সঙ্গে যারা প্রথম ব্যাচে আমার সঙ্গে পাশ করেছিল। ওরা এর মধ্যে দু তটো প্রোমোশন পেয়েছে। আমার পুরো ব্যাপার শুনে তারা খুব আফশোষ করল। শেষাদ্রির পিছনেও নাকি এক অফিসার লেগেছিল, শেষে সব থেকে উপর ওয়ালাকে লিখে সুবিচার পায়, তার কারণ পিছনে লাগা অফিসারটি ততদিনে অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। আমি বললাম—আমিও লিখেছিলাম, কিন্তু চাটুকার উপরয়ালাকে তেল মালিশ করে একেবারে হাত করে ফেলেছিল বলে কিছু হয়নি। ওরা বলেছে—এখন ত চাটুকার চলে গেছে, তুমি আবার চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি বলেছি—হ্যাঁ লিখব, এবারে জনতা রাজ হয়েছে কিছু হতে পারে।

'আর একটা ব্যাপার শুনে এলাম। প্রায় এক বছর আমার বদলির দরখাস্ত ঝুলে রইল, আমি নোটিশ পাঠালাম। ঠিক সেই সময় দুর্নীতির দায়ে চাটুকারকে সরিয়ে দিয়েছে—এখন ত তার বিরুদ্ধে নাকি বড় দরের মামলা হবে, কমিশন বসবে। চাটুকারের জায়গায় মিঃ পাণ্ডে এসেছে, সে-ই নাকি আমার নোটিশ দেখে জানতে চেয়েছিল—এরকম নোটিশ দিয়েছে কেন?—কলকাতায় বদলি করা হচ্ছে না বলে। কত বছর কলকাতার বাইরে আছে?—প্রায় তের বছর। কলকাতায় ঐ পোষ্টের লোক কত বছর সেখানে আছে?—প্রায় সাত বছর। আশ্চর্য্য, তাকে বাইরে না পাঠিয়ে একজনকে এত বছর বাইরে রেখেছে! সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিল—সাহিড়ী শুড্ বি পোষ্টেড টু ক্যালকাটা এণ্ড দেবেশ টু পাটনা।'

শবু শুনে ভাবছে, ভাগ্যিস ঠিক সময়মত চাটুকারের জায়গায় পাণ্ডে এসেছিল, না হলে কি যে হ'ত। তার চাইতে বড় কথা, দীননাথের এই

সফরের মধ্যে আর একটা লড়াইয়ের বীজ সংগ্রহ হয়েছে—অন্যায়ভাবে প্রোমোশন না দেবার বিরুদ্ধে লড়াই। তা করুক, লড়াই ছাড়া সহজে কিছু পাওয়া যায় না। ঘরের খেয়ে চাকরি করে নিশ্চিন্ত মনে যত খুশি লড়াই করুক—চাকরি ছাড়ার ভূত মাথায় না চাপলেই হয়।

এবারে শবু বের করল দু-খানা প্যাকেট ও একটি রেজিস্ট্রি করা খাম। প্যাকেট দুটো থেকে বের হল সোভিয়েৎ ও চীনের দুটো পত্রিকা সঙ্গে দুটো সুন্দর সুন্দর ক্যালেণ্ডার। সেগুলো দীননাথের নামে এসেছে—কলকাতার অফিসে ঢুকেই সে ওদুটোর জন্য চাঁদা দিয়েছিল। আর রেজিস্ট্রি চিঠিটা এসেছে টি ভি কোম্পানী থেকে—সাতদিনের মধ্যে এসে টাকা জমা দিয়ে টি ভি নিয়ে যেতে পারেন।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে শবু ও দীননাথ আলিপুরে টিভির অফিসে গিয়ে টিভি পছন্দ করে ট্যাক্সিতে সোজা বাড়ীতে নিয়ে এল। পাড়ার টিভি দেখার ভিড় অধেক চলে এল শবুদের বাড়ীতে—তার মধ্যে কচির দিদিরা বাঁকা-দাসের ছেলেমেয়েরা মামীমার পাশের বাড়ীর বৌ ছেলেমেয়েরা, ভাড়াটে বাড়ীর সুকু ও তার বৌদি, রায় মশাই-এর মেয়েরা আর বৃন্দা নামে পাশের বস্তির একটি মেয়ে নিয়মিত দর্শক। রায় গিন্নী, দাস গিন্নী, তন্বীদি- তারাও মাঝে মাঝে আসে। দীননাথের বন্ধুরা তাস খেলা না জমলে বসে বসে টিভি দেখে। মীরা আর মন্টু ত সব সময়ই আছে। খেলা দেখালে পাড়ার ছেলেরা এসে ভেঙে পড়ে। তবে সিনেমার দিনে পাড়ার ছেলেদের ঢুকতে দেয়া হয় না—সেদিন একচেটিয়া শুধু মেয়েরা আর দীননাথের বন্ধুরা।

শবুর কাজ বেড়ে গেছে—বড়দেরকে চা পান দেয়া, গিন্নীবান্নী যারা আসে তাদের বসতে দেয়া। টিভি এসে থেকে শবুদের বাইরে বেরোনো বন্ধ হতে বসেছে।

অখিল মিস্ত্রীকে ডেকে দীননাথ টিভির জন্য একটা উঁচু কাঠের টেবিল বানাতে দিয়েছে, মন্দির শহর থেকে আনা কাঠের টেবিলটা বড়ই পল্‌কা। শবু বলাতে মিস্ত্রীদা পানের সরঞ্জাম রাখার একটা ছোট পায়াঅলা পিঁড়িও বানিয়ে দেবে বলেছে। সেই সঙ্গে তৈরী হচ্ছে মঙ্গলাদেবীর ব্যবহারের ভাঙা নড়বড়ে চৌকিটার বদলে কাঁঠাল কাঠের সিঙ্গল চৌকি, সেটা বাইরের ঘরে থাকবে। মোট খরচ পড়বে প্রায় তিন শ টাকা।

তিন

ভাগ্যদেবী বুঝি ওদের সুখে নিশ্চিন্তে ঘরকন্না করতে দেখে মুখ টিপে হাসছে। তিনটে মাসও যায়নি, দীর্ঘ এক বছরের লড়াই, অভাব অনটন টানাটানি ও নানা দুর্গতির পর তারা যখন সবে একটু গুছিয়ে বসতে চাইছে তখনই শবুর নিয়তি তার ভাগ্য নির্ণয়, নতুন পথ নির্দেশ করতে লেগে গেছে।

আসছে বাংলা নববর্ষ।

দীননাথ তার কথা রেখেছে। কদিন আগে শবুকে সঙ্গে করে কলকাতায় গিয়ে শাড়ীর একজিবিশন থেকে শবুর পছন্দ করা প্রায় তিনশ টাকা দামের একটা সুন্দর সিল্কের শাড়ী কিনে দিয়েছে। শাড়ীটা শবু এবার নববর্ষে পরবে।

বছরে বিশেষ চারটিদিন ওরা কখনো ভোলে না। দুর্গাপুজোয় ও নববর্ষে শবুর অঙ্গে শোভা পায় নতুন শাড়ী, বিবাহ বার্ষিকী বারোই অঘ্রান আর দোলের রাতে শবু তার স্বামীকে প্রণাম করে আর স্বামীও তাকে বিশেষ আদর করে। এমনি ভালবাসা ও আদরে তারা যেন বছরের পর বছর এই চারটি দিন পালন করতে পারে, শবুর শাঁখা সিঁদুর যেন অক্ষয় থাকে এর চাইতে বেশী সুখ সে কামনা করে না।

যখন শবু আগামী নববর্ষের অপেক্ষায় মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে তখনই মূর্তিমান শনিগ্রহের মত আবির্ভাব ঘটল ভবর—সঙ্গে সামান্য কিছু মালপত্র।

শবু জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপার, সঙ্গে এত মোটঘাট আবার দেখি একা। তারপর তোমার ছেলে হয়েছে খবর পেয়েছি—সে বাবদ মিষ্টি কোথায়?'

ভব বলল—'দাঁড়াও দাঁড়াও—একটা একটা করে বলি। আমি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছি। দু মাস আগেই আসতাম কিন্তু হাসপাতাল নিয়ে আটকা পড়ে গেলাম। ওদেরকে সব বাপের বাড়ীতে রেখে এসেছি। আমি আপাততঃ এখানেই থাকব। আর মিষ্টিটা না হয় একেবারে ছেলের অন্নপ্রাশনের সময়ই খায়োনি।'

দীননাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল—'যখন বদলি হয়ে এসেছিস তখন চিন্ময়কে বলে দি, ওরা অন্য বাসায় চলে যাক।'

ভব ততোধিক ব্যস্ত হয়ে বলল—'না, না, ওদেরকে ওঠাবার দরকার

নেই, পরে হয়ত এমন জানাশোনা ভাড়াটে পাবি না। আমি এখানে দু একমাসের মধ্যে কোয়ার্টার পাব তখন সেখানেই থাকব।'

আগ্রহ দেখাতে গিয়ে দীননাথ বেকুব হল। আগে হলে শবু হয়ত অবাক হত নিজেদের বাড়ী থাকতে কেউ কোয়ার্টারে যায় কিনা ভেবে। এখন আর হল না। এদের সবাইকে তার চেনা হয়ে গেছে।

দীননাথ ওর চিন্ময়রা অফিস চলে গেলে মীরা জিজ্ঞেস করল—'মামীমা, এই বুঝি ভোলাদের ভালমামা? এ বাড়ী থাকতে মামারা কোয়ার্টারে যাবে বলল কেন?'

এ কেনর জবাব শবু দিতে পারে না, শুধু বলল—'কদিন দেখ তখন নিজেই বুঝতে পারবে।'

মীরা বলল—'চলুন যাই আমরা ভালমামার ছেলেটাকে দেখে আসি।'

শবু বলল—'অপেক্ষা কর, সে হয়ত তার মার কোলে চেপে কিছু পরেই আসতে পারে।'

শবুর কথাই ঠিক হল। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে মালতী ছেলে কোলে করে এল। ছেলে দেখে মীরা জিজ্ঞেস করল 'ভাল মামী, ছেলে কার মত দেখতে হয়েছে?'

মালতী ঠোঁট উল্টে জবাব দিল—'কি জানি। ওবাড়ীতে মা ঠাকুমারা বলল ঠিক নাকি শাশুড়ীর মত হয়েছে। এতদিন পরে ছেলে হল ত শাশুড়ীই এসে ঘাড়ে ভর করল।'

যাবার আগে মালতীও ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিয়ে গেল তারা কোয়ার্টারের অপেক্ষায় দিন গুণছে।

মালতী চলে গেলে মীরা শবুকে বলল—'মামীমা, ঐ মামীকে দেখে মনে হল যেন বড্ড রিজার্ভড, মেপে মেপে কথা বলে।'

শবুকে কিছু বলতে হয়নি, কয়েক ঘণ্টাতেই মীরা অনেক কিছু বুঝে গেছে।

শবু ভাবছে, সব দিক থেকে নিষ্কণ্টক হয়ে তবে ওর কলকাতায় বদলি নিয়েছে, একটা নাকি প্রোমোশনও পেয়েছে আঠারো বছর চাকরির পর। সে পাক। যখন দেখেছে মা মঙ্গলা দেবী সোনার দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে মেদিনীপুরে আটকে পড়েছেন সহজে আর কলকাতায় আসতে পারছেন না, এখানে সেজদারও চাকরির ঝামেলা মিটে গেছে—ঠিক তখনই তদ্বির তদারক করে কলকাতায় বদলি নিয়েছে। নিজের মেয়েকে হোষ্টেলে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, হয়ত মামা বাড়ীতেই রাখত কিন্তু কাছেই নিজেদের বাড়ী আছে

মেয়ের ঠাকুমা আছে সেখানে কেন রাখা হলনা সেই প্রশ্ন এড়াতেই তা করতে পারেনি। ভব তার মেয়েকে যার হাতে ছেড়ে দিতে পারেনি। সোনা দিয়েছে, পরে হয়ত বুঝবে। ভাগ্নছেলে আর তার বৌ মঙ্গলা দেবীকে ভাল চিনেছে। চেনে নাই শুধু দীননাথ, তাই সে এখনও সুযোগ পেলেই ভাল মানুষী দেখায়।

আবার কলকাতায় এসেই ভাল ছেলে কোয়ার্টার দেখাচ্ছে—ঘর খালি করাবার কথায় তার প্রবল আপত্তি। একে ত মালতীর শবুদের সংসারে এক সঙ্গে থাকার ইচ্ছে নেই। তার উপরে দুই ভাই যদি এক সংসারে থাকে তবে মঙ্গলা দেবী যে কোন মুহূর্তে মেদিনীপুরের বাস তুলে দিয়ে এখানে চলে আসতে পারেন। কোয়ার্টারে থাকলে বৌয়ের মনরক্ষাও হবে, আর মা আসতে চাইলে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হবে এই বাড়ীটা—ভাল ছেলের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। অতএব আটঘাট বেঁধেই সে কলকাতায় বদলি নিয়েছে।

রাতে অফিস থেকে ফিরে ভব বলল—'ওহো বৌদি, আমি ও বাড়ীতে খেয়ে এসেছি, রাতে কিছু খাব না।'

এখন থেকে বোধ হয় এই ব্যবস্থাই চালু হবে—অফিসের ভাত এবাড়ীতে আদায় করে রাতে শ্বশুর বাড়ী দেখাবে। রাগে শবুর পিত্তি জ্বলে গেল, বলল—

'অফিস যাবার সময় বলে যেতে পারলে না? এখন একজনের ভাত তরকারি ফেলা যাবে।'

সে কথার ধারে কাছে না গিয়ে ভব বলল—

'আরে বৌদি, তোমরা টিভি কিনেছ দেখছি। করেছ কি তোমরা—বাড়ী গাড়ী রেডিও টিভি! ফ্রীজ গ্যাস গোদরেজ আলমারী এ সবই বা বাকি থাকে কেন?'

শবু বলল—'যা হয়েছে সে সবই ভব সোনার দৌলতে। বাকিগুলো আমরা কোয়ার্টারে গিয়ে দেখে আসব।'

কথাটা ভব গায়ে মাখে না, দাঁত বের করে হাসে। কিল খেয়ে কিল হজম করতে সে ভাল জানে।

কিন্তু এদিকে শবুর মাথায় অন্য চিন্তা জাঁকিয়ে বসেছে। ঠিক নববর্ষের মুখে ভবরা এসে একটা জগাখিঁচুড়ি পাকিয়ে তুলেছে। শুধু পয়লা বৈশাখ কেন সামনের পুরো বছরটাই বুঝি শবুর জন্য অপেক্ষা করছে অমঙ্গল আর একটা প্রচণ্ড দুর্যোগ নিয়ে। সেই দুর্যোগের ঝাপটায় হয়ত শবুর সুখের সংসার তছনছ হয়ে যাবে।…তার মন বলছে।

চাঁদের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাহু—কেতুর, শবুর সঙ্গেও তেমন ভব ও মঙ্গলা-দেবীর। মঙ্গলাদেবী যদি হন ধূমকেতু ভব তবে শনিগ্রহ। একের আবির্ভাবের সঙ্গে অপরের আগমনও অবধারিত। দুটিতে একত্র হলেই ঘটাবে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শবুর জীবনে। তাই এতদিন পরে যখন শনির উদয় হয়েছে—ধূমকেতুর আবির্ভাবেরও তবে দেরী নেই।

ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে মাত্র দিন পনরো এ বাড়ীতে কাটিয়ে ভব কাছেই একখানা ঘর রান্নার বারান্দাসহ ভাড়া নিয়ে সপরিবারে আলাদা সংসার পাতল। অজুহাত, এ বাড়ীতে ঘর খালি নেই। যে কদিন কোয়ার্টার না পাওয়া যায় এই ব্যবস্থা নাকি চলবে। মাঝখানে ভবর খালি জমিটা তার একটা বাড়ী পরেই সে বাসা, শবু প্রাচীরের উপর দিয়ে মাথা উঁচু করলে সে বাড়ীর কিছুটা দেখতে পায়। দীননাথ লম্বা মানুষ, সে মাথা উঁচু না করে-ও দুবেলা দেখতে পায় তার সাধের একান্নবর্তী পরিবারের একটি সাক্ষাৎ নমুনা।

ভবর বিয়ের খাটটা এতদিন মীরারা ব্যবহার করছিল—নতুন বাসায় যাবার দিন ভব সেটা নিয়ে গেল। চিণ্ময় আর মীরার মুখ ভার হল, মন্টু 'আমাদের খাট আমাদের খাট' বলে রীতিমত কান্না জুড়ে দিল। মীরা বাইরের জানালায় মুখ বাড়িয়ে কচিব দিদিদের বলতে লাগল—'আমাদের বিয়ের মস্ত খাট দেশের বাড়ীতে পড়ে আছে, এতদিন আনা হয়নি, তাই। সামনের মাসে মন্টুর বাবা গিয়ে নিয়ে আসবে।' মীরা বি এ পাশ হলে কি হবে মেয়েমানুষ সে, মেয়েলী স্বভাব যাবে কোথায়?

বৈশাখের প্রচণ্ড গরম. তার সঙ্গে চলছে লোড্ শেডিং। সন্ধ্যের মুখে লোড্ শেডিং হলেই টিভি দেখা মাথায় ওঠে—তখন দীননাথ ও শবু ছাদে উঠে যায় গরমের হাত থেকে বাঁচতে। দীননাথ এখানকার অফিসে জয়েন করে থেকে পাঁচটার পরে এক মিনিটও সেখানে থাকে না—চাটুকারের সঙ্গে লড়াইয়ের মূল বিষয়ই ছিল সেটা, সেই পয়েন্ট থেকে একচুল সে নড়বে না এই তার প্রতিজ্ঞা। তাই সন্ধ্যে ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে সে বাড়ী ফিরে আসবেই—কারো তোয়াক্কা সে করে না।

সেদিনও এমনি এক সন্ধ্যেয় দীননাথ ও শবু ছাদে গিয়ে সবে বসেছে, মীরারা নীচেই আছে। এমন সময় 'সেজদা, সেজদা' বলতে বলতে মহী সাইকেলে চেপে হাজির হল। সে অনেক দিনই পাটনায় পাট চুকিয়ে আবার

দমদমে স্থায়ী হয়েছে।

মহী সাইকেল নীচে রেখে সোজা ছাদে উঠে এসে বলল—

'বাঃ, গ্র্যাণ্ড জায়গা। এখানে বসে বেশ নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে। বৌদি, এক কাপ চা হবে?'

'হ্যাঁ, হবে' বলে শবু চা তৈরী করতে নীচে নেমে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে গল্প করে মহী যাবার সময় বলল—

'চলি বৌদি, কদিন পরে আবার আসব। টিভিতে সামনের শনি রবিতে কি কি সিনেমা আছে? যাই থাক একদিন এসে দেখে যাব।' মহীকে হঠাৎ খুব ভালমানুষ মনে হচ্ছে।

মহী চলে গেলে দীননাথ চিন্তিত ভাবে বলল—

'মহী আমার কাছে তিন হাজার টাকা ধার চাইল।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'তুমি কি বললে?'

'ব্যাঙ্কে যখন টাকা আছে দিয়েই দি। বলেছে মাসে মাসে দেড়শ দুশ করে দেবে আর কয়েক মাস পরে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে বাকিটা একেবারে দেবে।'

ধীরে ধীরে একটা অশুভ চক্র যেন তাদের চারদিকে গড়ে উঠছে। গত একবছরে বিপদের দিনে যাদের কাছে পাওয়া যায় নি, এখন তারাই আসা যাওয়া শুরু করেছে। এই মহী শবুর বধূজীবনের শুরুতে একান্নবর্তী সংসারটাকে ভেঙেছিল মাসে মাত্র পঁচিশটি টাকা বেশী দিতে রাজী না হয়ে। তার তিনমাসের মধ্যে মেজোভাসুর বিশ্বনাথ মারা গেল,—দীননাথের টিবি হল। গত বিশ বাইশ বছর মহী কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। ইদানিং সে খুব মাতৃভক্ত হয়েছে—আর এই ত গত বছরই রেডিও বাজানো নিয়ে মার হয়ে দীননাথের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে গেল। বিপদের দিনে সে একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি, কি করে দিন চলছে খোঁজ নেয়নি—বিপদ কেটে গেছে দেখে সে-ই এসে তিন হাজার টাকা ধার চাইছে। মহীর সঙ্গে শবুর কোন ঝগড়া নেই—কথা-বার্তাও তেমন হয় না। তবে মহী হঠাৎ কেন আসা যাওয়া শুরু করল সে ভেবে পায় না।

একদিকে ভব এসে একটা জগা-খিঁচুড়ি পাকাচ্ছে, এদিকে মহী তাদের সামান্য পুঁজি ধরে টান মারছে—তারপর আর কে?

কদিন যেতেই বড়দা হৃদিনাথ সোদপুরে ডেকে পাঠাল দীননাথকে। শবুও

সঙ্গে গেল। মেজ মেয়ে সুবর্ণার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বিয়েতে খরচ পড়বে ষোল থেকে আঠারো হাজার টাকার মত। বড়দা রিটায়ার করেছে, এখন ভাইরা বিয়েতে কে কতটা সাহায্য করতে পারবে তারই পরামর্শ চলল।

দীননাথ বলল—'মহী ভব সোনা শেফালী আর আমি প্রত্যেকে দেড়হাজার করে দিলে সাড়ে সাত হাজার হবে।'

হৃদিনাথ বলল—'তা হলে কোন ভাবনা নেই, আমি দশ বারো হাজার খরচ করতে পারব।'

দ্রুত বিয়ের যোগাড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল এবং শুভ দিনে বিয়েও মিটে গেল। বড় বৌদি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেল। এখন তার মাথায় চিন্তা কি করে একমাত্র ছেলে পার্থকে সাহার মেয়ের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়।

দীননাথের কথামত সে, ভব আর শেফালী টাকা দিয়েছে। কিন্তু সোনা কোন খবর পাওয়া যায়নি বা মঙ্গলা দেবী সে বিয়েতে আসেন নি। বিয়ের বাজার করতে গিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে দীননাথ মহীকে পাকড়াও করেছিল কিন্তু সে 'আসছি আসছি' বলে পিছলে বেরিয়ে গেল, টাকা ত সে দিলই না, বিয়েতেও একবারের জন্ম এল না।

বীণা দুঃখ করে বলেছে—'সুপর্ণা অন্যজাতে বিয়ে করেছে বলে ছোট্ট-ঠাকুরপো এরকম ব্যবহার করল। শাশুড়ী-ঠাকরুনও এলেন না। ওদিকে তিনি কায়স্থ বেটার বৌয়ের ছেলে মেয়েকে নিয়ে দিব্যি ঘর করছেন আর ছোট্ট ঠাকুরপোও মাসে মাসে সেখানে গিয়ে বেশ কুটুম্বিতা ও ভালমানুষী করে আসছে।'

কথাটা সবারই জানা। 'মঙ্গলা দেবী বলেছেন—ছেলে নীচু জাতে বিয়ে করলে কোন দোষ নেই, তাদের সন্তানরা লাহিড়ী পদবী নিয়ে কালীনাথ ফণিনাথের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় কোন মার্জনা নাই।

সত্যিই যে একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে সে বিষয়ে শবুর মনে সন্দেহ নেই। নতুন বছর শুরু হয়েছে দুমাসও হয়নি, ভবরা এসেছে তাও প্রায় একই সময় হল—তারই মধ্যে ঘটে গেল এক মস্ত অঘটন।

বড়বৌদি বীণার ভাইঝি লীনার বিয়ে ঠিক হয়েছে। লীনা বীণার ছোড়দা ননীবাবুর ছোট মেয়ে—তারা থাকে মাজদিয়া-কৃষ্ণগঞ্জে। সুবর্ণার বিয়ের সময়ই ননীবাবু ও বীণাদি দীননাথ ও শবুকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছে—এ

বিয়েতে যেতেই হবে। কিন্তু ঐ দিনই দেখা যাচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়ার যোগ আছে. বাড়ীতে কাসুন্দি পাততে হবে। তাই ঠিক হয়েছে দীননাথ ও শবু বাসি বিয়ের দিন খুব সকালে ট্রেন ধরে মাজদিয়া যাবে।

বীণা বলেছে—'ঠিক আছে, ছেলে মেয়েরা বিয়ের দিনই যাবে, আমি শ্রাবণী ও সেজ- ঠাকুরপোকে নিয়ে বাসি বিয়ের দিন যাব।'

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রায় সারাদিন খেটে খুব শুদ্ধাচারে শবু দু হাঁড়ি কাসুন্দি বসিয়েছে। মুখে ঢাকা দিয়ে ঘরে রেখেছে, কাল আর ওগুলো ছোঁয়া হবে না। পরশু সকালে ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে বসাতে হবে, পরপর কদিন ধরে রোদে দিতে হবে।

পরদিন খুব সকাল থেকে শবুদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, ঘণ্টাখানেক আর বাকি। তারপরেই রওনা হয়ে ট্রেন ধরতে হবে--সোদপুর থেকে সেই ট্রেনেই সঙ্গ নেবে বীণাবৌদি। এমন সময় পড়ল প্রচণ্ড বাধা। একটি স্যুটকেশ হাতে করে এসে উপস্থিত পাটনার গোকুলবাবু সঙ্গে তার মেয়ে মুকুল।

দীননাথ অপ্রস্তুতভাবে অভ্যর্থনা জানাল—

'কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন।'

গোকুলবাবুও ব্যবহারে খুব ভদ্র, বললেন—

'দেখে মনে হচ্ছে আপনারা কোথাও বের হচ্ছেন. আমরা এসে আপনাদের অসুবিধে করলাম।'

'না, না, অসুবিধে আর কি? মানে, এখনই আমাদের একটা বিয়ে বাড়ীতে যাবার কথা আছে মাজদিয়ায়।' দীননাথ রীতিমত তোতলাতে লাগল।

গোকুলবাবু বললেন—'সে ত বেশ দূর পথ। আমরা এসেছি, মুকু ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি পেয়েছে, কলকাতায় ব্যাস্থ ভিলাতে তার একমাস ট্রেনিং শুরু হবে কাল থেকে। ওকে শিয়ালদার কাছে এক লেডীজ হোষ্টেলে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, আমি এসেছি পৌঁছে দিতে, মেয়েত আগে কলকাতায় আসে নি। আজকের দিনটা হাতে আছে, ভাবলাম—যাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আসি। তা আপনারা যাবার জন্য প্রস্তুত হন, আমরাও যাই ব্যারাকপুরে সেখানে আমার এক দাদা আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি গিয়ে।'

অগত্যা। তার মধ্যে চা মিষ্টি খাইয়ে যতটা সম্ভব আপ্যায়নের মাঝে শবু মুকুলের কাছে তার মা ও পাটনার অনেক খবর জেনে নিল। শেষে ঘরে তালা লাগিয়ে চারজনেই বেরিয়ে পড়ল। পথে সোদপুরে বীণা বৌদি ট্রেনে

উঠল আর ব্যারাকপুরে নেমে গেলেন গোকুলবাবু ও মুকুল। শবুর মন খারাপ হয়ে গেল—ভদ্রলোককে প্রায় বাড়ীর দরজা থেকেই বিদায় দেওয়া হল, বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা একটা বেলা থাকবেন ভেবেই এসেছিলেন।

কিন্তু বড়বৌদির হাসি গল্পের গুণে শবু বেশীক্ষণ মন খারাপ করে থাকতে পারে নি। মাঝদিয়া ষ্টেশনে স্বয়ং ননীবাবু উপস্থিত। ষ্টেশনে নেমে পাশের এক দোকানে অর্ডার দিয়ে বড়বৌদি সবাইকে ভরপেট মিষ্টি খাওয়াল, দামটা সে-ই দিল, দীননাথকেও দিতে দিল না। তার মুখে এক কথা—

খাও, খাও, শ্রাবণী, পেটভরে মিষ্টি খাও। তোমাদেরকে মিষ্টি খাওযাতে আমার খুব ভাল লাগছে।'

পরে শবুকে নিয়ে এক রিক্সায় বসে যেতে যেতে বীণা বলল—

'জানো শ্রাবণী, আমার ছোড়দা মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে। খুব গরিব অবস্থা ত, চল, গেলেই দেখতে পাবে। তাই আমি যখনই আসি ছোড়দাকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াই।'

শবু বলল—'সত্যি দিদি, মিষ্টি খেতে আমারও খুব ভাল লাগে। যদি কোনদিন ডাক্তাররা বলে—আর মিষ্টি খাওয়া চলবে না—তবে আমি হয়ত মরেই যাব। আজ মিষ্টি খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি—আমার ইচ্ছা আপনাকে একদিন পেটভরে মিষ্টি খাওয়াব।'

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল—'সে পরের কথা পরে। ঐ দেখ আমরা দাদার বাড়ীর সামনে এসে গেছি।'

শবু অনেক গরিব লোক দেখেছে, তাদের অনেক বাড়ীও দেখেছে। কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন গরিব অবস্থা কারো দেখেনি। এ কি বাড়ী! কাঁচা মেঝে, পাটকাঠির চেয়েও সরু কাঠির বেড়া দেয়া ঘর, দরজা জানলায় চাটাইয়ের বেড়ার ঝাঁপ লাগান। শুধু চালাগুলোই যা টিনের। অথচ বীণাদির বাবা জ্যেঠারা ছিল এককালের জমিদার—দেশ বিভাগের আগে। তাদের দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত সেকালে।

খুব গরিবী মতে বাসি বিয়ে। খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে বিকেলে বরকনে ও বরযাত্রীরা চলে গেল। বরের বাবা কালকের বৌভাতে সবাইকে যাবার জন্য এমন আন্তরিকতার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল যে কেউ আর না করতে পারল না। অতএব রাত্তিরটা কাঠির ঘরেই থাকা। শবুর মাথায় তখন ভাবনা ঘুরছে—আজ ত ফেরা হল না, বন্ধঘরে কাল কাস্তুদির কি অবস্থা হবে?

গ্রামের পাশেই ছোট্ট নদী মাথাভাঙা। সকালে উঠে নদীতে স্নান, একটু

দুয়ে খেয়া পেরিয়ে শিববাড়ী গ্রামে বিশাল শিবলিঙ্গ ও মন্দির দেখে সবাই বাসে করে দুপুরে লীনার শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছল। এ বাড়ীর অবস্থা আরো কাহিল, জ্যৈষ্ঠের দুপুরে টিনের চালা দেয়া কাঠির ঘরগুলো যেন এক একটা অগ্নিকুণ্ড। চারপাশে চাষের ক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট একটি গ্রাম, কাঁচা রাস্তা, মাঝে মাঝে কিছু আম কাঁঠাল আর সজনে গাছ। ছোটবেলায় তপুর বর্ণনার সেই মাটিমাটি ঘর, কাদামাটি রাস্তার গ্রামের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

প্রচুর আন্তরিকতার মধ্যে দুপুরে বৌভাতের খাওয়া সেরে বীণা দীননাথ ও শবু কৃষ্ণনগরের পথে কলকাতা রওনা হল, আর সবাই গেল মাজদিয়ার দিকে। মনে হচ্ছিল লীনার শ্বশুরবাড়ীর সবাই কলকাতার বড়লোক কুটুম্বদের অ্যাপায়ন করে নিজেরা কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত বোধ করছিল।

কৃষ্ণনগরের মুখে রাধানগরে নেমে শবুরা দেখা করল শঙ্খর সঙ্গে তার অফিসে। শঙ্খ গত ডিসেম্বরে বিয়ে করেছে, কৃষ্ণনগরে চাকরি নিয়ে এসে নতুন বাসা ভাড়া করে শবু ও দীননাথকে একদিনের জন্য নিয়ে গেছিল। সেদিনই শঙ্খর নতুন কেনা গ্যাসের উনুনের উদ্বোধন হয়েছিল শবুর পায়েস রান্নার মধ্য দিয়ে—শঙ্খর বৌ তখন মন্দির শহরে শাশুড়ীর (শবুর বড় কাকীমা) কাছে ঘর গেরস্থালীর ট্রেনিং নিচ্ছে। সেবারে শঙ্খ শবুদের কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরভাজা খুব খাইয়েছিল। আজও ভরা পেটে আবার ঠেসে মিষ্টি খাওয়াল শঙ্খ। বারবার করে বলল—

'মেজদি চল, বাসায় এখন বৌ আছে, রাত্তিরটা থেকে যা।'

শবুর মাথার কাসুন্দির চিন্তা, তাই থাকা অসম্ভব। ছুটল কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে ট্রেন ধরবে বলে। এই কৃষ্ণনগর আবার দীননাথের এককালের প্রেমের লীলা ভূমি—তখন নাকি সে অলোকের বোন সীমার প্রেমে পড়েছিল। দীননাথের মুখটা এখন গরু-চোরের মত লাজুক লাজুক দেখাচ্ছে।

শবু বীণাদির কানে কানে বলল—'দিদি, এটা নাকি আপনার দেওরের এককালের প্রেমের লীলাভূমি।'

বীণার রঙ্গ পেলে আর কথা নেই, হেসে গড়িয়ে পড়ে বুঝি, দীননাথকে বলল—'তোমরা ছেলেরা কত লীলাই জানো সেজঠাকুরপো।'

শেষে ট্রেন ধরে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল।

বাড়ী ফিরতেই মীরা সুখবর শোনাল—

'জানেন মামীমা, আজ সকালে ভালমামারা তাদের জমিতে ভিৎ পুজো করে গেল, দিদিমা নাকি চিঠি লিখে এই দিনে ভিৎপুজো করতে বলেছে।'

আর একটা ধাক্কা খেল শবুরা। মাত্র মাসখানেক ভাড়া বাড়িতে থেকে ভবরা কোয়ার্টারে উঠে গেছে। এই দিনে যে ভিৎপুজো হবে সে কথা ঘুণাক্ষরেও তাদেরকে জানায় নি। ওরা কি তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিল? শবুরা কি ওদের ভিৎ পুজোয় বাধা দিত, নাকি তারা উপস্থিত থাকলে অমঙ্গল হ'ত? ওদেরকে এড়িয়ে গেল কেন?

দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'কাসুন্দির কি হল দেখবে না?'

শবু বলল—'রাত করে ত আর রোদে দেওয়া যাবে না, স্নান করে শুদ্ধ কাপড়ে না হলে ছোঁয়াও যাবে না। সকালে স্নান সেরে যা করার করতে হবে।'

সেই স্নান সেরে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে শবু দেখছে, দু দুটো হাঁড়ি কাসুন্দি সময়মত রোদে দিতে না পারায় পচে ফেনা কেটে বসে আছে। সারাদিন রোদে দিয়েও সেগুলো রক্ষা করা গেল না।

ভয়ে শবুর বুক কাঁপছে। কাসুন্দি করে নষ্ট হয়ে যাওয়া নাকি খুব খারাপ। কিছু একটা ঘোর অমঙ্গল হবেই।

চার

আবার ভোটের বাদ্যি বেজে উঠেছে। এবারে দিল্লীর ভোট নয়, পশ্চিম বঙ্গ সহ আরো অনেকগুলি রাজ্য বিধান সভার।

এসময় গরমের ছুটিতে কানাই তার এক বন্ধুর সঙ্গে মিঠিদিঠিকে পাঠিয়েছে। দু দিন বরানগর ও তিনদিন তপুদের বাড়ীতে থাকা ছাড়া শবুদের কাছেই রইল তারা দু'জন। তপুরা এখন বাসা বদল করে কোন্নগর রিষড়ার দিকে আছে। তপুদের বাড়ী থেকে ফিরে মিঠি দিঠির অনেক অভিযোগ। মিঠি বলল—

'জান মেজপিস্, ছোটপিসীর বাড়ীউলী ভারি পাজি। একটু বেশী জল দিয়ে চান করলেই বকে—এই, বেশী জল খরচ কোরো না। এই গরমে ভাল করে চান না করলে কি থাকা যায় বল?'

দিঠি বলল—'মেজপিস্, পুতুল আমাদের খেলতে দেয়না। খব খময় আমাদের খেলা ভেঙে দেয়। ছোট পিস্ কিথু বলে না।'

শবু ওদের আদর করে ভোলায়। শিশুমনের এসব অভিযোগ বড় ক্ষণস্থায়ী।

এ বাড়ীতে দিনের বেলায় তারা খেলা করে আপন মনে। মন্নুর ওসব মেয়েলী খেলা পোষায় না, সে বেশ দুরন্ত আছে। মাঝে মাঝে তার তিন-চাকার সাইকেল নিয়ে সামনের গলিতে বেরিয়ে পড়ে, গলা ছেড়ে আবার গান জুড়ে দেয়—তারে ভোলা ত গেলনা কিছুতে। শুনে সবাই হাসে—আড়াই বছরের ছেলের গলায় কি গান!

অবসর মত দীননাথ দুজনকে মোটর বাইকে করে এরোড্রোম, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় ঘুরিয়ে আনে, দোকান থেকে লালি পপ, বাবল্‌ গাম কিনে দেয়। বাড়ে আছে টিভি দেখা। কিন্তু লোড্‌ শেডিং হলেই দু বোনে কান্না জুড়ে দেয়—

'ও পিস মশ্‌, কারেন্ট আসবে কখন?'

কারেন্টের আশায় ছাদে বসে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর উপায় থাকেনা তখন।

গরমের দীর্ঘ দিনগুলি তাদের কাটতে চায় না। দীননাথ বুদ্ধি করে কলতলার গেটের সঙ্গে একটা দোলনা ঝুলিয়ে দিলে তাই নিয়ে কদিন মেতে থাকে। তারপরে সে দোলনাও পুরোনো হয়ে যায়। তখন বুঝি তাদের মা বাবা দাদু ও ছোট বোনটির জন্য মন কেমন করতে থাকে—প্রায় পনরোদিন হয়ে গেল সবাইকে ছেড়ে এসেছে ত। শেষে পুটু এসে একদিন মিঠি আর দিঠিকে মন্দির শহরে নিয়ে যাবে বলল—সে এবার ওদিকেই যাবে বেচারামের কাজে।

এরই মধ্যে ভোট হয়ে বসু মন্ত্রীসভা রাজ্যের শাসনভার হাতে নিয়েছে, মিঠি দিঠিরা তাদের পিস্‌ মশ্‌এর সঙ্গে মোটর বাইকে চেপে কলকাতায় গিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাবার পথে নেতাকে দেখে এসেছে। সেখানকার ভিড় দেখে ওরা অবাক।

যাবার আগে শবু দু বোনকে জিজ্ঞেস করল—

'মিঠি, দিঠি—তোমাদের মেজ পিসের বাড়ী ভাল লাগল ত? আবার তোমরা আমাদের বাড়ী আসবে ত?'

দুজনেই বলল—'খুব ভাল লেগেছে, টিভি দেখেও খুব আনন্দ হয়েছে, বাবা মা থাকলে আরো আনন্দ হত।'

শবু বলল—'এর পরেরবারে মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।'

মিঠি দিঠি পুটুর সঙ্গে চলে গেল। ওরা চলে যাওয়াতে শবুর মনটা খারাপ লাগছে।

মিটিয়া থাকতেই হয়ে গেছে ভোট। এবার আর শবুরা শুধুই দর্শক নয় রীতিমত ভোটার। ভোটের আগে রাতে তাস খেলতে এসে বা টিভি দেখতে বসে দীননাথের বন্ধুরা জোর আলোচনা শুরু করে দিত।

শশধর বাবু বলে—'লাহিড়ীবাবু, আপনি এসব কি আরম্ভ করেছেন? ফ্রণ্টকে পঞ্চাশটার বেশী আসন ছাড়তে চাইছেন না।'

সমীর বাবু বলে—'প্রমোদ বাবু বলেছে—জনতা এখানে এত সীট চায় কি করে, পশ্চিমবঙ্গে ওদের সংগঠন কোথায়?'

নিকুঞ্জ বাবু বলে—'সেন মশাই বলেছে জনতার হাওয়ায় ফ্রণ্ট উড়ে যাবে।'

চিন্ময় বলে— ঠিক কথা, এমার্জেন্সীর সময় ত ফ্রণ্টওয়ালারা শেয়ালের মত গর্তে লুকিয়ে ছিল সেন মশাইরাই তাদের গর্ত থেকে টেনে তুলেছে।'

দীননাথ হেঁয়ালী করে বলে 'যা করছি ঠিকই করছি। দেখুন না বারিন্দিরের প্যাঁচ, সবাইকে ঘোল খাওয়াব।'

এদের আসরে দীননাথের ভূমিকা বোঝ কাগজে নাম বের হওয়া সেন মশাইএর নতুন পরামর্শদাতা ডি এন লাহিড়ীর—দীননাথ লাহিড়ীও যে সংক্ষেপে তাই দাঁড়ায়।

ভোট হয়ে গিয়ে যখন ফল বের হওয়া শুরু হয়েছে, দীননাথ খবর শুনেছে আর খবরের কাগজের লিষ্টে পছন্দের লোকদের নামের পাশে জয়ের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সব গবেষণা অনুমান ওলট পালট করে দিয়ে, বারিন্দিরকে অতলে তলিয়ে ধস নামিয়ে দিয়েছে ফ্রণ্ট ওয়ালারা—দীননাথের পছন্দের দল ত একাই নিরঙ্কুশ। সারা ব্যারাকপুর অঞ্চল লালে লাল।

খবর শুনতে শুনতে শবুও উত্তেজনায় কেঁপেছে—এমন দিনের কথা সে ভাবতে পারে নি। সেই কত বছর আগে থেকে দীননাথ আগ্রহ নিয়ে ভোটের ফল শুনত আর শেষে হতাশ হয়ে পড়ত, দুবার সাফল্যের গোড়ায় গিয়ে অল্পের জন্য নিরাশ হয়েছে। এবার আর কেউ ঠেকাতে পারে নি। কেন্দ্রে বন্ধু সরকার, রাজ্যে রাজ্যে জনতার জয়, পশ্চিমবঙ্গ লালে লাল—দেশের চেহারাটাই পাল্টে গেছে।

দীননাথ মনের আনন্দে বলেছে—

'এতদিনের অন্যায় অবিচারের শোধ নিয়েছে জনগণ। এবার আবার আমার লড়াই শুরু হবে দিল্লীতে আমার প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে।'

আনন্দ শবুর মনেও। এতদিন ঘরে পরে অনেক অত্যাচার অবিচার সে মুখ বুজে সহ্য করেছে—এবার এসেছে পরিবর্তনের পালা। শবুর মত মেয়ে বা

বৌরা কি চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাবে? এখন নিজের অধিকার বুঝে নিতে হবে শবুকেও। কিন্তু সে কি তা পারবে? সে যে বেশী কথা বলতে পারে না, মন তার বড়ই দুর্বল। একমাত্র ভরসা—স্বামী তার পাশে আছে, স্বামী তার সহায়।

কদিন পরে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে বেড়াতে এলে ভব বলল—

'বৌদি, এবার ত তোমার ভাসুর ঠাকুর গদী পেয়েছে—এখন কি করবে?'

শবু মুখের মত জবাব দিল—'ভাসুর ঠাকুর গদী পেয়েছে, দেওররা এবার সাবধান! অতীত কুকর্মের ফল সবাইকে ভুগতে হবে।'

ঐ পর্য্যন্তই। এর পর কি করতে হবে, কেমন করে শাশুড়ী, দেওর, ননদদের সঙ্গে লড়তে হবে তা সে জানেনা। মনে হয়—মানুষ অবস্থার দাস, নিজে থেকে সে কিছুই করতে পারে না।

এবার কথা বলল মালতী—'দেখুন সেজদি, সেদিন তাড়াহুড়ো করে জমিতে ভিৎপুজো করা হল। আমরা কদিন কলকাতায় আছি তার ঠিক নেই ওদিকে শাশুড়ী ঠাকরুন হুকুম পাঠালেন—বাড়ী তৈরী কর। তাঁর কি সেই বাড়ীতে থাকার মতলব? তবে আমরা যাব কোথায়?'

শবু এবারে ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল—

'তাতে কি হয়েছে? তিনিও থাকবেন তোমরাও থাকবে। তোমরা ত সবাই ভাল।'

মালতী সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল—'কে চায় ওনার কাছে ভাল হতে? ওনার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। এ আবার লোন, সিমেন্টের পারমিটের জন্য দরখাস্ত করে বসে আছে। সে সব পেলে ত বাড়ী করতেই হবে। কি যে হবে ভেবে আমি রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি না।'

সেদিনের হরিমতী বর্ত্তমানের মালতী এখন স্বরূপ ধরেছে। এখনও কি ভবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে—সেজদাকে সবাই খারাপ বলে কেন আর তাকে ভাল বলে কেন? ভালর ভালত্ব কি এখনও বজায় আছে? শবু শুধু ভাবে, মুখে কথা ফোটে না।

এতর মধ্যেও দু কান কাটার মত ভব দীননাথকে বলল—

'ভাবছি কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে টন খানেক সিমেন্ট ধার নিয়ে বাড়ীর ভিৎটা গেঁথে ফেলি বর্ষা বেশী নামার আগ দিয়ে। কিন্তু একটন দেড়টন সিমেন্ট রাখি কোথায়? জমিতে একপাশে আবার কারা সব খোয়া ভাঙিয়ে

ফেলে রেখেছে, কাজ করার কি করে ?'

দীননাথের ভালমানুষির অন্ত নাই। সঙ্গে সঙ্গে বলল—'এই সিঁড়ির নীচে রাখতে পারিস। ঐ খোয়া হরিদাসের, পরে তুলে নেবে।'

বাড়ীতে শবুরা আর মীরারা মিলে পা ফেলার জায়গা নাই, এসে গেল সিমেণ্ট, দশদিন ধরে ধুমাকুট কাজ হল, বর্ষায় কত উঁচু পর্য্যন্ত জল ওঠে জেনে নিয়ে তার থেকে উঁচু করে ভিৎ গেঁথে সিমেণ্ট শেষ করে মিস্ত্রী মজুররা বিদায় নিল। বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখতে শবু আর সন্ধ্যার খাটুনির চূড়ান্ত, কোয়া-র্টারের মালতীর গায়ে বাতাসটি লাগল না। বদলি হয়ে এসেই যারা ভাড়া বাড়ী খুঁজে নিল, সিমেণ্ট রাখার জন্য তেমনি ঘর ভাড়া করা গেল না ? সব দোষ দীননাথের ভালমানুষীর।

এদিকে বর্ষাও এসে গেছে। ভব দু'লরি ইট আনিয়ে বড় রাস্তায় মোড়ে ভাঙিয়ে খোয়া করে সেখানেই ফেলে রেখে গেছে, নিজেদের জমিতেও আনিয়ে রাখেনি। পাড়ার লোকে এমন কি ঐ হরিদাসও আসতে যেতে দীননাথকে কথা শোনায় আর সে বাড়ীতে এসে নিজের মনে গজ গজ করে। ভাল-মানুষী দেখিয়েছে—এখন ত লোকের কথা মিষ্টি মিষ্টি লাগার কথা। শবু বলতে পারে না। হারাণীদিকেও বলতে পারে না—আপনারাও ত খোয়া ভেঙে কতমাস আমার দেওরের জমিতে ফেলে রেখেছেন। রাস্তা যে পাব-লিকের, লোকে বলতেই পারে।

বর্ষা একটু একটু করে নামছে। বর্ষা নামলেই বাড়ীর গাছপালার দিকে নজর পড়ে বেশী করে এ ব্যাপারে শবু ও দীননাথ দুজনই সমান।

এবারো গ্রীষ্মে আম গাছটায় প্রচুর আম হয়েছিল, মিঠি দিঠিরাও অনেক আম খেয়ে গেছে। পাশের বাড়ীর শোভার ছেলে আম চুরি করতে এলে শবু একদিন দেখে ফেলেছিল—কিন্তু কিছু বলেনি। মঙ্গলা দেবী বলতেন—গাছে বেশী আম হয় না, আবার চোরে চুরি করে নিয়ে যায়। দু বছর ধরে শবুরা গাছে অনেক আমই হতে দেখল, আর শোভার ছেলে ছাড়া আর কেউ চুরি করতেও আসেনি।

গত বর্ষায় দীননাথ একটি কলমের গোলাপ গাছ এনে লাগিয়েছিল, এখন তাতে ভালই ফুল ফুটছে। ছোটমামার মেয়ে শীলা থাকে দু মাইল দূরে। তাদের বাড়ী থেকে একটি শিউলির চারা ও টগরের ডাল এনে লাগান হয়েছিল। বসন্তের শুরু থেকে ছোট্ট টগর গাছটায় ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

শিউলি গাছটিও বেশ বেড়ে উঠেছে—এই শরতেই হয়ত কিছু ফুল ফুটবে। বাড়ীতে একটা তুলসী গাছ গজিয়ে উঠেছিল শিউলি গাছের পাশে সেটিও আছে।

আমগাছ ছাড়া আছে পেয়ারা গাছ, এখন তাতে প্রচুর বর্ষার পেয়ারা। ঝড় পড়ে একটা বড় ফলন্ত নারকেল ও পাঁচটা সুপুরীগাছ সেবার মরে গেলেও আর দুটো নারকেল গাছ ছিল। একটাতে ভাল ফল দেয়না দেখে দীননাথ সেটাকে কাটিয়ে ফেলেছে—বাড়ীতে বেশী জায়গা ত নেই। অন্য নারকেল গাছটায় গত বর্ষায় প্রচুর নারকেল হয়েছিল—শবুরা খেয়ে বিলিয়ে ফুরোতে পারে না। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে এবার আরো বেশী ফল ধরবে। গত-বার যে কাঁঠাল গাছ ও ভাল লাগা আমের দুটো আঁটি লাগান হয়েছিল সে গুলো এখন সবে বড় হচ্ছে। একটা পেঁপেঁ ও একটি নিমগাছও নিজে থেকে গজিয়ে বড হচ্ছে। এবারের বর্ষায় দীননাথের নতুন সংযোজন জাম গাছের একটি চারাকে তুলে সুবিধেমত জায়গায় লাগান।

জামগাছের চারা লাগাতে লাগাতে দীননাথ বলেছে—'লোকে বলতেই বলে আম জাম কাঁঠাল—আমাদের বাগানে সেই তিনটেরই নমুনা থাক।'

মাত্র আড়াই কাঠা জমি তার উপরে চারকামরার বাড়ী করে তিনপাশে যে চিলতে পরিমাণ জমি বাদ আছে তার অধিকাংশই গাছে গাছে ছেয়ে গেছে। সেটাকেই শবুরা গর্ব করে বলে—'বাগান'। ভাল লাগে শবুরও এই সব গাছপালা নিয়ে মেতে থাকতে।

পাঁচ

বাড়ীটা যেমন নানা গাছপালায় ভরে গেছে, তেমনি বর্ষা কালটাও কাটছে নানান ঘটনার ব্যস্ততায়।

প্রথমেই এল কানাই। এবার সে এসেছে অন্য উদ্দেশ্যে, বলল—'দেশের চেহারাটা পাল্টে গেল, এখানে ফ্রন্ট সরকার, আমাদের ওখানে জনতা। এবার ভাবছি ওখানে বাড়ীর কাজ শুরু করব। এখানে ত দেখছি ভববাবুও বাড়ী করছে। আমাদের জমিটা অনেকদিন কেনা হয়ে পড়ে আছে। আগের বাড়ীটায় আমরা আর যাব না। সেটা বিক্রি করলে এখনই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দাম পাওয়া যায়। ছোটকাকাও বাড়ী বিক্রি করতে রাজী

আছে—টাকা পেলে বেলায় বিয়ের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু বড়কাকীমা আর সঞ্জয় বলছে তারা বিক্রি করতে দেবে না—ওটা নাকি বড়কাকীমার শ্বশুরের ভিটে। আচ্ছা তুই বল মেজদি, শ্বশুর বেঁচে থাকতে যে বাড়ী হয়ই নি সেটা শ্বশুরের ভিটে হল কি করে?

'শঙ্খকে এ ব্যাপারে চিঠি লিখে লিখেও কোন জবাব পাচ্ছিনা। তাই এসেছি শঙ্খর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে—সে কি বলতে চায় জানতে।'

দীননাথ বলল—'সে ত থাকে কৃষ্ণনগরে, সেখানে তবে যেতে হয়। মোটর বাইকে যাবি?'

কানাই বলল—'আমারও তাই ইচ্ছে—চলুন আপনি আর আমি কালই বেরিয়ে পড়ি। বাবা আবার একা একা কি করে ঠিক নেই।'

শবু বলল—'শঙ্খর সঙ্গে ঝগড়া করিসনা, যা বলবি ভাল মুখে বলবি। বাবার শরীর কেমন আছেরে? পয়লা বৈশাখে বাবার লেখা চিঠিটা দেখে মনে হল -বাবার হাতের লেখা যেন কেঁপে যাচ্ছে।'

কানাই বলল—'ঠিকই ধরেছিস। বাবার লিখতে হাত কাঁপে, কানে একটু কম শোনে, চশমা থাকতেও চোখে ভাল দেখতে পায় না, অনেক কথা ভুল হয়ে যায়। ওদিকে কাকলীর শরীরটাও ভাল যাচ্ছেনা—পেটে নানা উপসর্গ, ব্যথা, হজমের গণ্ডগোল।'

শবু বলল—'বাবার কথা শুনে মন খারাপ লাগছে, আবার কবে বাবার সঙ্গে দেখা হবে জানি না। তবে কাকলীর ব্যাপারটাও চিন্তার, ওকে কলকাতায় নিয়ে এসে একবার ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখা।'

'হ্যাঁ তাই করতে হবে' বলে কানাই কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য নতুন গাড়ীটাকে ঘষে মেজে আরো চকচকে করতে করতে বলল—'আমার নতুন গাড়ীটাকে আমি এই প্রথম দেখলাম, নারে মেজদি?'

শবু বলল—'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওখানে আমাদের আদরিণী কেমন আছেরে?'

কানাই বলল—'ফার্স্ট ক্লাশ। শুধু মাইলোমিটারটা কাজ করছে না, ওখানকার মেকানিক সারাতে পারছে না।'

দীননাথ বলল—'সেবারে আমরা কোনারক যেতে লক্ষ্য করেছিলাম। ওটা সারিয়ে নিস, না হলে গাড়ী চালাতে খুব অসুবিধে হয়—স্পীড, দূরত্ব কিছুই বোঝা যায় না।'

কানাই আর দীননাথ মোটর বাইকে কৃষ্ণনগর ঘুরে এল, ফেরার পথে রাণাঘাটে ছোট মামাদের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে পরদিন বেলা দশটায় বাড়ী ফিরল।

নাঃ, শম্ভু কোন সঠিক জবাব দেয়নি, শুধু ঝানু পলিটিশিয়নের মত বলেছে 'আলোচনায় সমাধান হয় না এমন কোন সমস্যাই দুনিয়ায় নেই'—আর কৃষ্ণনগরের সরভাজা খাইয়ে ওদেরকে বিদায় দিয়েছে। শম্ভুর বৌয়ের নাকি বাচ্চা হবে।

শবু জিজ্ঞেস করল—'এখন তাহলে বাড়ী তৈরীর কি করবি কানাই?'

কানাই বলল—'কি আর করব। হাতে নগদ যা আছে, আর গয়না বন্ধক দিয়ে যা হয় তাই দিয়ে শুরু করব। তারপর ধার দেনাও কিছু করতে হবে—জামাইবাবুর কাছ থেকেও কিছু ধার নেব—প্রায় হাজার দশেক। প্রায় ষাট হাজার টাকার এষ্টিমেট।'

শবু এবার তাকাল দীননাথের দিকে—'দেবে না তুমি টাকা কানাইকে বাড়ী করার জন্য?'

দীননাথ হেসে বলল—'বৌয়ের ভাইকে টাকা দেবেনা এমন স্বামী দুনিয়ায় কজন আছে? দরকারে আমার ভাইদের টাকা দিয়েছি, তোমার ভাইকেও দেব। এ বাড়ী টাকা সব তোমার আর আমার—দুজনের সমান অংশ।'

না, দীননাথ এক চোখো নয়, অকৃতজ্ঞও নয়। কষ্টের বছরে কানাইয়ের উপকার সে ভোলে নি।

শবু বলল—'তপুর বর অমলের হাতে বেশ কিছু টাকা আছে, অমলের কাছেও টাকার কথা বলতে পারিস।'

কানাই বলল—'না, মেজ জামাইবাবু ছাড়া বাড়ীর অন্য কোন জামাইয়ের কাছে টাকা চাইতে পারব না। অমল নতুন জামাই, তার কাছে ত নয়ই। মেজ জামাইবাবু আমাদের বাড়ীর লোকের মত।'

কথাটা মা বলতেন—দীনু আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। শবুর শুনে খুব ভাল লাগত।

রাতে বাইরের ঘরে কানাইকে শুতে দিয়ে মহা অসুবিধে হল, বাঁধিপোতার নেটের মশারীর ভিতর সিলিং ফ্যানের হাওয়া ঢোকে না। দীননাথ এখানে বদলি হয়েই দুটো সিলিং ফ্যান ও দুটো টিউবলাইট কিনে দুঘরে লাগিয়েছে। চিন্ময়রাও ইনস্টলমেণ্টে একটা সিলিং ফ্যান কিনে লাগিয়েছে সেই জানুয়ারীর শীতে। সে ফ্যান শীত গ্রীষ্মে সমান বেগে ঘুরে চলেছে।

দীননাথ পাটনায় কেনা টেবিল ফ্যানটা কানাইয়ের বিছানার পাশে ফিট করে দিয়ে বলল—'এখন দেখ অনেক হাওয়া পাবি।'

কানাই বলল—'জামাইবাবু, নাইলনের মশারীতে খুব হাওয়া লাগে, আপনি একটা সেই মশারী কিনুন।'

শবু বলল—'কানাই, তুই বললি ত? আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। বলে—ওটা ভাল না, কেমন থলথল করে, টাটা নেটের মশারী এনেছি—এটাতে ভাল হাওয়া লাগবে। সেটাতেও ভাল হাওয়া লাগেনা, গরমে আমার খুব কষ্ট হয়।'

কানাই বলল—'না, জামাইবাবু, আপনার এটা অন্যায়। একটা নাইলনের মশারী কিনবেন, দেখবেন গরমের দিনে সত্যি আরাম পাবেন।'

অনিচ্ছুক দীননাথ বলল—'ঠিক আছে, একটা নাইলনের মশারীই না হয় কেনা যাবে।'

দীননাথ অনেক ব্যাপারে ভীষণ গোঁড়া, কিছুতেই সহজে একটা নতুন জিনিষকে মেনে নিতে পারে না। বলে—যখন নাইলন বাজারে আসেনি তখন কি লোকে মশারীর নীচে শোয় নি? বাসনপত্রের ব্যাপারেও তার চাই শুধু কাঁসা। শবুই পুরোনো কাপড় বদলে কিছু ষ্টীলের বাটি যোগাড় করেছে।

আর একদিন থেকে তপুদের ও ষষ্ঠীতলায় কাকা-কাকীমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে কানাই চলে গেল। যাবার সময় বলে গেছে, কাকলীকে চিকিৎসার জন্য শিগগীরই কলকাতায় নিয়ে আসবে। দীননাথও কথা রেখেছে—একটা ডবল বেডের মাপের নাইলনের মশারী কিনে দিয়েছে।

এই বর্ষাকালেই বড়ভাসুরপো পার্থ এক রাতে এসে খবর দিল—'ঠাকুমা মেদিনীপুরে খুব অসুস্থ দেখে এলাম, মা সেখানে দেখতে যেতে চায়, কিন্তু সামনে আমার পরীক্ষা। আমি ভাল কাকু ও ছোট পিসীকে খবর দিয়ে এলাম, এখনই বোধ হয় তারা কেউ যেতে পারছে না।'

দীননাথ বলল—'ঠিক আছে, কাল সকালে তুই বৌদিকে ট্রেনে তুলে দিস আমিও ঐ ট্রেনে রওনা হয়ে মেদিনীপুরে গিয়ে মাকে দেখে আসব।' পার্থ চলে গেলে দীননাথ শবুকে বলল—'বড় বৌদি যাচ্ছে, তোমার আর যাবার দরকার নেই। দেখে আসি কি হয়েছে।'

সকালে উঠে দীননাথ চলে গেল। সারাটা দিন শবুর দুশ্চিন্তায় কাটল। পরের প্রায় সারাটা দিন দুশ্চিন্তায় কেটে যেতে শেষে বিকেলে দীননাথ ফিরে

জানাল—'কদিন আগে অম্বুবাচী গেছে, মা সেই উপোসটুপোস করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বৌদি আর আমাকে দেখে বলল—তোমরা আবার এসেছ কেন, আমার কিছুই হয়নি, পার্থটা শুধু শুধু সবাইকে ব্যস্ত করে তুলেছে। ওদিকে সোনার মেয়ে বুদ্ধি করে আগেই টেলিগ্রাম করে এলাহাবাদ থেকে সোনাকে আনিয়েছিল। আমরা যেতে সোনা এলাহাবাদ ফিরে গেল, বলে গেল, অবস্থা বেশ জটিল হয়ে উঠত কিন্তু আমি এসে সময়মত ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অল্পেতেই সামলে উঠেছে। আজ দুপুরে ভব গিয়ে পৌছলে আমি চলে এলাম, বৌদি পরে ভবর সঙ্গে ফিরবে।

সোনার মেয়ে ত বেশ কাজের আছে, খুব বুদ্ধি করে সময়মত খবর পাঠিয়েছে। কতই আর বয়স হবে—বারো তের মাত্র। সবাইকে নিশ্চিন্ত করার জন্য ওকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ।

দীননাথ আবার অন্য কথা শোনাল--'দেখলাম মা সোনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে না। সে নাকি কথা শোনে না, কাছেই মামাবাড়ী—সেখানে যায় আসে, স্কুলে বা পাড়ার ক্লাবে নাচগানে অংশ নেয় মামারা তাকে সে কাজে উৎসাহ দেয় সেই তার অপরাধ। মেয়েটা লেখাপড়ায় খুব ভাল।'

সবার কাছে যে কাজ প্রশংসার মঙ্গলা দেবীর কাছে তাই দোষের। আশ্চর্য এই মাতৃ চরিত্র!

রথ উল্টোরথ গিয়ে শ্রাবণ মাস পড়েছে। এই মাসে শবুর জন্মদিন, তপুর মেয়ে পুতুলেরও জন্মমাস এটা। অমল—তপুর ইচ্ছেতে পুতুলের জন্মদিন শবুদের বাড়ীতেই হল। যা কিছু হাট বাজার, কি দিয়ে কি রান্না হবে সব অমল বলে দিচ্ছে—রান্নার ব্যাপার সে ভালই বোঝে। জন্মদিন যখন পায়েস ত হবেই। শবু আর তপু রান্নার দিকটা সামলাল। ষষ্ঠীতলা থেকে সবাই এসেছে, পাশে মীরারা আছে তাদেরও নেমন্তন্ন।

সে রাতে শশধর বাবু টি ভি দেখতে এসে জিজ্ঞেস করল—'আরে. এই মেয়েটা কে? রাশিয়ান না চীনা? একেবারে যেন মোমের তৈল পুতুলের মত।'

সত্যি, মেয়েটার ধবধব করছে গায়ের রং, নাকটা থাঁদা, একটা চোখ একটু ছোট প্রায় বোজা—ঠিক একটি চীনা পুতুল যেন। মাত্র এক বছর বয়স হল, যে দেখে সেই কোলে তুলে আদর করে।

তপুর মেয়ে পুতুলের জন্মদিন মিটতে এল আর একটি অনুষ্ঠান। ভবর ছেলের অন্নপ্রাশন হবে কোয়ার্টারে। সেই প্রথম শবুরা গেল ভবর কোয়ার্টারে।

করবী, শেফালী, বড় বৌদিরাও এসেছে। আর এসেছেন স্বয়ং মঙ্গলা দেবী সঙ্গে সোনার দুই ছেলে মেয়ে শশী ও শান্ত। শশী মেয়েটিকে বেশ ভালই লাগল—ভব ও শেফালীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া হাতের কাছে যা বই পেল তাতেই মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ভবর শ্বশুর শাশুড়ীরাও এসেছে।

কে বলবে মঙ্গলা দেবী মাত্র কদিন আগে কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন। তিনি হাঁক-ডাকে সবাইকে অস্থির করে তুললেন। অন্নপ্রাশনের কাজ হচ্ছে কোয়ার্টারে কিন্তু তিনি যেন বীণা ও শবুর উপরই বেশী সদয়—একবারও তাঁকে 'মোতি' 'মোতি' করে মধুর ডাক ডাকতে শোনা গেলনা। শবু আর কি করবে, শাশুড়ীর কুশল সংবাদ নিল, যতটা সম্ভব কাজে কামে সাহায্য করল, অনুষ্ঠান শেষে খাওয়া দাওয়া সেরে বড়জা বীণা ও দীননাথের সঙ্গে বাড়ী ফিরে চলল।

পথে যেতে শবু বীণাকে জিজ্ঞেস করল—

'কি ব্যাপার দিদি, মা যেন এবার আপনার ও আমার উপর বেশী সদয় মনে হল। আপনি ত আবার তাঁকে সোদপুরের বাড়ীতে এসে থাকার কথাও বললেন।'

বীণা বলল—'ওমা, তা জাননা বুঝি? তিনি চেয়েছিলেন চাঁপাতলায় অনুষ্ঠান করতে, কিন্তু মালতী তা হতে দেয়নি অফিসের লোকদের কাছে, ঐ যে তোমাদের কি বলে, ট্যাটাস্ দেখাতে হবে ত। তোমার ভাসুর ত একজিকুটিভ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে রিটায়ার করল, তা বাবা আমরা অত ট্যাটাস ফ্যাটাস জানিনা, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমরা' বলে হি হি করে হাসতে লাগল। পরে আবার বলল—'মাকে আসতে বললাম কিন্তু বড় ছেলের কাছে তিনি কখনই আসবেন না, দু জনেই সমান রাগী ত। আর করবীর কাণ্ডটা দেখলে কেমন মালতীর খোসামোদ করছিল। ভব নাকি করবীর এক ছেলেকে এক কণ্টাক্টরের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবে।'

এত খবর শবু জানেনা, বীণা ছেলে মেয়েদের মারফৎ অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছে, শবুর সোজাসুজি যা কানে আসে তার বেশী সে জানেনা।

পরদিন দীননাথ আবার কোয়ার্টারে গেল, সেখান থেকে মাকে ও সোনার দুই ছেলে মেয়েকে ট্যাক্সিতে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা করে দিয়ে অফিস করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বলল—

'আমি ওখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম। সোনার ছেলে মেয়েকে নিয়ে মা রওনা হওয়া পর্য্যন্ত একবারও ঠাকরুনের সঙ্গে কথা হল না, ঠাকরুনও

শুধু প্রণাম করা ছাড়া রওনার মুখে দোতলা থেকে নেমে ট্যাক্সি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এল না—ভব তো অফিসের নাম করে সকালেই কেটে পড়েছে।'

ভবর বিয়ে হয়ে থেকে দীননাথ তার বৌকে ঠাকরুন বলে উল্লেখ করে, আর সোনার বৌকে বলে কায়েত-গিন্নী—দুজনই তার অপছন্দের। মালতী আর শাশুড়ী ত এক সঙ্গে থাকেই না তাতেই এই সম্পর্ক দু দিনের জন্ম এসে, শবুর মত যদি আট দশ বছর ঘর করতে হত তবে না জানি কি হত।

ছয়

শবুর শাশুড়ী ভবর কোয়ার্টার থেকে মেদিনীপুরে চলে গেছেন, এদিকে মীরার শাশুড়ী এসেছেন ওদের একখানি ঘরের সংসারে। ভদ্রমহিলা বয়সে প্রবীণা অথচ দীননাথ ও শবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেয়াই বেয়ানের।

দীননাথ প্রস্তাব দিল—'কিছুদিন থেকে আমি বাইরের ঘরে শুচ্ছি বেয়ান ঠাকরুন যতদিন আছেন এঘর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

মীরার শাশুড়ী বললেন—'না, না, আমরা আমাদের ঘরেই চালিয়ে নেব। কিন্তু বেয়াই বেয়ানের আলাদা বিছানা কেন ?'

শবু হেসে বলল—'আপনার বেয়াই-বেয়ান এখন সাহেব—মেম হয়েছে, আলাদা বিছানায় শোয়।'

মীরার শাশুড়ী ঠাট্টা করে বললেন—'আহা, সে কি কথা! এমন ফুটফুটে সুন্দরী রূপসী বৌকে ছেড়ে বেয়াই আলাদা বিছানায় শোয় কি করে ? চিন্ময়ের বাপ ত এক বিছানায় না শুলে ঘুমোতেই পারত না।'

ভদ্রমহিলা একদিকে রসিক হলেও আর এক দিকে ভীষণ কড়া। প্রথম দিনেই মন্টুকে দুপুরে দীননাথের পাশে খেতে বসতে দেখে এক ধমকে তাকে তুলে নিয়ে গেলেন, বললেন—

'বৌয়ের আক্কেল মন্দ কিছু নেই, খাওয়ার সময় ছেলে ছেড়ে দিয়ে লোককে বিরক্ত করে!'

মীরার প্রশ্রয়ে মন্টুর যে অভ্যাস সাতমাস ধরে গড়ে উঠেছিল শাশুড়ী একদিনেই তাতে ইতি টেনে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—ছেলে মানুষ করা এত সহজ নয়, চিন্ময় কি এমনি এমনি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল ? তার জন্ম চাই কড়া শাসন। মন্টুর এই সামান্ত উৎপাত শবুর গা সহা হয়ে

গিয়েছিল—ছেলেটা এমনিতে খুব ভাল সারাদিন খেলাধুলা হৈ চৈ করে মেতে থাকে। শবুর মন খারাপ লাগে, আর সে খাবার সময় এসে বলে না—'দাদাই কি খাচ্ছিস' 'দিদি আমার আলু ভাজা কই ?'

শাশুড়ীর কড়া নজরে মীরার পাড়া বেড়ানো, গল্প করা বন্ধ হয়ে গেছে, শোবার ও রান্নার দুখানা ঘরে তাকে মেপে চলতে হয়। তাতেও চুন থেকে নুন খসে। একদিন কি কথাতে মাতৃভক্ত চিন্ময় ঘরের মধ্যে মীরার গালে বুঝি একটা চড়ই মেরে বসল। না, মীরা শবুকে সে কথা বলেনি—কোন বৌয়ের পক্ষেই একথা অপরকে বলা সম্ভব নয়। মীরার প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে—ভাল ছেলে বলে চিন্ময়ের প্রতি যে ভাল ধারণা ছিল তা আর রইল না। যত দোষই করুক তাই বলে বৌকে মারবে—এতে যে মা লক্ষ্মী রুষ্টা হন।

সুবীর-মালার মেয়ে মণীষার বিয়ে। শবুদেরও সেখানে নেমন্তন্ন। সুবীর বাবু এখন বেহালা ছেড়ে সরকারী কোয়ার্টারে উঠেছে, সেখানেই বিয়ে। কোয়ার্টারে ঢোকার আগে দীননাথ বলল—

'ঐ দেখ, মাঠের ও পাশের ঐ কোয়ার্টারে ভবরা আছে।'

শবুরও তাই জায়গাটা চেনা চেনা লাগছিল। এমনিতে সে কলকাতার পথ ঘাট কিছু চিনতে পারে না।

বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে মালা জিজ্ঞেস করল—'দিদি, ওদিকের কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলে ভাই ?'

শবু দূরের কোয়ার্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'ওখানে আমার দেওর আর জা থাকে।'

মণীষা বলল—'তাই নাকি জ্যেঠিমা ? সেদিন দেখলুম ও বাড়ীতে বিয়ে টিয়ে কি একটা হল। খুব উলু পড়ছিল তাই শুনে আমরা বলাবলি করলুম—নিশ্চয়ই বাঙালদের বাড়ী তাই এত উলুর ঘটা।'

শবু বলল—'বিয়ে নয় দেওরের ছেলের অন্নপ্রাশন হল।'

খোকাকে সঙ্গে নিয়ে শবু গেল একবার মালতীর সঙ্গে দেখা করতে—শাশুড়ীর সঙ্গে কি রকম কি হল একটু জানা দরকার। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হল না। মালতী মেপে মেপে কথা বলতে লাগল—

'ঐ কোয়ার্টারে বিয়ে ? ও গুলো ত ক্লাশ থ্রিদের কোয়ার্টার, আমরা ও দিকে যাই না। এ পাশে একটা লাইন বাদ দিয়ে ঐ যে গোলাপী রংয়ের ফ্ল্যাট

গুলো দেখছেন ওগুলো ক্লাশ ওয়ানদের।'

শবুর অনেক জ্ঞান সঞ্চয় হল—হলুদ, লাল, গোলাপী দিয়ে শ্রেণী বিভাগ হয়েছে—হলুদ কোয়ার্টার ক্লাশ থ্রি দের; লাল, গোলাপীদের বলা হয় ফ্ল্যাট, মালতী লাল ফ্ল্যাটে বসে গোলাপী ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। অথচ হরিমতীদের বাপের বাড়ীতে ভাড়া থাকার সময় দেখেছে ওদের কি খারাপ অবস্থা ছিল, রোজ এক তরকারি ভাত বা রুটি খেত। শবুদের অবস্থা বাপের বাড়ীতে বা বিয়ে হয়ে এসেও এককালে খুব খারাপ ছিল—কিন্তু অত খারাপ অবস্থা কখনো হয়নি, আবার এখন অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও এমন উন্নাসিক ভাবও সে কল্পনা করতে পারে না।

শবুর উৎসাহ কমে গেল। এমন রিজার্ভ লোকের কাছে কিছু শোনার আশা করাও যায় না। 'যাই বিয়ে বাড়ীতে' বলে মালতীকে চা করতে বারণ করে সে খোকাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল।

এদিকে বিয়ে বাড়ীতে মালা তার মার উপর ভীষণ খাপ্পা, বলছে—

'জানলে ভাই দিদি—আমার মা মাগী একেবারে হাড়কেপ্পন। আমার এই একমাত্র মেয়ের বে'তে মাকে বলেছিলুম তার সাড়ে তিনভরির হারটা দিতে, তা ত দিলেই না, নিজে এলে না, ভাই রাখালকেও আসতে দিলে না—মাত্র তিনশ টাকা পাঠিয়েছে।'

সুবীর বলল—'মোচলমানদের গাঁয়ের বামুন আর কত হবে? আমি আগেই বলেছিলুম কিনা, শুধোও দিকি আর যারা এয়েছে তাদেরকে।'

মালা বলল—'কাকে শুধোতে যাব? ভাসুর ত ভাইয়ের মেয়ের বে' তে এক পয়সাও ঠেকালে না, দেওরও না। মা মাগী যে এমনটি করবে ভাবিনি-কো।'

দেওর সামনেই বসে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করছে, শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে। ঘর ভর্ত্তি আত্মীয় স্বজন সবাই শুনছে কেউ গ্রাহ্য করছে না। হ'ত যদি বাঙালদের বাড়ী, এখনই লেগে যেত তুমুল ঝগড়া।

শবুরা সকালেই বিয়েবাড়ীতে এসেছে, দুপুরে খেতে বসে একটা খবর শুনে শবুর গলায় বুঝি খাবারের দলা আটকে গেল—মাত্র বছর খানেক আগে দেখা গ্রামের সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবান জামাই অনন্ত, যার কলকাতার ফুটপাথে বইয়ের দোকান ছিল, কিছুদিন আগে স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে, যা কিনা ভাবাই যায়না।

গাঁয়ের দু চারজন লোকও এসেছে তাদের মধ্যে শবু গনেশ মাষ্টার ও মন্ত্রী

সেনের ডান হাত সেই শিশিরকে চিনতে পারছে। শিশির দীননাথকে ধরেছে, বলছে—

'ভোটের ফল এমন হল কেন লাহিড়ী বাবু, বলুন ত ?'

দীননাথ বলল—'কেন, এমার্জেন্সী জারী করতে পারলেন আর এটা বুঝতে পারছেন না ? আসলে জনগণ থেকে দূরে চলে গেলেই তখন এমার্জেন্সী, মিলিটারী শাসন এই সব আসে।'

শিশির বলল—'আবার দিন পাল্টাবে।'

দীননাথ বলল—'দিল্লীতে পাল্টাতে পারে, অন্য রাজ্যেও—কিন্তু এখানে আপনাদের সুবিধে হবে না, এখানে তৈরী হয়েছে সংগ্রামী ঐক্য।'

বরযাত্রী সহ বর এসে পৌছতে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। ঘন ঘন শাঁখে ফুঁ আর উলু দিয়ে বর বরণ করে বিয়ের আসরে নিয়ে গিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে বাসি বিয়ে শুরু হয়ে গেল। দেখা গেল এরাও বাঙালদের মত উলু দেওয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শবুরা বাড়ী রওনা হল।

সুবীর ও মালা একেবারে ঘরের লোকের মত তাদেরকে বৌভাতে বরের বাড়ীতে যেতে বলল কিন্তু দীননাথ রাজী হল না। ওদের আন্তরিকতার অভাব নেই। তবু একটা ব্যাপারে শবুর খুব খারাপ লেগেছে। দুপুরে জামাই অনন্তর মারা যাবার কথা শুনে খেতে পারেনি ভাল করে। বিকেলে বরযাত্রী আসার আগে মালা সবাইকে ডেকে ডেকে বরের বাড়ী থেকে তত্ত্ব আসা মিষ্টির পাহাড় থেকে প্লেটে করে খেতে দিল, শুধু শবুর বেলায় বারবারই তার দৃষ্টিটা পিছলে গেল। কি ভীষণ খিদে পেয়েছিল তার, তবু গনেশের দেয়া দু কাপ চা ছাড়া বিকেলে সে কিছু খেতে পায়নি। মালা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল কেন ?

সাত

জীবনে এমন এক একটি ঘটনায় মানুষকে জড়িয়ে পড়তে হয় যার জন্য সে প্রস্তুত থাকে না। বিশেষ করে সেই ঘটনা যদি হয় অনাবশ্যক আবার একই সঙ্গে অপমানজনক—তবে তার বেদনাময় অনুভূতি তাকে বহুদিন বয়ে বেড়াতে হয়। অথচ হয়ত সে তার জন্য কোনমতেই দায়ী ছিল না। এমনই একটি ঘটনায় চিন্ময় মীরাদের সঙ্গে শবুদের সুসম্পর্কে চিড় ধরল।

মাঝে দশদিনে বোম্বে বেড়িয়ে দুজনে বাড়ী ফিরে এসেছে। দেখেছে আগ্রা, পিকসিটি জয়পুর, ফতেপুর সিক্রি, অজন্তা আর বোম্বে। শবুরা ভেবেছিল জয়পুরে যেতে আসতে মরুভূমি দেখতে পাবে, কিন্তু শুনল রাজস্থানের পশ্চিম অংশে না গেলে তা দেখা যাবে না। মরুভূমির বদলে প্রচুর উট আর ময়ূর দেখে ফিরতে হয়েছে। পথে বার বার আমাশা হয়ে দীননাথ যেমন কষ্ট পেল তেমনি অজন্তার পরে আর ইলোরায় না গিয়ে জলগাঁও থেকে সোজা বোম্বের ট্রেনে উঠে পড়তে হল। বোম্বেতে গিয়ে উঠেছিল শেফালীর ভাসুর অঞ্জনদের বাড়ীতে। ওরা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে। অঞ্জন অলকা ও তাদের দুই ছেলে মেয়ে শবুদের পেয়ে খুব খুশী, অনেক আদর যত্ন করল, বোম্বাই শহর ঘুরিয়ে দেখাল। এত আদর যত্ন সেবারে যখন অঞ্জনরা পাটনায় গিয়েছিল তখন শবুরাও করতে পারেনি। অঞ্জনের দেওয়া ট্যাবলেট খেয়ে দীননাথের আমাশা সেরে গেল অথচ ঐরকম কিছু ওষুধ বা ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়ে সে কিছুতেই পথে বের হবেনা। সেবার দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়েও সেই একই অবস্থা হয়েছিল।

শবুরা ফিরে এলে চিন্ময় জিজ্ঞেস করল—'মামীমা, বোম্বে থেকে আপনারা কি নিয়ে এলেন?'

শবু বলল—'আমার জন্য একটা সিন্থেটিক শাড়ী আর তোমার মামার একটা চামড়ার বেল্ট। তোমার মাকে দেখছিনা যে?'

মীরা খুশী খুশী ভাবে জবাব দিল—'মা দেশের বাড়ীতে চলে গেছেন।'

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল।

ভাড়াটে হিসেবে চিন্ময়রা খারাপ ছিলনা। চিন্ময় ছিল দীননাথের তাস খেলার সাথী, মীরার সঙ্গেও শবুর সদ্ভাব ছিল। মনুর কথা ত বলারই নয়। তবু দীননাথ বাধ্য হয়ে তাদেরকে অন্য বাসা দেখে নিতে বলল। একটা ভদ্রতার মুখোস অবশ্য রাখল—সিমেন্টের পারমিট পাবার সময় হয়েছে বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগাতে হবে।

ব্যাপারগুলো খুব সামান্য তবু মানে লাগে। বোম্বে থেকে ফিরে শবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে—ডাক্তার চক্রবর্তী দেখে বলেছে—

'ভয় নেই বৌদি, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, সেরে যাবে।'

শবুর জ্বরের মধ্যে গ্রাম থেকে এল মীরার দাদা ভোম্বল আর দীননাথের দিদি জবার এক মেয়ে বুঁচি। দীননাথ বুঁচির নিজের মামা—সে ভাবল বোনঝি তার মামার কাছেই থাকবে, যে কদিন শবুর জ্বর থাকে সে কদিন মামা মামীকে দেখবে। কিন্তু বারবার বলেও বুঁচি শবুদের ঘরে বিশেষ পা

দিলনা, দেখা শোনা ত দূরের কথা। থায় মীরাদের হেঁসেলে। একদিন ছাদে মেলে দেয়া শুকিয়ে আসা শবুর জামা কাপড় হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে গেল। বুঁচি নিজের আর মীরাদের জামা কাপড়গুলো নামিয়ে নিয়ে এসে মামীর কাপড় বৃষ্টিতে ভিজছে বলে মীরার সঙ্গে খিল খিল করে হাসতে লাগল। জ্বর গায়ে বৃষ্টিতে ভিজে শবু ভিজে যাওয়া কাপড় জামা নামিয়ে নিয়ে এল।

বুঁচির এই ধরনের ব্যবহার ওদের আশ্চর্য্য করে। কে বলবে ওরই বড়দা হাবলু এই মামা-মামীর কাছে সাত আট বছর থেকে মানুষ হল। ওর আর এক দাদা ভোলাও এবাড়ীতে পাঁচ সাত বছর থেকে স্কুলে পড়ল—তখন অবশ্য শবুরা শিলং—পাটনায় থাকত। বুঁচির এমন ব্যবহার বড়ই দুর্বোধ্য!

দেখে ও শুনে দীননাথ বুঁচির উপর ভীষণ রেগে গেল। তাই কদিন পরে যখন শুনল ভোম্বল কাল ফিরে যাচ্ছে অথচ বুঁচি আরো কিছুদিনের জন্য মীরাদের কাছেই থেকে যাবে তখন সে চিন্ময়কে বলল—

'চিন্ময়, বুঁচিকে ভোম্বলের সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দাও।'

চিন্ময় বলল—'মামা, বুঁচি শুধু সম্পর্কে আমার শালী নয়, ছোটবেলা থেকে আমার বোনের বন্ধু তাই আমার বোনের মত। সে নিজে থেকে যেতে না চাইলে···।'

দীননাথ বলল—'সে তোমার বোনের মত হলেও আমার নিজের ভাগ্নী। ওর ব্যবহারে আমি অপমানিত বোধ করছি, আমাদের বাড়ীতে থেকেও সে কোন সম্পর্ক রাখে নি।'

চিন্ময় ভাল মানুষের মত বলল—'মামা, আমি নিরুপায়, বুঁচিকে আমি যেতে বলতে পারি না।'

প্রচণ্ড অপমানে দীননাথের মুখ কালো হয়ে গেল। ভোম্বল বুঁচিকে না নিয়েই চলে গেল।

দুদিন পর সন্ধ্যায় লোড শেডিং এর জন্য টিভি চলছে না, তাস খেলার বন্ধুরাও আসছে না দেখে দীননাথ বন্ধুদের খোঁজে বের হল। একটু পরেই বাড়ী ফিরে সে বলতে লাগল—

'চিন্ময়কে দেখলাম সমীরবাবুদের বারান্দায় আমারই বন্ধুদের জুটিয়ে নিয়ে আসর জমিয়েছে। নিশ্চয়ই সে বন্ধুদেরকে ওখানে আটকে দিয়েছে আমাকে জব্দ করার জন্য। কী স্পর্দ্ধা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া, আবার মুখে 'মামা, মামা!' কালই ওদেরকে বলব বাড়ী ছেড়ে দিতে।'

বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা বলতে উঠে পড়ে লেগে চিন্ময় তিন দিনের মধ্যে

কোয়ার্টার যোগাড় করে উঠে গেল টালিগঞ্জে।

চিন্ময়দের হাবলু নিয়ে এসেছিল—যতদিন ওরা ছিল হাবলু মাঝে মাঝে আসত, মীরা চিন্ময়ের সঙ্গে গল্প করে চলে যেত, হঠাৎ সামনা সামনি পড়ে গেলে ঢোক গিলে বলত—মামীমা, কেমন আছেন। ঐ পর্য্যন্তই। শবুরা হাবলুকে সাত আট বছর খাইয়েছে পরিয়েছে, স্কুলে পড়িয়েছে—কি অদ্ভুত তার প্রতিদান! চিন্ময়রা যাবার আগের দিন হাবলু এসে নিজের বোন বুঁচিকে করবীদের বাড়ী নিয়ে গেল। দেখেশুনে মনে হয়, এরা যেন সবাই মিলে মামা মামীদের অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল।

তবু যাবার সময় উভয় পক্ষই মৌখিক ভদ্রতা বজায় রাখল—কোয়ার্টারে বেড়াতে যেতে বলে গেল। ওদের জন্য নয়—মন্টুটার জন্যই শবুর মন খারাপ লাগছে। হঠাৎ যেন বাড়ীটা খালি খালি লাগছে। পয়লা সেপ্টেম্বর ওর চলে গেল। মাসটা যে ভাদ্র মাস সেটা মনে পড়তে শবুর মন ভীষণ দমে গেল এই মাসে কেউ বাড়ী থেকে যায় না, কাউকে যেতেও দেয়না কেউ। কিন্তু অবস্থাটা এমনই অপমানজনক হয়ে উঠেছিল, অন্য কিছু ভাবতেই পারা গেল না। বুঁচি এসেই যত গণ্ডগোল করে দিল।

বাড়ীটা খালি খালি লাগছিল, হঠাৎই সেটা কদিনের জন্য ভরে উঠল। কানাই কাকলীকে নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য, সঙ্গে মিঠি দিঠি ও মিষ্টি। আনন্দে শবুর নাচতে ইচ্ছে করছে। তপুরাও এসে তিন দিন থেকে গেল। ষষ্ঠীতলা থেকে পুটু বেলা আসা যাওয়া করছে। বাড়ী একেবারে জমজমাট। মন্দির শহরে কাকলীর মা পিসীরা বাবার দেখাশোনা করছে।

কাকলীর চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে মিঠিরা কাকলীকে সারা বাড়ী ঘুরে দেখাতে লাগল—

'এই দেখ মা আমরা চিলে কোঠার এইখানে খেলনা বাতি সাজিয়ে খেলা করতাম।'

'এইখানে ছাদে বসে মেজপিসের সঙ্গে গল্প করতাম।'

'মা, এইখানে পিস্‌মশ্‌ আমাদের জন্য দোলনা টাঙিয়ে দিয়েছিল।'

বাড়ী দেখে কাকলীও খুব খুশি।

কতদিন থাকতে হবে ঠিক নেই, সময় কাটাবার জন্য কানাই ক্যারাম বোর্ড ও একসেট গুটি কিনে আনল। এত বড় হয়েও তার ছেলেমানুষী স্বভাব যায় নি, সব সময়ই একটা হুজুগ তার চাই। কানাই অমল তপু

দীননাথ, মাঝে মাঝে কাকলী পুটু ক্যারাম খেলা নিয়ে মেতে থাকে। আর সন্ধ্যে লাগলেই সবাই টিভির সামনে। সেখানে একটা করে ছবি দেখে আর মিষ্টি আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে—

'এ কি' 'একি' 'এ কি'?

মিষ্টি মায়ের বার বার প্রশ্নে শবু হেসে বাঁচেনা, বলে—'কাকলী, তোর গাঁওটিয়া মেয়েকে নিয়ে আর পারিনা—সবেতেই বলে 'এ কি'।' বলে আর মিষ্টি মাকে কোলে জড়িয়ে আদর করে।

ডাক্তার দেখে, এক্সরে ইত্যাদি করে বলে দিল—পেটে আলসার, টিউমার, ষ্টোন বা পাথর কিছুই হয় নি—এমনি সাধারণ ওষুধেই ভাল হয়ে যাবে।

বৃষ্টি! বৃষ্টি!! বৃষ্টি!!! হঠাৎ কি বৃষ্টিটাই নামল! একদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারদিক ভেসে গেল।

জল দেখে কাকলী ভয় পেয়ে গেল—'এত জল চারদিকে, যদি সাপ খোপ বের হয়? আমার ভয় করছে।'

দিঠি অভয় দিল—'মা, এ দল খমুন্দ্রের দল না।'

কাকলীর এখন বাড়ীটা ভাল লাগছে না দেখে দীননাথের মুখখানা ছোট হয়ে গেল, জোর করে মুখে হাসি এনে বলল—

'ঘরে জল ঢুকলে কত সুবিধে—টিভির ছবি, আবার তার জল ছবিও দেখা যাবে।'

শবু বলল—'দেখলি ত কাকলী, বাড়ীটাকে খারাপ বলেছিস আর দেখ তোদের জামাইবাবুর মুখখানা এতটুকু হয়ে গেছে।'

কাকলী তাড়াতাড়ি বলল—'না, না, মেজদি, খারাপ বলব কেন? এত জল ত দেখিনি, ছোটমেয়েটা যদি জলে পড়ে যায়? জামাইবাবু, আপনার বাড়ী আমি খারাপ বলিনি।'

হঠাৎই ডাক্তারের পাট শেষ হয়ে গেছে, ট্রেনে অল্প সময়ে রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক হল প্লেনে ওরা সবাই মিলে ভুবনেশ্বর হয়ে ট্যাক্সি করে মন্দির শহরে যাবে। আর এ বাড়ীতে জল বলে দুপুরে কোন রকমে খেয়ে কাকলীরা ষষ্ঠীতলায় গিয়ে উঠবে—পরদিন সেখান থেকেই রওনা।

সাতদিন থেকে সবাই ষষ্ঠীতলায় চলে গেল—ক্যারামটা কানাই রেখে গেল, পরে যখন আসবে খেলা হবে। পরদিন শবু আর দীননাথ গিয়ে সবাইকে দমদমে বিকেলের প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে এল।

কাকলী বাড়ীটা অপছন্দ করে গেছে, জল দেখে প্রায় পালিয়েই গেছে—

দীননাথের মন খারাপ। ক্ষুব্ধ অভিমানে সে বলতে লাগল—

'দু বছর হ'ল দেখছি ঠিক তিনচার ইঞ্চির জন্য মার খেয়ে যাচ্ছি। ঘরের মেঝে আর চার ইঞ্চি উঁচু হলে ঘরে জল ঢুকত না। সব কাজ ভবর বুদ্ধিমত করা হয়েছে—পাশ করা ওভারসীয়ার! যাক্‌গে, এবারে যখন মিস্ত্রীর কাজ হবে তখন মেঝে উঁচু করিয়ে নেব। চৌকাঠে মাথা ফাটলে ফাটুক। না হলে ঘরে জল ঢুকে একদিকে অপদস্থ অন্যদিকে অসুবিধের চূড়ান্ত!'

শবুরও খুব খারাপ লাগছে, তবু দীননাথকে সান্ত্বনা দিতে বলল—

'বছরে ত মাত্র দু চারদিন ঘরে জল ঢুকে অসুবিধে হয়, তার জন্য মন খারাপ কোরো না। মেঝেগুলো এত বছরের ব্যবহারে কি সুন্দর পালিশ হয়ে গেছে, ঘর মুছতে কত সুবিধে হয়। মেঝে কোথাও ফাটেনি বা ভাঙেনি—এর উপর আবার মেঝে করতে খরচও হবে, মেঝেও খসখসে হবে। তার চাইতে আমি বলি কি, পিছনের যে ড্রেন দিয়ে জল ঢুকে ঘরে আসছে সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা কর, জলের সমস্যা অনেক কমবে।

দীননাথ চোখ দুটো বড় বড় করে ভাবতে লাগল। মনে হচ্ছে কথাটা মনে ধরেছে। এত কষ্টের বাড়ীকে খারাপ বললে মন ত খারাপ হয়ই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শবুর দুর্বল শরীর, বুঁচির ব্যবহারে অপমানিত মন কদিনের আনন্দ উৎসাহে দুই-ই চাঙা হয়ে উঠেছে। নতুন উৎসাহে শবু আবার ঘরকন্না শুরু করেছে, কাজের মেয়ে সন্ধ্যা যথারীতি কাজ করছে। দীননাথ আছে অফিস, টিভি আর বন্ধুদের নিয়ে। পুজোর আর মাসখানেক বাকি। বদলির পর থেকে ভাল মন্দ মিশিয়ে প্রায় নটা মাস কেটে গেছে।



চতুর্থ পর্য্যায়

এক

আবার কি ধূমকেতুর অবির্ভাব! একবার ভব-সোনার পৈতের ব্যাপারে মঙ্গলাদেবীর আসা-যাওয়ায় ছমাসের মধ্যে শবুদের ঘর ছাড়া হতে হয়েছিল—দীননাথের শিলংয়ে বদলি হয় তখন। আবার কি তেমনই কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে? না হলে যা কেউ কোন দিন দেখে নি, শোনেনি, জানে না—তাই হতে চলেছে কেন?

মেদিনীপুর থেকে মঙ্গলা দেবীর কাছ থেকে একযোগে চিঠি এসেছে শেফালী ভব ও দীননাথের কাছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা সামনের রবিবারে তিনি পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন—তাঁর ননদের ডাক্তার ছেলে, ভবর শ্বশুর, গ্রাম সম্পর্কের এক দেওর, মেজ জামাই ও স্বয়ং পুরুত ঠাকুর। ভোজনের সঙ্গে সোনা ও পৈতে দক্ষিণা দেবেন, তার আগে কিছু পূজো আর্চা-যাগযজ্ঞও কি কি সব হবে। এই অনুষ্ঠান হবে চাঁপাতলায় দীনুর বাড়ীতে। সবাই যেন নির্দিষ্ট কাজগুলো করে রাখে ও আর সকলকে খবর দেয়। এটা নাকি তাঁর শেষ ইচ্ছে বা শেষ কাজ।

সবাই ব্যস্ত হয়ে যে যার কাজে লেগে পড়েছে, কিন্তু শবুকে কেউ কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। শুধু দীননাথ চিঠিটা পেয়ে তাকে বলেছে—

'বুড়ো মানুষ, কবে আছে করে নেই, শেষ ইচ্ছা বলে লিখেছে—করুক একটি অনুষ্ঠান, একটা দিন বৈ-ত নয়।'

দীননাথের উপর ভার পুরুতকে বলে রাখা আর রান্না খাওয়ার জায়গা বাসনপত্র যোগাড় রাখা। ভেকরেটরকে ডেকে ভবর জমির এক অংশে রান্নার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে, বাসন পত্রও তারা দেবে। পুরুত ঠাকুরকে ডেকে অনুষ্ঠানের কথা বলতে ঠাকুর মশাই বোকার মত বললেন—

'এটা ঠিক কি ধরনের অনুষ্ঠান বুঝতে পারছি না।'

দীননাথ 'যার অনুষ্ঠান সে এসে বুঝিয়ে দেবে' বলে তার কর্ত্তব্য শেষ করে বসে আছে।

এ দিকে শবুর মনে কত প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কে তার জবাব দেবে? প্রথমত এমন একটি পূজা যাগ যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে যা পুরুত ঠাকুরেরও জ্ঞানের

বাইরে। যদি সদ্‌ব্রাহ্মণ ভোজন করানোই উদ্দেশ্য হয়, সারা মেদিনীপুর শহরে কি পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া গেল না? নাকি ঐ নির্দিষ্ট পাঁচজনকেই চাই? সে কাজের জন্য চাঁপাতলাই কি একমাত্র উপযুক্ত জায়গা। ভবর কোয়ার্টার বা সোদপুরে বড়ছেলের বাড়ীতে নয় কেন?

আবার পুজো হোম যজ্ঞও নাকি হবে। কীসের পুজো, কী যজ্ঞ, কী তার উদ্দেশ্য? সেবারে ভব দুপুরে শাপ শাপান্ত করে জলস্পর্শও না করে চলে গেলেন, পরে হাবলুকে সঙ্গে করে কাউকে না জানিয়ে মিথ্যা বলে ঘর থেকে লক্ষ্মী নিয়ে গেলেন—তাতেও তাঁর মনের আক্রোশ মেটেনি? এবার কি তাই শবুদের বুকের উপর বসে ব্রাহ্মণ ভোজনের নাম করে বধূ-বধ যজ্ঞের আহুতি দেওয়া হবে?

এ সব প্রশ্ন শবুর বুকের ভিতর বারবার খোঁচা দিলেও, মনে মনে সে ক্ষত বিক্ষত হলেও মুখ ফুটে কারও কাছে বলতে পারে না। মা থাকলে বলতে পারত, কিন্তু তার মা নেই, কার কাছে সে মনের কথা বলবে?

অনুষ্ঠানের আগের দিন করবী তার দলবল নিয়ে এসে গেল। ভব শেফালীরাও এসে ঘুরে গেল, আবার কাল সকালে তারা আসবে। কিন্তু সব কিছুর মূলে যিনি বা যাঁর ইচ্ছের এত উদ্যোগ আয়োজন তিনি কোথায়? ভব শেফালীর কাছে শোনা গেল—তিনি এসে গেছেন সকালেই, আছেন ভবর ফ্ল্যাটে। কাল সময়মত তিনি হাজির হবেন। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া তিনি এ বাড়ীতে আসবেনই না, এ বাড়ীর অন্নজলও গ্রহণ করবেন না। এত আক্রোশ মনে পুষে রেখেও তিনি এ বাড়ীতেই তাঁর অনুষ্ঠান করবেন।

সকালে এলেন মঙ্গলা দেবী সঙ্গে ভবরা সবাই। একে একে লোকজনে বাড়ী ভরে গেল। শেফালীর শ্বশুর বাড়ীর সবাই (অঞ্জন অলকারা আছে দূর বোম্বাইতে), ভবর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা, সপরিবারে হাবলু, সোদপুর থেকে সুপর্ণা বাদে বীণারা সবাই, করবীর মেয়ে জামাই, ডাক্তার দাদা ও তার এক মেয়ে। এত বড় অনুষ্ঠানে উপেক্ষিত শুধু বীণা ও শবুর বাপের বাড়ীর সম্পর্কের কেউ। সোনা গোপা আছে দূর এলাহাবাদে। আর মঙ্গলাদেবীর ভাইবৌ অনিমাদেবী তার ছেলে ছেলের বৌ—তারাও উপেক্ষিত। তাদেরকে কোন খবরই দেওয়া হয়নি।

বীণা চুপে চুপে শবুকে জিজ্ঞেস করল—'শ্রাবণী, এটা কীসের অনুষ্ঠান? পুজোপাঠ হোম যজ্ঞি কি সব হবে শুনছি কিন্তু বাড়ীর বৌ হিসেবে তুমি আমি মালতী কারো ত কোন কাজে ডাক পড়ছে না?'

শবু বলল—'যাঁর অনুষ্ঠান তিনিই জানেন।'

করবী শেফালী হাবলুরা সব নানা কাজে ব্যস্ত। ভব গরুচোরের মত মুখ করে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গল্প জমাতে এল—

'আচ্ছা সেজবৌদি, এবার বর্ষায় তোমাদের বাড়ী কবার ডুবল? আমাদের ভিতের কতদূর অবধি জল উঠেছিল?'

'তোমাদের বাড়ী' কথাটা শুনে শবুর পিত্তি জ্বলে গেল, বলল—

'আমি ত জল মাপার কাঠি নিয়ে বসে ছিলাম না তাই বলতে পারব না, তোমার সেজদাকে জিজ্ঞেস কর 'ম্নত বলতে পারবে। আর এ বাড়ী কবার ডুবল জিজ্ঞেস করছ? তোমার মত বড় ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে যে বাড়ী তৈরী হয়েছে সে ত জলে ডুববেই, আবার জলের হাত থেকে বাঁচতে মেঝে উঁচু করলে দরজার চৌকাঠ লেগে মাথাও ফাটবে। 'তোমাদের' বাড়ী ঠিক হলেই হল।'

এক বাড়ী লোকের সামনে শবুর স্পষ্ট কথা শুনে ভবর মুখখানা কালো হয়ে গেল, দাঁত বের করে হাসতেও ভুলে গেল। যার বৌ ফ্ল্যাটে বসে ক্লাশ ওয়ানের স্বপ্ন দেখছে তার ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার এমন নমুনা দেখে অতি নির্লজ্জেরও দু কান কাটা যায়।

পাড়ার আট দশটি ছেলে এসেছে পার্টির কাজে চাঁদা চাইতে। দীননাথ বাইরে বেরিয়ে তাদেরকে দেখে বলল—

'ভাই, আজ আমি খুব ব্যস্ত, তোমরা পরে এসো।'

একটি ছেলে বলল—'জানি—আমরাও আপনার বেশী সময় নেব না।'

দীননাথ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস্ করল—'তোমরা কি জান বল ত?'

ছেলেটি বলল—'জানি আজকের এই অনুষ্ঠানের কথা। আপনাদের মা দেশত্যাগী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন, অনেক দিন পরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেছে এটা তারই অনুষ্ঠান, মিলনোৎসব।'

শুনে দীননাথ অবাক! কে এসব রটনা করেছে, না কি এ শুধুই পাড়া প্রতিবেশীর উর্বর কল্পনা শক্তির প্রকাশ! একটু থেমে দীননাথ বলল—

'না, তিনি কোথাও হারিয়ে যান নি বা দেশত্যাগীও হননি। তোমরা আমার ছোটভাই সোনাকে চেন ত, যে এককালে পাশের ঐ খালি জমিতে তোমাদের ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছে? সে মেদিনীপুরে বাড়ী করেছে। মা প্রায় দেড়বছর হল তার বাড়ীতে আছে, সেখান থেকেই এসেছে আবার তার বাড়ীতেই ফিরে যাবে। তোমাদের কল্পনা শক্তির বাহাদুরী আছে! এখন

যাও তোমরা—যারা এ সব ঘটিয়েছে তাদেরকে বল নিজেদের চরকায় তেল দিতে।'

ছেলের দল মাথা নীচু করে চলে গেল।

সারাদিন পুজোপাঠ, খাওয়া দাওয়া, দান ধ্যান হল। মাত্র দুজনই বিধবা ছিলেন—এক মঙ্গলা দেবী আর শেফালীর শাশুড়ী। তাঁদের জন্য আলাদা রান্না হয়েছে, অবশ্য আজকের অনুষ্ঠানের সব কিছুই তাঁর টাকায় কেনা। শুধু এ বাড়ীর কলের জলটাই ব্যবহার হয়েছে, পারলে তিনি তাও সঙ্গে নিয়ে আসতেন।

সন্ধ্যের পর শেফালীর শাশুড়ীকে পাশে বসিয়ে মঙ্গলা দেবী কিছুক্ষণ টিভি-ও দেখলেন। তারপর সাড়ে সাতটায় খবর আরম্ভ হতেই তিনি হুকুম করলেন—

'করবী ভবা হাবলু তোরা সব জিনিষ পত্র গুছিয়ে নে, এখন আমি ভবার ফ্ল্যাটে যাব, কাল সেখান থেকে মেদিনীপুর। বৌদি, আপনি শেফালীদের সঙ্গে যাবেন তো?' শেফালীর শাশুড়ী তাঁর গ্রাম সম্পর্কে বৌদি হন।

শুরু হয়ে গেল গোছগাছ।

রওনা হবার মুখে মঙ্গলা দেবী সবাইকে শুনিয়ে বললেন—

'কিরে ভবা, তোকে বলে গিয়েছিলাম বাড়ীর কাজ আরম্ভ করতে—তুই শুধু ভিৎ গেঁথে ফেলে রাখছিস?'

ভব মিনমিন করে বলল—'লোন, সিমেন্টের পারমিটের দরখাস্ত করেছি। না পেলে কাজ আরম্ভ করতে পারছিনা।'

মঙ্গলা দেবী হুঙ্কার ছাড়লেন—'সে সব আমি জানিনা। তুমি আমার ইঞ্জিনীয়ার ছেলে, ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীর কাজ শেষ হওয়া চাই—আর সেখানে আমার জন্য যেন আলাদা একখানা ঘর থাকে। সোনার ছেলে মেয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ঝাড়া হাত পা হয়ে চলে আসব।'

বীণা আবার ভালমানুষী করল—'মা, আপনি সোদপুরের বাড়ীতে এসে থাকুন, সেখানে দোতলায় সম্পূর্ণ আলাদা একখানা ঘর আছে।'

মঙ্গলা দেবী রেগে জবাব দিলেন—'আমি কি হৃদির গোলাম হয়ে থাকব সেখানে? আমি কারো অধীন নই।'

হৃদিনাথ দুপুরে খেয়ে চলে গেছে, মার এই অপূর্ব উক্তি তার শোনার সৌভাগ্য হলনা। তার মেজ মেয়ে স্বর্ণা মুখফোড়ের মত বলল—

'ঠাকুমা, সোনা কাকুর বাড়ীতে তুমি কার গোলাম হয়ে আছ? শশী শাস্তর পড়াও ত শেষ হয়নি।'

মঙ্গলা দেবী ফুঁসে উঠলেন—'আমার যেখানে খুশি সেখানে থাকব, তুই ছুঁড়ী বলার কে?'

সকালে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে সন্ধ্যের পর কাল বোশেখীর ঝড় তুলে মঙ্গলা দেবী ভবর কোয়ার্টারে রওনা হলেন সঙ্গে করবী, ভব ও হাবলুর দল। কিছু পরে শেফালীরাও সদলে চলে গেল। এবার রওনা হবে বীণা ছেলে মেয়েদের নিয়ে।

বীণা শবুকে জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপার বলত শ্রাবণী, মা সোদপুরে মেদিনীপুরে ভবর কোয়ার্টারে বা তোমাদের বাড়ীতে কোথাও থাকবেন না—অথচ তোমার কালুজের উপর এই চাঁপাতলাতেই থাকবেন! ওঁর মতলবখানা কি? আবার এ বাড়ীতে বসেই কি সব হোম যজ্ঞ হল। আমি বলে দিচ্ছি শ্রাবণী, তোমার কপালে ঘোর দুখ্খু আছে। গরিব মুখ্যু দিদি বলে কথাটা উড়িয়ে দিও না। তোমার কথা ভেবে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছে।'

বীণা-বৌদি চলে গেল। বড় বৌদি আজ যে কথা বলছে সে কথা শবু বহু আগেই ভেবেছিল যখন ভবর জন্য ঐ জমি কেনার কথা হয়েছিল। সেদিন তার কথা কেউ শোনেনি, এমনকি তার স্বামীও সে কথা বোঝেনি। আজও না বুঝে মার শেষ ইচ্ছা পূরণে খেটে চলেছে।

এটা নাকি তাঁর শেষ ইচ্ছা, শেষ কাজ। কিন্তু এই কি তার লক্ষণ? বলা হল—কবে আছি কবে নেই তাই এ অনুষ্ঠান। কিন্তু এই যে ঝড়ের মত আসা আর যাওয়া, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সরবে ঘোষণা করছে—আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব—আমার হুকুমে সবাই উঠবে বসবে—আমার ইচ্ছাতেই কালীনাথের বংশধরেরা চলছে, চলতে বাধ্য। শেষের দিনের কথা ভাবলে কেউ কি এমন ভাবে চলাফেরা করে?

তিনি মা। তাঁর ইচ্ছাতে সবাই চলবে এই ত স্বাভাবিক। কিন্তু মার সহনশীলতা, ধৈর্য্য, স্নেহ, মায়া, মমতা তাঁর মধ্যে কোথায়? তার পরিবর্তে এই দাপট, এই কর্তৃত্ব স্পৃহা! এতে আর যাই পাওয়া যাক, শ্রদ্ধা ভালবাসা মমতা পাওয়া যায় না।

সবাই চলে গেছে। রাতে শুতে যাবার আগে শবু দীননাথকে বলল—

'মা কি বলে গেলেন শুনেছো?'

দীননাথ লঘুভাবে বলল—'আরে রেখে দাও ওসব কথা। তব যা দীর্ঘসূত্রী—ও বাড়ী ছ মাস কেন ছ বছরে হয় কিনা দেখ।'

শবু বলল—'একদিন ত হবেই, তখন কি হবে?'

দীননাথ শবুকে একটু আদর করে বলল—

'আমি আছি, ভয় কেন গো কর? আমার আদরিণী ভীরু পাখীটা বড় অল্পেতেই ভয় পায়। ওসব চিন্তা মাথায় না রেখে নাও শুয়ে পড, রাত অনেক হয়ে গেছে' বলে শবুর বিছানায় মশারী টাঙিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শোবার আগে অভ্যাস মত বলল—'সব ঠিক আছে ত, আলো নিভিয়ে দিলাম।'

এটাই আজকাল তাদের রেওয়াজ হয়ে গেছে। নাইলনের মশারী কেনার পরও কিছুদিন দুজনে এক বিছানায় শুয়েছিল। কিন্তু বর্ষাকাল, শেষরাতে পাখার হাওয়া নাইলনের মশারী ভেদ করে বেশী লেগে দীননাথের সর্দি লাগে বলে বাইরের ঘরে সে বিছানা পেতেছে। শবু বলেছিল—

'ঠিক আছে, বর্ষায় না হয় সুতির মশারীই টাঙাও।'

দীননাথ বলেছে—'আমার সহ্য হয়না বলে তুমি কেন কষ্ট পাবে? আলাদা বিছানা হলেও ঘরটা প্রায় একই। সাহেব মেমরা আলাদা বিছানায় শোয়, কানাই কাকলীও শোয়।'

অতএব গত উল্টোরথের রাত থেকে দুজনের বিছানা হয়েছে আলাদা। কানাই কাকলী আলাদা বিছানায় শোয় বটে কিন্তু একই ঘরে—পাশাপাশি। মা-বাবা চিলে কোঠার ঘরে এক চৌকিতে শুত, কিন্তু শেষ দিকে 'ছোট চৌকিতে দুজনে অসুবিধে হয়' বাবার মুখে একথা শুনে মা বুঝি অভিমানে দোতালায় নেমে এসে জোড়া চৌকিতে মিতু আর তার ছেলেদের সঙ্গে শুতে লেগেছিল। আর মাত্র দু মাসের মধ্যে মা চলে গেল। তাই দীননাথের এই ব্যবস্থায় শবুর মন সায় দেয় নি।

আজ একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শবুর নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে। কিছুদিন আগে কানাইরা চলে গেলে শবু শরীরে ও মনে নতুন উত্তম ফিরে পেয়েছিল আজ যেন হঠাৎই তা নিঃশেষ হয়ে গেল। মনের দিক থেকে সে চিরকালই দুর্বল। আজ সেই মন বুঝি আতঙ্কে দিশেহারা। বিয়ের এতবছর পরে এবং তার এত বয়স হয়ে গেলেও আজও মঙ্গলাদেবীর হুকার ছেড়ে কথা বলা শুনলে শবুর হৃৎকম্প শুরু হয়, শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। আজ তার কেবলই মনে হচ্ছে···তিনি আসছেন, তিনি আসবেন। নিজেদের বাড়ীতে

এসে যদি থাকতেন তবে হয়ত কিছুই মনে হ'ত না। ঘাড়ে কিছু চাপালে বওয়া যায়, কিন্তু কলজের উপর বসলে যে মারাত্মক ব্যাপার হবে। অতীতের সব ঘটনা সব স্মৃতি তার মনে আসে—কোন কিছু সে ভুলতে পারে না।

প্রায় এক বছর আগে মঙ্গলা দেবী দুঘণ্টার জন্য এসে জলস্পর্শও না করে ভর দুপুরে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল করবী। কদিন পরে শেফালী এসে ব্যাখ্যা দিল—সেজদা চাকরি ছেড়ে বসে আছে বলে মার দুশ্চিন্তা। উদাহরণ দিয়েছিল নিজের শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির। শেফালীর শাশুড়ীকে শবু আগেও দেখেছে, আজও দেখল। যখন শেফালী বলল—মা, চলুন, এখন আমরা যাব—তখনই তিনি উঠে পড়লেন। শাশুড়ী বলেননি—. চল বৌমা, এবার যেতে হবে—কিম্বা—এখন না, আর একটু পরে যাব। হয়ত তাঁর টিভির সিনেমার শেষ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাও বলেন নি। শবুর মা-ও ছিল এমনি কোমল প্রকৃতির—শুতে বললে শুয়ে পড়ত, বসতে বললে বসা, খেতে বললে খাওয়া। আর স্বাধীনচেতা মঙ্গলা দেবী? কোন মায়ের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না।

রাতে একা বিছানায় নিজেকে কত নিঃসঙ্গ লাগছে। স্বামী তাকে ভালবাসে, সব কিছু থেকে আগলে রাখতে চায়। তার কতটুকু ক্ষমতা পাশে এসে বসা এমন জাঁদরেল, মুখরা, কর্তৃত্ব পরায়না, কুটবুদ্ধিশালিনী মাতাঠাকুরানীকে সে এঁটে উঠবে? যে মা তিন মাসের মধ্যে সোনার মত ধীর স্থির বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলেকে পাগল করে তুলতে পারে, স্বামী স্ত্রীতে সন্দেহ অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে, কোন বৌ যাঁর সঙ্গে দু তিন মাসের বেশী ঘর করতে পারে না—সেই মা কলজের উপর এসে বসে কি অঘটন ঘটাতে পারে ভাবতেই শবুর গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

এমন রাতে যদি দীননাথ পাশে এক বিছানায় থাকত তবে স্বামীর বুকে মাথা রেখে শবু মনে বল পেত, অঙ্গ স্পর্শে মনের অনেক ভার লাঘব হ'ত। বিছানার দূরত্ব কি ওদের মনের দূরত্ব এনে দেবে? মা বাবার আলাদা বিছানায় যে পরিণতি হয়েছে, তাদের জীবনেও কি তাই হবে?

ভয়ে আতঙ্কে শবুর বুক কাঁপছে। রাতে অনেক দেরী করে ঘুম এলেও নানা দুঃস্বপ্নে বারবার সে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অনেক বছর আগে মিলিয়ে যাওয়া দুঃস্বপ্ন দেখা রাতগুলি তার জীবনে বুঝি আবার ফিরে আসছে একটা ঘোর অমঙ্গলের পদধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে মঙ্গলা দেবীর আগাম আগমন ঘোষণায়।

দুই

মনের এই অবস্থায়ই পুজোয় শবুদেরকে যেতে হল মন্দির শহরে। পথে যেতে যেমন হল বিষম বিভ্রাট, সেখানে পৌঁছেও দেখল এক অমঙ্গলের সূচনা। রওনা হয়েছিল ভরা অষ্টমীর সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি না দেখেই আর সারা নবমীর দিন ট্রেনে কাটিয়ে বাড়ী হয়ে যখন দুর্গাবাড়ীতে পৌঁছল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে—সন্ধ্যারতি, উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে নবমীর নিশি পোহাবার মুখে মা দুর্গার মুখে বুঝি আসন্ন বিজয়ার করুণ বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে। আবার একটা ঘোর অমঙ্গলের ভাবনায় শবুর বুক কেঁপে উঠছে—মনে হচ্ছে জীবনে বুঝি সে আর মা দুর্গার পূজা আরতি দেখতে পাবে না।

সুধীর বাবু বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পুজোয় মন্দির শহরে যেতে চায়। কানাই ছোটবেলায় শবুদের সঙ্গে একবার বাসনা গ্রামে গেছিল, পরেও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সূত্রে তারা কানাইদের বাড়ীতেই উঠবে—আর শবুদেরকেও সঙ্গে যেতে হবে। নেহাৎ বাপের বাড়ী যাওয়া, বাবাকে দেখতে পাবে—তাই শবু যেতে রাজী হয়েছে।

মাত্র কদিন আগেই মঙ্গলা দেবী এসে বাড়ীতে মচ্ছব করে গেছেন। এখন সুধীরের আব্দারে শবুরা পড়েছে বিপদে, খালি বাড়ী রেখে কি করে যাবে?

হঠাৎ মুস্কিল আসানের মত দুলু এসে বলল—'সেজদা, সেজবৌদি—আমরা দিন পনরোর জন্য দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যাব, অফিসের কাজের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসা আর কি। মার শরীর ত ভাল না, ভুলুর উপরও ভরসা করা যায় না। ভাবছি মাকে আপনাদের বাড়ীতে রেখে যাব।'

অতএব উপায় হয়ে গেল। দীননাথের মোটে ছুটি পাওনা নেই, সে তিন দিন পরেই ফিরে আসবে। ঐ তিনটে দিন মামীমাকে একটু একা থাকতে হবে, তারপর দীননাথ ফিরে এলে আর কোন অসুবিধে নেই। শবু দিন পনরো বাপের বাড়ীতে থাকবে।

তপুরা একদিন এল। অমল শবুর জন্য সুন্দর একখানা তাঁতের শাড়ী কিনে এনেছে পুজো উপলক্ষে। গত পুজোয় শবু তপুকে শাড়ী দিয়েছিল।

শবু পুতুলকে আদর করতে করতে বলল—

'তপু, পুজোর সময় আমরা বোধ হয় মন্দির শহরে যাচ্ছি। এখনো দিন ঠিক হয়নি, টিকিট কাটতে দিয়েছে।'

তপু বলল—'যা ঘুরে আয়। আমরাও বোধ হয় বক্রেশ্বর আর কোথায় কোথায় যাব দুতিন দিনের জন্য।'

ডুলু এসে মামীমাকে রেখে গেল পুজোর দুদিন আগে। মামীমা তাঁর ছেলের বৌ রত্নার নামে সাতকাহন বলতে লাগলেন, কি ভাবে রত্না তাঁকে কথায় কথায় হেনস্তা করে অশিক্ষিত, গ্রাম্য, কাজে অপটু বলে যদিও তিনি বাড়ীর বারোআনা কাজ করেন। রত্নার আবার এখন ছমাস চলছে, সে আর কতটুকু কাজ করতে পারে?

মামীমা ভাগ্য করে ছেলের বৌ পেয়েছেন, আর শবু ভাগ্য করে শাশুড়ী—সবই ভাগ্য! মঙ্গলা দেবীর পূজা হোম ব্রাহ্মণ-ভোজন দান ধ্যানের কথাও হল।

অফিস থেকে ফিরে দীননাথ জানাল—

'ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেছে - অষ্টমীর রাতে রওনা।'

পরদিন পাড়ার ছেলেরা এসে ঘাড়ের উপর পড়ল, বলল—

'কাকু, আপনার ভাইয়ের দু'লরি খোয়া পুজোর জায়গায় সেই কবে থেকে ফেলে রেখেছেন—আমরা প্যাণ্ডেল বাঁধতে পারছি না।'

দীননাথ বলল—'পাড়ায় কত লোক বাড়ী করছে, মোড়ের মাথায় মাল এনে ফেলছে—সব দায় কি আমার?'

তারা বলল—'যার জিনিষ তাকে ত পাচ্ছিনা। আপনার ভাইয়ের জিনিষ বলে কিছু বলতেও পারছিনা। আপনি পাড়ার একজন মাথা। আমরা না হয় কুলি লাগিয়ে যতটা সম্ভব একপাশে সরিয়ে রাখছি—খরচ যা হবে আপনার ডবল চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেবেন।'

দীননাথ বলল—'যা হয় কর, আমি ওসব নিয়ে টানাটানি করতে পারবনা। যাবে না হয় কিছু গাঁটগচ্চা।'

এত সব বাধা ঝামেলা সামলে অষ্টমীর সন্ধ্যায় যখন শবুরা হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হল তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুজো প্যাণ্ডেলে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি ঢাকের আওয়াজে চাপা পড়েছে।

ষ্টেশনে ভিড়ে পা ফেলা যাচ্ছে না, ট্রেনেরও নাকি কি সব ভীষণ গণ্ডগোল। সুবীররা যাচ্ছে ভ্রমণ ভাতা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাশে আর শবুরা পেয়েছে এ্যাটে-ণ্ড্যাণ্টের কোটায় দুটো সেকেণ্ড ক্লাশ স্লীপার বার্থ। সে সেকেণ্ড ক্লাশে শবুরা

ঢুকতেই পারল না—শেষে সুবীরদের কুপেতেই উঠে বসল। ট্রেনটা আবার স্পেশাল ট্রেন না কি, দেরী করে ছেড়ে কত পথ ঘুরে, দাঁড়াতে দাঁড়াতে খড়্গপুরেই পৌঁছল নবমীর দিন বেলা এগারোটায়।

সেখান থেকে ট্রেন ছাড়তে কণ্ডাক্টার গার্ড এসে টিকিট দেখতে চাইল। সুবীররা জীবনে প্রথম ফার্স্ট ক্লাশে চেপেছে, ছেলে খোকা বাহাদুরী করে 'টিকিট দেখবেন?' 'টিকিট দেখবেন?' বলে ওদের চারখানা টিকিট দেখিয়ে এমন অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল যে শবুর লজ্জাই করতে লাগল। কণ্ডাক্টার বিরক্ত হয়ে পরে শবুদের টিকিট চাইতে বের হল দুখানা সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট। তবু কণ্ডাক্টার ভদ্রভাবে শবুদের বলল—

'এতক্ষণ ট্রেনে অসম্ভব ভিড় ছিল বলে আপনাদের ফাইন করলাম না। কিন্তু সামনের ভদ্রক বা বালেশ্বরে অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে যাবে, তখন যদি আপনারা বন্ধুদের ছেড়ে নিজেদের জায়গায় না যান আমি পুরো ফাইন উশুল করতে বাধ্য হব।'

কণ্ডাক্টার চলে গেল। অপমানের চূড়ান্ত হল শুধু ঐ খোকাটার গ্রাম্য অভদ্র ব্যবহারের জন্য। মনের জ্বালায় শবুর মনে পড়ে গেল মণীষার বিয়ের সন্ধ্যের কথা। মালাকে বলেই ফেলল—

'জানো ভাই. মণীষার বিয়ের দিন বিকেলে আমাকে কেউ কিছু খেতে দেয় নি, কি ভীষণ খিদে পেয়েছিল।'

মালা বলল—'সে কি ভাই, তুমি নিয়ে খেলেনা কেন, তুমি ত আমাদের ঘরের লোক। চাইলে না কেন?'

আর চাওয়া! যারা আসল ঘরের লোক নিকট আত্মীয় তাদের ডেকে ডেকে দিল, নিজের মা সোনার হার দেয়নি বলে মাগী ছাগী কত কি বলছিল সেখানে কোন বন্ধুর বৌ হয়ে শবু হল ঘরের লোক? হয়ত শবুরা সে বিয়েতে সোনাদানা না দিয়ে শুধু শাড়ী দিয়েছে বলে ইচ্ছে করেই সেদিন শবুকে হেনস্তা করেছে।

বালেশ্বর আসতেই শবুরা নিজেদের জায়গায় গিয়ে এই অপ্রিয় ও অপমানকর সংসর্গ এড়িয়ে বাঁচল। দীননাথও বন্ধু-পুত্রের অসভ্যতায় রেগে ছিল, সেকেণ্ড ক্লাশে এসে হাঁফ ছেড়ে বলল—

'এই সব গেঁয়ো লোক সঙ্গে থাকলে মান সম্মান নিয়ে চলা যায় না। তবু কণ্ডাক্টার ভদ্রতা করেছে। এরা ত জীবনে কখনো ফার্স্ট ক্লাশ দেখেনি, কত আর হবে!'

এমনি বিভ্রাটে অপমানে গড়াতে গড়াতে গাড়ী যখন মন্দির শহরে পৌঁছল তখন রাত এগারোটা—নবমীর পুজো অঞ্জলি সন্ধ্যারতি সব শেষ। আর দুর্গাবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল প্রায় নবমী নিশি শেষে যখন প্রতিমার মুখে লেগেছে বিজয়ার বিষন্নতা। এমন অমঙ্গলের ঘটনা শবুর জীবনে আর ঘটেনি।

প্রতিমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে চোখের জলে শবু মনে মনে বলতে লাগল—মাগো, সময়মত এসে পৌঁছতে পারিনি, ক্ষমা কোরো মাগো। শবুর চোখে মা আর মা দুর্গা চিরদিনই অভিন্ন।

পরদিন বিকেলে কাকলী, মালা, মণীষাকে নিয়ে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরাতে গিয়ে শবুর হাত যেন অবশ হয়ে আসছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে-এই বুঝি তার জীবনে মাকে শেষ সিঁদুর পরানো, শেষ প্রণাম জানানো।

দ্বাদশীর বিকেলে দীননাথ চলে গেছে। ট্রেনের টিকিট না পেয়ে কানাই-দের মত সেও ভুবনেশ্বর থেকে প্লেনে দমদমে উড়ে গেছে। ফিরতে একদিন দেরী হলে নাকি তার পাঁচ দিনের মাইনে কাটা যাবে। আরো দুদিন পরে সুবীর বাবুরা চলে গেলে তবে শবু বাবা ও আর সবাইকে প্রণাম করে গেল।

কাকলী নিষ্ঠাভরে বাড়ীর তিন পুরুষের পবিত্র লক্ষ্মীর পট সামনে রেখে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করল, লক্ষ্মীর কথা শুনল। মা কি সুন্দর লক্ষ্মীর কথা শুনত—বাড়ীর বৌ সেই ধারা বজায় রেখেছে।

বাবা একদিন বললেন—'মিতুদের নাকি খুবই কষ্ট হচ্ছে। তোরা কি ওদের নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারিস? তাহলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।'

শবু বলল—'হ্যাঁ বাবা, আমরাও সে কথা ভেবেছি, যাবার আগে মিতুদের সঙ্গে কিছু কথাও বলে গেছে। আমি গিয়ে কথা বলব।'

মিতুর সঙ্গে দেখা করতে সে বলল—'তুই সেবারে এসেছিলি, তখনই বলে-ছিলাম আমাদের এখানে সংসার চলছে না, কলকাতায় নিয়ে চল। তখন বললি—পরে জানাব। সেদিন জামাইবাবু এসেছিল, সেও নিয়ে যাবে বলল কিন্তু বাড়ীতে কি সব মিস্ত্রী মজুর লাগবে বলে কমাস দেরী হবে। কলকাতায় নিয়ে যাবি না বলে দে তাহলেই আর সাধি না।'

শবু বলল—'মিস্ত্রী মজুরের কথা ঠিকই বলেছে। আবার সামনে মন্তুর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা বুঝি, এ সময় ও গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে।'

মিতু বলল—'তার মানে তোরা নিয়ে যাবি না।'

শবু বলল—'তোর জামাইবাবু কলকাতায় চলে গেছে। আমি ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে তোকে জানাব। কিন্তু দু একমাসের মধ্যে যদি তোদের যাওয়া হয়ও—মন্তুকে তার মামা বাড়ীতে রেখে যাবি—একেবারে পরীক্ষা দিয়ে তবে সে যাবে।'

'সে যা করার করব, তুই তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে চিঠি দিবি' বলল মিতু, কিন্তু মন্তুর যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বললনা।

ফিরে এসে বাবাকে সে কথা বলতে বাবা বললেন—'দীননাথকে বলে তোরা যদি ওদেরকে নিয়ে যাস তবে আমি অনেক নিশ্চিন্ত হই, শান্তি পাই। হ্যাঁ, পরীক্ষা না দিয়ে মন্তুর যাওয়া ঠিক হবে না, সে এ বাড়ীতেই থাকতে পারে।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর কানাইকে মিতুদের ব্যাপারটা বলতে কানাই ভীষণভাবে আপত্তি করল, বলল—

'খবরদার এমন কাজ করিস না মেজদি, অশান্তিতে জলে পুড়ে মরবি। জামাইবাবুও যাবার দিন সে কথা বলছিল, বলল—মা আর দুটি ছেলে কি অশান্তি করবে বুঝতে পারছিনা। জামাইবাবু ত সব কিছু জানে না—কিন্তু সব জেনে শুনে তুইও নিয়ে যাবার কথা বলছিস? কি করে যে অশান্তি সৃষ্টি করতে হয় ছোড়দির মত আর কেউ তা জানে না। আমরা কি ওদের দেখছি না? নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে পরে কিন্তু পস্তাবি।'

বাবা নিশ্চিন্ত হবে, বাবার মনে শান্তি দেবে তার জন্য শবু সব কিছু করতে প্রস্তুত, যে কোন অশান্তি যে মাথা পেতে নেবে। একটু ভেবে শবু বলল—

'গিয়ে তোর কথাও আবার বলি, তারপর যা হয় তোকে জানাব।'

কাকলী বলল—'সাধ করে বিষ-বৃক্ষ ঘরে নিয়ে যেতে চাইছেন মেজদি?'

শবু জানে, শেষদিকে মা-ও মিতুকে তার চরিত্রের জন্য দু চক্ষে দেখতে পারত না। মিতু আর দীননাথে আবার শালী জামাইবাবু সম্পর্ক। পুরুষ-মানুষকেই বা বিশ্বাস কি? শেষে কিছু হলে কাকে সে দোষ দেবে—নিজের ভাগ্যকে? তবু বাবার কথাটা ··বাবার মনের শান্তি ··।

শেষে শবু বলল—'দেখি কি করা যায়।'

মিষ্টি মাকে কোলে করে শবু মিঠি দিঠিকে বোঝে আগ্রা জয়পুর বেড়াতে যাবার গল্প বলে। কানাইকে বলে অজন্তার শিল্প সৌন্দর্য্যের কথা, তখন ওদের

বারবার কানাইয়ের কথা মনে পড়েছে—সে যে একজন জন্মগত শিল্পী।

কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'ডাক্তারখানায় ভর্তি হয়ে আমার মধ্যে শিল্পীর আর কিছু নেই। আমি এখন ফটোশিল্পী, কাল দেখিস তোর কয়েকটা রঙিন ফটো তুলব।'

মিঠি দিঠিকে শবু শোনায় মৈত্র পরিবারের অতীত দিনের কথা, দাদু মহিম মৈত্রের ভদ্রাসনের কথা, বাবা কাকাদের দিনরাত গান বাজনার আসরের কথা—সুদিন দুর্দিনের কথা। ওরা অবাক হয়ে শোনে—ওরা সে সব কিছু দেখেনি। ওরা দেখবে কোথা থেকে—কানাই-ই তখন একেবারে শিশু, সে-ই বা কতটুকু দেখেছে? শবু ওদের আদরের মেজ্‌পিস্—এমনি করেই তারা পরিবারের অতীত ইতিহাস জানবে—যা এখন অনেকটা গল্পকথার মত শোনায়।

বন্ধু হীরার সঙ্গে দেখা করে পুরোনো বন্ধুদের খোঁজ খবর নেয়। কারো বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না, সবাই প্রায় বিয়ে থা করে সংসারের অন্দর-মহলে হারিয়ে গেছে। একমাত্র সুনন্দা এখন মস্ত বড় গাইয়ে আর উর্মিলা বিয়ে থা না করে কটকে একটি কলেজে প্রফেসারী করছে। দুজনেই নিজের নিজের চরিত্র অনুযায়ী কাজে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে।

বড় কাকীমা শশুর পাঠানো টাকায় খাচ্ছে দাচ্ছে আর না-দেখা-শশুরের ভিটে আগলাচ্ছে। বেকার সঞ্জয় বি এ পাশ করে হাত খরচের টাকার জন্ত মাকে প্রায়ই জলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিচ্ছে। বড়কাকার সেদিনের গভীর অন্তর্বেদনায় না-বলা কথাগুলোই বুঝি বাস্তব রূপ ধরে দেখা দিয়েছে।

দীননাথের পৌঁছা সংবাদ এসেছে। লিখেছে একটন সিমেণ্টের পারমিট পেয়েছে, বাড়ীর কাজ আরম্ভ হবে, শবুর তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। কানাই খবর নিয়ে জানাল সাতদিনের মধ্যে কোন রাতের গাড়ীতে সীট বা বার্থ পাওয়া যাবে না। শেষে ঠিক হয়েছে সকালে দিনের গাড়ীতে রওনা হয়ে খড়্গপুরে গাড়ী বদল করে যেতে হবে। কানাই মেজদিকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে যাবে—জামাই বাবুর সঙ্গেও তার বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার আছে।

যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কাল রওনা হবে, আজ শবু বাবা ও সবাইকে রেঁধে খাওয়াবে—রাঁধুনীর আজ ছুটি। সুক্তো, ডাল, ভাজা, মাছ, ধোকার ডালনা, চাটনি সব পরিপাটি করে রেঁধে বাটিতে সাজিয়ে থালায় ভাত

বেড়ে শবু বাবাকে খেতে দিল।

খেতে খেতে বাবা বললেন—'অনেক দিন বাদে যেন রান্নায় স্বাদ ফিরে এসেছে।'

কাকলী বলল—'বাবা আজকের সব রান্না মেজদির।'

বাবা বললেন—'রাঁধুনীর হাতে রান্না খেয়ে খেয়ে বাড়ীর রান্নার স্বাদ প্রায় ভুলেই যাচ্ছি।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'রান্না ভাল হয়েছে, বাবা?'

বাবা জল খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন—'আজ বোধ হয় খাওয়াটা বেশীই হয়ে গেল।'

শবুর মন আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরে গেল, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারল না, রান্নাগুলো মায়ের রান্নার মত হয়েছে কি না। বাবাও মুখে সে কথা বললেন না। এ সব কথা বলার নয়—অনুভবের।

শেষে রওনার দিনটিতে শবুর ভীষণই কান্না পাচ্ছে। দাদু কত্তামা ঠাকুমা মা বড়কাকা ভাবু নন্দু প্রত্যেকের কথা শবুর মনে পড়ছে। তাদের কারো সঙ্গে আর দেখা হবে না। আজন্মের কত স্মৃতিঘেরা সকলের স্পর্শধন্য এই শহরে আবার কবে ফিরে আসবে সে জানেনা। সব অতীতের স্মৃতি-স্তম্ভ, স্নেহের খনি বাবা এখনো আছেন, কিন্তু তিনিও প্রায় জরাজীর্ণ। সেই কত বছর আগে সংসারের দুর্দিনে নিজের অধ্যবসায়ে বাতজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করে সংসারটাকে একটু একটু করে দাঁড় করিয়েছিলেন। এখন এই বয়সেও চেষ্টায় আছেন লোকের হাঁপানীর কষ্ট নিরাময়ের মত কোন ওষুধ তৈরী করা যায় কিনা। অথচ তিনি নিজে বাত ও ঠাণ্ডা লাগার নানা উপসর্গে ভোগেন।

চিরকালের কর্মঠ এখন প্রায় অচল এই বাবাকে ফেলে শবুকে চলে যেতে হচ্ছে, কালের গতিতে আবার কবে দেখা হবে, আদৌ দেখা হবে কিনা—ভাবতে ভাবতে চোখে নামে জলের ধারা। মা-হারা পৃথিবীতে শবুর বেঁচে থাকা যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি শবুতে বাবাতে চিরবিচ্ছেদও অকল্পনীয়। শবু তার মাকে যাবার আগে দেখতে পায় নি—শবুর জীবনের আদর্শ বাবাকেও কি সে শেষ দেখা দেখতে পাবে না? সে যে ছিল বাবা-মার সব চেয়ে আদরের সন্তান।

বাবাকে প্রণাম করে সবাইকে আদর করে শবু কানাইয়ের সঙ্গে রিক্সায় উঠে বসল। বাবা বললেন—

'তোরা সব সাবধানে যাস, খড়্গাপুরে নাকি গাড়ী বদল করতে হবে, এমন ত কখনো হয়নি।'

শবু বলল—'তুমি ভেবোনা বাবা, কানাই ত সঙ্গে আছে।'

চলতি রিক্সায় বসে পিছন ফিরে তাকিয়ে শবু দেখতে পাচ্ছে সেই পরিচিত দৃশ্য। গেটের কাছে মিঠি দিঠি মিষ্টিকে নিয়ে কাকলী দাঁড়িয়ে আছে আর বাবা দাদুর সেই ছড়িখানি হাতে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন সকালের ডাক্তারখানায় উদ্দেশ্যে—বারবারই তিনি শবুদের দিকে মুখ তুলে চাইছেন। একটু পরে বাবা চোখের আড়াল হয়ে গেলেন আর এক পাশে নজরে পড়ল সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশি। শবুর দু চোখ বেয়ে নামল আবার জলের ধারা—যার স্বাদ সমুদ্রের জলের মতই লবণাক্ত।

কানাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—'তুই যেন আজ বড় বেশী কাঁদছিস মেজদি!'

শবু জবাব দিতে পারল না, একটা অমঙ্গল-আশঙ্কা তার বুকে ভর করে আছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি বাবার সঙ্গে তার শেষ দেখা—অনেক কথা মন ডেকে বলে, কেন বলে বোঝা যায় না। আজকাল তার যেন কি হয়েছে, মঙ্গলা দেবীর যাগ-যজ্ঞের পর থেকে যেন কেমন এক অমঙ্গলের আভাস বারবার তার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

না, শবুর এত কাঁদা উচিৎ নয়। সত্যিই ত কিছু হয়নি, বাবাকে মোটামুটি সচল সুস্থ দেখেই সে রওনা হয়েছে, এ অবস্থায় কাঁদাটাই ত অমঙ্গলের।

তিন

অমঙ্গল যেন শবুকে তাড়া করে ফিরছে। একটি মাসও তাকে সুস্থির বা নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেনা।

পূজোর মধ্যে মন্দির শহরে যাবার আগে দেখে গিয়েছিল ফিরে এসেও দেখতে পেল বাড়ীর ছোট্ট শিউলি গাছটিতে দু চারটি করে ফুল ফুটে সকালে ঝরে পড়ছে। শবু কানাইকে ডেকে দেখাল—

'দেখ কানাই, কতটুকু গাছে ফুল ধরেছে। শিউলি ফুল আমার খুব পছন্দ।'

দীননাথ বলল—'মামীমা দুদিন আগে চলে গেছে। দুলু দক্ষিণ ভারত

থেকে কেনা একটা বেত কভায় দিয়ে গেছে। মামীমার কাছে শুনলাম আমরা না থাকতে শোভাদের বাড়ীর লোকেরা নাকি নারকেল গাছটার অনেক ডাল কেটে দিয়েছে। এক ধার থেকে এত ডাল কাটলে গাছ বাঁচবে কি করে?'

বাড়ীতে কি কি কাজ হবে সে বলল। নেড়া ছাদে রেলিং হবে, নতুন দুটো ঘরের জলছাদ হবে, স্টোররুম একটু বড় করা হবে, উঠোন পাকা করা হবে আর কলতলাটা উঁচু করা হবে। এক টন সিমেণ্ট পাওয়া গেছে, আর একটনেরও আশা আছে।

শবু বলল—'যাই কর আর তাই কর বাথরুমের উপরটা অবশ্যই ঢাকা দরকার।'

কানাই সব কাজের ব্যাপার জেনে নিয়ে নিজের কাজের কথা পাড়ল। ঠিক হল ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার নয়, ন'হাজার টাকা তুলে কানাইকে দেওয়া হবে। শবু ব্যাঙ্কে গিয়ে দীননাথের সঙ্গে কাগজ পত্র সই করে দিয়ে এল, যেমন দিয়েছিল মহীকে টাকা ধার দেবার বেলায়। কিন্তু টাকা পেতে নাকি দিন দশেক সময় লাগবে।

কানাই বলল—'আমি ততদিন থাকতে পারব না। রাথহরিবাবুর ছেলে রতন আমার কণ্ট্রাক্টর, সে পরে এসে টাকার চেকটা নিয়ে যাবে।'

কানাই শবুকে নিয়ে দু দিন ধরে ষষ্ঠীতলা ও তপুদের বাড়ীতে দেখা করে এল। যাতায়াতের পথে সে কানাইকে দিয়ে ডিজাইন পছন্দ করিয়ে ঢাকা জুয়েলারীতে পুরোনো হার ভেঙে একটি নতুন হার গড়াতে দিল।

ফিরে যাবার আগে কানাই বলল—'মেজদি, সেবার পুজোর আগ দিয়ে এসে প্লেনের টিকিট কাটতে হল বলে তোকে পুজোর শাড়ী দিতে পারিনি। এই দেড়শ টাকা রাখ শাড়ী কিনে নিস। তপুকে দুশ দিয়ে এসেছি, আর এই দুশ টাকা রাখ, বড়দিকে দিস। আর ছোড়দিদের এখানে না আনার কথা যা বলেছি মনে রাখিস কিন্তু।'

শবু বলল—'মনে আছে, তবু তোর জামাইবাবুকে বল।'

কানাই বলল—'জামাইবাবু, ছোড়দিদের নিয়ে এসে যেন সাধ করে অশান্তি ডেকে আনবেন না।'

দীননাথও শবুর মত দোটানায় পড়েছে, বলল—'দেখি কি হয়।'

কানাই চলে গেল। কানাইয়ের কথায় শবুরা মিতুদের কথা আপাতত মন থেকে বাদ দিতে চাইছে।

শবু বলল—'কানাই টাকা দিয়ে গেল, আমাকে শাড়ী কিনে দেবে কবে?'

দীননাথ বলল—'মিতুদের কথা, শাড়ী কেনার কথা আমার এখন ভাবার সময় নেই, কাল থেকে বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগবে। পরে তোমাকে শাড়ী কিনে দেব।'

শাড়ী কেনার কথা তুলে রাখা গেলেও মিতুদের আসা ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। কার্ত্তিক মাস শেষ না হতেই মিতুর চিঠি এল—সে জিনিষ পত্তর বেঁধে ছেঁদে বসে আছে, কবে মেজদিরা তাদের আনার ব্যবস্থা করছে?

একরকম নিরুপায় হয়েই পুটুর শরণাপন্ন হতে হল। সে বেচারামের কাজে মন্দির শহরে যাচ্ছিল, তার হাতে টাকা ও বাবা আর কানাইকে আলাদা চিঠি দিয়ে মিতুকে এক ছেলেসহ পুটুর সঙ্গে পাঠাতে বলা হল। শবু ভাবছে—অশান্তি যাই হোক বাবার মনে ত শান্তি আসবে।

পয়লা অঘ্রানেই যখন সারাদিন ধরে বাড়ীতে জলছাদ পিটাইয়ের কাজ পুরোদমে চলছে—পুটুর সঙ্গে মোটঘাট নিয়ে সাতসকালে এসে গেল মিতু ও সন্তু—এবং সঙ্গে মস্তুও। মিতু একটি অশান্তির বীজ সঙ্গে করেই এনেছে।

তবু বাবার কথা মনে করে শবু সকলকে অভ্যর্থনা জানাল, পুটুকে ধন্য-বাদ দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করল।

দীননাথ এখন খরচের চাপে দিশেহারা। কমাস হল মহী কতগুলো টাকা নিয়ে গেছে, কদিন আগে কানাইয়ের বাড়ীর জন্য ন'হাজার টাকার চেক রতনের হাতে তুলে দিয়েছে। কানাই আবার রতনের সঙ্গে নিজে হাতে আঁকা তার প্ল্যানের বাড়ীর একখানি ছবি পাঠিয়েছে—কি সুন্দর লাল ল্যাটে-রাইট পাথরের চারকামরার বাড়ী হবে, গেটের দুপাশে থাকবে এক জোড়া নারকেল গাছ। কৈলাস ভবনের পাশেই ওদের জমি—শিল্পী কানাইয়ের বাড়ী একদিন শিল্পীর ছবির মতই সেখানে শোভা পাবে।

এ ছাড়া আরো কয়েকশ' টাকা হাতছাড়া হয়েছে। পুরুতঠাকুর তার বাড়ী তৈরীর কাজে ঠেকে গিয়ে দুশ টাকা ধার নিয়ে গেছে। ছোটমামার এক ছেলে গৌর সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে—দেড়শ টাকা ধার নিয়ে গেছে। সুবীর বাবু প্রোমোশন পেয়ে দিল্লী বদলি হয়ে গেছে—যাবার আগে ছেলে খোকার হাতে চিঠি পাঠিয়ে পাঁচশ টাকা নিয়ে গেছে। সে টাকা সত্যি সুবীরের হাতে পড়ল কিনা, কবে ফেরৎ দেবে কিছুই জানা গেল না। চিঠিতে শুধু এক লাইন লেখা আছে—জানুয়ারীর শেষে এসে দেখা করব।

এই রকম দানছত্র খোলাতে শবু একদিন দীননাথকে বলেছিল—'তুমি যে

এভাবে সবাইকে টাকা পয়সা বিলোচ্ছ, নিজেদের বিপদ আপদ বলে ত কিছু ভাবতে হয়।'

দীননাথ বলেছে—'দরকারে চাইছে, 'না' বলি কি করে? তা ধর কানাইকেও ত দরকারে দিয়েছি।'

ঐ একটি কথায় শবু অভিমানে ফুলে ফুলে কেঁদেছে। শেষে অনেক চেষ্টা করে দীননাথ তার মান ভাঙিয়েছে, বলেছে—

'কানাই আমাদের কত আপন, আমাদের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই আমরা সে বিপদ পার হতে পেরেছি।'

শবু চোখের জল মুছে বলেছে—'মনে থাকে যেন, কানাইকে নিয়ে কোন কথা বল্‌বে না, কারো সঙ্গে তুলনা করবে না।'

দীননাথ সে কথা মেনে নিয়েছে। তার মান ভাঙাতে চোখের ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে প্রায় ষাট টাকা দিয়ে চশমার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিছুদিন হল শবু পড়াশুনা করতে বেশ অসুবিধে বোধ করছিল।

এরই মধ্যে ছোটমামার মেয়ে শীলা দুমাইল দূর থেকে ক'বার হাঁটাহাঁটি শুরু করেছিল—তার মেয়ের বিয়ে, জামাইবাবুর কাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা। শবু সোজা তাকে বলে দিয়েছে—

'তোর জামাইবাবুর কাছে এখন অত টাকা নেই, সামনে আবার বাড়ীর পিছনে অনেক খরচ আছে। তুই তোর ভাইদেরকে বল।' শীলা এখন ভাইদের পিছনে ঘুরছে।

মাঝখানে প্রতিবেশিনী বাঙাল বৌ শবুর সঙ্গে বসে পান খেয়ে গল্প করে কুড়িটা টাকা ধার নিয়ে গেছে। সে কথা শুনে দীননাথ ঠাট্টা করেছে—

'গেছে কুড়িটা টাকা।'

শবুও বলেছে—'যাক। তোমাদের নেতার এক বন্ধু যে কমাস আগে তোমার কাছ থেকে দশ টাকা কাল দেব বলে নিয়ে গেছে, ফেরৎ দিয়েছে?'

আর এখন বাড়ীর কাজ আরম্ভ হয়ে থেকে দীননাথের রোজ দেড়শ দুশ টাকা লেগে যাচ্ছে মিস্ত্রী মজুর টুকিটাকি মাল মশলা কিনতে, বড় খরচ চুন সুরকি ইট সিমেন্ট ত আলাদা।

এই অবস্থার মধ্যেই এসে পড়েছে মিতুয়া, দৈনিক সংসার চালাবার খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

দুদিন শান্তিতে কাটার পরই শুরু হল অশান্তি। সকাল থেকে ছাদ-

পিটানী মজুরনীর দল কাজে এসেছে। সর্দারনী গানের সুর ধরেছে আর মজুরনীর দল সেই সুরে সুর মিলিয়ে এক তালে ছাদ পিটছে। শুনতে বেশ মজা লাগছে। তারই মধ্যে কাজের জায়গায় দুভাই নাচানাচি করতে গিয়ে সন্তু পড়ে গিয়ে চুন সুরকির গাদে মাখামাখি হয়ে দীননাথের কাছে ধমক খেল আর এদিকে মিতুর মুখখানা অন্ধকার হল।

এক সকালে জলখাবারের রুটি সেঁকতে সেঁকতে শবু জিজ্ঞেস করল—'মিতু সন্তু কবে ফিরে যাবে? সামনে ওর পরীক্ষা, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।'

মিতু রুটি বেলা বন্ধ রেখে বলল—'সন্তু ত যাবে না, আমার কাছেই থাকবে। তোরা বলেছিলি বটে, বাবাও বলেছিল—কিন্তু আমরা তিনজনে আলোচনা করে ঠিক করলাম আমরা এক সঙ্গেই থাকব। সন্তু বলেছে—মা, দাদাভাইকে সঙ্গে নিয়ে চল, তাতে ভাল হবে। ওর খুব বুদ্ধি।'

শবু অবাক হয়ে বলল—'সে কিরে মিতু, তোরা ঐটুকু এক শিশুর বুদ্ধিতে এমন কাজ করলি? বাবা আমরা সবাই মিলে যা বললাম তা শুনলি না? ছেলেটা ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হবে।'

মিতু জেদীর মত বলল—'আমিও কিছু লেখাপড়া শিখেছি, ভালমন্দ বুঝি। একটা ছেলেকে খেতে পরতে পড়াতে পারবি না বলে দিলেই হত—তবে আমাদের এখানে নিয়ে এলি কেন? দে, আমাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দে।'

মা ঠিক কথাই বলত, মিতু সব কথাতেই উল্টো বুঝলি রাম। এখন শবু বুঝতে পারছে দুধকলা দেখিয়ে কি কাল সাপই ঘরে এনে তুলেছে। আর কথা না বাড়িয়ে সে চুপ করে গেল।

সন্তুকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করে ফিরতে শবু দীননাথকে বলল—'মিতু বলছে সন্তু নাকি এখানেই পড়াশুনা করবে, ওকেও স্কুলে ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা কর।'

দীননাথ বলল—'সে কি কথা! ওখানকার ক্লাশ টেনের ছেলে, এখানে বোর্ড, সিলেবাস সব আলাদা। দেখি দু তিনটে স্কুলের পরিচিত হেডমাষ্টার আর সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে।'

খোঁজ খবর করে দুদিন পরে দীননাথ জানাল—'এ ছেলেকে হয়ত ক্লাশ নাইনের উপরে নেবেনা। বাবাকে লিখে দাও ওর টি. সি. ও মার্কশীট পাঠাতে।'

চিঠি চলে গেল। কিছুদিনের মত শান্তি।

অঘ্রানের শুরুতে শুভদিনে শীলার মেয়ে শিখার বিয়ে হয়ে গেছে। মিতুদের

নিয়ে শবুরা সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। নগদ টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও মেয়েকে নতুন সিল্কের শাড়ী দিয়ে আশীর্বাদ করেছে। অর্থের টানাটানিতে ইচ্ছে থাকলেও আর কিছু করা সম্ভব হয়নি।

সামনে বারোই অঘ্রান—শবুদের বিবাহ বার্ষিকী। কদিন আগে ছোটকাকা কাকীমা বেলা এসেছিল—মিতুরা এসেছে, দেখা করতে।

সে সময় বেলা বলেছিল—'মেজদি, কদিন পরেই ত তোদের বিবাহবার্ষিকী আর পরের বছর ত সিলভার জুবিলি এনিভার্সারী হবে। পাশের বাড়ীর শান্তি বৌদিরও তোদের মত ঐ বছরই বিয়ে হয়েছিল—আসছে বছর তারা নাকি বিশেষ অনুষ্ঠান করবে। তোরা কী করবি?'

শবু ক্লিষ্ট হেসে বলেছে—'বাড়ীতে যে বার্ষিকী শুরু হয়েছে তাই কতদূর গড়ায় দেখ।'

কাকা কাকীমা মিতুদের সব দিক মানিয়ে চলতে বলে গেলেন।

আজ সেই বিবাহ বার্ষিকী। মিতু দু ছেলেকে নিয়ে শীলাদের বাড়ী গেছে, অষ্টমঙ্গলার পর শিখার ফেরার কথা আছে, তাকে দেখতে। শবু যায় নি। আজ বিশেষ দিন, দীননাথ অফিস থেকে ফিরবে।··

দীননাথ ফিরে শবুকে একা পেয়ে খুশি হয়ে বলল—'শুভ বিবাহ'।

'স্বাগতম্'—শবুও সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এটা ওদের প্রতিবছর বিবাহ-বার্ষিকীর প্রিয় সম্ভাষণ।

বেশ শীত শীত পড়েছে। দীননাথ কলতলা থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে টিভি খুলে বসল। শবু দীননাথের হাতে জলখাবারের প্লেট তুলে দিয়ে পাশের চেয়ারে বসল। দুজনে বসে টিভি দেখছে আর মাঝে মাঝে অতীত দিনের কথা বলছে।

একটু পরে কলতলার লোহার গেটে একটা ছোট্ট আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমে ঠিক খেয়াল না করে কিছু পরে দুজনেই বাইরে বেরিয়ে দেখল—কলতলা যাবার গেটটা আধখোলা, রান্না ঘর ও অন্য ঘরে জিনিষপত্র ঠিক আছে। গেট বন্ধ করে দুজনে আবার ঘরে এসে বসল—বোধহয় কুকুর টুকুর এসে থাকবে। দীননাথ হয়ত কলতলার গেট বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল।

মিতুরা বাড়ী ফিরতে মন্তু পায়খানায় যাবে বলে জল নিতে গিয়ে বলে উঠল—'মাসী, গাড়ু কই?'

গাড়ুটা খুঁজেই পাওয়া গেল না। সেটা ছিল শবুদের বিয়ের গাড়ু—আর ঠিক বিবাহ বার্ষিকীর সন্ধ্যায় একটু অসাবধানতায় চুরি হয়ে গেল ঠিক সেই

সময় চব্বিশ বছর আগে যখন ঐ গাড়ুর উপরে হাতে হাত রেখে দুটি মন প্রাণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এক সূত্রে গাঁথা হচ্ছিল।

এক গভীর অমঙ্গলের আশঙ্কায় শবুর বুকের কাঁপুনি হাতে পায়েও সংক্রামিত হচ্ছে। সেই নববর্ষের মুখেই ভবরা এল আর তখনই শবুর মনে হয়েছিল এ বছরটা তাদের কিছুতেই ভাল যাবে না। তারপর থেকে একের পর এক অমঙ্গলের ঘটনা ঘটে চলেছে। শুভদিনে তৈরী দু'হাঁড়ি কাসুন্দি নষ্ট হয়ে গেল, ভবর ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়ে শবুর নতুন শাড়ী পথের পাশের লোহার রডে বেধে অনেকটা ছিঁড়ে গেল, মীরারা ভাদ্র মাসে বাড়ী থেকে উঠে গেল, মঙ্গলা দেবী এসে বাড়ীতে যাগ যজ্ঞ কি সব করে গেলেন, পুরো নবমীর দিন পুজো আরতি দেখা অঞ্জলি দেয়া কিছুই হল না। আর সব শেষে মিতুরা আসার পরই বিবাহ বার্ষিকীর সন্ধ্যায় শবুদের বিয়ের গাড়ু চুরি হয়ে গেল!

শবুর অনুরোধে আজ রাতটা আলাদা বিছানায় না শুয়ে দুজনে এক বিছানায় শুয়েছে। শোবার আগে যথারীতি শবু দীননাথকে প্রণাম করেছে, দীননাথও শবুকে আশীর্বাদ ও আদর করেছে। এখন দীননাথের বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে শবু ভাবছে—এত বড় এক অমঙ্গলের ঘটনা ঘটে গেল, এর শেষ কোথায়, পরিণতিই বা কি?

চার

মিতুদের ব্যাপার দিনে দিনে জটিল হয়ে উঠছে। মাঝখানে তপু এসে ঘুরে গেল। সে-ও সাবধান করে দিয়ে গেল—

'বাবা মনে শান্তি পাবে বলে ছোড়দিদের এনে রেখেছিস ভাল কথা। কিন্তু খুব সাবধান মেজদি, ও যে কি নিয়ে অশান্তি পাকাবে কেউ বলতে পারে না। বিয়ের পর স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে যখন ছিল তখন ক'বছর ওকে নিয়ে ঘর করেছি ত, আমি ওকে চিনি। মা ওর জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরেছে।'

শুধু বাড়ীতে নয়, পাড়াতেও মিতুদের নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এসব ব্যাপারে মেয়েমানুষরাই সবার আগে কৌতুহলী হয়ে ওঠে—যারা এসেছে তারা কারা, কেন এসেছে, কতদিন থাকবে, ছেলেদের বাবা কোথায়?…

নিকটতম প্রতিবেশিনী হারানী কৌতূহল প্রকাশ করলেও শবু এড়িয়ে যায়। শোভাদের বাড়ীর সবাই বারবার উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু সোজাসুজি কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু পাশের তন্বীদি অন্য ধাতের মেয়েমানুষ তার কৌতূহল সোজা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

'অ শ্রাবণীদি, আপনাদের বাড়ীতে কারা আইছেগো? চেহারায় মনে হয় যানি আপনার বোন হইব?'

'হ্যাঁ আমার বোন—মিতালী।' শবুকে বলতে হয়।

'সঙ্গের ছেলেদুটি বুঝি মিতালীদির (তন্বীর ছোট সাজার স্বভাব মাত্রাতিরিক্ত)?' 'ছেলেদের বাবা কোথায় থাকে?' 'কতদিন এখানে থাকব?' তন্বীর মুখ দিয়ে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটে।

শবুকে অনেক রেখে ঢেকে বলতে হয়। হাজার হোক নিজের বোন, স্বামীর সঙ্গে থাকে না সে কথা ত বলা যায় না—'ভগ্নীপতির বদলির চাকরি, এবার অনেক দূরে বদলি করে দিয়েছে। কোথায়? রাজস্থানে (কিছুদিন আগে শবুরা রাজস্থান বেড়াতে গেছিল— তাই ঐ নামটাই মনে এসে যায়)। ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধের জন্য আপাততঃ এখানে পাঠিয়েছে। পরে ভাল জায়গায় বদলি হলে এসে নিয়ে যাবে।'

মাসীমা (তন্বীর শাশুড়ী) পরের সংসার নিয়ে মাথা গলান না, তিনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি জানতে চাইলে শবু এমন বানানো কথা বলতে পারত না। মাসীমাকে তাঁর শুদ্ধ সরল ও কোমল ব্যবহারের জন্য শবু নিজের মার মত শ্রদ্ধা করে—সেখানে মিথ্যা বলা অসম্ভব।

তন্বীও কতটা তার কথা বিশ্বাস করে বোঝা যায় না। শবু আবার গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। বললেও তুচ্ছ বিবেক-দংশনে মনে মনে বিব্রত হতে হয়। এদিকে মিতুকে নিয়েও ভয়—সে যদি কারো কাছে সত্যি কথাটা বলে দেয়—যে ত একরোখা মেয়ে! কি কথায় কি কথা বলে ফেলে, কি নিয়ে যে অশান্তি বাধাবে কেউ জানে না।

সেই অশান্তির একটা সুযোগ ঘটে গেল। রেজিস্ট্রী ডাকে মন্তুর টি সি ও মার্কশীট এসেছে, তার সঙ্গে বাবার একখানি চিঠি। বাবা লিখেছেন— এই ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে না মাতৃকুল নাশ করবে বুঝতে পারছি না। হাফ ইয়ারলী পরীক্ষায় সব বিষয়ে ফেল। এখন তোমাদের চেষ্টায় যদি সে উৎরে যেতে পারে তবে তার মায়ের দুঃখ কষ্ট কিছু লাঘব হয়।

মার্কশীট দেখে ত শবুর মাথা ঘুরে গেল। কোন বিষয়ে পাঁচ দশের বেশী নম্বর পায় নি, শুধু সংস্কৃতে কানের কাছ দিয়ে পাশ। অফিস থেকে ফিরে সব দেখে দীননাথও গুম মেরে বসে ভাবছে।

মিতুরা বাড়ী ছিলনা—শীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেছে খেয়ে উঠেই। একটু রাত করে সবাই ফিরল—মন্তু মনের আনন্দে হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ীতে ঢুকল। দীননাথ সিনেমার হিন্দী গান শুনলে রেগে যায় গাইতে বারণও করেছে। গত শনিবার রাতে বলে রেখেছিল, পরদিন সকালে নাপিত ডেকে দুভাইয়ের চুল ছাঁটিয়ে দেবে। নাপিত এসে সন্তুর চুল ছাঁটল, কিন্তু বড়ভাই মন্তুকে তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। মিতুও বলল না সে কোথায় গেছে। নাপিত চলে যাবার অনেক পরে মন্তু এলে দেখা গেল সে সেলুন থেকে রীতিমত উত্তম-ছাঁট দিয়ে এসেছে। তাতেও দীননাথ প্রচণ্ড রেগে আছে—নিশ্চয় মিতুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সেলুনে গেছে অথচ মিতু তা বলেনি।

মিতুর দল বাড়ীতে ঢুকতে দীননাথ গম্ভীরভাবে বলল—

'মন্তুর টিসি আর মার্কশীট এসেছে।'

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত মা বেটা গুটিয়ে গেল। মার্কশীটটা হাতে করে তিন মা ছেলেতে নিজেদের ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ গুজগুজ ফিসফাস, চাপা তর্কাতর্কির পর মিতু পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বলতে লাগল—

'এ মার্কশীট ভুল।··পরীক্ষার আগে অসুখ করেছিল বলে মন্তু একমাস স্কুলে যেতে পারেনি।·মন্তুর পড়ার বইখাতা ছিল না।···মাস্টাররা শত্রুতা করে ওকে কম নম্বর দিয়েছে,।·যাতায়াতের ভাড়া দিলে মন্তু গিয়ে সঠিক মার্কশীট এনে দেবে।'

বেশ বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথা বানানো আর মিথ্যা।

দীননাথ বলল—'টাকা পয়সা খরচ করে গিয়ে ছেলে পাঁচের পিঠে শূন্য বসিয়ে পঞ্চাশ করে আনবে? আমি ও সব জালিয়াতির মধ্যে নেই। এই মার্কশীট নিয়েই স্কুলের দরজায় দরজায় ঘুরব। তারা এমন রত্নকে ক্লাশ সেভেন না এইটে নেবে দেখি।'

সন্তু ও মন্তু রাতে খেলেও মিতু শরীর খারাপ বলে না খেয়ে শুয়ে পড়ল। শবু তাকে সাধতে যায় নি। শুধু ভাবছে—মিতু মা হয়ে ছেলের দোষ আড়াল করছে! কানাই প্রত্যেক বছর ওদের ক্লাশের সব বই কিনে দেয়—বই ছিলনা কথাটা একেবারেই নির্লজ্জ মিথ্যা।

দীননাথ খোঁজ খবর করে জানাল—'একটি স্কুল থেকে বলেছে সাতদিন পরে ছেলের পরীক্ষা নিয়ে জানাবে ক্লাশ এইটে নেবে, না নাইনে। অন্য এক স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বার্তা বলছি। এ সাতদিন ইংরেজী অঙ্কটা ভাল করে ঝালিয়ে নিক।'

মনে হচ্ছে যেন দু ভাই খুব পড়াশুনা করছে। দীননাথ যতটা সম্ভব দেখা শোনা করছে। আর পড়াশুনার দৌলতে শোবার ঘরে টিভির উপরে রাখা এত বছরের টাইমপিস্ ঘড়িটি চুরি হয়ে গেল। মন্তু সন্তু সকাল বেলা বাইরের ঘরের দরজা জানালা খুলে বসে পড়ছে, দীননাথ গেছে বাজারে। শবু রুটি তৈরী করে ডাকল—'মন্তু সন্তু, জলখাবার নিয়ে যাও।'

সন্তু এসে খেতে বসে গেল, মন্তু কলতলায় গিয়ে বসল দাঁত মাজতে। কিছু পরে বাজার থেকে ফিরে দীননাথ ঘড়ি দেখতে গিয়ে বলে উঠল—

'আরে, ঘড়ি গেল কোথায়? এদিকে বাইরের ঘরের দরজা গেট সব খোলা, ঘরে কেউ নেই।'

কিছুদিন হল মাসখানেকের জন্য সন্ধ্যা দিদির বাড়ী বেড়াতে গেছে বলে নতুন ঝি কাজ করছে, বাড়ীতে মিস্ত্রী মজুর খাটছে—কে ঘড়ি চুরি করল বোঝা গেলনা। দীননাথ রাগারাগি করতে লাগল। মিতু আড়ালে মন্তব্য করল—

'ভারি ত একটা পুরোনো ঘড়ি!'

পরদিনই অফিস ফেরৎ দীননাথ একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে ঠিক আগের মত একটি ঘড়ি কিনে আনল। আগেরটার দাম ছিল পঞ্চান্ন টাকা, শবুর মনে আছে। তার চাইতে বড় কথা ঐ ঘড়ির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মা পদ্মিনী-দেবীর স্মৃতি। প্রথমবার অসুস্থ মাকে পাটনায় নিয়ে গেলে তাঁকে সময়মত ওষুধ পথ্য দেবার জন্য সেটি কেনা হয়েছিল। সে স্মৃতিটুকু আর রইল না।

আজ শুক্রবার, মন্তুর আজ পরীক্ষা। ঘড়ি হারিয়ে যাবার পর থেকে ওদের বাইরের ঘরে পড়া বন্ধ, নিজেদের ঘরে বসেই লেখা পড়া করে।

মিতু আবার সন্তোষী মায়ের ব্রত করে। প্রত্যেক শুক্রবারে তার জন্য গুড় ছোলা আর সব কি কি বাজার থেকে আনতে হয়। দীননাথ এই জিনিষ-টাকে খুবই অপছন্দ করে, বলে—সিনেমার ঠাকুর, আগে কোনদিন নামও শুনিনি, কি একটা সিনেমা হল আর চারদিকে হুজুগ উঠল।

ষ্টোরুকম বড় করে তার মেঝে হয়ে যেতে মিতু একদিন বলেছিল—

'জামাইবাবু, আমি ও ঘরটাতে সন্তোষী মায়ের আসন পাতব ?'

বিরক্ত দীননাথ শুধু জবাব দিয়েছিল—'না, ও ঘরের অন্য কাজ আছে, তোমাদের ঘরে শেল্‌ফ করে দিয়েছি সেখানে যার ইচ্ছে আসন পাত।'

শবু মিতুর ধৃষ্টতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। কথাটা শবুকে না বলে সোজা জামাইবাবুর কাছে বলতে গেছে।

আজ আবার সেই সন্তোষী মায়ের পুজোর দিন। দীননাথ বাজার করে ফিরল, সঙ্গে বরাদ্দমত পুজোর জিনিষও। ওদিকে পড়ার বই খাতা সামনে খুলে রেখে মন্তু আর মিতু মুখোমুখি বসে গল্প করছে। দীননাথকে আসতে দেখে মিতু একটু সরে গেল। মিস্ত্রীদের কাজ বুঝিয়ে দীননাথ এসে দেখল আবার দুজনে গল্প করছে। দু তিন বার দেখে দীননাথ এগিয়ে গিয়ে মিতুকে বলল—

'আজ ওর পরীক্ষা, তুমি গল্প করে পড়া নষ্ট করছ কেন ?'

মিতু বলল—'আমি ওকে পড়া বোঝাচ্ছি।'

দীননাথ বলল—'সেজন্য আমি আছি। ও করছে অঙ্ক, তাতে হেসে গল্প করে কি বোঝাবার থাকতে পারে ? আর কোন কাজ না থাকে রান্না ঘরে গিয়ে মেজদিকে সাহায্যও ত করতে পার।'

মিতু দুম দুম করে পা ফেলে এসে শবুকে বলল—'দে দেখি কি কাজ আছে, ভারি ত কাজ।'

শবু শাকের আঁটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল—'এগুলো একটু কুটে বেছে দে, বেগুনটাও কেটে দিস। আমি আবার কড়াইতে মাছ ছেড়েছি।'

মিতু প্রথমে বেগুন কাটতে কাটতে বলল—

'এ কজনের রান্নায় কজন লোক লাগে, আমাকে ছেড়ে দে আমি একাই পারি। বাড়ীতে ঝি-ই বা রেখেছিস কেন, সে কাজও আমাকে দিতে পারিস। মন্দির শহরে বাপের বাড়ীতে কত বছর আমি গুষ্টির রান্না করেছি। কাকলী ত কিছুই করত না খালি খেত, নিজের মেয়ে দুটিকে খাওয়াত। মন্তু সন্তু পাত কুড়োনি খেয়ে থাকত। মা কেবল পান খেত আর শুয়ে বসে গল্প করত। যা, তুই গিয়ে পান খা আর শুয়ে থাক—দেখ এখানেও আমি গুষ্টির পিণ্ডি সেদ্ধ করতে পারি কি না।'

মেয়েমানুষের নিজের সংসারে আঁচলে চাবির গোছা আর হাতে যদি হেঁসেল না-ই থাকল তবে তার কি রইল ? তাই কাজ কম হোক বেশী হোক শবু হেঁসেল ছাড়েনি। কিন্তু মিতু কি কথা বলল ? পিণ্ডি সেদ্ধ করবে—

কার পিণ্ডি সেদ্ধ করবে ? শবু আর দীননাথের কি ? শবু পান খায় তারও খোঁটা দিল ! সব থেকে বড় কথা মাকে শুয়ে বসে থাকার অপবাদ দিল যে মা অসুস্থ শরীরেও কত কাজ করত। এক বছর ধরে সন্তকে টানতে টানতে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

শবুর জীবনে প্রথম ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, মিতুর হাত থেকে শাকের আঁটি ছিনিয়ে নিয়ে বলল—

'যা, তোকে কিছু করতে হবে না, কারো পিণ্ডিও সেদ্ধ করতে হবে না। আমিও একা অনেক লোকের রান্না করতে পারি, কিন্তু কারো পিণ্ডি সেদ্ধ করা শিখিনি।'

মিতু বিড় বিড় করতে করতে উঠে গেল। দীননাথ এসে শবুকে জিজ্ঞেস করল—

'কি হল, গোসাঘরে খিল পড়ল মনে হচ্ছে যেন ?'

শবু কিছু বলতে পারল না—রাগে দুঃখে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দীননাথের সঙ্গে গিয়ে মন্তু পরীক্ষা দিয়ে এল। ফিরে এসে দীননাথ বলল—

'ওর পরীক্ষার ফল ও মার্কশীট দেখে হেডমাস্টার বলেছে জানুয়ারীতে ক্লাশ এইটে ভর্ত্তি করে নিতে পারে, সেভেনে হলেই ভাল হয়। অন্য স্কুলের সেক্রেটারী কি বলে কদিন পরে জানা যাবে।

দুপুরে শবু মন্তু সন্তু দীননাথকে খাইয়ে দিয়ে নিজেদের ভাত বেড়ে ডাকল—

'মিতু খাবি আয় !'

মিতু খেতে এল না. মন্তু এসে বলল—'মার সন্তোষী পুজো, আজ ত খাবে না।'

শবু সন্তোষী পুজোর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল—মিতুর ভাত তুলে রেখে নিজে খেয়ে নিল।

পরদিন থেকে মিতু আর ঘর থেকে বেরই হচ্ছে না, খেতে ডাকলে আসছে না। প্রথমবার ভাত বেড়ে নিজে গিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে শবু বলে এল—

'মিতু খেয়ে নে, খাবার রেখে গেলাম।'

তারপর থেকে মন্তু সন্তুকে দু বেলা খাইয়ে মন্তুর হাত দিয়ে মিতুর খাবার সাজিয়ে পাঠাচ্ছে শবু। পরে খালি এঁটো বাসন রেখে যাচ্ছে ঝি মাজবে বলে।

কদিন পরে দীননাথ খবর আনল—'সেক্রেটারী আমার অনুরোধে ক্লাশ নাইনে নিতে রাজী আছে, তবে আমার মনে হয় অন্য স্কুলটাতে যে এইটে নিতে চাইছে সেইটাই ঠিক হবে।'

মিতু বলল—'ক্লাশ টেনের ছেলে ক্লাশ এইটে ভর্ত্তি হবে ?'

দীননাথ বলল—'বোর্ড, সিলেবাস সব আলাদা—মার্কশীটের যা নম্বর তাতে এইটাই ভাল। কদিন সময় আছে হাতে, তোমরা ভেবে দেখে বল কি করতে চাও।'

পাঁচ

আর বেশীদিন ভাবার অবসর পাওয়া গেল না। শবু মিতুকে বলে বলে হার মেনেছে, শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে—কিন্তু মিতুকে ঘর থেকে বার করতে পারে নি। সব সময় তিন মা ছেলেতে দরজা বন্ধ করে ঘরের বিছানায় গোল হয়ে বসে ফিস ফিস করে কি সব পরামর্শ করে। রাতে যখন তিনমূর্ত্তি ঐ রকম আলোচনা করে দেওয়ালে তাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে কেমন একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দিন সাতেক হল এই অবস্থা চলছে, রোজ দুবেলা মিতুকে ঘরে খাবার পাঠানো হচ্ছে।

সেদিন রান্না ঘরে দু ভাইকে খেতে দিয়ে শবু মন্তুকে বলল—'এখানকার স্কুলের ব্যাপার ত সব দেখলি। তার চাইতে এখনো সময় আছে, তুই মামার কাছে গিয়ে থেকে পরীক্ষাটা অন্তত দিয়ে আয়। ঠিকমত পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় পাশ করে না বেরোলে কি করবি ? মাত্র বছরখানেক মামার কাছে থাকতে পারবি না ?'

মন্তু বলল—'মামী আমাদের দেখতে পারে না।'

শবু বলল—'মামা আছে দাদু আছে, মিঠি দিঠিও তোদের কত ভালবাসে। কটা মাসের জন্য গেলে দোষ কি ? মামী ত তোকে খেয়ে ফেলবে না ?'

'মা বলেছে, ও বাড়ীতে যাওয়া হবে না।'

'তোদের বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না ? বাবা তোদের ভালবাসে না ?'

'বাবা আমাদের ভালবাসেনা। মেরে মেরে শেষ করে দেয়।'

'বাবা যখন, আদরও করবে আবার শাসনও করবে। তাই বলে কি বাবা কারো খারাপ হয় ?'

'মা বলেছে বাবার কাছে আর কখনো যাবে না।'

'বাবার কাছেও যাবি না, মামার কাছেও গিয়ে কটা মাস থাকতে পারবি না, এত রাগ কেন তোদের?'

মন্তু বলল—'জানো মাসী, মা মামা-মামীর নামে আঁইটা বেঁধেছে।'

শবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—'সে আবার কি! আঁইটা কি?'

মন্তু বলল—'সে এক রকমের মানত রাখা, ব্রত—বছরে একবার করে পূজো দিতে হয়। মামা আমাদের তাড়িয়ে দিল ত তাই মা আঁইটা বেঁধেছে মামা-মামীর যেন কোনদিন ছেলে না হয়।'

সন্তু মুখভরা খাবার নিয়ে বলল—'মার আঁইটা তত্যি (সত্যি) হয় যে।'

হায় ভগবান! এ কি ডাইনী সাধনার কথা শুনছে শবু। ভাই-ফোঁটা রাখি-বন্ধনের দেশের মেয়ে হয়ে মিতু ওদের একমাত্র ভাইয়ের এত বড় অমঙ্গল কামনা করে মানত রেখেছে! কি চরিত্রের জন্য কানাই মিতুকে বাড়ীতে থাকতে দেয় নি তা এই ছেলে দুটো না বুঝলেও মিতু নিজে ত জানে। বাড়ীতে থাকতে না দিলেও মিতুদের সংসারের সব দায়—বাড়ী ভাড়া, খাই খরচ, পড়াশুনার খরচ সব ত কানাই-ই দিচ্ছে—তবু বোন হয়ে ভাইয়ের এত বড় অমঙ্গল কামনা সে করেছে! কানাই জানলে ত মেরে ওকে মাটীতে পুঁতেই ফেলবে! এ যে নিজের বাপের বংশকে নির্বংশ করার ব্রত।

এখন যে ওরা তিন জনে সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে শলা পরামর্শ করে—ওরা কি শবুদের নামেও আঁইটা বাঁধছে নাকি? শবুদের বাড়ীতে বসেই কি সর্বনাশের মন্ত্র আওড়াচ্ছে ওরা! ছেলে মেয়েত নেই—তবে কি শবু-দীননাথের মৃত্যু কামনায় আঁইটা বাঁধছে?

শবুর মাথার মধ্যে সব বুঝি ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

রাতে দীননাথ শবুকে বলল—'সাত আট দিন হয়ে গেল হোটেলের মত ঘরে খাবার পাঠাচ্ছ, আর কতদিন এরকম চলবে? এভাবে ত বাস করা যায় না।'

শবু ভাবশূন্য দৃষ্টিতে দীননাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'তবে কি করবে?'

দীননাথ বলল—'ভাবছি একটা বাসা ভাড়া করে ওদের সেখানে পাঠিয়ে দেব।'

যা হয় করুক, শবু আর ভাবতে পারছে না। তবু ত আঁইটা বাঁধার কথা বলাই হয় নি।

পরদিন মিতু ও মন্তুকে ডেকে দীননাথ বলল—'তোমরা এরকম করছ কেন? এভাবে ত এক সঙ্গে বাস করা যায় না।'

মিতু বলল—'মেজদি আমাকে দেখতে পারে না, আমাকে কোন কাজ করতে দেয় না।'

'মেজদির জন্যই তোমরা এ বাড়ীতে এলে আর মেজদি তোমাকে দেখতে পারে না? মিলে মিশে বাড়ীর কাজ করবে, থাকবে—তাতে আবার কাজ করতে দেয়া না দেয়ার কি আছে? তা যদি না পার তবে আমি অন্য বাসা ভাড়া করে দিচ্ছি তোমরা সেখানে গিয়ে থাক।'

মন্তুর চোখে যেন খুশির ঝিলিক খেলে গেল। মিতু দুঃখের ভান করে বলল—

'জামাইবাবু, আগে আপনি কত হাসি খুশি ছিলেন, আমার সঙ্গে কত গল্প করতেন। এখন আমার সঙ্গে আপনিও হেসে কথা বলেন না, মেজদিও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে।'

দীননাথ বলল—'তুমি যখনকার কথা বলছ সেটা আমরা দুই যুগ আগে পেরিয়ে এসেছি। তা ছাড়া মেজদিকে দিয়েই তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সেখানেই যখন মানিয়ে চলতে পারছ না তখন আর এভাবে থাকা চলেনা। তোমাদের আলাদা থাকাই ভাল।' বলে দীননাথ স্নান করতে গেল।

মিতু মন্তু নিজেদের ঘরে গিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

মিতুর কথা শুনে শবু বিস্ময়ে অবাক। মেজদির নামে দোষ দিয়ে সে কি দীননাথের কাছে ভাল সাজতে চায়? দীননাথের সঙ্গে কি সে আলাদা সম্পর্ক পাতাতে চায়? যে নিজের বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি সে কি ওদের সুখের সংসার সহ্য করতে পারছে না? কাকলী ত তবে ঠিকই বলেছিল—এ যে সত্যিই সাধ করে বিষবৃক্ষ ঘরে রোপণ করা।

সন্ধ্যের সময় দীননাথ পুটুকে সঙ্গে করে ফিরল। পুটু মিতুদেরকে বোঝাতে গেল। ততক্ষণে মিতুরা বোধ হয় আলোচনা করে কিছু ঠিক করেছে। মিতু বারবার পুটুকে বলতে লাগল—

'জামাইবাবু আমাদের জন্য বাড়ী ভাড়া করে দেবে বলেছে, তুই আমাদেরকে সেখানেই নিয়ে চল।'

দীননাথ ও পুটু চলে গেল শীলার বাড়ীতে, সেখানে শীলার বর শীতলের সাহায্যে তার দাদা বৌদিদের পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া ঠিক করে এল।

পুটু ষষ্ঠীতলায় যাবার আগে মিতুকে বলে গেল—'কাল দুপুরের পরে এসে তোদের অন্য বাড়ীতে নিয়ে যাব।' মিতুরাও খুশি হয়ে গোছগাছ শুরু করে দিল।

পরদিন যাবার সময়ও মিতু শবুর সঙ্গে একটি কথাও বলল না, প্রায় বিজয়ীর গর্বে মাথা উঁচু করে মালপত্তর নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ওদের পৌঁছে দিয়ে পুটু এসে শবুকে বলল—

'মেজদি, সেবারে ছোড়দিদের নিয়ে আসাতে খুশি হয়ে ধন্যবাদ দিয়েছিলি, এবারে কি দিবি—আশীর্ব্বাদ? কানাইদা আমাকে বারবার বলেছিল, মেজদি-জামাইবাবু যে কি ভুল করছে বুঝতে পারছে না।'

পুটু চলে গেল। শবু এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে মিতুদের এনে রাখতে চেয়ে কি ভুলই করেছিল। সে যে বাবাকে নিশ্চিন্ত করবে ভেবেছিল বাবার মনে শান্তি দিতে চেয়েছিল। এখন সে বাবাকে কি বলবে, বাবাকে মুখ দেখাবে কি করে? শবু কি চেয়েছিল আর কি হল!

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল—আজ ত পৌষ মাসের দশ তারিখ—ভরা পৌষ মাসে ওরা বাড়ী ছেড়ে গেল। এত বড় অমঙ্গলের কথা এ ক'দিনের জ্বালা যন্ত্রণায় একটিবারও মনে আসেনি।

কয়েকদিন পরে কাকীমার সঙ্গে দেখা হতে কাকীমা বললেন, ওদেরকে নিয়ে এসে বিপদের মুখে ফেললি মনে হচ্ছে, মন্দির শহরে দুঃখে কষ্টে যা হোক করে ছিল। এখানে ওরা কি করে চালাবে?

জানা গেল নতুন বাসায় গিয়েই মিতুরা একদিন তিনজনে খুঁজে পেতে ষষ্ঠীতলায় গিয়ে কাকীমার কান ভারি করে এসেছে। দোষের ভাগী হয়েছে যেন শবুই।

তপুর সঙ্গে দেখা হতে সে একবারও শবুকে দোষ দিল না, বরং বলল—

'ছোড়দিকে নিয়ে বাস করা সত্যি অসম্ভব। তুই দুঃখ করিসনা মেজদি, আমি বাবাকে সব বুঝিয়ে চিঠি দেব। ওরা একদিন আমাদের বাড়ীতেও এসেছিল, দশদিনেই নাকি কানের একটা দুল বেচে খেয়েছে। আমি বললাম—ছোড়দি, এখানে থাকলে ত তুই মারা পড়বি, এখানে কে তোকে সেলাইয়ের কাজ দেবে? তোরা মন্দির শহরে ফিরে যা। মনে হয় যেতে রাজী আছে বলেছে জামাইবাবু আমাদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুক।'

শবু বলল—'বাড়ী ভাড়া অগ্রিম দিয়ে একশ টাকা হাতে দিয়ে ওদের নতুন বাসায় পাঠানো হল। ঠিক সাতদিন পরে এসে মস্ত একশ টাকা

চাইল। তোর জামাইবাবু বলল—সাতদিনে একশ টাকা খরচ হলে মাসে ত পাঁচশ টাকা লাগাবে। আমার এত টাকা কোথায়, কানাই ত মাত্র এক দেড়শ টাকা পাঠাবে। বাইরের চাল না কিনে রেশনের চাল নিয়ে যাস কাল এসে, আমি বেশী করে রেশন ধরে রাখব। তারপর থেকে মন্তু আর এলই না।'

তপু বলল—'বেশ বোঝা যাচ্ছে—ওরা ভেবেছে জামাইবাবুর অনেক টাকা আছে, যখনি যাবে একশ' করে টাকা নিয়ে আসবে আর সেই টাকায় ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াবে আর সিনেমা দেখবে। রেশনের চাল ওদের মুখে রুচবে না। যত তাড়াতাড়ি পারিস ওদের পাঠিয়ে দে। মন্তুটাই মনে হয় মাকে চালাচ্ছে।'

শবু বলল—ঠিক বলেছিস। বাড়ীতে মিস্ত্রী মজুর খাটছে. রোজ মুঠো মুঠো টাকা তাদের দিতে দেখেছে তাই ভেবেছে চাইলেই শয়ে শয়ে টাকা পাবে। দেখি, পুটুকে বলে ওদের ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

শবু আগেই বাবা ও কানাইকে সব কথা লিখে জানিয়েছিল। হঠাৎ এক সকালে কানাই এসে উপস্থিত হয়ে বলল—

'মেজদি—জামাইবাবুর নতুন ডিজাইনের ছাদের রেলিং আর তোর অবস্থা দেখতে এলাম। এই নে বাবা তোকে একখানি চিঠি দিয়েছে।'

বাবা লিখেছেন শবুকে—তুমি দুঃখ কোরোনা, মিতু যখন তোমাদের কাছেও থাকতে পারল না তখন কোথাও থাকতে পারবে না—এখন ওরা যেখানে খুশি যাক, জাহান্নমে যাক'আমার আর কোন দুঃখ নাই—মন্তুর মত এমন একটি রত্ন যখন সে পেটে ধরেছে, ওর ভাল কেউ করতে পারবে না।

শবু জিজ্ঞেস করল—'কানাই, বাবা আমার চিঠি পড়ে কি বলল রে?'

কানাই বলল—'বাবা চিঠি পড়ে বলল—মিতু যখন শবুর মত ঠাণ্ডা মেয়ের সঙ্গে দুটো মাসও মানিয়ে চলতে পারল না তখন আর কোথাও তার ঠাঁই হবে না।'

'আর তোর বক্তব্য?' শবু খুঁটিয়ে জানতে চায়।

'তুই আর কথা বলিসনা মেজদি, কত করে আমি বললাম ওদের ট্যাক্‌ল্ করা বড় শক্ত—কথা ত শুনলি না। কি, না, উপকার করব! অপাত্রে উপকার করতে গেলে এই হয়—তোদেরই খাবে আবার তোদেরই বদনাম দেবে। মন্তুটা কি চালু—একবার আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেত,

একবার বাবার কাছ থেকে। সময় সময় সন্তটাকে পাঠাত, যাতে ওর কচি মুখ দেখে মায়ায় পড়ে টাকা দিতে বাধ্য হই। সব দোষ জামাইবাবুর—কি দরকার ছিল আপনার এই উপকার করতে যাবার? এখন হ'ল ত?'

সেদিনের ছোকরা কানাইয়ের তিরস্কারেও দীননাথ মাথা নীচু করে রইল। শবুর ত কিছু বলারই মুখ নেই। আইটা বাঁধার কথাটা সে কানাইয়ের কাছে কোন মুখে উচ্চারণ করবে? প্রসঙ্গ পাল্টাতে শবু জিজ্ঞেস করল—

'কানাই, ওখানে বাড়ীর কাজ আরম্ভ হয়েছে?'

'খুব জোর কাজ হচ্ছে। বাবাও বেশ আগ্রহ নিয়ে খোঁজ খবর করে।' কানাই বাড়ী তৈরির বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল।

কানাই মাত্র দুদিন থেকে কাকীমা ও তপুদের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

আবার পুটুর শরণাপন্ন হতে হল। সাতদিন পরে খরচ খরচা করে পুটুর সাহায্যে মিতুদের হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে তুলে দিলে তবে প্রায় দু মাসের মাথায় মিতু পর্ব শেষ হল।

এই সব মিলে এবারের বিবাহ বার্ষিকী থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সবটাই শবুদের বিস্বাদ হয়ে গেল যেন। পিছনে রেখে গেল আরও একটি গভীর অমঙ্গলের পূর্বাভাষ।



পঞ্চম পর্য্যায়

এক

মিতুরা এসে থেকে গত দু মাসে শবুর প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরপর কয়েকটা অমঙ্গলের সূচনাও নজরে পড়েছে। আপাতত মনে হয়েছিল সেসব বুঝি কেটে গেল, এখন একটু নিরুপদ্রবে কিছুদিন কাটানো যাবে। কিন্তু তা হবার যো নেই।

মিতুরা অন্য বাসায় যাবার পরপরই ভবর আবির্ভাব ঘটেছে। ছোট রান্না ঘর বড় করা হয়েছে দেখেই সে বলল—

'এই ত এই ঘরটাতেই আমি আট টন সিমেণ্ট রেখে কাজ আরম্ভ করতে পারব।'

কাউকে বলার বা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই, যে যার মত ঘর দখল করতে চায়। মিতু সেখানে সন্তোষী মায়ের আসন পাততে চেয়েছিল, ভব চাইছে সিমেণ্ট রাখতে। দীননাথ ভালমানুষ, বলল—

'তা রাখতে পারিস, তবে একসঙ্গে আট টন বোধ হয় ধরবে না।'

ভব বলল—'ঠিক আছে চার টন করে দুবারে আনা যাবে। বুঝলে বৌদি, লোন আর সিমেণ্টের পারমিট দুটোই পেয়ে গেছি, শিগগীরই জোর কাজ আরম্ভ হবে।'

'শুনে কৃতার্থ হলাম'—বলে শবু ভবকে চা খাইয়ে বিদায় করল।

এতদিন শুধু মিতুদের ঝামেলাই ছিল না, সেই পূজোর পর থেকে বাড়ীতে অনেক কাজ হয়েছে। ছাদে নতুন ডিজাইনের ইটের রেলিং, জলছাদ, ছোট রান্নাঘর বড় করা, বড় রান্না ঘরের মেঝে উঁচু করা, ঘরের দেওয়ালের নোনা ছাড়িয়ে নতুন করে প্লাষ্টার করা, বাথরুমে ও উঠোনের উপর এ্যাসবেসটসের ঢাকনা দেওয়া, উঠোন আর কলতলা সমান উঁচু করে পাকা করা হয়েছে। সব শেষে সারাবাড়ী চুনকাম সবে শেষ হয়েছে। রোজ রোজ চুন সুরকি, বালি সিমেণ্ট আবার কলিচুনের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে করতে শবু নাজেহাল হয়েছে। ভাগ্যিস সন্ধ্যা আবার ফিরে এসেছে।

তবু দুটো কাজে একটু করে খুঁত রয়ে গেছে। বাথরুমের পিছনের দেওয়াল ও চালার মধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটা লম্বা ফাঁক থেকে গেছে ইট কম পড়ে যাওয়াতে। ওতে যে শবুর কত অসুবিধে দীননাথ বোঝে না। আর উঠোনটা যেখানে কলতলায় মিশেছে সেখানে লোহার গেটটা উঁচু করা হল না বলে ধনুকের মত গোল হয়ে একইঞ্চি মত উঁচু নীচু হয়ে রইল—শবুর ধারণা ঐ উঁচু-নীচুতে পা বধে সে নির্ঘাত কোন দিন আছাড় খাবে। এমনিতেই ওর আছাড় খাওয়া অভ্যাস আছে।

দীননাথ বলেছে – সা াঙ্ক উঁচু নীচু তাও পালিশ করে প্রায় মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, পায়ে বাধবে না। ঐ জায়গাটা একটু খেয়াল করে পা ফেললেই হবে।'

কখন খেযাল থাকে আর না থাকে তার ঠিক কি ?

সারা বাড়ী চুনকাম হয়ে গিয়ে যেদিন বিকেলে দীননাথ শবুকে ডেকে বাইরে থেকে বাড়ীটা কি সুন্দর হয়েছে বলে দেখিয়েছে আর শবুও তাদের এত সাধের সুন্দর বাড়ীটাকে দেখে মনে মনে পুলকিত হযেছে তার পরদিনই ভব এসে সিমেন্টের জন্য ঘর বরাদ্দ করে গেছে।

পাড়ার বাঙাল বৌ সেদিন বেড়াতে এসে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে গেল আর বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে দেখে খুশি হল। শবু বলল—

জানেন দিদি, বাড়ীর কাজ শেষ হল বটে কিন্তু এবার দেওরের বাড়ী তৈরীর কয়েক টন সিমেন্ট এসে ঘর বোঝাই হবে।'

'সে কি ? কোন ঘরে সিমেন্ট রাখব—এই ঘরে ? সর্বনাশ—মাইরা ত দাইব্যা যাইব গিযা। শুন সোন্দর বৌ, কত্তারে কইয়ো এ্যামন কাম যানি না করে।'

শবু সে কথা দীননাথকে বলেছে, সে তাতে কোন আমল দেয় নি। ভব সিমেন্ট রাখতে এলে শবু তাকেও বলেছে। ভব কিছুক্ষণ ভুরু দুটো কুঁচকে ভেবে বলেছে—

'মেঝে বসে গেলে আবার মেরামত হবে।'

ঐ পর্য্যন্তই। রাস্তার খোয়া পুজোওয়ালারা সরিয়ে পনরো টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে সে টাকাও কি সে দিয়েছে ?

সুতরাং সিমেন্ট এসে আবার বাড়ী ভর্ত্তি হয়ে গেছে আর পুরোদমে ভবর বাড়ীর কাজ চলছে।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর সময় তপু ও অমল পুতুলকে নিয়ে এসে দুদিন ছিল।

অমলও বাঙাল বৌ এর কথা সমর্থন করে বলেছে—'ভদ্রমহিলা ঠিক কথাই বলেছেন, রান্না ঘরের কাজের জন্য তৈরী মেঝেতে সিমেন্ট রেখেছে মেঝে বসে যাবে।'

অমলও ইঞ্জিনীয়ার ভব আর সোনার মত। 'কন্তু তার কথাও গ্রাহ্য হয়নি।

এই জানুয়ারী মাসে আরো কত ঘটনা ঘটে গেছে। ঠাকুর মশাই দুশ টাকা ফেরৎ দিয়ে গেছেন আবার একটা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দীননাথের কাছে কছু অর্থ সাহায্যও চেয়ে গেছেন। দীননাথ বলেছে—পরে দেখব। গৌর এসে দেড়শ' টাকা দিয়ে গেছে।

পাটনা থেকে গোকুল বাবুর ছেলে বিদ্যুৎ এসে দুদিন থেকে চাকরির জন্য ও দুটো ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ বলেছিল—

'মেসো, যে দুটো ইন্টারভিউ দিয়েছি দুটোতেই চাকরি পেয়ে যাব মনে হয়—একটায় বোম্বে যেতে হবে, অন্যটায় দুর্গাপুর। কোনটা এ্যাক্সেপ্ট করা ঠিক হবে বলুন ত?'

দীননাথ বলেছে—'বো ম্বতে এক দুশ টাকা বেশী পেলেও খরচ অনেক বেশী, দুর্গাপুরই ভাল।'

'আর মাসীর মতটা কি বলুন ত?'

শবু বলেছে—'দুর্গাপুর ত পাটনায় যেতে পথে পড়ে—সহজেই তুমি মাঝে মাঝে গিয়ে মা বাবা দাদা দিদি বৌদি ভাইপোদের দেখে আসতে পারবে। দুর্গাপুরই ভাল।'

বিদ্যুৎ দুজনের যুক্তিই মেনে নিয়ে দুর্গাপুরে চাকরিতে ঢুকে পরে এসে দেখা করবে বলে গেছে। বিদ্যুৎ ভাল ছেলে—প্রথমেই অফিসার হয়ে চাকরিতে ঢুকবে।

তপুরা এসে যে রাতটা ছিল তার পরদিন খুব ভোরে উঠে দীননাথ আচমকা মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেল। তপুরা এলে শবুরা নিজেদের শোবার ঘর ছেড়ে দিয়ে পুরোনো শোবার ঘরটায় শোয়। পাশের ঘরে কুটুমরা ঘুমিয়ে রইল আর আগে থেকে কাউকে কিছু না বলে বাড়ীর কর্তা বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে—শবুর ভাল লাগেনি।

দীননাথ বলেছে—'সেবার মেদিনীপুরে গেলে সোনা বলেছিল—শান্তর টিভি দেখার খুব শখ, তুই একবার ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোদের টি

ভিটা দেখিয়ে দিস। আমি বিকেলে তপুরা ফিরে যাবার আগেই শান্তকে নিয়ে ফিরে আসব। ওরা আছে এই সুযোগে ঘুরে আসি, তাহলে আর তোমাকে একা থাকতে হবে না।'

শেষ পর্য্যন্ত চুপি চুপি সে যেতে পারেনি, জামা কাপড়ের জন্য শীতের ভোর রাতে তপুদের ঘুম ভাঙাতে হল। অমল তপু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'একি জামাইবাবু এই ভোরে কোথায় চললেন ?'

দীননাথ মোটামুটি সব কথা বলে বিকেলেই আসবে জানিয়ে চলে গেল। কিন্তু সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে যায় দেখে তপুরা চলে গেলে রাত প্রায় আটটায় শান্তকে নিয়ে দীননাথ ফিরে বলল—

'ইস্, তপুরা চলে গেছে ? পথে ট্রেন তিন ঘন্টা লেট করিয়ে দিল।'

শান্ত তিন দিন থেকে মহীর সঙ্গে মেদিনীপুরে ফিরে গেছে। এ কদিন শবু শান্তর আদর যত্ন করেছে, অবসর সময় কানাইয়ের ক্যারামবোর্ড পেতে ক্যারাম খেলেছে, লুডো খেলেছে টিভিও দেখেছে। আবার ফাঁকে ফাঁকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছে—মা বাবার জন্য মন খারাপ লাগে কিনা, ঠাকুমা আদর যত্ন করে কিনা, মামাবাড়ী যাওয়া আসা করে কিনা, দিদি কোন ক্লাশে পড়ে তুমি কোন ক্লাশে পড।

শান্ত সব কথারই স্বাভাবিক উত্তর দিয়েছে। শুধু ঠাকুমার কথাতেই অসহিষ্ণু হয়ে বলেছে—

'ঠাম্মা দিদির সঙ্গে কথা বলে না, আমাকে কেবল দিনরাত হুকুম করে, মামা-বাড়ীতে গেলে রাগ করে। আমাদের মা বাবার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে।'

শবু শান্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—'ঠাকুমার কথা শুনতে হয়। তিনি ত তোমার বাবার মা—তোমার বাবা জ্যেঠাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন তাই তারা এখন ভাল ভাল চাকরি করে।'

বলেছে বটে, কিন্তু মনে মনে শবু শিশু দুটির জন্য আর তাদের ছেড়ে থাকা মা-বাবার জন্য গভীর বেদনা বোধ করেছে। মাঝখান থেকে ভব মালতারা ছেলে মেয়ে নিয়ে মনের আনন্দে ফ্ল্যাটে বসে হাওয়া খাচ্ছে।

কথা নেই বার্ত্তা নেই শেফালীও হঠাৎ মা মঙ্গলাদেবীর মত পুজোর আয়োজন করে বসেছিল। মা-কালী নাকি তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার কাছে খেতে চেয়েছে। তাই অকালে কালীপূজার আয়োজন। পুজোটা

অবশ্য তার শ্বশুরবাড়ীতেই হল।

সেবার শেফালীদের বাড়ী যেতে গিয়ে কাজর শ্বশুর বাড়ীতে যেভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তার পর থেকে দীননাথ আর ওমুখো হতে চায় নি কিন্তু মা-কালী বলে কথা, শবুর বিশেষ অনুরোধে পূজোর পরদিন সকালে দুজনে গাড়ী নিয়ে সেখানে গেছে। সোদপুর থেকে বড়বৌদিরাও এসেছে আর যাদবপুর থেকে করবীর দলবল ত আগের রাত থেকেই আছে।

বীণা ও শবু ঠিক বুঝতে না পেরে শেফালীর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছিল এই অসময়ে কালীপূজো কেন?

শেফালীর শাশুড়ী স্বাভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে বলেছেন—তোমাদের ননদ স্বপ্ন দেখেছে, তাই। এটা আমাদের বাড়ীর পূজো নয়।

শুনে বীণা শবুকে জিজ্ঞেস করেছে—মা করলেন পূজো হোম যজ্ঞ দান ধ্যান, মেয়ে করল কালীপূজো ব্যাপারটা কি? মা কালী কাকে খেতে চেয়েছে, আর বাঁদর পাঁঠাই-বা কে?

বলতে বলতে বীণা হেসে গড়িয়ে পড়েছে, কথাটা নিয়ে দুজনে বেশ কিছু হাসাহাসি করেছে। তবু দুটো কথা শবুর মনে ঘুরপাক খেয়েছে। শেফালী সেবারে বলেছিল, সে তার শাশুড়ীর কত বাধ্য, মান্য করে চলে। আর বাড়ীতে দেখছে, তার ইচ্ছেই সেখানে শেষ কথা। অথচ নতুন বিয়ে হয়ে আসা বৌ রেখা ও শবু লক্ষ্মীর মূর্ত্তির সামনে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়েছিল তাইতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল রব উঠেছিল, শেফালীর বেলায় ত কোন কথা উঠছে না। তখন শেফালীও শবুকে কথা শোনাতে ছাড়ে নি।

যাওয়াতে এই লাভ হল যে করবীর ছেলেরা ও শেফালীর এক ননদের ছেলে বাঁদরামী করতে গিয়ে গাড়ীটা কেলে দিয়ে তার আয়না ভেঙে ফেলল পরে যার জন্য দীননাথকে বাট টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। আর পূজো বাড়ীতে প্যালেস্তার বাসিন্দা ভবদের আসার কথা ছিল কিন্তু শবুরা চলে আসা অবধি তাদের দর্শন পাওয়া যায় নি।

এর সব শেষে আত্মীয়দের শেষে দিল্লী থেকে এসেছে সুধীরবাবু। গ্রামে গিয়ে জমির ধান বিক্রি করে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছে—দীননাথকে তার পাঁচশ টাকা দিয়েছে।

শবু জিজ্ঞেস করেছে 'মালারা এখন কোথায়?'

সুধীর বলেছে 'তারা মায়ে পোয়ে দিল্লীতে সাধারণতন্ত্র অনুষ্ঠান দেখবে বলে আসেনি, আমি একাই এয়েছি। আপনারা একবার দিল্লীতে বেড়াতে আসুন না।'

দীননাথ বলেছে—'আমরা একবার দিল্লী ঘুরে এসেছি। আমার প্রোমোশনের ব্যাপারে একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি। তার কি জবাব আসে দেখি। যদি অন্যায়ের প্রতিকার না হয় তবে আবার একটা নোটিশ দিয়ে সামনের এপ্রিল মে মাসে হরিদ্বার লচমনঝোলা ঘুরে আসব ভাবছি।'

সুবীর বলেছে—'দিল্লী হয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরে আসব।'

দুপুরে খাওয়া সেরে সুবীর কলকাতায় মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে দেখা করতে গেছে, সেখান থেকে সে হাওড়া গিয়ে দিল্লীর ট্রেন ধরবে।

শবুর হরিদ্বার লচমনঝোলা বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু যদি মালারা সঙ্গে যায়, গত পুজোয় নবমী পুজোর সারাটা দিন যেভাবে নষ্ট হল, হরিদ্বার যাওয়াও হয়ত মাথায় উঠবে। আবার চাকরির ব্যাপারেও কি নোটিশ দেবে ব'ছে। জিজ্ঞেস করেছে—

'আবার নোটিশ দেব বলছ, সেবারের কথা মনে আছে ত?'

দীননাথ হেসে বলেছে—'এবারে ভয় পাবার কিছু নেই, নতুন আইন হয়েছে ত্রিশ বছর চাকরির পেনসন পাব, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ডফাণ্ড নিজেদের বাড়ী—আমাদের দুটি প্রাণীর নিশ্চিন্তে কেটে যাবে। আমাদের কীসের ভাবনা?'

ভাবনা নেই, ভরসাও নেই। পাশেই ভবর বাড়ী হচ্ছে। হয়ে গেলে যে কি হবে কে জানে।

সুবীরের দেয়া পাঁচশ টাকা দিয়ে দীননাথ শীলার বর শীতলকে একটা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে—মিতুরা যে বিপদে ফেলেছিল ওরা তা থেকে উদ্ধার করেছে। এটা তারই প্রতিদান।

দুই

পরপর দুটো ঘটনায় শবুর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

সন্ধ্যা বেশ ভাল মেয়ে, আটাশ ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, এখনো বিয়ে হয়নি। মাথায় একটু ছিট আছে বলে সবাই। আশপাশে বিয়ে শাদী লাগলে সে যেন কেমন হয়ে যায়—দু'তিন দিন কামাই করেই বসে। শবুর কষ্টই লাগে—আহা, এখনো বিয়ে হয়নি, নিজের ঘর সংসার হল না, মন

খারাপ লাগারই কথা। এটাকে ছিট বলা ঠিক নয়। ওর দিদি জামাইবাবু বিয়ে দেবে বলে একমাস কাছে রেখেছিল, তবু বেচারীর বিয়ে হয়নি।

শীতের কোন ভোরে একমাইল দূর থেকে সন্ধ্যা কাজ করতে আসে। সহানুভূতিতে শবু তার পুরোনো উলের স্কার্ফ টা সন্ধ্যাকে দিয়ে দিয়েছে। সেটা পেয়ে সে খুব খুশি, পরদিন সকালে এসে শবুকে বলেছে—'মাসী. পাড়ার সবাইরে চাদরটা দেখাইছি, সবাই কইছে খুব ভালা হইছে। ভারি উম হইছে।'

সন্ধ্যারা কুম্ভকার পাল, জয় বাংলা থেকে এসেছে, বাড়ী ছিল ফরিদপুরে রাজবাড়ীতে একদিন সে বলেছিল—

'মাসী, আমাগো বাড়ী ছিল রাজবাড়ী তোমার বাড়ী কোথায় আছিল?'

শবু কি খেয়ালের বশে বলে ফেলেছিল—আমারও বাপের বাড়ী রাজবাড়ীতে ছিল, কিন্তু আমি কোনদিন সেখানে থাকি নি।'

তাকে কি হয়েছে, সেই থেকে সন্ধ্যার কাছে শবুর কদর বেড়ে গেছে—'রাজবাড়ীর লোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, মাসীও পরিষ্কার আমিও নোংরা দেখতে পারি না।'

এমন যে সন্ধ্যা সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিন দিন হল কাজে আসছে না। কাকে দিয়ে খোঁজ করাবে যখন ভাবছে শবু তখন এক সকালে আলুথালু বেশে উদ্‌ভ্রান্তের মত সন্ধ্যা এসে কেঁদে পড়ল—

'মাসী, আমার সর্বনাশ হইছে, আমার ইজ্জৎ নিয়া নিছে।'

সন্ধ্যার কথায় জানা গেল ওদের বস্তিতেই থাকে গীতার মামা, রিক্সা চালায় সে এক রাতে সন্ধ্যা ঘরের বাইরে ডোবার পাশে গেলে আচমকা ঝাপটে ধরেছিল, আবার রাতের অন্ধকারে বস্তি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। রাতেই সন্ধ্যার চীৎকার শুনে বস্তির লোকেরা জড়ো হয়ে ঠিক করেছে সন্ধ্যার সঙ্গে ওর জোর করে বিয়ে দেবে। কিন্তু তিনদিন ধরেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সন্ধ্যা কেঁদে বলল—'মাসী, তুমি কি আমারে দিয়া কাম করাইবা? আমি যে অশুচি হইয়া গেছি।'

একদিকে শবুর মন দোটানায় পড়লেও সন্ধ্যার সরল ব্যবহারে আর না করতে পারল না, বলল—

'হ্যা কাজ কর, তোমার কি দোষ?'

সন্ধ্যার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে গিয়ে তার মুখে নিষ্পাপ কুমারীর হাসি ফুটল।

পাড়ায় আর একটি অঘটন ঘটে গেছিল প্রায়। এবারেও সেই কচি ফড়িংদের বাড়ী।

এর মধ্যে কচির এক দাদার বিয়ে হয়েছে, তাদের ছমাসের বাচ্চাও আছে। সেই দাদা দিন দুপুরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাতে চাইছে, ভাই বোন ঠাকুমা কেঁদে চীৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলল।

শবুরা গিয়ে দেখল কচির বৌদি চীৎকার চেঁচামেচি কিছুই না করে প্রাণপণে তার স্বামীর দেশলাই শুদ্ধ ডান হাতটা চেপে ধরে আছে যাতে কাঠি জ্বালতে না পারে। পুরুষদের মধ্যে দীননাথ সবার আগে পৌঁছেছিল, সে ছেলেটির কব্জিতে চাপ দিয়ে দেশলাই কেড়ে নিতে সবাই গিয়ে তাকে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে বালতিতে করে জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিল। বৌটা এতক্ষণ বীরের মত লড়াই করে এখন দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

বাড়ীতে কি নিয়ে অশান্তি হল বোঝা গেল না, এই ত সবে বছর দেড়েক আগে ছেলেটির বিয়ে হল এরই মধ্যে এত কাণ্ড! কচির ঠাকুমা পরে এসে শবুর কাছে কেঁদে বলতে লাগল—

'নাতির বে' হল, ভালই থাকে। মাঝে মাঝে তার মার কথা মনে পড়লেই সে যেন কেমন হয়ে যায়। তখন আমার গলা টিপতে আসে, বলে—এই বুড়ী যত নষ্টের গোড়া, আমার মাকে খেয়েছে। আমি কি করবো বলত মা? এবারে ত নিজেই নিজের গায়ে আগুন ধরাতে গেছল।'

পৃথিবীতে কত সমস্যা।

কিন্তু সন্ধ্যার মত নিজেকেও যে অশুচি বোধ করতে হবে শবু কখনো ভাবেনি। এমন নোংরা ব্যাপার ঘটতে পারে তার কল্পনায় ছিল না। এক-কালে এই বাড়ীতে থাকতেই শবু দেখেছে মাতুলকে আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে—সেটা ঐ লম্পট মার্কা মাতুলের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। এমন মানুষ আরো নজরে পড়ে, প্রতিটি মেয়েমানুষ তার নারীসুলভ সহজাত বোধশক্তি দিয়ে তাদের চিনে নিতে পারে। কিন্তু এমন জঘন্য কাণ্ড যে ঘটতে পারে কোনদিন শবু কল্পনাও করে নি। সন্ধ্যার জীবনে ঘটে যাওয়া সেরাতের ঘটনার কথা মনে এলে ঘেন্নায় তার সারা শরীর শিউরে ওঠে। চিন্তাটাকে কিছুতেই সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

মনের এমনি অবস্থায় এক সন্ধ্যেয় শবু গেছে বাথরুমে—গা ধুতে। হঠাৎ সেই আবছা অন্ধকারে সে অনুভব করল দেয়ালের সেই ছ'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে

কেউ যেন উঁকি দিচ্ছে। প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায়—'কে' 'কে'—বলে সে ছুটে বাইরে এল। দেখতে পেল পিছনের দুবাড়ীর মাঝের গলি দিয়ে একটি ছায়া মূর্ত্তি ছুটে পালাল। অন্ধকারে ঠিক চেনা গেল না কিন্তু পনরো ষোল বছরের কোন ছেলে তাতে সন্দেহ নেই। আশপাশের কোন বাড়ীর ছেলে মনে হয়, যারা সদ্য মাধ্যমিক বা পি ইউ পরীক্ষা পাশ করেছে। এদের শবু একটু একটু করে বড় হতে দেখেছে, তাদেরই একজনের এমন জঘন্য প্রবৃত্তি দেখে শবুর মুখ থেকে শুধু—'ছি. ছিঃ!' শব্দই বেরিয়ে এল। অথচ এদের মায়েরাই ছেলের বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্রের গুণগানে পাড়া মাতিয়ে তোলে।

ঘেন্নায় শবুর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। এমন ঘটনায় নিজেকে বড়ই অশুচি লাগছে—ঐটুকু ছেলে, মা-মাসীকেও রেহাই দেয়না! সন্ধ্যার ঘটনাতে তবে তাকে দোষ দেবে কি করে, অশুচিই বা ভাবেবে কেন?

প্রতি মাসের প্রথমে মহী একবার করে আসে, কিছু কিছু করে টাকা শোধ দিয়ে যায়। এবারও এসেছে। দীননাথের হাতে একখানা রসিদ দিয়ে মহী বলল—

'সেজদা, তোর বাকি টাকা সুদ সমেত আমি ব্যাঙ্কে তোর একাউণ্টে জমা করে দিয়েছি এটা তার রসিদ।'

দীননাথ টাকার অঙ্ক দেখে বলল—'মনে হচ্ছে অনেক বেশী টাকা জমা দিয়েছিস!'

মহী বলল—'ও ঠিক আছে, বাইরে থেকে ধার করলে আরো কত বেশী দিতে হত। বৌদি, এক কাপ চা হবে?'

মহী চা খেয়ে কিছুক্ষণ টি ভি দেখে চলে যেতে দীননাথ বলে উঠল—

'মহীর টাকাগুলো পাওয়া গেছে, এবার অখিল মিস্ত্রীকে ডেকে দুটো আয়না বসানো দেওয়াল আলমারী বানিয়ে নিতে হবে। আলমারী আর ড্রেসিং টেবিল দুই কাজই চলবে।'

টাকা যেন দীননাথকে কামড়ায়। এক পয়সা সঞ্চয় করতে চায় না, হাতে টাকা এলেই ভাবতে থাকে কি করে খরচ করবে।

এসে গেল অখিল মিস্ত্রী, কাজেও লেগে গেল। হিসেব হল প্রায় হাজার টাকা পড়বে দুটো আলমারীতে। আয়না দুটো ঘরেই ছিল। আরো কিছু টুকটাক কাঠের কাজ হবে। মীট সেফের তারের জাল ফুটো ফুটো হয়ে গেছে, দীননাথ ত্রিশ টাকা দিয়ে এলুমিনিয়মের জাল নিয়ে এসেছে, দোকানী

বলেছে ত্রিশ বছরেও এ জাল নষ্ট হবে না।

গত আশ্বিনে এমনি এক ঢালাই করা লোহার ভারি উনুন সে কিনে এনেছে ষাট টাকা দিয়ে। তোলা বালতি উনুনগুলো ছ'মাস ন'মাসে ভেঙে যায়—এটা পনরো বছরেও ভাঙবে না যদি হাত থেকে পড়ে না ভাঙে।

পনরো বছর ত্রিশ বছরের সব পরিকল্পনা, মানুষ কদিন বাঁচে তার ঠিক নেই! দীননাথ বলেছে -আরো প্রায় ত্রিশ বছর আমরা অনায়াসেই বাঁচব জিনিষ পত্র করতে হলে মজবুৎ দেখে করা ভাল।

এমন সব মজবুৎ কাজ হল যে প্রথম দিনই শবু একটা আলমারীর পাল্লা টেনে খুলতে গিয়ে পাল্লার হাতল উপড়ে ফেলল। শবু ভয় পেয়ে ছেলে মানুষের মত হাত ছুটো কচলে দীননাথকে বলল—'শুনছো রে, আমি একটা আলমারী ভেঙে ফেলেছি।

'এ্যাঁ, ভেঙে ফেলেছ।' বিস্মিত দীননাথ ছুটে গিয়ে দেখে বলল—'না ভাঙেনি শুধু হাতলটা উপড়ে পড়েছে। দোকানী বলেছিল, চারটে করে স্ক্রু আছে আট হর্স পাওয়ারেও খুলবে ন। তোমার হাতে ত তবে দশ হর্স পাওয়ার। অখিলের কাজ শেষ হয় নি, কাল ওকে দিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।'

পরদিন অখিল দেখে বলল—'আমার দোষ নয়, ইস্ক্রুগুলাই কম জোর, নাটবল্ট, লইয়া আসেন লাগাইয়া দিতাছি।'

দীননাথ বলল—'তা এনে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি চোখে কম দেখছ, তাড়াতাড়ি চশমা নাও।'

শবু সন্থ কমাস হল চশমা নিয়েছে, সে বলল—

'সত্যি মিস্ত্রীদা, চশমা লাগালে খুব ভাল দেখতে পাবেন। আমি সূচে সুতো পড়াতে পারতাম না এখন একটুও অসুবিধে হয় না।'

অখিল বলল—'নিমু মা, নিমু। বাবুর কামডি শ্যাষ হইলে কিছু টাকা পামু, মাইয়াদের একটা ফুট্ সেলাই মেশিন কিন্না দিমু, চশমাও নিমু একখান।'

তিন

দীননাথ বলছিল আরো ত্রিশ বছর অনায়াসে বাঁচা যাবে। কিন্তু ভবর বাড়ী তৈরীর শুরু থেকে যা উৎপাত আরম্ভ হয়েছে শবুকে আর বাঁচতে

দেবে না। সকাল নেই দুপুর নেই বিকেল নেই মিস্ত্রী মজুররা বাড়ীতে যেন রাজত্ব করছে, যখন তখন বাড়ীতে ঢুকছে বেরোচ্ছে, এটা দাও সেটা দাও বলে এসে দাঁড়াচ্ছে, বিকেলে বাড়ীটাকে সিমেন্ট বালিতে একসা করে রেখে যাচ্ছে। তখন শবু আর সন্ধ্যাতে মিলে প্রাণপাত করে রোজ সারা বাড়ী ধুচ্ছে, মুছছে। সন্ধ্যা বিরক্ত হয়ে বলে—

'মাসী, ম্যাওরের বাড়ীর লাইগা খাইটা মর ক্যান, তোমার জামাই আইতে পারে না?'

কেন যে শবু খেটে মরে, জা যে কেন একবার উঁকি মেরে দেখতেও আসে না—সে কথা শবু জানে না।

সব চাইতে খারাপ লাগে বেলা দুটোর সময় শবু এক দেড়ঘণ্টার জন্য শুয়ে বিশ্রাম করে, একটু ঘুমিয়েও নেয়—এটা তার বহুদিনের অভ্যাস। কিন্তু ঠিক ঐ সময়টিতেই তারা এসে হাঁক ছাড়বে—'সিমেন্ট লাগবে'।

বারবার বলেও এটা বন্ধ করা যায় নি। দীননাথ বাড়ীতে থাকলে বিশ্রামে ব্যাঘাতের জন্য তেড়ে মারতে যায় কিন্তু তবু তারা নির্লজ্জের মত নির্বিকার।

প্রায় দশ বারোদিন অখিল মিস্ত্রী বাড়ীতে সারাদিন কাজ করেছে, সে ত ওদের বিশ্রামে এতটুকু ব্যাঘাত ঘটায়নি বরং মিস্ত্রীরা ডাকাডাকি করলে বলেছে—

'মা অখনে ঘুমাইতাছে, তারে বিরক্ত করবা না, যা দরকার হয় আমারে কও।'

সে ত মাত্র দশটা দিন, কিন্তু ভবর বাড়ীর কাজ চলছে একমাস হল। এর মধ্যে একটা দিনও শবু দুপুরে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারে নি। উপরন্তু কাঁচা ঘুম ভেঙে মাথা ধরে সে এক অসহ্য ব্যাপার, খাটাখাটনি ত আছেই।

আর যাদের বাড়ী হচ্ছে, তারা? মাসতোর ত দেখাই নাই। ভব সকালে বা বিকেলে একবার করে আসে, মিস্ত্রীদের নির্দেশ দেয়, মজুরদের সঙ্গে কথা বললেও তার প্রেষ্টিজ যায়—তারা যে কণ্ট্রাক্টরের মজুর, সস্তায় পাওয়া, আর প্যাণ্টের পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে চলে যায়, আবার চা করেও খাওয়াতে হয় তাকে। শবু যেন সবার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে এসেছে।

বাড়ী তৈরী করা, মিস্ত্রী মজুর খাটানোর যে ঝামেলা ধাপে ধাপে বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে শবু তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। এই ত সেদিন কানাই

বলে গেল—পাশেই জমিতে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, বাবা এক মুহূর্ত সুস্থির থাকতে পারে না, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, চিলেকোঠা থেকে চিৎকার করে না হয় বারবার তিনতলা একতলা করে মিস্ত্রী মজুরদের ধমকায়—ঠিক মত কাজ কর, আমি বলি বাবা, বাড়ীর কাজ কণ্ট্রাক্টরকে দিয়েছি, সে-ই বুঝবে—বাবা বলে—না কানাই তুই বুঝিস না, এরা ভীষণ কাজে ফাঁকি দেয়; বাবার দুপুরের বাধা নিদ্রা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আর এদিকে দেখ ভব মালতীকে, একজন এক ঘণ্টার জন্য এসে প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে ঘুরে চলে যায়। আর একজন ত ফ্লাটের দোতলা ছেড়ে নামলই না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তার বাড়ী হয়ে যাচ্ছে।

যত মরণ হয়েছে শবুর। এই বাড়ীটাই শবুকে মারবে! আর এ ব্যাপারে দীননাথ একেবারে ভাল মানুষ, তার ভাল মানুষীর শেষ নেই।

দেড়মাস ধরে কাজ করে পাড়া জাগিয়ে মিক্সচার মেশিন ও ভাইব্রেটার চালিয়ে ছাদ ঢালাই করে মিস্ত্রী মজুররা মিষ্টি খাওয়ার টাকা নিয়ে এক সন্ধ্যায় চলে গেলে ভবর বাড়ী তৈরীর এক পর্ব শেষ হল। মনে হচ্ছে এবারকার মত শবু বুঝি বাঁচল। আর একদিন পরেই সরস্বতী পুজো।

ভব যাবার আগে ধন্যবাদ জানাতে এলে শবু বলল—

'ছাদ ঢালাই করে মিস্ত্রী মজুররা মিষ্টি খাবে আর আমাদের বেলায় শুধু শুকনো ধন্যবাদ?'

ভব কাজ শেষ হওয়ার আনন্দে দাঁত বের করে হেসে বলল—'ওহো, তুমিও যে ওদের দলে আমার মনে ছিল না। ঢালাই মিস্ত্রীরা আর আমরা ত এক পাড়ায় থাকি নাই না?'

শবু বলল 'বাড়ী যখন করছ তোমরাও এ পাড়াতে থাকবে।'

ভব বলল—'এখানে থাকব বলে কি বাড়ী করছি নাকি, ভাড়াটে বসাব।'

'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক' শবুর পরিষ্কার জবাব। প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে ঘুরে বেড়ানো ফুলবাবু আর তার রিজার্ভ বৌ এর চাইতে ভাড়াটে প্রতিবেশীই ভাল।

সরস্বতী পুজোর আগ দিয়ে দলে দলে পাড়ার ছেলেরা চাঁদার জন্য আসছে আর দীননাথ তাদের সোজা হাঁকিয়ে দিচ্ছে—

'গত বছর সরস্বতী পুজোর সময় আমার বাথরুমের বাল্‌ব চুরি হয়েছে। আমি এক পয়সাও চাঁদা দেবে না।'

ছেলেগুলোর মুখ দেখে কষ্ট হয়, মাত্র পঁচিশ পঞ্চাশ পয়সা পেলে শিশুর দল খুশি হয়, পুরো একটাকা পেলে আকাশের চাঁদ হাতে পায় যেন। কত দিকে কত পয়সা যাচ্ছে, কারা বাল্ব চুরি করেছে তার জন্য এই শিশুর দলকে নিরাশ করা! ঘর থেকে গাড়ু আর ঘড়ি চুরি হল কি করা গেল? ইচ্ছে করলে শবু পারে শিশুর দলের মুখে হাসি ফোটাতে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু করা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

সব থেকে বড় কথা—মা সরস্বতী স্বয়ং বাগ্‌দেবী, কথার অধীশ্বরী, লেখাপড়া সাহিত্য সংস্কৃতির আদি দেবী। বাক্য দিয়েই লোকে মনের ভাব প্রকাশ করে, লেখাপড়া শিখেছে বলেই তারা শিক্ষিত, তার দৌলতেই মুখের অন্ন, বাড়ী ঘর সব।

'মা সরস্বতীর পুজোকে অমন অবহেলা কোরোনা' শবু অনুরোধ করল।

দীননাথ বলল—'অবহেলা ত করছি না, বাড়ীতে যথারীতি নিয়ম নিষ্ঠায় পুজো হবে।'

হ্যাঁ, সেদিক থেকে দীননাথ কোন ত্রুটি রাখল না। এতদিন শঙ্খ ঘণ্টা প্রদীপ না থাকাতে খুব অসুবিধে হত এবারে সে সবও কিনে এনেছে। অমল তপু আর পুতুল এসেছে। দেড় বছরের ফুটফুটে পুতুলকে দেখতে এত সুন্দর লাগছে হাতে একটি বীণা দিয়ে বসালে ঠিক যেন মা সরস্বতী। এ বাড়ীতে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি পুজো নেই। তপু আলপনা দিয়ে সুন্দর করে সরস্বতী আঁকল সামনে কয়েকটা বই রাখা হল—তপুর ড্রয়িং এর হাত ভাল।

শুধু একটু কেপ্পণ হয়েছে, এক কেজি তেলে নাকি মাস চালায়। রান্নার সময় বোতলে তেল ঢালতে গিয়ে তেল চুঁইয়ে পড়ছিল, তপু নীচে হাত পাতল। সত্যি ওর হাত দিয়ে এক ফোঁটাও তেল গড়াল না।

দীননাথ বলল—'তুই যে কেমন কেপ্পণ প্রমাণ হয়ে গেল।'

শবু বলল—'আহা, অমন করে বোলো না, কেপ্পণ না, মিতব্যয়ী।'

বলল বটে, তবে শবুর মনে হয় কৃপণতায় তপু—অমল দুজনই যেন সমান—একেবারে রাজযোটক। একবার দীননাথ চারখানা টিকিট কেটে তপু অমলদেরকে কলকাতায় হলে একটি ভাল দলের নাটক দেখিয়েছিল। তার প্রতিদানে মাসখানেক পরে ওরা শবুদের আর একটি দলের নাটক দেখতে যেতে বলেছিল। শবু ও দীননাথ একটু দেরীতে যখন হলে পৌঁছল তখন নাটক শুরুর আগের সেকেণ্ড বেল বাজছে। কিন্তু বাইরে অমলদের না পেয়ে ফিরে আসতে হল। পরে শুনেছে, টিকিটের টাকা নষ্ট হবে ভেবে ওদের না দেখে

নাটক শুরু হবার আগেই ওদের দুখানা টিকিট বিক্রি করে দিয়ে হলে ঢুকে পড়েছে অমল।

পুজো, ভোগ, অঞ্জলি মিটিয়ে যাবার আগে দীননাথ পুরুত মশাইকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা ও পঁচিশ টাকা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দিল।

তপু বলল - 'আমি কেপ্পণ বলে জামাইবাবু যেন বেশী বেশী করে টাকা দিল।'

শবু বলল—'না, ও টাকাটা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়া হল, বড় মুখ করে চেয়েছিল ত।'

মামাতো দেওর ভুলু বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায়, তাকে দুপুরে খেতে বলা হয়েছিল। খেতে এসে ভুলু খবর জানাল—

'জানেন বৌদি, আমি পি. এস সি পরীক্ষায় পাশ করেছি, পুলিশ ভেরিফিকেশন আর মেডিকেল হয়ে গেলেই আমি রাইটার্সে চাকরি পাব।'

শবু বলল—'খুব ভাল কথা, প্রথম মাইনে পেয়ে মাকে একটা ভাল শাড়ী কিনে দিও। আর এবারে একটা বিয়ে কর'

ভুলু বলল—'ওসব শাড়ী কেনার ফর্ম্যালিটি আমার আসে না। তবে বললেন যখন, দেব, ওটা কোন ব্যাপারই না। আর বিয়ের কথা বলচেন? মাত্র পাঁচশ' টাকা মাইনে পাব তাতে আমার নিজেরই চলবে না, সংসার চালানো টালানো আমার দ্বারা হবে না।'

শবুর মনে পড়ে মাত্র বছর খানেক আগে ভুলু বলেছিল—আমার কিছুই লাগেনা। আর এখন পাঁচশ টাকাতেও নিজের চলবে না বলছে। কত লোক আড়াই তিনশ টাকায় সংসার চালাচ্ছে। আসলে বাউণ্ডুলেপনা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

পুজোর দিনটা ভালই কাটল।

পরদিন বিকেলে রওনা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় অমল বারবার বলতে লাগল—'ভববাবু বাড়ীর ছাদ ঢালাই করে রেখে গেছেন দুদিন আগে, ছাদে জল দেয়া হচ্ছে না, ছাদ যে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেল।'

শবুর মাথায় অন্য চিন্তা, দীননাথ পুজোয় কাউকে চাঁদা না দিয়ে মা সরস্বতীকে অবহেলা করেছে, মা বুঝি রাগ করেছে। বারবার মনে মনে সে মাকে ডাকতে লাগল—

—হে বাগ্‌দেবী, তুমি আমাদের ক্ষমা কোরো। মানুষটা একটু জেদী একরোখা হলেও নাস্তিক নয়। ওর যেন কোন অকল্যাণ না হয়, আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ো না।

সেই রাতেই ভব এসে ছাদের অবস্থা দেখে অগ্নিরূপ ধারণ করল—

'তিন দিন হল মিস্ত্রীরা ছাদে জল দেবার কোন ব্যবস্থা করেনি! আমার বাড়ীর ছাদ ত ভেঙে পড়বে। ওরা সব ক্রিমিন্যাল। আঃ, আমাকে কেউ একটা খবরও দিল না?' বলে সত্যি সত্যি কপাল চাপড়াতে লাগল।

ভবুর অবস্থা দেখে শবুর রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। এত পরিশ্রমের জিনিষ, এতগুলো টাকা নষ্ট হয়ে গেলে কার না দুঃখ হয়?

কেউ খবর দেয়নি কথাতে দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলল—

—'কে গিয়ে খবর দেবে? তিন দিনে তুই একবার এসে খবর নিতে পারলি না। কার উপর তুই ভার দিয়ে গিয়েছিলি?'

ভব বলল—'এ কয় দিনের খাটুনিতে খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। জল দেয়াটা মিস্ত্রীদের চুক্তির মধ্যে পড়ে, ভেবেছিলাম ওরা জল দিচ্ছে। দেখি একটা বালতি, আমিই ডোবা থেকে জল তুলে যতটা পারি ভিজিয়ে দিয়ে যাই।'

দীননাথ বাধা দিল—'এই অন্ধকারে ডোবায় নামার দরকার নেই, সাপ খোপ থাকতে পারে। মাঝখানে একদিন ভাল বৃষ্টি হয়েছিল, রাতে রোদ নেই বরং বেশ হিমই পড়বে। যা করার কাল সকালে করিস।'

'কাল আমার চারজন লোক আসবে' বলে রাগ দেখিয়ে ভব গট্‌গট্ করে চলে গেল—যাবার আগে ভাল করে একটা কথাও বলে গেল না, চাও খেতে চাইল না।

এখন ভাবতে গিয়ে শবুর রাগ পরছে। সত্যি ত, এমন ভাবে কথা বলে গেল যেন ওরাই দোষী। দেড় মাস ধরে শবু গায়ে গতরে প্রচুর খেটেছে, দুপুরের বিশ্রাম ঘুচে গেছে—মালতী ত কিছুই করল না, একবার দেখতেও এল না। এরপর কি শবুরা পিওনের কাজও করবে? ভব তার শালাদেরকে অনেক কাজের ভার দিয়েছে, তাদের কেন দেখতে বলে যায় নি? তারা ত কাছেই থাকে। সব দায় যেন শবুর আর দীননাথের—যেন ঝি চাকর পেয়েছে। সেদিন ভব ধন্যবাদ দিতে এসেছিল, আজ দেখিয়ে গেল অন্যরূপ।

চার

সরস্বতী পুজো থেকে দোল। মোটে ছ'টা সপ্তাহ। এর মধ্যে এক এক করে সাতটা মৃত্যুর সংবাদে শবু বুঝি দিশেহারা। চারদিকে শুধু দুর্লক্ষণই

দেখতে পাচ্ছে। মৃত্যুর মিছিল যেন চলেছে একের পর এক।

সরস্বতী পুজোর পর পরই সোদপুর থেকে খবর এসেছে একবার যাবার জন্য—খুব জরুরী ব্যাপার। ব্যাপার জরুরী হলেও যেতে দুটো দিন দেরী হল।

সোদপুরে যেতেই বীণা ডুকরে কেঁদে উঠল—

'ঠাকুরপো, শ্রাবণী—আমার ছোড়দা আর নেই। কালই খবর এসেছে, ছোড়দা চলে গেছে। তিনদিন আগে হঠাৎই পেটে ভীষণ ব্যথা হওয়াতে মাজদিয়া কৃষ্ণগঞ্জ থেকে কৃষ্ণনগরের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সেখানে অপারেশনের টেবিলেই সব শেষ। দাদা যে মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসত আর যে আমার মিষ্টি খাওয়া আর খাওয়ানোর উপর থেকে সব আকর্ষণ উঠে গেল।'

কতদিন আর হবে, এক বছরও নয়। গত বৈশাখে লীনার বিয়েতে গিয়ে দেখল ননীবাবু হাসিখুশি ভাল মানুষ—গরিব অবস্থা বলে সব সময়ই একটা নরম নিরীহ গোবেচারী ভাব। মিষ্টির দোকানে বসে কি তৃপ্তি করে মিষ্টি খেল। শবুরা লীনার শশুর বাড়ীতে বৌভাতে যাবার সময়ও হাসি মুখে বলেছিল—দীনুবাবু, আপনারা আবার আসবেন। ভাবতে ভাবতে শবুর চোখেও জল নেমে এল—কি বলে সে বড়বৌদিকে সান্ত্বনা দেবে। কতই বা বয়স হয়েছিল ননীবাবুর—দীননাথের চেয়ে সামান্য দু চার বছরের বড়।

শোকের ভাব একটু কমলে হৃদিনাথ বলল—

'পার্থর ব্যাপারে কি করা যায় দেখত দীনু, যে জন্য তোদের ডাকা।'

বড় বৌদি বীণা কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমার কি দুঃখের শেষ আছে শ্রাবণী। একদিকে আমার দাদা গেল আর একদিকে ছেলে পার্থ সেই সাহার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। নতুন চাকরি পেয়েছে আর বলছে এখনই আমার বিয়ে দিয়ে দাও, আমি বউ নিয়ে কাজের জায়গা গোয়ায় চলে যাই।

'সোনা জাত না মেনে বিয়ে করল, সুপর্ণাও তাই। মাঝখানে পার্থ মেদিনীপুরে গিয়েছিল সেখানে শাশুড়ী তার কানে মন্ত্র দিয়েছে—যেখানে তোর ভাল লাগে সেখানেই বিয়ে কর। অথচ সুপর্ণার ব্যাপারে তাঁর অন্য কথা। সোনাও এর পিছনে আছে, সে ত সাহাকে চিঠি দিয়ে সেজঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল—ঠিক কিনা বল ঠাকুরপো?

'এদিকে ছেলের বাপ দিনরাত জপ করছে, আমি জাত মানি না। এ সব বংশেরই দোষ বুঝলে শ্রাবণী।'

হরিনাথ বলল—'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমার এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব বলে অনেক বছর আগে থেকে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি কথায় খেলাপ করতে পারি না।'

বীণা বলল—'সে ত বামুনের মেয়ে, দেখতে শুনতেও ভাল। কিন্তু বাপ হয়ে দিনরাত 'জাত মানিনা' বলে জপ করলে ছেলে মেয়েরা বিগড়ে যাবে না? সুপর্ণার এই বিয়েতেও আমি মত দিই নি। তখন তুমিই ত আমাকে নেমন্তন্ন করলে—আজ কালীঘাটে তোমার বড় মেয়ের বিয়ে, ইচ্ছে হলে যেতে পার। বলো নি তুমি সে কথা?'

'যত সব উল্টোপাল্টা কথা' বলতে বলতে হরিনাথ পাশের ঘরে গিয়ে নিজেকে আড়াল করল যেন।

সুপর্ণা পাশে ছিল। সে বলল-'আমি ওরকম বিয়ে করলেও পার্থর এমন বিয়েতে আমার সায় নেই। পার্থ যে আমাদের একমাত্র ভাই।'

দীননাথ পার্থকে জিজ্ঞেস করল—'কত বছর হল চাকরি করছ তুমি?' দীননাথ রেগে গেলে যাকে 'তুই' বলায় তাকে 'তুমি' বলে।

পার্থ বলল—'এখনো চাকরিতে জয়েন করিনি, পনরো দিনের মধ্যে গোয়াতে জয়েন করতে হবে।'

'এখনো কাজে জয়েনই কর নি, এখনই বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ? দু চার বছর চাকরি কর তারপর দেখা যাবে।'

সুপর্ণা বলল—'দুচার বছর কি, ও ত ছ মাস হল রেজিস্ট্রী করে বসে আছে।'

দীননাথ আরো রেগে গেল—'তাই নাকি, তবে যে তিনমাস আগে বললে, মিথ্যা কথা, রেজিষ্ট্রি করিনি।'

পার্থ কনে-বৌ-এর মত মাথা নীচু করে আছে। শেষে দীননাথ বলল—

'বিয়ে একবারই হয়। রেজিষ্ট্রি বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন আবার ছাদনা তলায় বসার শখ কেন? আমি এ সব বিয়ের মধ্যে নেই।'

কোন সমাধানে না পৌঁছেই শবুরা ফিরে এল। আগে যখনই এ সব কথা উঠেছে শবু পার্থকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—'দেখ পার্থ, তুমি বাবা-মার এক ছেলে—বাবা-মার মনে দুঃখ লাগে এমন কাজ যেন কোরোনা।'

পার্থ মিটি মিটি হেসেছে আর বলেছে—'আমি কোন অন্যায় কাজ করতে পারি বলে তোমার মনে হয়, কাকী?'

সোজা জবাব সে দেয়নি। তখনই শবু বুঝেছে এ ছেলে সহজ নয়। যে

ছেলে পাটনা থেকে পালাবার জন্য ঘড়ি আংটি বিক্রি-বন্ধকের চেষ্টা করেছিল সে সব পারে।

এখন অবস্থাটা কি দাঁড়াল? দীনানাথ কথা খেলাপের দায় থেকে উদ্ধার পেতে হয়ত চাইছিল—দীনু মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই বিয়েটাই মেনে নিয়ে মিটিয়ে দিক। দীননাথ সেদিক দিয়েই গেল না। মাঝখান থেকে শবুরা কাউকেই খুশি করতে পারল না—না ভাল হতে পারল বড়দা বড়বৌদির কাছে না পার্থর কাছে।

বিয়ে অবশ্য আটকে থাকেনি। পার্থ কেঁদেকেটে দিদি সুরমাকে ধরেছে 'রমা তুই আমার বিয়ে দিয়ে দে।' সুরমাও বাবার পরোক্ষ অনুমোদন নিয়ে ওর বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান করেছে। সেখানে বড়দা বড়বৌদি না গেলেও করবী শেফালী ভব সবাই গিয়েছিল—আর শবুদের কেউ খবরই দেয় নি।

পার্থ বিয়ে করে সাতদিন নিজেদের বাড়ীতে থেকে বউ নিয়ে গোয়ায় চলে গেছে। যাবার আগে বৌকে নিয়ে একবার এসে শবুদেরকে প্রণামও করে গেছে। আত্মীয় স্বজন সবাই ভাল সেজেছে, মাবা-মাও ছেলে ছেলের বৌকে ফেলে দিতে পারবে না। শুধু শবুরাই সবার চোখে খারাপ রয়ে গেল দীননাথের একগুঁয়েমীর জন্য।

দীননাথের একগুঁয়েমীর জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে শবুদের আবার খারাপ হতে হল।

বুঁচীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। দিদি জবা এক ছেলেকে নিয়ে এসেছে—আশা, ভাইবোনদের কাছ থেকে অন্তত হাজারখানেক টাকা যোগাড় করা। প্রথমেই সে এসেছে তার পিঠের ভাই দীনুর কাছে।

দীননাথ সোজা বলে দিল—

'আমার হাতে এখন টাকা পয়সা নেই, বাড়ীর পিছনে কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে হল, মহী এসে সেদিন অতগুলো টাকা ধার নিয়ে গেল। তুই অন্য সবার কাছে দেখ দিদি।'

জবা অন্য ভাই বোনদের কাছে ঘুরতে গেল।

খরচ পত্র খুবই হয়েছে এ ক'মাসে। হাতে টাকা প্রায়ই থাকেনা। সেই যে পুজোর পরে এসে কানাই শবুকে দেড়শ টাকা দিয়ে গিয়েছিল শাড়ী কিনতে তা এখনো কেনা যায় নি টাকার টানাটানিতে।

এরই মধ্যে মহী একদিন বিকেলে এসে দীননাথের সঙ্গে ছাদে বসে কথা

বলে ছয় হাজার টাকা ধার চাইতে দীননাথ বলেছে—

'ছ' হাজার ত পারব না, সাড়ে চার হাজার পর্য্যন্ত দিতে পারি।'

'তাই দে' বলে মহী চা খেয়ে চলে গেছে, আর দুদিন পরে এসে টাকাটা নিয়ে গেছে। এর জন্য শবুকেও একদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে সই সাবুদ করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্কের জমা তলানিতে ঠেকেছে। মহী মাত্র মাস খানেক আগে তিন হাজার টাকা শোধ দিয়ে ছ হাজার টাকা চেয়ে সাড়ে চার হাজার নিয়ে গেল। এটা শোধ হলে কি আবার দশ হাজার চাইবে? সে একা মানুষ, ভাল চাকরি করে—তার এত টাকা লাগে কিসে শবু বুঝে পায় না।

সুতরাং হাতে যে বিশেষ টাকা পয়সা নেই সে কথাও ঠিক। তবু নিজের দিদি এসে মেয়ের বিয়ের জন্য বড় মুখ করে চাইল, একেবারে না করে দেয়া ঠিক না।

শবু বলল - 'হাতে টাকা পয়সা নেই জানি, তবু দু তিনশ টাকা তুমি দিতে পার না এমন ত নয়। লোকে আমাদের নিন্দে করবে।'

দীননাথ বলল—'করুক নিন্দে, কমাস আগে বুঁচী এসে আমাদের কি অপমানটা করে গেল মনে নেই? নিন্দে করবে। আর দুটো মেয়ের বিয়েতে আমি দুশ তিনশ করে দিই নি? বুঁচীর বিয়েতে আমি এক পয়সাও দিতে রাজী নই।'

আগের কথা কেউ মনে রাখে না। অথচ এই দীননাথই মাসখানেক আগে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসেছিল। তার অফিসের এক রিটায়ার করা বন্ধু অনাথবাবু দুই মেয়ের বিয়ের জন্য বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ধার চেয়েছিল—দরকারে সে তার বাড়ীও বন্ধক রাখতে রাজী।

শবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি এত ভাবছ কেন? তোমার কাছে কি অত টাকা আছে?'

দীননাথ চিন্তিতভাবে বলেছিল—'না, নেই, কিন্তু মেয়ের বিয়ে বলছিল, টাকার যোগাড় না হলে হয়ত পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

কোথাকার কে তার জন্য এত চিন্তা, এদিকে নিজের বোনঝির বিয়েতে কিছু না দিলে যে নিন্দে হবে সেটুকু বোঝে না।

দিদি জবা অন্য ভাইবোনদের কাছে ঘুরে দু তিনশ করে মোট হাজার টাকা নিয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় আবার ভদ্রতা করে বলে গেল—

'দীনু, শ্রাবণীকে নিয়ে বিয়েতে অবশ্যই যাস, তোর জামাইবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছে।'

দীননাথ বলেছে—'দেখি।'

সবাই টাকা দিল, সবাই ভাল হল—আর সকলের চোখে শবুরা খারাপ হয়ে গেল। দীননাথ ভাই, তাকে কেউ দোষ দেবে না—শবু বৌ, বদনাম হবে তারই। আর সবই হল দীননাথের একগুঁয়েমীর জন্য।

পাঁচ

অথচ এই দীননাথই একদিন শবুকে বলে বসল—

'তোমার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এলে যত খুশী হও, হেসে গল্প কর—অন্য কেউ এলে ত সেরকম দেখি না।'

শুনে শবু যেন বিস্মিত হতেও ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করল—'কার সঙ্গে আবার খারাপ ব্যবহার করলাম বলত?'

দীননাথ বলল—'না, না, খারাপ ব্যবহার করবে কেন? মনে হল তাই বললাম।'

মনে হল তাই এতবড় একটা কথা দুম্ করে বলে দিল? মহী ভব সোনা বড় বৌদি মামীমা শেফালী তাদের ছেলে মেয়েরা কারো সঙ্গে ত শবুর কোন ঝগড়া বিবাদ নেই। সোনার ছেলে শান্ত এসে তিন চারদিন থেকে গেল—তার আদর যত্ন তার সঙ্গে খেলা গল্প টিভি দেখা কিছুতে সে ত্রুটি করে নি। করবী সেবারে এসে ঝগড়া করে যাবার পর তার বাড়ীর কেউ এ বাড়ীমুখোই হয়না, বিজয়ার প্রণাম জানাতেও আসেনা। সে তুলনায় শবু নিজের বোন মিতুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছে, ছোটমামার মেয়ে শীলা মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার ধান্দায় এলে তাকে পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছে। দীননাথই ভালমানুষী করে শীলার বর শীতলকে পাঁচশ টাকা দিয়ে সাইকেল কিনে দিয়েছে মেয়ের বিয়েতে প্রায় দুশ টাকার শাড়ীও দিয়েছে।

তবে লোক বিশেষে, অবস্থা বিশেষে সবার সঙ্গে হাসি গল্প শবুর আসে না, তা সে যে-ই হোক না। শবুর চোখে যে খারাপ সে চিরদিনই খারাপ। কানাই তপু বা কাকীমারা ত কোন খারাপ ব্যবহার করেনি, তাদের দেখলে সে খুশি হবে না কেন? শম্ভু মুখে ভালমানুষী করলেও শবু ত তাকে ভাল বলে না। পুটু বেলা ভাল বলেই শবুর কাছে ভাল। এই যে ভব, তার সঙ্গেও হেসে কথা বলে—আবার খোঁচা দিতে এলে পাল্টা খোঁচা দিতেও ছাড়ে না।

শবু বলল—'শুধু মনে হল বলে অত বড় কথাটা বলা তোমার ঠিক হয়নি। জানো, এটা কতখানি অসম্মানজনক ?'

দীননাথ বোধ হয় বুঝতে পারে কত বড় অন্যায় কথা সে বলে ফেলেছে। অনুতপ্ত হয়ে বলল—'সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে, এবারটি মাপ করে দাও।'

কান্নায় শবুর গলা বুজে আসছিল, কান্না জড়ানো গলায় বলল—'আর যদি কোনদিন না বুঝে এমন কথা না বল তবে মাফ করতে রাজী আছি। তবে তোমার একথা আমি কাকীমা ও তপুদেরকে বলে দেব, তারা যেন বেশী হাসি গল্প না করে।'

'তথাস্তু। তবে শালা শালীদের সঙ্গে হাসি গল্প করতে আমার কোন বাধা নেই' বলে দীননাথ হাসতে লাগল।

কেমন ধারা যেন মানুষটা! কি যে ভাবে আর একটা কথা দুম করে বলে দেয় যার কোন মাথা মুণ্ডু নেই।

আবার এক মৃত্যু সংবাদ। পাড়ার তিন মহিলা অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাস-পাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল। এমন ত মাঝে মধ্যে হয়ই। তিন জনের দুজন বৃদ্ধা অন্যজন শবুর পরিচিত কাছের মানুষ রুমার মা।

দুই বৃদ্ধার মধ্যে একজন সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে, অপরজন হাস-পাতালে আরোগ্যলাভ করছে। কিন্তু এক ভর দুপুরে খবর এল রুমার মা আর ফিরবে না। দুঃখে অধীর হয়ে শবু ছুটল রুমাদের বাড়ী, সেখানে কান্নার রোল উঠেছে। হারাণীদি, রায় গিন্নী, বাঙাল বৌ এর মত রুমার মা-ও পুরোনো বাসিন্দারের একজন, তারাও সবাই এসেছে।

রুমারা তিন বোন দু ভাই, এক ভাইয়ের মাত্র বছর দুই আগে বিয়ে হয়েছিল, একটি মেয়েও হয়েছে। রুমা বোনদের মধ্যে বড়, এখনও বিয়ে হয় নি। মাঝে মাঝে বিয়ের জন্য চেষ্টা চলছিল। এমনি অবস্থায় ভরা সংসার ফেলে, স্বামী ছেলে মেয়ে ছেলের বৌ নাতনী রেখে রুমার মা চলে গেল। কতই আর বয়স হবে, শবুর চাইতে বছর পাঁচেকের বড়।

সবাই বলছে—বড় সুখের যাওয়া গেছে, সধবা সতীলক্ষ্মী মাথায় সিঁদুর নিয়ে চলে গেল। কিন্তু শোকে পাষাণ হয়ে যাওয়া তার প্রৌঢ় স্বামীর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। কাঁদছে রুমা, তার বৌদি আর ভাই বোনেরা। একজন চিরদিনের মত চলে গেল—শবুরা তার নাম জানেনা—সবাই জানে সে ছিল রুমার মা।

রাতের খবরে জানা গেছে হাওড়া লাইনে ট্রেনের একটা বড় ধরনের এক্সিডেণ্ট হয়েছে। তপুর বর অমলও ঐ লাইনে ঐ রকম সময় ট্রেন ধরে অফিসে যায়। খবর শুনে দুশ্চিন্তায় রাত কাটল।

সকালে উঠে খবরের কাগজে হতাহতের তালিকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, তাতেও কিছু পাওয়া গেল না। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত কাগজে একটা নিরুদ্দেশের খবর বেরিয়েছে—দেবানন্দপুরের শিবেশ্বর বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা—সঙ্গে একটা ফটোও ছাপিয়েছে, একনজর দেখেই বোঝা যায়—এই ত সেই চেনা মানুষটি।

দীননাথ বলল—'রইল আমার অফিস যাওয়া, আজ চল দু জায়গায় খোঁজ খবর করে আসি—বিষড়াকোন্নগর আর দেবানন্দপুর একই লাইনে। তাড়াতাড়ি খেয়ে গাড়ী নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।'

তপুদের বাড়ীতে যেতে তপু হাউ মাউ করে বলে উঠল—'জানিস মেজদি, কাল আমার কি অবস্থা। সারাদিন একবার ঘর একবার বার করছি। শুধু আমি নই, পাড়ার অধিকাংশ বাড়ীতেই এক অবস্থা। পাড়ার ছেলেরা ছুটে ছুটে ষ্টেশনে যাচ্ছে, সেখানে খোঁজ নিচ্ছে আর যার যার বাড়ীতে খবর দিচ্ছে। আমি কোন খবর পাচ্ছিনা। তারপর রাত প্রায় আটটায় ফিরে এসে বলল আমি সে গাড়ীতে যাইনি, উল্টোদিকের গাড়ী ধরে সাইটে গিয়েছিলুম। দুশ্চিন্তা হয় কি না, বল মেজদি?'

'দুশ্চিন্তা বলে দুশ্চিন্তা! ঘরের মানুষ বেরিয়ে বাড়ী না ফেরা পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তা থাকেই, তার উপর আবার এত বড় একটা এ্যাক্সিডেণ্ট। যাক, অমল সুস্থ আছে, আজ আবার খেয়ে দেয়ে অফিসে গেছে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল' —বলে শবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দীননাথও নিশ্চিন্ত হয়ে বলল—'আমি তা হলে এই ফাঁকে দেবানন্দপুরে গিয়ে শিবেশ্বরবাবু কি করে হারিয়ে গেল জেনে আসি। তোমরা ততক্ষণ বসে বসে গল্প কর।' দীননাথ চলে গেল।

তপু জিজ্ঞেস করল—'তোরা সেবারে বর্দ্ধমান থেকে ফেরার পথে যাদের বাড়ী গিয়েছিলি—সেই ভদ্রলোক হারিয়ে গেছে?'

শবু বলল—'হ্যাঁ, শিলংএ তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—তারাও স্বামী স্ত্রীতে একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল।'

তপু বলল—'তোরা ত খেয়ে এসেছিস বললি, আয় আমরা এখানে বসে বসে গল্প করি।'

শবু বলল—'হ্যাঁ, গল্প ত করবই। আয় এখানে মেঝেতে শুয়ে শুয়ে গল্প করি, অনেক কথা আছে।

'দাঁড়া তবে, মাদুরটা পেতে দিই'

তপু মাদুর পেতে দিতে পুতুলকে কোলে নিয়ে পাশে শুইয়ে নিজেও শুয়ে শবু বলল—

'জানিস তপু, আমার আর আগের সেই শক্তি নেই, সব সময় কেমন দুর্বল ঠেকে। সেই যে বোম্বে থেকে ফিরে আমার কদিন জ্বর হল তারপর থেকে কিছুতেই আর শরীরটা ভাল হচ্ছে না। অথচ বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। তারই মধ্যে সব করতে হচ্ছে। দেড়মাস ধরে ভবর বাড়ী তৈরীর ঝামেলাও পোহাতে হল।'

দু বোনের সুখ দুঃখের গল্প চলতে লাগল। শবু দীননাথের বলা কথাটাও তপুকে বলল। শুনে তপু বলল—

'ঠিক বলেছিস মেজদি। এরা এমনিতে বেশ আছে, কিন্তু এদের মা-বাবা ভাই বোনরা এলেই এরা যেন কি রকম হয়ে যায়। আর হয়েছে অফিস। বাড়ীতে ফিরে যদি কথা বলল ত হয় অফিসের কথা না হয় মেয়েটাকে নিয়ে 'মা রে' করে আদর করা। তবু ত জামাইবাবু আর তুই বেশ সারাদিন গল্প করিস ঠিক আমাদের বাবা-মার মত, আমার দেখে খুব ভাল লাগে।'

শবু বলল—'ঐ টুকু আছে বলেই বেঁচে আছি। না হলে সেদিন যে অত বড় কথাটা বলে ফেলল শুনে কেমন লাগে, বল?'

তপু বলল—'সত্যি মেজদি, জামাইবাবু বেশ চালাক চতুর আবার একএক ব্যাপারে খুবই বোকা।'

শবু বলল—'হ্যাঁরে ভাল কথা, সেবারে যে তোকে বড়বৌদির দেয়া কাপড় থেকে কেটে ব্লাউজ করতে দিয়েছিলাম, হয়েছে?'

তপু মুখখানা করুণ করে বলল—'না রে মেজদি, কি হয়েছে জানিস? সেলাই মেশিনটা খুললেই বাড়ীউলীরা এসে জ্বালায়, আমার এইটা একটু সেলাই করে দাও ত। দেবো রে, দেবো। তোর কি ব্লাউজ কম পড়েছে?'

'না, দিস যখন সুবিধে হয়' শবু পুতুলের সঙ্গে খেলা করতে করতে অন্য-মনস্কভাবে জবাব দিল।

তপু বলল—'মেজদি, জামাইবাবুকে যদি একটা উলের সোয়েটার বুনে দি পরবে না?'

'তুই জিজ্ঞেস করে দেখিস, তুই বুনে দিলে নিশ্চয়ই পরবে। এমনিতে

হাতে বোনা ওর পছন্দ নয়।'

'জিজ্ঞেস করে আর কি হবে, তুই বললেই হবে। এবার শীত ত গেলই—সামনের শীতের আগে বুনে দেব।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁরে, অমলের বিয়ে-পাগলা বন্ধু দেবনাথবাবুর খবর কি?'

তপু—'আছে। এখনও মাসে একটা করে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাকেও জ্বালাতে আসে।'

দীননাথ ফিরে এল। বলল—'সন্ত রিটায়ার করা মানুষ শিবেশ্বরবাবু সত্যিই হারিয়ে গেছে। সকালে উঠে লুঙ্গী আর সামান্য একটা শীতের চাদর জড়িয়ে অন্যদিনের মত ঘুরতে বেরিয়েছিল আর ফেরে নি। মাঝে মাঝে নাকি কেমন সব ভুলে যেত। শিবেশ্বর বাবুর স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করছে।'

বিয়ের পর থেকে এত বছর এক সঙ্গে ঘর সংসার করে একজন যদি এরকম হঠাৎই চলে যায় তবে কান্না ছাড়া আর কি থাকে? মামা হারিয়ে যাবার পর থেকে মামীমারও সেই অবস্থা। নিরুদ্দেশ হওয়া আর মারা যাওয়া প্রায় একই কথা—কোনদিন ফিরবে না হয়ত, কোথায় কি অবস্থায় থাকে, কোথায় কি ভাবে মারা যায় জানা যায় না—ভাবতেই কেমন লাগে।

অমল বাড়ী ফিরলে তাকে দেখে একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে শবুরা বাড়ী ফিরে চলল। বলল—

'অমল—তপু আর পুতুলকে নিয়ে আবার একবার কদিনের জন্য এসো।'

অমল বলল—'যাব মেজদি, দোলের পরেই আমরা একবার হরিদ্বার লচমন ঝোলা বেড়াতে যাব, বাবা মা-ও যাবেন, তাঁদের জন্যই যাওয়া। আমার ভাই ভাইবৌরাও যাবে।'

শবু বলল—'আমাদেরও একবার দিল্লী হয়ে হরিদ্বার যাবার কথা আছে, তবে সে হয়ত মে মাসে। তপু আসিস।'

তপু বলল—'ঐ ত শুনলি। দেখ কবে ফিরি, কবে আবার তোদের ওখানে যাওয়া হয়।'

হ্যাঁ, তপুদের যাওয়া আসা আছেই। সেইজন্য ওদের বিয়ের নাইলনের মশারীটা, একটু পুরোনো হয়ে গেছে, শবুদের বাড়ীতে রাখা আছে যাতে বার-বার টানাটানি করতে না হয়।

ছয়

কিছুদিন বিরতির পর ভবর বাড়ীর কাজ আবার শুরু হয়েছে। ছাদের সেন্টারিং খোলা হয়েছে, কিন্তু ছাদ ভেঙে পড়েনি। এখন সেখানে জোর প্লাষ্টার ও মেঝের কাজ চলছে আর শবুকে সিমেন্ট বালির জঞ্জাল পরিষ্কারের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, দুপুর বেলায় বিশ্রামের ব্যাঘাত ত আছেই। কবে যে সিমেন্টের বোঝা ঘাড় থেকে নামবে!

ভব বলেছে—'ষ্টোররুমের মেঝেটা হয়ে গিয়ে আগে গোটা তিনেক দরজা বসিয়েই সিমেন্ট সেখানে রেখে তোমার ঘর খালি করে দেবো।'

শবু বলেছে—'তোমার দয়া।'

অন্য পাঁচরকম অসুবিধে ছাড়াও একটা নতুন অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। সেদিনের ঘটনা ভেবে বাথরুমে স্নান করতে শবুর অস্বস্তি লাগে। আগে স্নানের জন্য ছোট রান্না ঘরটাকে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারত, সিমেন্টের জন্য তাও পারা যায় না। বাড়ীতে এত কাজ হচ্ছে তবু ঐ ফোকরটুকু বন্ধ করাবার অবসর পাচ্ছে না দীননাথ।

সে এখন অফিস সংসারের সঙ্গে সঙ্গে সব দরজা জানালা নতুন করে পেণ্ট করতে ব্যস্ত। কার্ত্তিক নামে একজন লোককে লাগিয়ে আগে দরজা জানালা গুলো ঘষে পরিষ্কার করিয়ে বাইরের বড় দরজা জানালা রং করার মত কঠিন কাজগুলো করিয়ে নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে দীননাথ নিজেই রোজ একপাল্লা দুই পাল্লা করে রং করছে। একটা করে রং লাগান হচ্ছে আর শবুকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে—

'দেখ, কেমন সুন্দর রং করেছি, কার্ত্তিকের থেকে কিছু খারাপ হয়েছে কি?'

'না, খুব ভাল হইছেরে বা, কিতা কও তুমি! ইন্‌কো সব কাম আতা হ্যায়' বলে শবু দীননাথের পিঠ চাপড়ে দেয়। 'এবার চান করতে যাও, অফিসের বেলা হয়ে গেল। রং লেগে লেগে জামাটার কিছু রইল না।'

শবুরা অনেক রাজ্য ঘুরেছে, শেফালীর বর কাঞ্চন ঠাট্টা করে বলত—'বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসামের রাণী, মহানসম্রাজ্ঞী।' তাই সুখ দুঃখ আনন্দে নিজেদের মধ্যে কখনো ওড়িয়া, বা অসমীয়া, বা শিলেটী ভাষা ব্যবহার করে

শবুরা। পাটনায় থাকতে যমুনাকেও তার স্বামী সুমনজীর কাজের প্রশংসায় বলতে শুনত—ইনকো সব কাম আতা হ্যায়। শবুর 'ব' (বর) ই বা কম কিসে ?

অর্দ্ধেক কাজ করিয়ে কার্ত্তিককে ছাড়িয়ে দিতে সে মনঃক্ষুন্নই হয়েছিল। শবুকে বলেছিল—

'বৌদি, দাদারে ক'ন—সবডা কামই আমারে দিতে।'

শবু বলেছিল, তাতে কোন কাজ হয়নি। নিজেই করবে, কতগুলো পয়সা বাঁচবে। ওদিকে একটু একটু করে রং হচ্ছে বলে রোজ রং-এর কৌটোয় সর পড়ে একগাদা করে দামী রং নষ্ট হচ্ছে। হোক, সামনে দিয়ে সুচ না গললেই হল। এই বুদ্ধি নিয়েই দীননাথ সংসার করে।

এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় ভব এক কাণ্ড করে বসল। কণ্ট্রাক্টরের প্রাইভেট গাড়ীতে করে কিছু সরঞ্জাম এনে তার কুলি মজুরদের হাঁক ডাক করতে লাগল—

'এরা সব গেল কোথায় ? রাতে দুজনের অন্তত এখানে থাকার কথা। এখন এতগুলো জিনিষ দু'শ হাত দূরের রাস্তা থেকে কে টেনে আনবে ?'

কে টেনে আনবে ? শেষে গাড়ীটাকেই গলিতে ঢুকিয়ে শবুদের বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে কণ্টাক্টর, দীননাথ আর ভব হাতে হাতে সে সব এ বাড়ীতেই ঢোকাল। গাড়ী ঘোরাতে পারল না, সরু গলি, ব্যাক করে ফিরতে গিয়ে একটা চাকা কাঁচা ড্রেনে বসে গেল। ঝামেলা বেড়ে গেল চতুর্গুণ। শেষে মোড়ের মাথায় আড্ডামারা পাড়ার বেকার ছেলেদের অনুরোধ করতে তারা এগিয়ে এল।

বড় শালের খুঁটি চাই না হলে গাড়ী ওঠানো যাবে না—বলল সবাই।

'আমার বাড়ীর ছাদে অনেক শাল বল্লা পড়ে আছে—ভব জানাল।

কিন্তু কে ছাদে উঠে নামাবে ? ভব প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। দীননাথ ঐ রাত করে একটা নড়বড়ে মই বেয়ে উঠে খুঁটি নামিয়ে দিতে সবাই মিলে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে গাড়ীটাকে ভাল রাস্তায় তুলে দিল।

পাড়ার ছেলেরা চলে গেলে দীননাথ ভবকে বলল—'ছেলেগুলোকে চা মিষ্টি খাইয়ে দিতে হত।'

ভব গর্বিতভাবে বলল—'কণ্ট্রাক্টর ওদের মিষ্টি খেতে পঁচিশ টাকা দিতে গেছিল, ওরা নেয় নি। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে—আমাদের আড্ডা

মেয়েও সময় কাটে না, তবু ত একটা কাজ জুটে গেল। মিষ্টি খেয়ে আর কি হবে, তার চাইতে আপনারা আমাদের একটু দেখবেন।'

ভব আর কণ্টাক্টর গাড়ীতে চেপে চলে গেল। সবাই জানে দীননাথের ভাইয়ের বাড়ী হচ্ছে, সে নাকি ইঞ্জিনীয়ার, তার হাতে কণ্টাক্টর, অনেক চাকরি। শবু জানে ভব কোনদিনই এদের দিকে ফিরে তাকাবে না, এখানকার কাউকে এখন সে মানুষ বলেই মনে করে না।

কিন্তু দেখ দীননাথকে। ছোটভাই প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল আর প্রায় পঞ্চাশ বছরের দাদা রাত করে মই বেয়ে ছাদে উঠল। এ কি ধরনের মানসিকতা? শবুরও আজকাল কেমন যেন হয়েছে। কেউ কিছু করতে বললেই সঙ্গে সঙ্গে সেইকাজে লেগে যায় হাতের কাজ ফেলে—হয়ত তাতে রান্না পুড়ে ছাই হতে থাকে কিম্বা কলের জল পড়ে রান্নাঘর ভেসে যেতে থাকে। এই দাস-মনোবৃত্তির জন্য শবু নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনা।

শীতের শেষ অনুষ্ঠান শিবরাত্রিও চলে গেছে। একদিন শীলা তার দুই বড়জাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। শীলার সব থেকে বড় জা-ই নিজে উদ্যোগ নিয়ে খুঁজে পেতে মিতুদের জন্য বাসা ঠিক করে দিয়েছিল রাতারাতি। ওদের সে উপকার শবুরা ভুলবে না কোনদিন। দীননাথ তাড়াতাড়ি গিয়ে কুটুমদের জন্য বিশেষ করে শীলার ভাসুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বড়জার জন্য দোকান থেকে মিষ্টি কিনে এনে দিল।

শবু ও শীলারা তিন জায়ে মিলে খুব হাসি গল্প হল। হাসির গল্পের একটা বড় খোরাকও আছে। শবু জিজ্ঞেস করল—

'শীলা, এবার কি তোরা তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল চড়াতে যাবি?'

শীলা জবাব দেবে কি চার মেয়ে মানুষই এ কথায় হেসে অস্থির।

শীতল খুব শিবভক্ত। আগের দুবছরের মত গত বছরও সে পায়ে হেঁটে বাবার মাথায় জল চড়াতে যাবে। শীলা বলল—এবার আমিও তোমার সঙ্গে বাবার মাথায় জল চড়াতে যাব।

শীতল তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে বলেছে—খুব ভাল কথা। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে তারকেশ্বরে গিয়ে জল চড়ালে দুজনের অক্ষয় স্বর্গবাস।

আগে থেকে হিসেব টিসেব করে সবাইকে খবর দিয়ে পরদিন ভোরে উঠেই দুজনে রওনা হবে। হঠাৎ অসময়ে সেই রাতেই শীলা আটকা পড়ে গেল—শেষে শীতল একাই তৃতীয়বারের জন্য গিয়ে বাবার মাথায় জল চড়িয়ে

নিজের জন্য অক্ষয় স্বর্গবাস নিশ্চিত করে এসেছে। শীলার জল চড়াতে যাবার কথায় তাই মেয়েলী হাসি বাধা মানে না।

শীলা বলল—'না শবুদি, একবার বাধা পড়েছে—আমার ভাগ্যে সে পুণ্য আর নেই।'

শীলার বড়জা বলল—'ও দিকে ঠাকুর পো এই জামাইবাবুর গুণগানে পাড়া মাতিয়ে তুলেছে—ভায়রা আমাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে—দিদি জামাইবাবুর মন খুব ভাল। জামাইবাবুকে বলবেন, শীলা আর ঠাকুরপোকে যেমন মাঝে মাঝে মোটর বাইকে চড়ায়, আমাকেও একদিন চড়াতে হবে।'

মেজজা বড় জায়ের মত দ্বিতীয় পক্ষ নয়, কম বয়সীও নয়। বলল—'আমার বাপু ও সব গাড়ী দেখলে ভয় করে, কি করে যে মেয়েমানুষগুলো ওর পিছনে বসে।'

সবাই মিলে গল্প করে টিভি দেখে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে হাসি গল্পে শবুর মন ভাল আছে। শবুও শিবভক্ত, খুব কাছের ঠাকুর মনে হয় শিব-ঠাকুরকে। বিয়ের আগে এবং পরেও অনেকবার সে শিবরাত্রির উপোস করেছে। এবার অবশ্য করা হয়নি নানা ঝামেলায়।

মন বোধ হয় দীননাথেরও ভাল ছিল। অনেক দিন বাদে তারা দুজনে পরস্পরকে কাছে পেয়েছিল, শিবরাত্রির দুদিন পরে তারা ফিরে পেয়েছিল একটি মিলনরাত্রি।

দুখানি চিঠি এসেছে। একটিতে বিদ্যুৎ লিখেছে, সে দুটো চাকরিরই অফার পেয়ে মাসী মেসোর কথামত দুর্গাপুরেরটাই এ্যাক্সেপ্ট করেছে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে যাবে বাবা-মাকে প্রণাম করতে। আর পয়লা বৈশাখে আসবে মাসী মেসোর সঙ্গে দেখা করতে।

আর একখানি চিঠি লিখেছে সুবীরবাবু দিল্লী থেকে। বিলম্বিত পৌঁছা সংবাদ দিয়ে দীননাথকে লিখেছে—আপনার জন্য একটা খবর আছে, শুনলাম চাটুকার স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে, শাহ কমিশনে তার নামে দুতিনটি মামলা চলছিল।

দীননাথ খুশি হয়ে বলতে লাগল—'ঠিক হয়েছে। কত আশা ছিল বয়স ভাঁড়িয়ে আরো দশ বছর চাকরি করবে। আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে।'

শবু খুশি হতে পারে না, চুপ করে থাকে। মৃত্যু মাত্রেই তার কাছে

শোকাবহ মনে হয়, তা সে যত বড় শত্রুরই হোক।

দীননাথ বলে চলেছে—'আমার দরখাস্তের জবাবের জন্য হেড অফিসে একটা তাগাদা পাঠাতে হবে। দেখি চাটুকারের ভূত ওদের ঘাড় থেকে নেমেছে কিনা।'

এদিকে দরজা জানালা রং করা প্রায় শেষ, এখন বাকি শুধু ছোট রান্না ঘর আর পায়খানা বাথরুম। ভবর ঘরে দু তিনটে দরজা লাগতে তার মজুররা সিমেণ্টের বস্তাগুলো নিয়ে গেল। দীননাথ বলল—

'সন্ধ্যাকে বোলো ঘরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় যেন, কাল থেকে ও ঘরের দরজা জানালা রং করা হবে।'

সিমেণ্টের বস্তা সরে যেতে ও মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করতে দেখা গেল বাঙাল বৌ-এর ধারণা কত সঠিক ছিল। ঘরের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে, মেঝের একটা দিক বসে গেছে। দীননাথকে ডেকে দেখালে সে বলল—

'দেখা যাক ভব কি বলে।'

শবু ভবকেও ডেকে দেখিয়েছে। সে ঘাড চুলকে বলল—'তাই তো। এমনটা ভাবা যায়নি।'

ভবর ভাবা ঐ পর্য্যন্তই। নিজের ঘরের ছাদ ভেঙে পড়বে বলে সে কপাল চাপড়েছিল, এ বাড়ীর ঘর বসে গেল, ফাটল ধরল তার বেলায় নাকি—এমনটি ভাবাই যায় নি!

সাত

এতদিনে দীননাথের হাত একটু অবসর হয়েছে, রং এর কাজ শেষ। সেই কবে পুজোর পরে বাড়ীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল এতদিনে বোধ হয় সব কাজ শেষ হল। দোল আসতেও আর দেরী নেই।

দীননাথ বলল—'এবার চল বোম্বে ডাইইংএর দোকান থেকে তোমার পছন্দের একখানা শাড়ী কিনে নিয়ে আসি।'

সেখানে অনেক ভাল ভাল প্রিণ্টের শাড়ী, কিন্তু সবই পাড় বিহীন। এ সব শাড়ীর নাকি পাড় থাকে না, বিনা পাড়ের শাড়ী শবুর পছন্দ নয়। তার চোখের সামনে ভাসে চওড়া চওড়া পাড় দেয়া শাড়ী পরা মার সুন্দর ছবি-খানি।

নাঃ এবারেও হল না। শেষে একটা ব্লাউজ পীস কেনা হল, শবু বাড়ীতে নিজেই কেটে হাতে সেলাই করবে। দীননাথ তার বাইরের ঘরের বিছানার জন্য চাদর ঠিক মত খুঁজে না পেয়ে একটা ব্লাউজের থান থেকে মাপমত একটা পীস কিনল।

শবু বলল—'এ কাপড়ে চাদর হবেনা, চওড়ায় টান পড়বে।'

দীননাথ শুনল না. বলল—'না, হয়ে যাবে।'

ফিরে এল দুজনে। দেখা গেল শবুর কথাই ঠিক, চাদরটা চওড়ায় আঁট পড়ছে, ঝুলে থাকা ত দূরের কথা তোষকই পুরো ঢাকছে না। ধুলে ত আরো ছোট হয়ে যাবে। দীননাথ ভাবনায় পড়ে গেছে, চাদরটা নিয়ে এখন সে কি করবে।

ধাপে ধাপে আর একটি মৃত্যু এগিয়ে আসছে একেবারে প্রায় বাড়ীর দোর গোড়ায়। তন্বীর শাশুড়ী মৃত্যু শয্যায়।

মাসীমা ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, খুব নিষ্ঠাবতী। স্বভাবতই শেষ বয়সে একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই নিয়ে সে বাড়ীতে মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দিত। এক এক সময় মন খারাপ লাগলে মাসীমা এসে শবুর কাছে কেঁদে নিজের মনের ভার লাঘব করতেন। তন্বী শোভা তারাও এসে নিজের শাশুড়ীর কথা বলে। শবু শুনে যায় শুধু. কিছু বলে না, নিজের শাশুড়ী সম্বন্ধেও কিছু বলে না। কি হবে বলে--শুধুই লোক হাসবে।

মাসীমা মনের দুঃখে অনেক কথা বলেন—

'নাতি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল হেইতে বৌয়ে কি হৈচৈডাই না করল। বেশী প্রশংসা করলে পোলা ত বিগড়াইবোই, অখনে তিন চারডা মাষ্টার রাইখ্যাও পোলা কুনো রকমে পাশ করে।

'আমি বিধবা মানুষ, আচার বিচার লইয়া থাকি। বৌয়ের ত ঝাড়া হাত পা, সোয়ামী রোজগার করে, হ্যায়ও বোধন বোসরে ধইর‍্যা একখান চাকরিত ঢুকছে। আমিষ রাঁধনের বাইরের কামের আলাদা আলাদা লোক রাখছে। তা যা করে করুক, আমি যানি আমার বাপের দেওয়া বাড়ীত থাইকা শান্তিতে দুচোখ বুজতাম পারি।...

'তা গো মা দুর্গা, তুমারে আমি মা দুর্গাই কই, তুমি ত এত বছর শাশুড়ী লইয়া ঘর করলা লোকের মুখে শুনছি নিজেও দেখছি কুনদিন শাশুড়ীর লগে উঁচা গলায় কথাডি কও নাই। তুমার মত শান্ত নরম মাইয়া মানুষ আমি

আর দেখছি না।···

'সময় থাকতে তুমারে কইয়া রাখি গো মা দুর্গা, দেহের কথা, মরণ বাঁচনের কথা ত কওন যায় না। ছাওয়ালরে কইয়া রাইখো, আমার মৃত্যু হইলে যানি কাঁধ দেয়, বামুনে ছাড়া আর কেউ যানি কাঁধ না দেয়। তাইলেই আমার আত্মার তৃপ্তি হইবো। অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করছি, অখনে যত তাড়াতাড়ি যাইতে পারি হেই কামনাই করি।'··

সেই মাসীমা এখন মৃত্যু শয্যায়। শবু গিয়ে দেখে এসেছে, তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি যেন মাঝে মাঝে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, এদিকে পুরোপুরি জ্ঞান আছে। শবু পাশে গিয়ে বসতে তার একখানি হাত ধরে মাসীমা তাকিয়ে রইলেন, দুচোখ বেয়ে জল ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে, নীরব চাহনিতে মাসীমা যেন বলছেন—বামুনের কথাডি যা কইছিলাম, মনে আছে ত, মা দুর্গা?

মাসীমাকে দেখে অবসন্ন দেহ মন নিয়ে বাড়ী ফিরে শবু দীননাথকে বলল—

'শুনছো, মাসীমা বোধ হয় আর বাঁচবেন না, তোমাকে যে কথাটি বলেছি মনে আছে ত?'

পৃথিবীতে মৃত্যু যেমন আছে, জন্মও তেমন সত্য। আর সবেতেই জড়িয়ে আছে মানুষের কর্তব্যবোধ মাসখানেক আগে বেহালাতে ডুলুর বৌ রত্নার একটি ছেলে হয়েছে। মাসীমা নাতি হবার আনন্দে শবুদেরকে একবার গিয়ে দেখে আসার জন্য চিঠি দিয়েছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার।

দীননাথ বলল—'কাল সকালে আহ্নার পাট না করে চল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। টেভিটা গণ্ডগোল করছে, টিভির অফিসে খবর দিয়ে এম্ এল্ এ হোস্টেলে দুপুরের খাবার খেয়ে বেহালায় কিস্কুদিদের বাড়ী, ডুলুর কোয়ার্টার হয়ে ফেরার পথে পারলে একবার যাদবপুর ঘুরে বাড়ী ফেরা যাবে সন্ধ্যে নাগাদ।'

পাশের বাড়ীতে মাসীমা মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। এখন দূরে কোথাও যেতে শবুর ভাল লাগছে না। অথচ কর্তব্যও একটা আছে। আর যাদবপুরে যাবার কথাটাও ভাল লাগছে না। করবীরা ত আসা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। বছর খানেক আগে ঐ করবীর বাড়ী থেকে ফিরতেই মাণিকতলায় এসে এমন বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর হয়ে শবু কদিন খুব কষ্ট পেয়েছিল। এবার আবার কি হয়!

শবু বলল—'এক সঙ্গে এতগুলো জায়গায় কি যাওয়া যাবে? তোমারও আবার সর্দি কাশি হয়েছে।'

দীননাথ বলল—'কাশি হয়েছে, তাল মিছরিও আছে। মোটর বাইকে যাব কোন অসুবিধে হবে না। যাতায়াতের পথে তোমার সেই শাড়ীটাও কেনার চেষ্টা করা যাবে।'

কথা বার্ত্তা ঠিক করে দুজনে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। অভ্যাস মত চোর তাড়ানো মন্ত্র পড়া শেষ করে শবু সবে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্ট করছে। এমন সময় পাশের ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনে শবু ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল—

'কি হল, অমন আওয়াজ হচ্ছে কিসের?'

কোন জবাব এলনা। পরক্ষণেই চাঁদনী রাতের আবছা আলোয় শবু দেখতে পেল দীননাথ পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে ঘটি থেকে উঁচু করে জল গলায় ঢেলে বসে হাঁফাতে লাগল। ঘটনাটা কয়েক সেকেণ্ডের। শবু তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দীননাথকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল—

'কি হয়েছে, এমন করছ কেন? এই ঠাণ্ডার রাতেও দেখছি তোমার সারা শরীর ঘেমে উঠেছে!'

দীননাথ একটু দম নিয়ে বলল—'চিৎ হয়ে শুয়ে মুখের তাল মিছরি এক গাল থেকে আর এক গালে নিতে গিয়ে সোজা গলায় ঢুকে আটকে গেল। উঠে বসে গলা খাঁকারি দিলেও তা বের হল না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ছুটে এসে গলায় জল ঢেলে দিতে মিছরি গলা থেকে নামল। এখন ঠিক আছে, নাও শুয়ে পড়।'

শবু দীননাথকে হাত ধরে বিছানায় পৌঁছে দিতে দিতে বলল—'আমার গা ছুঁয়ে বল, আর কখনো মিছরি মুখে নিয়ে শোবে না।'

দীননাথ বলল—'দেখি।'

এই দেখি শবুর জানা আছে। তার মানে আবার দরকার হলে সে মিছরি খাবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছিল। সেবার সুব্রত মুখার্জী গলায় মাংস না কি বেধে খাবার টেবিলেই মারা গেল, শবু খবরের কাগজে পড়েছে। এটা কেন বোঝে না, শবুর জীবনে দীননাথই সব, তার কিছু হলে শবুর যে সব শেষ হয়ে যাবে।

কাল কয়েক জায়গায় যাবার কথা আছে আর আজ রাতেই এত বড় একটা বাধা। ঠিক যেন মরণের মুখ থেকে ফিরে আসা। এ যাওয়া মোটেই ভাল

হবে না। বিশেষ করে ঐ যাদবপুর যাওয়াটা।

সকালে উঠে স্নান সেরেচ। জলখাবার খেয়ে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে, আবার এক বাধা পড়ল। শবু তাড়াহুড়ো করে আলনা থেকে কাপড় জামা নিতে গিয়ে চৌকির কোণায় এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। ব্যথায় পা টনটন করে উঠল, শব্দ শুনে দীননাথও ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল—

'কি হল, চৌকিটায় আবার ধাক্কা খেলে? দিনের মধ্যে কবার ওখানে ধাক্কা খাও বলত? একটু দেখে চল না কেন? দেখি কতটা লেগেছে?'

লেগেছে বেশ জোরই, হাঁটুর উপরটায় রীতিমত কালসিটে পড়ে গেছে, ফর্সা রংএর মধ্যে নীল হয়ে ফুটে উঠেছে। জায়গাটায় একটু জল হাত বুলিয়ে শাড়ী পড়ে শবু প্রস্তুত হয়ে দীননাথের সঙ্গে রওনা হল।

সারাদিন ধরে সি আই টি রোডে টিভি অফিস, এম এল এ হোস্টেল, বেহালায় দিদিদের বাড়ী, ঢুলুদের কোয়ার্টার, টালিগঞ্জে চিন্ময়দের কোয়ার্টার শেষে যাদবপুরে করবীদের বাড়ী হয়ে যখন ফিরে রওনা হল তখন রাত প্রায় আটটা বাজে।

জামাইবাবু রিটায়ার করেছে অনেক দিনই, এখনও পেনশন হাতে আসে নি। সুশীল কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে, বিশেষ কথা টথা বলে না, তবে অনেকদিন পর আদরের মেজো শালী শবুকে দেখে আগের মতই দুষ্টুমি ভরা মিটি মিটি হাসছিল। শবুরা মিষ্টি নিয়ে গেছে, আগে ভাগে মিষ্টি খেতে আরম্ভ করেছে। কানাইয়ের দেয়া দুশ টাকা শবুরা অনেক আগেই একবার এসে দিয়ে গেছে।

শবুর আজকাল দুর্বল লাগে শুনে দিদি বলেছে—'শবু, তোর প্রেসার কি 'লো' না কিরে? 'লো' হলে হাঁসের মত সারাদিন খাবি।'

না, শবুর প্রেসার 'হাই'ও না 'লো'ও না—'নর্ম্যাল', ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে। দীননাথ আবার বেশী খেতে বারণ করে, বেশী মোটা হলে না কি হার্টের পক্ষে খারাপ।

ঢুলুদের কোয়ার্টারে প্রথমবার গেছে শবুরা। প্রথমে ছেলেটাকে দেখে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখেছে। সবাই খুব খুশি। ঢুলু অফিস আর কো-অপারেটিভ নিয়ে খুব ব্যস্ত। রত্না ছেলে হওয়া ছাড়া অফিসের কোয়ার্টারের সোসাইটিতে নিজেদের প্রেস্টিজ বাড়াতে ব্যস্ত। বড় মেয়েটা এখনও চাঁপা-তলায় যাব বলে কাঁদে। মামীমার মন ত পড়ে আছে চাঁপাতলাতেই—বাড়ীটার

প্রতি মায়া, স্বামী ও চিন্ময় স্মৃতি, ভুলুর জন্য দুশ্চিন্তা এবং শবুদের ও অন্য প্রতিবেশীদের প্রতি টান। রত্নার মুখে নাকি এখন নতুন বুলি—প্রেষ্টিজ, এটিকেট আর 'যার যার তার তার'—এখনকার দিনে একটা অতিরিক্ত লোকের পিছনে খরচ কত পড়ে? আবার শাশুড়ীকে না হলে চলেও না, ছেলে মেয়ে মানুষ করা গু-মুত ঘাঁটা এসব করতে গেলে যে ফ্যাশন করা চলে না। আবার কথায় কথায় ফিট হওয়াও আছে।

রওনা হবার মুখে মামীমা বললেন—'শ্রাবণী, তোমরা এলে, আমার মনটা খুব খুশি হল। আবার কবে দেখা হবে কে জানে—চাঁপাতলা আর বেহালা ত কম দূর নয়। আমিও নানান অসুখে প্রায় পঙ্গু।'

চাঁপাতলার বাড়ীটা মামীমার প্রাণ। শবুদের বাড়ীটাও শবুর প্রাণ, কোনদিন যে সেটা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে মনে হয়না।

দিনের আলো থাকতে থাকতে কোয়ার্টার থেকে রওনা হবার মুখে দূরে পূব আকাশের কোণে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা গেল।

পথে চিন্ময়দের কোয়ার্টারে কয়েক মিনিটের জন্য বসা। শবুদের বাড়ীর জলছাদ উঠোন হয়ে যাবার পরে চিন্ময় মীরারা একবার গেছিল। মাঝখানে এখন আর খুঁচা নেই তাই সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছে। কোয়ার্টারে ওরা বেশ গুছিয়ে বসেছে—মফঃ গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে শহুরে পরিবেশে রপ্ত হয়ে উঠেছে।

যাদবপুরের বাড়ীতে পৌছতে সেখানে ঘরে করবীর বিধবা পিস্‌শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই, যে যার মত বেড়াতে ও আড্ডায় গিয়ে বসে আছে, মেজ ননদাই অফিস থেকে ফেরেনি, সন্ধ্যা গড়িয়ে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

খবর পেয়ে আধঘণ্টা পরে হন্তদন্ত হয়ে করবী ফিরতে দীননাথ বলল—'সন্ধ্যে বেলাও বাড়ী থাকিস না, রোজ রোজ মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে মেয়েকে কি কুমন্তর কানে দিস? ছেলেগুলোও আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

করবীর অজুহাত—'নাতির শরীর খারাপ, তাই একটু দেখতে গিয়েছিলাম।' এদিকে অসুস্থ নাতি তার মায়ের কোলে চেপে সেজদাদু দিদিকে দেখতে এসেছে।

রাত আটটা বেজে গেছে, আর বসার উপায় নাই। শবুদেরই আনা মিষ্টি থেকে দুটো করে মুখে দিয়ে জল খেয়ে আবার রওনা। ততক্ষণে ছেলেরা মামা মামী এসেছে খবর পেয়ে এক এক করে আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরছে, পড়াশুনার বালাই নেই।

যাদবপুর থেকে আবার সেই মানিকতলার মোড়ে পৌঁছতে রাত ন'টা। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ী আটকে থেকে আবার চলতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি— ক্লাচের তার ছিঁড়ে গেল, গাড়ী অচল।

রাত নটা বেজে গেছে, একটু পিছিয়ে কাছাকাছি যে স্কুটার কারখানা ছিল সেটাও মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। কুছপরোয়া নেই, সঙ্গে এক্সট্রা তার আছে, দীননাথ নিজেই তার লাগিয়ে নেবে। সার্কুলার রোডের উপর এক পেট্রোল পাম্পের আলোতে দাঁড়িয়ে তার লাগাতে গেল। ঐ যাঃ বড় স্ক্রু ড্রাইভারটাত নেই, ভবর ইলেকট্রিক মিস্ত্রী সেটা কাজের জন্য নিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি, ভবকে বলেও কিছু হয়নি।

পেট্রোল পাম্পের কর্মচারীর কাছ থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার চেয়ে নিয়ে সেখানে থেমে থাকা লরীগুলোর ড্রাইভার ক্লীনারদের সাহায্যে অপটু হাতে তার লাগাবার চেষ্টা চলতে লাগল। লোড শেডিং হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল—দূর পূব আকাশে দেখা মেঘটা কখন মাথার উপর উঠে এসেছে।

লোকগুলো বেশ ভদ্র, সবার সাহায্যে দেড় ঘন্টার চেষ্টায় কোনরকমে তার লাগিয়ে মোটামুটি চলার মত হল। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শবুরা আবার পথ চলছে। চিড়িয়ামোড়ে আসতে বৃষ্টি বাড়ল, আর বরানগর পালপাড়া ফাঁড়িতে এসে ঝমঝমিয়ে। ভিজে কাপড়ে থামার উপায় নেই, দীননাথ তার রেইনকোট অর্ধেক গায়ে জড়িয়ে বাকি অংশে শবুকে মাথা বাঁচাতে বলে বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ী ছুটাল। তার ঠিক মত লাগান হয়নি, গাড়ী পনরো বিশ কিলোমিটারের চাইতে বেশী বেগে চলছে না। ভিজে জবজবে হয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় দুজনে বাড়ী ফিরল। ভিজে পোষাকে গাড়ীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে শবুর ডজন খানেক হাঁচি হল—নির্ঘাত আবার সর্দি লাগবে, জ্বর হবে।

হবে না? দু দুটো বাধা ঠেলে বেরুনো। আর ঐ যাদবপুরের জন্যই এ সব হল। অতটা ঘুরতে না হলে পথে তারও ছিঁড়ত না, বড় জোর না হয় বাড়ীর কাছে এসে ছিঁড়ত, আর বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ী পৌঁছত। মাঝ-খান থেকে শবুর শাড়ীটাও কেনা হলনা।

সকালে ঘুম ভাঙল তন্বীদের বাড়ীতে কান্নার রোলে—মাসীমা মারা গেলেন এই ভোর রাতে ঊষা লগ্নে। আর তিন দিন পরেই দোল। দীননাথ মাসীমাকে কাঁধ দিতে গেল।

আট

বাড়ী থাকলে তার সঙ্গে খুটখাট কাজও লেগে থাকে। রান্না খাওয়া ছাড়াও শবুর বড় কাজ সারা বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গাছের ডালপালা শুকনো পাতা জড়ো করে গুছিয়ে রাখা, বাড়ীও পরিষ্কার থাকে উনুনে আঁচ দিতেও সুবিধে হয়। দীননাথও সব সময় বাড়ীর পিছনে লেগে আছে।

গত চৈত্রে এক লরী মাটি কিনে বাড়ীর চারপাশে ফেলা হয়েছিল, সেটা হয়ত উই ঢিবির পাশের মাটি ছিল, বর্ষায় বাড়ীর একটা দিকে ভীষণ উই পোকার আক্রমণ হতে দেখা গেছে। তার পিছনে কেরোসিন তেল, বেগন স্প্রে ছিটিয়েও কিছু হয়নি। ভব তার বাড়ীর ভিৎ গাঁথার সময় এ্যালড্রিন ছড়িয়েছিল অনেক, তার কথা মত দীননাথ বাকি ওষুধটা উইলাগা দিকটায় ঢেলেছিল। এখন এক দুদিন বৃষ্টি হতে আবার দু এক জায়গায় উই লাগতে দেখা যাচ্ছে। দীননাথ আবার স্প্রে পাম্প হাতে নিয়ে বেগন স্প্রে ছিটাতে লেগেছে।

আর এই স্প্রে পাম্প ব্যবহার করতে গিয়েই পাড়ায় ঘটল এক অঘটন। পাড়ার ভবানীবাবু সন্ধ্যের মুখে অফিস থেকে ফিরে চা রুটি খেয়ে তার স্ত্রীকে বলল -'শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে বিশ্রাম করি।'

কিন্তু চাঁপা নিমপুরের মশা, সন্ধ্যেবেলায় শুতে কি দেয়? বিরক্ত ভবানী বাবু উঠে সারা ঘরে বেগন স্প্রে ছিটাতে লাগল, শেষে নীচু হয়ে খাটের তলায় স্প্রে করতে গিয়েই বুকের অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার আসতে আসতে সব শেষ। ভবানী বাবু দীননাথের বন্ধুস্থানীয় তার স্ত্রীও শবুর পরিচিত, বাঙালবৌদের পাশেই তাদের বাড়ী।

আবার শবু দীননাথকে বলল—'দেখলে ত কি কাণ্ড হল ঐ স্প্রে করতে গিয়ে। আমার পা ছুঁয়ে বল আর কখনো তুমি স্প্রে করতে যাবে না—যত উইই লাগুক।'

দীননাথ মনে মনে ভয় পেলেও মুখে বলল—'না, না, শুধু স্প্রে করার জন্য হবে কেন? ভদ্রলোকের হার্টটা হয়ত দুর্বল ছিল, তার উপর নীচু হয়ে পাম্প করতে গেছে, তাইতে এই দুর্ঘটনা হয়ে থাকবে।'

নাঃ, বললে শুনবে না। যা করার শবুকেই করতে হবে। দীননাথ

অফিস চলে গেলে সে স্প্রেপাম্পটা লুকিয়ে রাখল—জেনে শুনে ত⋯।

আজ দোল। শবুদের রং খেলার কোন বাড়াবাড়ি নেই। বাড়ীতে যদি কেউ এল ত একটু আবীর দিয়ে প্রণাম করে গেল। কচি ফড়িং ও তাদের দিদিরা এসেছিল, সঙ্গে তাদের সেই বীরাঙ্গনা বৌদিও যে তার স্বামীকে দেশলাই জ্বালতে না দিয়ে আগুন লাগিয়ে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বৌটি শবুদের প্রতি কৃতজ্ঞ, ভাগ্যি তারা সময়মত গিয়ে পড়েছিল।

রং-এর পর্ব যা তা দুপুর পর্যন্তই। বিকেলে গতবারের মত ষষ্ঠীতলায় যাবে কাকা কাকীমার পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে।

দীননাথ বলল—'সেই ব্লাউজের কাপড়ের বিছানার চাদরটা সত্যি ছোট হচ্ছে। ওটা দিয়ে না হয় ব্লাউজই বানিয়ে নাও।'

শবু বলল—'বেশ, তবে ওটাকেও সঙ্গে নাও, বেলার মেশিন আছে, বেশ ভাল সেলাইও করে। ওকে বলব তিনটে ব্লাউজ সেলাই করতে—তপুর, বেলার আর আমার।'

ষষ্ঠীতলায় কাকার বাড়ীর কাছাকাছি এসে শবু বলল—'দোলের দিন যাচ্ছি কিছু মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়।'

দশটাকার মিষ্টি হাতে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে কাকীমা বললেন—'এসো দীননাথ, আয় শবু—বেশ ভাল দিনে এসেছিস। আজ পূর্ণিমা, বাড়ীতে সত্য-নারায়ণ পুজোর আয়োজন করেছি, তোরা প্রসাদ পেয়ে যাবি।'

'তাই নাকি, এই মিষ্টিটা তবে ঠাকুরের কাছে দিয়ে দাও কাকীমা, আমি ততক্ষণ হাত পা ধুয়ে আসি।'

বাড়ীতে পুজো হচ্ছে, শবুর খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে বাড়ীতে পুজো আর্চা করতে তার খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু দীননাথ সে দিক দিয়েই যায় না। আগে অমাবস্যায় লক্ষ্মীপুজো হ'ত এখন ত তার বিচিত্র হাল। শুধু আছে পৌষ পার্বণ আর সরস্বতী পুজো। এবার শিবরাত্রিটাও করা হল না। অন্য কোন বার ব্রত পুজো পার্বণের বালাই নেই বাড়ীতে, নেই কোন বারোমেসে লক্ষ্মী, নারায়ণ বা আর কারো সেবা।

শবু খুব মনযোগ দিয়ে বসে ঠাকুরমশাইয়ের পুজো করা দেখল, সত্য নারায়ণের পাঁচালী একমনে শুনল, শান্তিজল ছিটোনো হলে ভক্তিভরে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

দীননাথ ওদিকে তাগাদা দিচ্ছে যাবার জন্য। না, আজ সে কিছুতেই

যাবে না, সব শেষ হলে প্রসাদ পেয়ে তবে যাবে। আজই বুঝি সে প্রথম দীননাথের কথার অবাধ্য হল। কি করবে, নানান ঘটনায় আজ তার মন খুবই বিক্ষিপ্ত। লোকে সত্যনারায়ণের পুজো করে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য। তারও মন চাইছে একটু শান্তি, একটুখানি স্বস্তি। হে ঠাকুর সত্য নারায়ণ, তুমি আমার মনে শান্তি দাও—শবু মনে মনে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

কাকা কাকীমাকে পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করে, সত্যনারায়ণের প্রসাদ পেয়ে দীননাথের সঙ্গে যাবার জন্য শবু প্রস্তুত হচ্ছে। বেলাকে ব্লাউজের কাজ বুঝিয়ে কাকাকে জিজ্ঞেস করল—

'কাকা, কেমন আছ?'

কাকা বললেন—'এই আছি আর কি। আমাদের তাস খেলার সাথী কমে গেছে, তাস খেলাও বন্ধ।'

'কেন, কমে গেল কেন?'

কাকীমা বললেন—'ওমা, জানিস না বুঝি। অনেক দিন পরে এলি তাই শুনিস নি। মাসখানেক হল শান্তির স্বামী মারা গেছে ষ্ট্রোক হয়ে।'

'ওমা, সেকি!' শবু অবাক হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ল।

বেলা বলল—'হ্যারে মেজদি, সেই যে তোকে বলেছিলাম শান্তিবৌদিরা সামনের বছর বিয়ের সিল্ভার জুবিলী করবে—তা আর হল না।'

শোকাহত শবু জিজ্ঞেস করল—'শান্তিদি এখন কোথায়?'

কাকীমা বললেন—'কাজ মিটে যেতে এখন কদিনের জন্য বাপের বাড়ী গেছে।'

শবুর হাত পা বুঝি অবসন্ন হয়ে আসছে। কি সুন্দর হাসিখুশি ছিল শান্তিদি। একেবারে পাশের বাড়ী বলে যেন ঠিক ঘরের লোকের মত ছিল, সব সময় আসা যাওয়া বিশেষ করে কোন বিয়ে পুজো উৎসব হলে ত কথাই নেই। আজ বাড়ীতে পুজো হচ্ছে অথচ তাকে দেখতে পাচ্ছে না বলে কিসের যেন একটা অভাব বোধ করছিল। এমন একটা অনুষ্ঠানে শান্তিদি এ বাড়ীতে এল না ভাবা যায় না। যদি আসত, তাকে কী বেশে দেখত শবু! মনে পড়ে মা চলে যাবার টেলিগ্রাম আসার সেই সন্ধ্যের কথা—শান্তিদি সেদিন আপন বোনের মত শবুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আর তার এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল সময় মত সে তা জানতেও পারল না!

ভাবতে ভাবতে শবুর দুচোখ বেয়ে জল নেমে এল। চোখ মুছতে মুছতে বলল—

'এই ত মানুষের আয়ু আর ভবিষ্যৎ! দেড়মাস ধরে একের পর এক শুধু এই খবরই শুনছি, পাড়াতেই তিনজন চলে গেল। আসি গো কাকীমা, আবার কবে কি অবস্থায় দেখা হবে কে জানে।'

কাকীমা আদর করে শবুর থুতনি ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বললেন—'ষাট্ ষাট্, কি যে বলিস তুই শবু। ওরকম করে বলতে নেই।'

'কি জানি কাকীমা, আমার যেন আজকাল কেমন খুব দুর্বল ঠেকে।'

'দুর্বল লাগে? দীননাথের সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখা, ওষুধ খা।'

'কী ওষুধ খাব, আমার কি অসুখ করেছে তাই বলতে পারব না।'

দীননাথ বলল—'শুনলেন ত কাকীমা, কি অসুবিধে হচ্ছে তাই বলতে পারে না। শীত গেল, সর্দি কাশির হাত থেকে বাঁচতে ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড কিনে দুজনেই খাচ্ছি। ওটা একটা টনিকও।'

কাকীমা বললেন—'যাই হোক, একবার ডাক্তারের কাছে যাস শবু, তুই বলতে না পারলেও ডাক্তার ঠিকই বুঝে নেবে।'

'আচ্ছা। আসি কাকা, আসি কাকীমা' বলে সিঁড়ির মুখে গিয়েই শবু রেলিংএ ধাক্কা খেল।

পুটু ঠাট্টা করে বলল—'বাধা পড়ল মেজদি, একটু বসে যা।'

শবু সিঁড়ির মুখেই বসে পড়ল, সত্যিই ত, বাধা পড়েছে বসে যাওয়া ভাল।

পথে আসতে আসতে শবু দীননাথকে জিজ্ঞেস করল—'আসতে দেরী করলাম বলে রাগ করনি ত? পুজোর ওখানে বসে থাকতে আমার খুব ভাল লাগছিল।'

২

দীননাথ বলল—'রাগ করব কেন? রাত হয়ে যাচ্ছে, তাই বলছিলাম।'

ভরপেট খাওয়া হয়েই গিয়েছিল। একে অপরের বিছানা পেতে দিয়ে জল খেয়ে দুজনে শুতে গেল নিজের নিজের জায়গায়। পান মুখে দিয়ে শোবার আগে মন্ত্র পড়ে বালিশে মাথা রাখতেই কথাটা মনে পড়ে গেল। শবু পাশের ঘরে দীননাথকে উদ্দেশ্য করে বলল—

'শুনছো, আমি তোমাকে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে ভুলে গেছি।'

দীননাথ বলল—'ওহো, তাই ত, আমিও ভুলে_গেছি। থাক, শুয়ে পড়েছি। কাকা কাকীমাকে প্রণাম করে এসেছি, ঐ হ'ল।'

প্রতি বছরের মত সকালে বাজার থেকে দীননাথ কিছু আবীর কিনে এনেছিল। সেটা প্যাকেট ভর্তি অবস্থায়ই ঘরের তাকে অব্যবহৃত পড়ে রইল। এত বছরের মধ্যে যা কখনো হয়নি—এবারে তাই হল। কি করে

ওরা ভুলে গেল? শবু তার স্বামীর পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে ভুলে গেল—স্বামী তার কপালে আবীর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গেল—এ কি শুধুই ভুল?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গত বছর নাতি নাতনীদের সঙ্গে দোল খেলে বাঁকা দাসের মা অসুস্থ হয়ে পড়ল আর দিন সাতেক পরে মারা গেল। মনে পড়ছে এবারও কাল সন্ধ্যায় যখন দীননাথ শুকনো পাতা ডালপালা জড়ো করে বাড়ীর সামনে বুড়ীর ঘর পোড়াচ্ছিল তার কথা। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোয় ভরে তুলল তখন হঠাৎই শবুর মনে হয়েছিল তার চিতার আগুন বুঝি জ্বলছে। ভাবতে গিয়ে মনের ভিতরটা হু হু করে উঠেছিল, দীননাথকে ডেকে বলেছিল—

'এসো, আমরা বাড়ীর ভিতরে যাই।'

দীননাথ বলেছে—'কাছে না থাকলে আগুন যদি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে? কিম্বা নিভেও যেতে পারে।'

শবু বলেছে—'ঐ ত কচির ভাই বোনেরা আছে, ওরাই দেখবে। তুমি চলে এস, আমার দেখতে ভাল লাগছে না।'

চারদিকে এত মৃত্যু দেখে তার দুর্বল মন আজ অবসন্নপ্রায়। ষষ্ঠীতলার বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজো দেখে মনে যে শান্তি ও স্বস্তির ভাব ফিরে পেতে চাইছিল শান্তিদির দুর্ভাগ্যের খবর এবং এতবড় এক ভুলের পর তার আর কিছুই রইল না যেন।



ষষ্ঠ পর্য্যায়

এক

বাড়ীতে কি আবার বাজ পড়েছে? বাড়ীতে এখন একটি মাত্র নারকেল গাছ অবশিষ্ট, তার ডালগুলো কেন নুয়ে পড়েছে? অথচ সারা গাছে অজস্র ডাব নারকেল ধরে আছে।

ব্যাপারটা আগে নজরে আসেনি বা খেয়াল করা হয়নি। একদিন দুপুরে নারকেল গাছের একটা বাকলা শোভাদের টালির চালায় খসে পড়তে শোভা ঘরের ভিতর থেকে পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল—

'বাবা গো, মা গো, মলুম গো, গেলুম গো।'

শোভাদের বাড়ীটি এক অদ্ভুত বাড়ী। শ্বশুর শাশুড়ী দেওর জা এক ননদ ননদাই সকলের ছেলে মেয়ে নিয়ে বৃহৎ সংসার কিন্তু এক সংসার নয়। এক বাড়ী তিন হেঁসেল। ফলে যা হয়—মাঝে মাঝে শাশুড়ী-বৌ-ননদ-জায়ে তুমুল লেগে ওঠে। কিন্তু বাইরের লোকের বেলায় সবাই একজোট।

শোভার শাশুড়ী ডাকাডাকি শুরু করল—

'ও দীনুবাবু। না, সে ত আপিস গেচে বুঝি। অ শ্রাবণী, শ্রাবণী, শিগগির এসো, ছাকো কি কাণ্ড।'

স্নান করতে যাবার আগে শবু ঘরে বসে মাথার চুলে তেল লাগাচ্ছিল। কিছু একটা পড়ার শব্দে জানালা দিয়ে দেখেছে, টালির চালায় একটা বাকলা খসে পড়েছে। দীননাথ বাড়ীতে নেই। ডাক শুনে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল—

'কি বলছেন মাসীমা?'

'ছাকো, তোমাদের নারকোলের ডাল পড়ে টালি ভেঙে আমার বৌমা আর একটু হ'লে মারা পড়তো। তোমরা গাছটা ঝুরোও না কেন?'

শবু বলল—'দেখেছি, ডাল নয় একটা বাকলা খসে পড়েছে, টালি ভাঙে নি। গত ভাদ্রে গাছ ঝুরোনো হয়েছিল, আবার এই চৈত্র পড়েছে এবার ঝুরোনো হবে।'

শোভা ঘর থেকে বেরিয়ে বলল—'না শ্রাবণীদি, একটি টালি ফেটে গেচে, যদি ভেঙে মাথায় পড়তো?'

শোভার ননদ আড়াল থেকে মন্তব্য করল—

'ওঁরা খাবেন নারকোল আর মাথা ফেটে মরবো আমরা।'

কথাটা শোভার ননদের মুখেই সাজে। হঠাৎ কখনো সখনো এক আধটা ঝুনো নারকেল ওদের উঠোনে খসে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে জামাই ছুটে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে নারকেলটা কাপড়ের আড়াল করে ঘরে নিয়ে গেছে। জামাইকে নারকেল নিয়ে পালাতে শবু নিজে দেখেছে শোবার ঘরের কাঁচের জানালা দিয়ে। এ ছাড়া গত বছরও মঙ্গলা দেবী এলাহাবাদে গেলে ঘর পরিষ্কার করার সময় খাটের নীচে লুকিয়ে রাখা প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা নারকেল দীননাথ পাড়া প্রতিবেশীদের বিলিয়েছে, শোভারাও বাদ যায় নি।

শোভার শাশুড়ী বলল—'নারকোল গাছ প্রতিমাসে ঝুরোতে হয়, আমাদের দেশের বাড়ীতে গাছ আছে, আমরা জানি। আর জাকো, তোমাদের গাছটিতে পোকা লেগেছে, মরে গ্যাচে, উটিকে কেটে ফ্যালো আর মায়া না করে।'

এতগুলো লোকের সঙ্গে মহড়া দেয়া শবুর কর্ম নয়। তবু ত শোভার শ্বশুর আসরে হাজির নেই। সেবার শবু এমনি এক পরিস্থিতিতে শুধু বলেছিল—আপনারাও ত প্রাচীরের পাশে নারকেল গাছ লাগিয়েছেন, ওটাত একদিন বড় হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরমশাই মুখ ভেংচে বলেছিলেন—উটি ত একদিন বড় হবে, আবার উপমা দেয়া হচ্ছে!

'আচ্ছা বাড়ীতে এলে বলব।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শবু গাছতলা থেকে সরে এল।

মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। সত্যি ত গাছের অর্ধেক ডালপালা কেমন যেন ঝিমিয়ে নুয়ে পড়েছে, অন্যান্য গাছের মত সতেজ নয়—আবার গাছে অত নারকেল ধরে আছে। ফলন্ত গাছ অথচ মরে গেছে বা যাচ্ছে—এও কি সম্ভব!

সেবারে বাড়ীর বাজপড়া নারকেল গাছের যে বর্ণনা শুনেছিল এটারও কি সেই লক্ষণ? কবে বাজ পড়ল, করবীদের বাড়ী থেকে ফেরার দিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বেশ বৃষ্টিও হয়েছিল সেইদিন কি? চার বছর আগে বাড়ীতে বাজ পড়েছিল—সেবারই শবুর মা চলে গেল। এবারে কে—শবু বা দীননাথের মধ্যে কেউ কি? না কি বাবা? অনেকদিন বাবার খবর পায় নি। পয়লা বৈশাখের আগে বাবার চিঠি হয়ত আসবে না। কানাইটারও আবার চিঠি লেখার অভ্যাস কম। পাটনার রবি মাষ্টারের কথাটাও মনে পড়ে—গুরুদশা অবশ্যম্ভাবী।

অফিস থেকে ফিরে সব শুনে ও ছাদে উঠে গাছের অবস্থা দেখে এসে দীননাথ বলল—

'মনে হচ্ছে গাছটা মরে যাবে। গাছ ঝুরোনোর পরে পুজোর সময় ওরা একধার থেকে অতগুলো ডাল কেটে দিল, গাছ মরবে না? চারদিকে এত ঘন সব বাড়ী, প্রাচীর তার জন্যও হতে পারে, গাছ শেকড় মেলতে পারছে না। দেখি কাল লোক ডেকে, যদি বলে তবে কেটেই ফেলতে হবে। গাছটাকে ওরা কি বিষ নজরেই দেখেছে!'

দীননাথের দুঃখ সব থেকে বেশী, গাছটিকে সে নিজে হাতে লাগিয়েছিল, নিজ হাতে লাগান গাছ সন্তানতুল্য। মনের ক্ষোভে সে বলতে লাগল—

'ওদের বাড়ীর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়া ছেলে মেয়েরা এসে আমাদের গাছ থেকে আম চুরি করে, না বলেই এন্তার পেয়ারা পেড়ে খায়। এরপর কেউ এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।'...

পরদিন গাছওয়ালাকে ডেকে দেখাতে সেও বলল—

'পোকা লাগেনি, তবে গাছটা আর বাঁচবে না, কেটে ফেলাই ভাল।'

ফলন্ত গাছটার প্রায় আশীটা ডাব আর নারকেল কেটে নামিয়ে ডাল-পালা সব ছেঁটে যখন এক একটা কুড়ুলের ঘা তার গায়ে পড়ছে তখন মনে হচ্ছে প্রতিটি আঘাত বুঝি নিজেদের গায়ে এসে লাগছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গাছের কাণ্ডটা তিন চার খণ্ড হয়ে সরু জমিতে পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েকটি শিশু জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে—তারা কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না, ওরা যে একটু আগেও একই অঙ্গের বা দেহের অংশবিশেষ ছিল। একটি মাত্র নারকেল গাছ অবশিষ্ট ছিল—তাও আর রইল না।

এ যে শুধু নারকেল গাছ কাটা নয়, শবুদের সন্তান হত্যা—ব্রহ্মহত্যাও বটে। চারদিকে কাকগুলো ভীষণ কা কা করছে।

যেদিন ফলন্ত নারকেল গাছ কাটা পড়ল সেদিন থেকে ভীষণ কোন এক অমঙ্গলের আশঙ্কা শবুর মনে চেপে বসেছে, কিছুতে সেই দুশ্চিন্তাকে মাথা থেকে নামাতে পারছে না। কি হবে, কি হতে পারে—ভেবে ভেবে সে কুল-কিনারা পায় না। সেই বছর গুরুর মুখে তবদের আসা থেকে যে অমঙ্গলের ছায়া সে দেখতে পেয়েছিল, তার পর থেকে শুভদিনে তৈরি দু'হাঁড়ি কাসুন্দি নষ্ট হওয়া দিয়ে শুরু করে পর পর অনেক কুলক্ষণের চিহ্ন দেখা গেছে। বেশ

কয়েকটি মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে অতি নিকট পরিচিতদের ঘরে। সব কিছু মিলে তার মনকে বড়ই সংশয়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। এদিকে বছরও প্রায় শেষ হয়ে এল।

কি হতে পারে? সেই ট্রেন দুর্ঘটনা, পথের দুর্ঘটনায় নিজের বিলম্বিত সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়া, মা পদ্মিনীদেবীর চলে যাবার মত মর্মান্তিক ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আর নেই বলতে গেলে। মা বলতেন—শবুর জীবনে নাকি আর একটি ফাঁড়া আছে। সে কি এই বছরেই? এই অবস্থায় নিজের মৃত্যু হলে সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে। কিন্তু তার চোখের সামনে বাবা বা দীননাথের যেন কিছু না হয়। এর কোনটিই তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। হে ভগবান, তেমন যেন কিছু না ঘটে।

আর একটি আশঙ্কাও তার মনকে সদা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। যেদিন মঙ্গলাদেবী এসে যাগযজ্ঞ শেষে ঘোষণা করে গেলেন ভবর বাড়ী তৈরি হলে তিনি সেখানে অধিষ্ঠান করবেন সেদিন থেকে শবুর মনের গোপনে এক গভীর আতঙ্ক ও বিভীষিকা বাসা বেঁধে আছে—কবে হয়ত তিনি এসে কলজের উপর বসে তার জীবন দুর্বিসহ করে তুলবেন, সেদিন কি হবে, কি করে সে জীবন যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে!

মনের এই অবস্থাতে দুপুরে ডাকে একখানা চিঠি এল। পোষ্ট কার্ডের চিঠি—মা মঙ্গলা দেবী লিখেছেন মেদিনীপুর থেকে। লিখেছেন—দীনু, ভবর বাড়ীর কাজ কতদূর কি হইল, আমাকে কেহ কিছু জানাইবারও প্রয়োজন বোধ করেনা, ভবকে বলিবে শীঘ্র বাড়ীর কাজ শেষ করিতে এবং সেখানে আমার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে যাহাতে আমি গিয়া থাকিতে পারি…।

চিঠিতে শবুর কোন উল্লেখ নেই—না থাক। কিন্তু চিঠিটা পড়ে থেকে শবুর মন ভীষণ উদাস হয়ে গেল। মঙ্গলা দেবী এক ছেলের বাড়ীতে নাতি নাতনীকে নিয়ে আছেন সেখানে নয়, এ বাড়ীতে নয়, আরো দুই ছেলের বাড়ী বা ফ্ল্যাট আছে তাদের সঙ্গে নয়, চিরকুমার মহীর কাছে নয়, তিনি এসে ভবর এই খালি বাড়ীতে থাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেন? এখানে ত ভবরা থাকবে না বলেছে, তবু শবুর কলজের উপর এসে বসার এত আগ্রহ কেন? কোন নাতি নাতনীর মুখ দেখতে পাবেন না—দুবেলা বাঁজা বেটার বৌ এর মুখ দেখতে হবে যার পেটে নাকি কুকুর বেড়ালের বাচ্চাও ছিলনা। এত বছর জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে, শাপ শাপান্ত করে, ঘরের লক্ষ্মী উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে

যাগযজ্ঞ করেও তাঁর আক্রোশ মেটেনি ?

কীসের এত আক্রোশ ? মুখে মুখে কথার জবাব না দিয়ে, মুখ বুজে থেকে ঝগড়া করার সুযোগ করে দেয়নি বলে ? নাকি শবুর কল্জের উপর বসে অন্য ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের নিয়ে আদর সোহাগ দেখিয়ে শবুকে তিলে তিলে তুষের আগুনের মত দগ্ধে না মারতে পারলে তাঁর শান্তি হচ্ছেনা ? শবু তখন কি করবে ?···

দীননাথ অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা পড়লে শবু জিজ্ঞেস করল—

'এবার কি করবে ?'

দীননাথ বলল—'কিছুই করব না। আমাদের বাড়ীতে এসে থাকছে না। ওটা আমাদের বাড়ীও নয় আমার কিছু করারও নেই।'

'তুমি যে বলেছিলে ছ'বছরেও বাড়ী হয় কিনা দেখ। এখন ত বাড়ী প্রায় হয়েই গেছে। ভবর! ফ্ল্যাট ছেড়ে আসবে না অথচ উনি এসে ঐ খালি বাড়ীতেই থাকবেন। সেটা কি রকম হবে ?' শবু তার মনের ভাবনার কথা জানাল।

'ওবাড়ী ভাড়া দিলে বা খালি থাকলে মার সেখানে এসে থাকার কোন মানে হয় না। তবু যদি এসে থাকে, মা যখন ছেলে হিসেবে সকাল বিকেল খোঁজ খবরটা নেব।'

এত শান্ত ভাল মানুষ কি তিনি ? ক্ষুব্ধ শবু জিজ্ঞেস করল—'তোমার মা, একথা যখন বললে তখন মা হয়ে ছেলের কাছে না থেকে পাশেই খালি বাড়ীতে বা ভাড়াটের সঙ্গে থাকবেন, খারাপ দেখাবে না ?'

'কি জবাব দেব ? এত স্পষ্টই আমাদের জব্দ করার মতলব।'

'বুঝতেই যখন পারছ, তখন এটা বন্ধ করার চেষ্টা করবে না ?'

অসহায়ভাবে দীননাথ বলল—'কি করব বল ? চার ভাই চারখানা বাড়ী করেছি, মা যখন যার কাছে খুশি এসে থাকল, বলার কিছু নেই। মাঝে মাঝে এসে এ বাড়ীতেও থাকতে পারে।'

শবু বলল—'সে ত একশোবার। কিন্তু কাছে এসে থাকা আর বারোমাস পাশে বাস করা এক কথা নয়। এভাবে কি উনি নিজে শান্তিতে থাকবেন না আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন ?'

দীননাথ এবার একেবারেই অসহায়। বলল—

'আমার আর উপায় নাই, আমার হাত পা বাঁধা। সেই দুর্দিনে যা ব্যবহার করে গেল তাতে আমি অন্তত মাকে পায়ে ধরে সেধে ডেকে আনতে

পারব না। অন্য ছেলেদের বাড়ীতে দূরে দূরে থাকলেও বলার কিছু নেই। কিন্তু একেবারে পাশের জমিটা ভবর অন্য কিনিয়ে যে কি ভুল করেছি তা এতদিনে বুঝতে পারছি, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।'

এবার শবুর মুখে তিক্ত হাসি দেখা দিল, বলল—'সেই বোঝাই বুঝলে যখন আর করার কিছু নেই। অথচ কথাটা আমি জমি কেনার কথা উঠতেই বলেছিলাম, তুমি গ্রাহ্য করনি। বলেছিলে কি আবার হবে, পাশাপাশি থাকলে একে অপরের সহায় হব। সে সব স্বাভাবিক পরিবারে হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে এক বাড়ীতে থাকে, পাশাপাশি বাড়ীতেও থাকে সংসার বড় হয়ে গেলে। তোমাদের পরিবার ত চিরদিনই অস্বাভাবিক—বাড়ীতে ঘর থাকতেও ভাই বৌ নিয়ে সে বাড়ীতে থাকে না। আমার মা ঠাকুমাও তখন শুনে বারণ করেছিল, তুমি কারো কথা শুনলে না। হেসে উড়িয়ে দিলে। এখন আমি বলছি, এর বিষময় ফল হবে যদি এখনও যা ঘটতে যাচ্ছে তা বন্ধ করতে না পার।'

শেষদিকে অভিমানে শবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

দীননাথ বসে রইল—নিরুপায়, নিরুত্তর।

অন্য দিনের মত সেরাতেও খাওয়া শেষে একে অপরের বিছানা ঝেড়ে পেতে দিয়ে যে যার মত শুতে গেল। শবু পান মুখে দিয়ে চোর তাড়ানো মন্ত্র পড়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর আসছে না, এ সংসারে এসে থেকে দেখা অনুভব করা সহ্য করা সব ঘটনা এক সঙ্গে ভিড় করে এসে মাথাটাকে উত্তপ্ত করে তুলল—

কি করবে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল মা পদ্মিনী দেবীর কথা। আদরের মেয়ে শবুকে দীননাথের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—এখন থেকে আপদে বিপদে দীননাথ তোকে রক্ষা করবে, তোকে ভালবাসবে।

সে ছিল শবুর বাসি বিয়ের দিনের কথা। তারপর চব্বিশটি বছর কেটে গেছে—মার কথা আজও শবুর কাছে বাসি হয়নি। স্বামী তাকে ভালবাসে, এতদিন রক্ষাও করে এসেছে। কিন্তু সামনে যে বিপদের সূচনা দেখা দিয়েছে তার থেকে রক্ষা করতে পারবে কি? তবু যা করার দীননাথকেই করতে হবে। স্বামীই তাকে বাঁচাতে পারে।

শবু উঠে গিয়ে দীননাথের বিছানায় পাশে বসল। পরিশ্রান্ত দীননাথ শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে। কিন্তু গায়ে হাত রাখতেই সে কথা বলে উঠল—

'কি হ'ল, ঘুম আসছে না ?'

দীননাথও তবে ঘুমোতে পারেনি।

শবু বলল—'কিছু একটা কর।'

দীননাথ ঘুমের চেষ্টায় বাধা পেয়ে বিরক্ত হল, বলল—'অত ভাবছ কেন বল ত ? কিছু করার থাকলে কি করতাম না ? আমারই কি এটা ভাল লাগছে ? তবে একটা কথা। মার বয়স হয়েছে, যে কবছর বাঁচে হয়ত জ্বালাবে। আর আসবে বললেই হল ? সোনার ছেলে মেয়েকে তবে কে দেখবে ?'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শবু বলল—'তাঁর কাছে মায়া মমতা বাধ্য-বাধকতা কিছু আশা করা যায় না। সে সব থাকলে নিজের সংসার, স্বামী-ছেলে-মেয়ে ফেলে তিনি মাতুলের সংসার আগলাতেন না।'

'তবে ত কটা বছর সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই' দীননাথ চিন্তিতভাবে বলল।

শবু বলল—'সহ্য করার কথা বলছ ? তুমি অফিসে একটা চেয়ারের অসম্মান সহ্য করতে পারছ না, প্রোমোশন না দিলে আবার চাকরি ছাড়বে বলছ। আর আমি যে দুই যুগ ধরে অপমান অসম্মান কটুক্তিতে জর্জরিত হয়ে তিলে তিলে জ্বলে মরছি—তাতেও কি কারো শান্তি আছে ? আরো সহ্য করতে বলছ ?

'পরমায়ু! কার কত পরমায়ু কে বলতে পারে ? কে বলতে পারে আমিই আগে যাব না ? তা ছাড়া গুরুজনের মৃত্যু কামনাই বা করব কেন ?

'ঐ জমিটা কেনার সময় বারণ করলাম শুনলে না, পাটনা থেকে জোর করে বদলির চেষ্টা করতে বারণ করেছি শোননি, এনে ফেলেছ এক অশান্তির মধ্যে। নিজে অশান্তি এড়াতে চাকরি ছাড়তে চাইছ। আমি বাঁচব কি করে, কত আর সহ্য করব আমি ? আমারও বয়স হয়েছে। আমি অশান্তির হাত এড়াব কি করে ?'

কোন মানুষই তার কাজের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে বোকা-বুদ্ধিমান যদি হয়, দীননাথও পারল না। কর্কশভাবে বলে উঠল—

'তা আমাকে কি করতে বল তুমি ? মা দাদা ভাই বোন আত্মীয়জনকে দূরে ঠেলে দেব একটা কাল্পনিক চিন্তায় ? অনেক রাত হয়েছে, যাও ঘুমোবে যাও, আমাকেও ঘুমোতে দাও।'

শবুর মাথাটা ভীষণভাবে ঝিমঝিম করতে লাগল। এতদিনের শিক্ষা

নম্রতা সহিষ্ণুতা সব বুঝি ভেসে গেল দীননাথের রূঢ় কথায়। কড়া কথা, জোরে কথা শবুর দুর্বল মন সইতে পারে না। আজ তাই শুনতে হল এমন একজনের কাছে যার কাছে সে ছুটে এসেছে একটু আশ্রয়, ভরসা আর আশ্বাসের আশায়!

শবুর এতদিনের সংযমের বাঁধ বুঝি ভেঙে গেল, নিরুদ্ধ অভিমানে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল—

'যে কথা অ জ তুমি বললে তা শুধু পুরুষদের মুখেই শোভা পায়। তুমি ভুল করছ, আমি কাউকে দূরে ঠেলে দেবার—ত্যাগ করার কথা বলিনি, শুধু মা যা করতে চাইছেন সেটা বন্ধ করতে বলছি। আর সে কথাই যদি বল তবে বাপ মা ভাই বোনদের ছেড়ে আমি কি আসিনি এ সংসারে? এক-নাগাড়ে আটটি বছর তোমার বাবা মা ভাই বোনদের জন্য আমি কি না করেছি? পরিবর্তে কি পেয়েছি—শুধু কলঙ্ক দুর্মুখ আর দুর্ব্যবহার। আমি যা করেছি এ বাড়ীর কোন বৌ তা আট মাসও পারেনি আজ তুমি আমাকে মা ভাইবোনদের ছাড়তে বলার অপবাদ দিলে—এত বড় আঘাত তুমি আমাকে দিতে পারলে? তোমার বিবেকে বাধল না? তোমার এ অপবাদ আমি মাথায় তুলে নিচ্ছি। তুমি কথায় কথায় চাকরি ছাড়বে বল, আমিও ত এ বাড়ীর বিনে মাইনের দাসী। আমার যাবার মত মাত্র দুটি জায়গা আছে—এক বাপের বাড়ী আর এক যমের বাড়ী। আমাকে তবে সেই মুক্তিই দাও।'

এ কী বলল শবু! রাগ যে চণ্ডাল—এমন কথা সে তার স্বামীকে কোন দিন বলতে পারে স্বপ্নেও ভাবে নি।

দীননাথ চুপ করে আছে। সারা ঘরে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা।

এতক্ষণ ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে শবুর চোখে জল ছিলনা, ছিল হয়ত আগুনের আভা। এখন নিজের শেষ কথাগুলো কানে যেতেই সে আগুন দপ করে নিভে গিয়ে বুঝি নেমে আসে জল, গলার মধ্যে কান্না ঠেলে উঠছে। ছুটে নিজের বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে দীননাথের কথা শোনা গেল, বলছে—'ও সব মুক্তির কথা বলছ কেন? তোমার কাছে আমি যেমন, আমার কাছে তুমিও তেমন —অপরিহার্য্য, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। শুধু শুধু না ভেবে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

কথাটা শুধু শোনা গেল—একবার সে কাছে এলনা সান্ত্বনা দিতে।

মনের দুঃখে শবু শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। এমন কথা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল কি করে, সকালে উঠে সে দীননাথকে মুখ দেখাবে কি করে?

যদি সত্যি তেমন কিছু করে বসে, বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কোন মুখে? সে যে বাবার গর্ব—আমার শবু কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে জানেনা। সেই শবু স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? মা থাকলে শবুর মনের কথা বুঝত, তবু চলে আসাকে সমর্থন করত কি? মা গো, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমান নাকি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। হে ভগবান, তাই যেন হয়। রাতের এই ক্ষত যেন দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারের মত মিলিয়ে যায়।

শবুর ধ্যান জ্ঞান আদর ভালবাসা সব দীননাথকে ঘিরে। প্রচণ্ড অভিমানে বুকটা মুচড়ে ওঠে। স্বামী তাকে মিষ্টি করে একটা সান্ত্বনার কথাও ত বলল না। তার অসহায় অবস্থার কথা শবু বোঝে, সে অবুঝ নয়। মিথ্যে করেও বলতে পারত—তুমি ভেবনা, আমি দেখছি। এখনো যদি একবার এসে মিষ্টি মুখে দুটো কথা বলে, শবুর সব অভিমান চোখের জলে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে যে বড় অভিমানী।

দীননাথ কি করে এতখানি কড়া হ'ল, এমন রূঢ় কর্কশ ব্যবহার করল? নিজেই বলল—তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সে কি শুধু মুখের কথা! নইলে সে এখনও নিস্পৃহভাবে শুয়ে আছে কি করে. পাশের ঘরে শবু বিছানায় লুটিয়ে কাঁদছে জেনেও? সে কি শবুকে আর ভালবাসে না, পেতে চায় কি নিষ্কৃতি?

তার অটুট স্বাস্থ্য, নীরোগ দেহ। তাই কি দীননাথ ভাবছে শবু অমর? শবুর আয়ু কম, তার জীবনে যে ফাঁড়া আছে সে কথা মনে পড়ল না? ঠিক আছে, সে তবে মরেই যাবে। বেঁচে থাকতে তার মূল্য কেউ বুঝল না, মরে গেলে তখন বুঝবে। তখন কেঁদে বুক ভাসালেও শবুকে আর ফিরে পাবে না।

মানুষটাকে ফেলে মরেও যে সে শান্তি পাবে না, একা একা তার দুঃখ দেখে তার আত্মা কষ্ট পাবে। স্বামীর কোলে মাথা রেখে সধবা যাওয়া তার আজীবনের সাধনা, তবু এখনই সে কামনা শবু করে না। মনে হচ্ছে যত নষ্টের মূল এই আলাদা বিছানায় শোয়া। বিছানার দূরত্ব মনের দূরত্বকে বাড়িয়ে তুলছে।

আগেও কখনো কখনো তাদের মধ্যে মান-অভিমানের পালা হয়েছে। শবু হয়ত মনের দুঃখে কিছু কথা বলেই ফেলেছে। দীননাথ হয়ত চুপ করে

গেছে। ব্যথিত হয়েছে সে। শবু তখন দেখেছে বেদনায় তার মুখখানি করুণ হয়ে যেতে। মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে স্বামীকে আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে—বাবুর রা-গ হয়েছে, বাবুর মা-ন হয়েছে। দীননাথ হয়ত অভিমানে পাশ ফিরে শুয়েছে। স্বামী তার সঙ্গে কথা বলছে না এমন অবস্থা সে কল্পনা করতে পারে না। ছোট্ট ছেলের মত স্বামীকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করতে করতে মজা করে বলেছে—আহা গো, বকি-ঝকি তবু তুমিই যে আমার সব, দুটি নয়, পাঁচটি নয় তুমি যে আমার একমাত্র 'ব'……। তৎক্ষণাৎ অভিমান ভুলে গিয়ে দীননাথ দুষ্টুমি করে হেসে বলেছে—'ব' কি কারো দু-পাঁচটি থাকে? তবে শুনেছি দ্রৌপদীর নাকি পাঁচটি বর…। সঙ্গে সঙ্গে শবু স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়েছে—এই, ভাল হবে না বলছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের মান-অভিমান মিটে গেছে। কোথায় হারিয়ে গেল সেই দিনগুলি!… …

দুই

অর্ধেক রাত না ঘুমিয়ে শেষ রাতে শবু ঘুমিয়ে পড়েছিল—সন্ধ্যার ডাকে ঘুম ভাঙল—

'কি গো মাসী, এখুনো শুইয়া আছ, শরীল খারাপ নাকি?'

মনে পড়ে গেল আজ অফিস নেই, বলল—

'না, এমনি, আজ ছুটি ত।'

বাজারের ব্যাগ হাতে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—

'বাজার থেকে কি আনতে হবে, বল।'

'মুগের ডাল এনো, আর যা পাও নিয়ে এসো।'

কথা বার্তায় কিছুটা স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল।

দীননাথ বাজার থেকে ফিরে রুটি খেয়ে 'আমি একটু আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। তাকে যেন হঠাৎই খুব ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

রান্নার মাঝখানে হঠাৎ এল ভব আর মালতী। শবু মালতীকে জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপার, এত বড় একটা বাড়ী হয়ে গেল এতদিনে এলে বাড়ী দেখতে?'

ভব বলল—'তোমরা গল্প কর আমি ততক্ষণ বাড়ীটা একটু দেখে আসি।'

সে যেন পালাল মনে হচ্ছে।

মালতী বলল—'আমার মা অনেকদিন হাসপাতালে থেকে সেখান থেকে আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে মাসখানেক ছিল। আজ মাকে পৌঁছে দিতে এসেছি, ওখানেই থাব। নতুন বাড়ীর প্রতি আমার আর ইন্টারেষ্ট নেই। কাল মেদিনীপুর থেকে চিঠি এসেছে, বাড়ীটা হয়ে গেলেই উনি নাকি নতুন বাড়ীতে এসে থাকবেন। কি অন্যায় কথা বলুন ত সেজদি।'

শবু বলল—'বেশ ত, তোমরাও থাকবে মা-ও থাকবেন, ভালই হবে।'

মালতী বলল—'আমরা এখন এখানে আসছিই না। উনি এসে থাকলে অর্ধেক বাড়ীতে ভাল ভাড়াটেও পাওয়া যাবে না। উনি ত এ বাড়ীতেও থাকতে পারেন।'

দুই দিক বজায় রেখে শবু বলল—'এ বাড়ীতে থাকতে পারেন আবার ফ্ল্যাটেও থাকতে পারেন।'

'ফ্ল্যাটে সব মাপা জায়গা, অফিসের লোকজন আসা যাওয়া করে—অনেক অসুবিধে।'

শাশুড়ী না আসতেই মালতী তাঁকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়—মুখের সে 'মা' 'মা' ডাক আর নেই। তার বদলে শুধু 'উনি' 'তিনি'। ভদ্র ভাল মানুষীর মুখোশও খুলে পড়ছে, তাই সেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভব মালতী চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে দীননাথ ফিরল একগাদা পর্দা আর দুটো বালিশের ওয়াড় নিয়ে, সঙ্গে একজোড়া সুন্দর লালপেড়ে বারোমেসে শাড়ী। বলল—

'পর্দাগুলো মাপ মত একেবারে সেলাই করিয়ে নিয়ে এলাম, তোমার পরিশ্রম কমবে। শুধু এই ছোট জানালার পর্দাটা তুমি একটা পাশ হাতে সেলাই করে দাও, বাকিগুলো আমি ততক্ষণ টাঙিয়ে ফেলি। ওয়াড় দুটোতে কটা টিপকল লাগাতে হবে বোধ হয়। কেমন হয়েছে পর্দাগুলো? আর শাড়ী দুটো?'

'বেশ সুন্দর হয়েছে।' বলে শবু সূচ সুতো নিয়ে পর্দা সেলাই করতে বসে গেল। পুরোনো পর্দাগুলো বদলানোর জন্য শবু অনেকদিন থেকেই বলছে। কালকে রাতের মান অভিমানের পর আজই দীননাথ নতুন পর্দা কিনে একেবারে সেলাই করিয়ে এনেছে। না, ভালভাবে আদর করে কথা না বললে সে শুধু এতেই ভুলবে না। নতুন শাড়ী দুটোর জন্যও ধন্যবাদ জানান দরকার।

শবু ভব মালতীদের এসে ঘুরে যাবার কথা বললে সব শুনে দীননাথ বলল—

'ঠাকরুন এখন বুঝুক ঠেলা। তুমি শুধু শুধুই ভেবে অস্থির হচ্ছ, দেখই না শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

না, এত সহজে সে ভুলছে না।

দুপুরে দীননাথ স্নান করে এলে শবু ভাত বেড়ে ডাকল—'এস খাবে এস।'

পাতে বসে ভাতে হাত দিতে গিয়ে দীননাথ বলল—'একি, তোমার ভাত কোথায়?'

—'আমার খেতে ইচ্ছে নেই, খাবোনা ভাবছি।'

'ও বুঝেছি, অভিমান হয়েছে, কালকের কথায় রাগ হয়েছে। আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। খাবার উপরে রাগ করতে নেই, লক্ষীটি। ছুটির দিন দুবেলা আমরা একসঙ্গে খাই, তুমি না খেলে আমি খাবই না।' বলে দীননাথ শবুর ব্যবহারের নতুন কাঁসার থালায় নিজের হাতে ভাত বেড়ে দিয়ে বলল—'নাও খেয়ে নাও।'

এই মানুষের উপর রাগ করে থাকা যায়? শবুর চোখ ফেটে জল এল, বলল -'কাল রাতে তুমি আমাকে কথা শোনালে, বকলে কেন?'

'না, বকিনি, তোমার ভালর জন্যই বলেছিলাম, আর বলব না।'

'আমিও তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

দীননাথ বলল—'বেশ শোধ বোধ হয়ে গেল, আমরা কেউ কাউকে মুক্তি দেব না। নাও, এখন খাও।'

'আর বকবে না ত?'

'না'।

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'এই তোমার গা ছুঁয়ে বললাম।'

'কি বললে?'

'আর তোমাকে বকব না। হ'লত? এখন খাও। বাবা-বাবা, যেন পাঠ পড়াউছি।'

দুজনেই এক সঙ্গে খাবার মুখে তুলল, দুজনে চোখাচোখি হল, দুজনের মুখে ফুটল মান ভাঙা সলজ্জ হাসি…।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। তবে বিছানার দূরত্বের জন্য বারোঘণ্টা বিলম্বিত।

অনেকদিন পরে বড়বৌদি বীণা এল বিকেলে বেড়াতে, সঙ্গে বড় মেয়ে সুপর্ণা। বীণা দুঃখ করে বলতে লাগল—

'আমার সিনেমা দেখা বেড়ানো সব বন্ধ হতে বসেছে শ্রাবণী, চোখে বুঝি ছানি পড়ছে। কয়েকটা দাঁতও উঠিয়েছি। আর ওদিকে পার্থ গিয়ে থেকে পৌঁছা সংবাদ ছাড়া চিঠিপত্র দেয়নি, মাসে মাসে টাকা পাঠাবে বলেছিল তাও পাঠায় না। তোমার ভাসুর দুদিন ত বেটার বৌ নিয়ে বেশ ভালই ছিল, এখন আবার বলছে—পার্থ টাকা পাঠালে সে টাকা ছোঁয়া হবে না। সব দোষ আমাদের শাশুড়ী ঠাকরুনের।'

দীননাথ বলল—'চিন্তা করবেন না বৌদি, তিনি আবার আসতেছেন।'

'তাই নাকি, কবে, কোথায়?'

শবু যা জানে সব বলল, এমন কি দীননাথ কাল রাতে তাকে যে কথা বলে দুঃখ দিয়েছে সেকথাও। শবুর মা নেই, বড়বৌদির মত দিদি আছে, সব কথা বলে না কাঁদলে মন হাল্কা হবে কি করে?

বীণা বলল—'দেখলে শ্রাবণী, এরা ভাইগুলো সব সমান, বৌদের দুঃখ বোঝে না। এই সব বলতে গেলে তোমার ভাসুর যা তা মুখ করে গালাগালি করে। মা গুণে পুত। মা যদি ভাল হত, সব ভাইকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারত তবে আমরা কি সুখেই থাকতে পারতাম, আমরা পর-ঘরীরা মনে বল পেতাম। কি মতলবে তোমার কলজেয় এসে বসতে চাইছে, তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে? এটা কখনো হতে দিও না।'

শবু সহানুভূতির কথায় কেঁদে ফেলল—

'সেই কথা বলতে গিয়েই ত আমি খাঁরাপ হয়ে গেলাম।'

'তুমি ভেব না সেজকাকী। আসুক বুড়ী, আমি তার গায়ের বিষ ঝেড়ে দেব।'—সুপর্ণা যেন তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

শবু বলল—'কিছুতেই কিছু হবে না, আমি ত এত বছর হল দেখছি।'

বীণা বলল—'তোমার কপালে দুখ্খু আছে শ্রাবণী, আরো দুখ্খু আছে। কি করব, আমরা যে সব মেয়ে মানুষ, কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

বড়বৌদির আর কথায় কথায় সেই হেসে গড়িয়ে পড়া নেই। একমাত্র ছেলে ভিন্নজাতে বিয়ে করে প্রবাসী হয়েছে, সংসারের সচ্ছলতা কমে গেছে, চোখ আর দাঁত নিয়ে একটু একটু করে অচল হয়ে পড়ছে। তবু তার দুঃখে কাঁদার লোক আছে। শবুর দুঃখে কাঁদার কেউ নেই।

দিনটা ভালয় মন্দয় কেটে গেল। রাতে শোবার আগে 'আলো নিভিয়ে

দিলাম' বলে দীননাথ পুট করে সুইচটা অফ্ করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্য দিন আলো নেভাবার আগে সে শবুর কথামত গেটের তালা টেনে পরীক্ষা করে, জিজ্ঞেস করে—সব ঠিক আছে ত, আলো নিভিয়ে দেব? খাটের নীচ দেখেছ ত আজ কোথায় যেন ছন্দ কেটে গেছে, কথা হয়েছে সংক্ষিপ্ত। যেন মনের কোণে কোথায় একটা কাঁটা বিঁধে আছে।

অনেক কিছুই সহ্য হয়ে গেছে—এও হয়ত শবুর গা সহা হয়ে যাবে।

ঘরের আলো জ্বালানো যায়, নেভানো যায়। চোখের আলো নিভে এলে কি করা যায়?

এ জগতে অবিশ্বাস্য বলে বুঝি কিছু নেই। কদিন আগে কাঠের মিস্ত্রী অখিল লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পথ চিনে এসে কেঁদে পড়েছিল—

'বৌমা, আমার চোখের আলো নিভিয়া গেছে। আর আমি কাম করতে পারি না, সূর্য্যের আলো ছাড়া পথ চলতে পারিনা, ডাক্তারে কইছে ঢের দিন চিকিচ্ছা করতে লাগব, আমার চক্ষু বুঝি আর ভাল হইব না। কাম করতে না পারলে খামু কি? সংসার চলবে ক্যামনে?'

দীননাথ সহানুভূতি দেখিয়ে তার হাতে পঁচিশ টাকা দিয়েছে, কিন্তু ওতে আর কতটুকু হবে? অখিল চলে গেলে দীননাথ বলেছে -'এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে একদিন পথে দেখলাম অখিল পনরো টাকায় একজোড়া সস্তা চশমা চোখে দিয়ে খুশি মনে কাজে যাচ্ছে। একি ঐ সস্তা চশমার জন্য এরকম হল?'

মিস্ত্রীদাকে দেখে শবুর মন খারাপ হয়ে ছিল। কি সরল মানুষ, গত শীতে নিজের গাছের খেজুরের রস খেতে দিয়েছিল, ভবর মিস্ত্রী মজুরদের উৎপাত থেকে শবুকে বাঁচাত, গল্প করত—একবার ষ্টেশনের কাছে হাজার হাজার টাকার বাণ্ডিল কুড়িয়ে পেয়ে একবার গুণেও না দেখে পাশের এক দোকানীর হাতে তুলে দিয়েছে, দোকানী বাঁকা হেসে বলেছে- এ টাকা বুড়াটা ভোগ করতে পারল না এখন আমার ভোগে লাগবে।

ভাল, সৎ ও উপকারী লোকদের জীবনেই কি শুধু দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে?

সেদিন বড়বৌদিও এসে চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না বলে গেল। তার নাকি চোখের ছানি কাটতে হবে পরে চশমা লাগালে মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে।

আজ এসেছে শীলা ভুমাইল দূর থেকে ছুটতে ছুটতে। তার ভীষণ বিপদ,

শীতল দুচোখেই মোটে দেখতে পাচ্ছে না। কারখানার ডাক্তার বলেছে চোখের শিরা শুকিয়ে গেছে, ভাল হবার সম্ভাবনা কম। সে নাকি আগে থেকেই একটি চোখে ভাল দেখতে পেত না, এখন অন্যটিও যাবার মুখে।

শীলা কেঁদে বলল—'ও শবুদি, এখন আমার কি হবে? একমাত্র রোজগেরে লোক চোখে দেখতে না পেলে কারখানা থেকে যে ছাঁটাই করে দেবে। দিন চলবে কি করে? ভাই অনিত্য এক আকুপাংচার ডাক্তারের ঠিকানা পাঠিয়েছে—এখন কে সেখানে তাকে চিনে নিয়ে যাবে?'

দীননাথ শুনে বলল—'কাল বিকেলে আমি তাকে নিয়ে ফতিমা সেণ্টারে যেতে পারি, দেখা যাক আকুপাংচারের ডাক্তার কি বলে।'

শীলা বলল—'তাহলে খুব উপকার হয় জামাইবাবু। জানেন শবুদি, মেয়ের বিয়েতে ভাইরা অনেক সাহায্য করেছিল, তবু পাঁচ ছ হাজার টাকা ধার হয়ে গিয়েছিল। এখন এর চিকিৎসার জন্য দিনে পঁচিশ ত্রিশ টাকা শুধু ওষুধেই লেগে যাচ্ছে। সেজদাকে সব জানাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে বলেছে—যখন সুবিধে হবে আমাকে দিস, আমার মেয়ের বিয়ের এখনো দেরী আছে। আমরা বলেছি—অমনি অমনি টাকা দিবি কেন, আমাদের ছ'কাঠা জমির উপর বাড়ী, ঐ টাকার বদলে কিছু জমি লিখে দেব। সেজদা বলেছে—সে যা ভাল বুঝিস করিস। আমরা ঠিক করেছি কি শবুদি, এখন ত ওখানে জমির দর ছ হাজার সাত হাজার টাকা কাঠা, এঁ্যা, সেজদাকে আমরা দেড় কাঠা জমি লিখে দেব।'

দীননাথ শীলাকে জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কত করে কাঠা জমি কিনেছিলে?'

শীলা বলল—'এগারো শ' টাকা কাঠা। জমির দর এখন বেড়ে গেছে না?'

কাল ফতিমা সেণ্টারে যাবার কথা পাকা করে দীননাথের গাড়ীর পিছনে বসে শীলা বাড়ী ফিরে গেল। এটা দীননাথের বাঁধা কাজ, যেই আসুক তাকে ষ্টেশনে গাড়ী করে পৌঁছে দেয়। কাছে বাড়ী হলে বাড়ীতেই পৌঁছে দিয়ে আসে।

শবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল শীলা শীতলদের এই বিপদের কথা শুনে। তবু এই বিপদের মধ্যেও ওদের প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি শবুর ভাল লাগলনা।

শীলাকে পৌঁছে দিয়ে এসে দীননাথ বলল—'অনিল ওদের বিপদ দেখে এক কথায় দশ হাজার টাকা দিল, তার প্রতিদানে এক হাজার টাকা কাঠার জমি মাত্র দেড় কাঠা দেবে! দাম বেড়েছে ঠিকই তবু যদি অন্ততঃ তিন কাঠা দিত

তবে সে হয়ত একটা ভাল বাড়ী করতে পারত আর উপকারী ভাইকে এমন করে ঠকানোও হ'ত না।'

এ ব্যাপারে শবুও একমত। কাউকে অন্যায়ভাবে ঠকানো তারা কেউ পছন্দ করে না। আর এ ত একেবারে নিজের ভাই।

দীননাথ আবার বলল—'শীতলের চোখ দুটো নষ্ট হওয়া তার অত্যধিক পুণ্যের ফল কিনা কে জানে! পরপর তিন বছর চৈত্র বৈশাখের গরমে খালি পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে গেছে। শুনেছি কবিরাজী শাস্ত্রে নাকি বলে পায়ের সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তির সম্পর্ক আছে।'

তিন

তস্মীর শাশুড়ীর কাজের দিন শবুদের সেখানে নেমন্তন্ন—দীননাথ দ্বাদশ ব্রাহ্মণের একজন। সে আজ অফিসে যাবে না, বিকেলে শীতলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে থেকেই শবুর কেমন যেন খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ভাল করে মুখ হাঁ করতে পারছে না। হাত মুখ ধুয়ে গরম চা খেল তবু কিছু ভাল মনে হচ্ছেনা। চোয়াল দুটো যেন মাঝে মাঝে আড়ষ্ট হয়ে আটকে যাচ্ছে। সকাল থেকে কাকগুলো বড় বেশী কা কা করছে।

বাজারে যাবার দরকার ছিল না তবু অভ্যাসমত দীননাথ একবার টহল দিয়ে ফিরতে শবু বলল—

'শুনছো গো 'ব', আমি হাঁ করতে পারছিনা।'

'হাঁ করতে পারছ না! দাঁতের মাড়ি ফুলেছে কি? কিম্বা হয়ত ঠাণ্ডা লেগেছে। এক কাজ কর, অল্প গরম জলে নুন গুলে কুলকুচি আর গার্গল করে দেখত, উপকার হয় কিনা।'

শবু বলল—'তা করছি। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না, ভীষণ ভয় ভয় করছে। কাকগুলোও ভীষণ কা কা করছে, অনেকদিন বাবা বা কানাইয়ের চিঠিও পাচ্ছিনা।'

দীননাথ কাক ডাকায় আমল না দিয়ে বলল—

'কাকেরা তাদের স্বভাবে কা কা করছে। ঐ যে নারকেল গাছটা কাটা

হল, ওদের বসার জায়গার অভাব হয়েছে, তাই। তুমি নুন জল ব্যবহার করে দেখ ত।'

একটা অস্বস্তির মধ্যে দিন গড়িয়ে চলেছে। বেলা গড়িয়ে দীননাথ ব্রাহ্মণ ভোজন সেরে গীতা ও একটি টাকা ভোজন দক্ষিণা নিয়ে বাড়ী ফিরল। গীতার ব্যাপারে কিছু বলার নেই, কিন্তু ঐ টাকাটা দেখে শবুর ভাল লাগছেনা, বলল—

'ওটা না হয় কোন ভিখারীকে দান করে দিও।'

'টাকার আবার জাত আছে না কি' বলে দীননাথ নির্বিবাদে সেটা পকেটে চালান করে দিল।

ওপাশ থেকে তন্বী একভাবে ডাকছে—

'ও শ্রাবণীদি, ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ, অখনে ব্রাহ্মণীগর ভোজন হইব, আয়েন।'

দীননাথ বলল—'যাও, তুমি খেয়ে এলে আমি বের হব শীতলের ব্যাপারে।'

শবু অসহায়ভাবে তাকাল দীননাথের দিকে—'আমার যেন কেমন লাগছে, ভয় করছে, যেতে ইচ্ছে করছে না।'

সহানুভূতির সুরে দীননাথ বলল—'মাসীমা তোমাকে বড় ভালবাসতেন, তোমারও তাঁকে খুব ভাল লাগত—তাই তোমার মন খারাপ লাগছে। আমার ও খেতে যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উনি প্রাচীন মানুষ ছিলেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালে নাকি আত্মার সদ্গতি হয় তাই যাওয়া। না হলে ঐ গীতা আর টাকা দিয়েই বা আমি কি করব। আমি ব্রাহ্মণ কিনা জানি না তবে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে ত বটে। যাক, তোমার ভাল না লাগলে যেয়ো না। ওদেরকে তবে বলে দাও।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল' বলে শবু এগিয়ে গিয়ে ডাকল—'ও তন্বীদি, শুনুন। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, কিছু মনে করবেন না।'

তন্বী বলল—'অনেক আশা করছিলাম আপনি আইবান, আপনার জন্য পাতাও পাইড়া রাখছি। শরীর খারাপ হইলে আর কি করণ যাইব। যাই, নিমন্ত্রিতেরা আইয়া বইয়া আছে।'

শবু ঘরে এসে ঢুকলে দীননাথ বলল—'তুমি তাহলে ঘরেই চিড়ে মুড়ি যা আছে দুটো মুখে দিও, আমি চলি, শীতলকে ফতিমা সেণ্টারে নিয়ে যেতে হবে।'

দীননাথকে 'যাওন নাই আহ গিয়া' মন্ত্র পড়ে গাড়ীতে রওনা করে দিয়ে

গেট বন্ধ করে শবু বিছানায় এসে নিশ্চেষ্ট শুয়ে রইল। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, কিছু করার উৎসাহও পাচ্ছে না।

চোখ দুটো বুজলেই সামনে ভেসে উঠছে মাসীমার শয্যাশায়ী অবস্থার দৃশ্য অবশ দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্নিমেষে শবুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন, মুখের ভাষা তাঁর হারিয়ে গেছে। শবুর ভীষণ ভয় ভয় করছে, গা ছমছম করছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কাকগুলো দিনের শেষবারের মত আবার কলরব জুড়েছে—কা-কা-কা!

অনেকটা রাত করে দীননাথ ফিরে বলল—

'আকুপাংচারের অনেক ঝামেলা পঁচিশ ত্রিশবার গিয়ে সিটিং দিতে হবে তবু কোন সুফলের সম্ভাবনা আছে কিনা বলতে পারল না। ওরা ঠিক করেছে ওখানে আর যাবে না, কলকাতার এক বিলেত ফেরৎ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবে। পরিচিত একজন লোককে ধরেছে, ডাক্তারের ফী লাগবে না।'

অবেলায় নেমন্তন্ন খেয়েছে, দীননাথ রাতে আর কিছু খাবে না। শবু দুটো চিড়ে মুড়ি চিবিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দীননাথের হয়ত মনে পড়ে গেছে, জিজ্ঞেস করল—'কাল কবার গার্গল করেছ? এখন কি অসুবিধে হচ্ছে বল।'

না, আজ কালকের মত সেরকম লাগছে না। শবু বলল—'মনে হচ্ছে, অসুবিধে অনেক কম।'

দীননাথ নিজের ডাক্তারীতে খুশি হয়ে বলল—'নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগে ও রকম মনে হচ্ছিল, আরো দু একদিন গার্গলটা চালিয়ে যাও দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

আরো দু একটা দিন গরম নুন জলে গার্গল ও কুলকুচি করে মনে হচ্ছে সত্যি হাঁ করতে অসুবিধে আর হচ্ছে না. চোয়ালের আড়ষ্ট ভাব কেটে গেছে। কিন্তু কেমন একটা অবসন্ন ভাব শবুর দেহকে একটু একটু করে ঘিরে ধরছে। কাজে কর্মে আগের মত তেমন উৎসাহ বোধ করে না। যতটা সম্ভব পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে সে রোজ দীননাথকে খেতে দিত এখন ডাল আর একটা মাছ বা তরকারীর সঙ্গে ভাত রেঁধে দিতেই কেমন যেন আর পেরে ওঠেনা। সন্ধ্যা বাইরের কাজ করলেও উনুন ধরানো কুটি করা, মাছ তরকারী কোটা মশলা বাঁটা জল ভরা রান্না করা একা হাতে সব করতে হয়। এখন বাড়ীতে কেউ লোকজন আসবে, খাবে শুনলে আতঙ্ক হয়, অথচ আগে সে একা রোজ আট

দশজনের রান্না করে পরিবেশন করে খাইয়েছে।

অত দাম দিয়ে ভারী লোহার উনুনটা কিনে এনে হয়েছে ভীষণ অসুবিধে, একবার বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া আবার জলন্ত উনুন উঠিয়ে ঘরে নিয়ে আসা —শবু আর পারে না। দীননাথ বাড়ীতে থাকলে ভরা কলসী বা বালতি টেনে নিয়ে যাওয়া, জলন্ত উনুনটা এনে দেওয়া এ সব বললে করে দেয়। আবার অনেক সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ভুলে যায়।

দীননাথকে উনুনটা আনতে বলে শবু রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেরী দেখে উঠে গিয়ে দেখে গুলের উনুন আঁচ উঠে গন্‌গন্‌ করছে। বাইরের ঘরে গিয়ে দেখে দীননাথ কাগজে মুখ গুঁজে বসে আছে।

ক্ষোভে দুঃখে শবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—

'আমার একটা কাজও বুঝি তোমার করে দিতে ইচ্ছে করে না? পারবে না বলে দিলেই পার' বলতে বলতে দীননাথ কাগজ ছেড়ে উঠে আমার আগে ছুটে গিয়ে নিজেই জলন্ত উনুনটা পড়ি কি মরি করে ঘরে নিয়ে আসে।

দীননাথ অকৃত্রিম আফশোষে পিছন পিছন এসে বলে—'ইস্‌, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, আর এমনটি হবে না। বল আর কি করতে হবে?' বলে হাতে হাতে অনেক কাজ করে দেয়, টুকিটাকি জিনিষ শবুর কাছে এগিয়ে দেয়।

দেখে শবুর দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে। এমন দুর্বল অবসন্নভাব ত তার কোনদিন ছিল না। কি যে হয়েছে সে নিজেই বুঝতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝাও যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় মাসীমার মত তারও হাত পা বুঝি অবশ হয়ে আসছে। আবার মনে হয়, এটা হয়ত তার মনের ভুল, কিছুদিন আগে মাসীমাকে ঐ রকম অবস্থায় দেখেছে ত।

মনের ভ্রম কাটাতে শবু দীননাথকে জিজ্ঞেস করে—'দেখ ত, আমার একটা হাত অন্য হাতের চেয়ে সরু দেখাচ্ছে কিনা, মাসীমার মত আমার হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে কি?' তার ধারণা যে-অঙ্গ অবশ হবে তাকে অন্যটির চেয়ে সরু দেখাবে—পোলিও হওয়া ছেলে মেয়েদের ঐ রকম সে দেখেছে।

দীননাথ আশ্চর্য্য হয়ে বলে—'সরু হবে কেন, ঠিকই আছে। আসলে মাসীমাকে ঐ অবস্থায় দেখে তোমার মনের উপর নিশ্চয়ই ভীষণ চাপ পড়েছে। ওসব চিন্তা তুমি মোটে কোরো না।'

হয়ত দীননাথের কথাই ঠিক। মনটাই ত সমস্ত দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে চালায়। মন মস্তিষ্ক আর দেহযন্ত্র সব এক সঙ্গে বাঁধা।

এমনি অস্বস্তি অবসন্নতার মধ্যে এল বাবা আর কানাইয়ের চিঠি। শবু তাড়াতাড়ি প্রথমে বাবার চিঠিখানি পড়ে ফেলল। বাবা লিখেছেন—আমার শরীর ভালই আছে তবু বার্দ্ধক্যের লক্ষণগুলি একে একে আক্রমণ করছে। আমার জন্য চিন্তা কোরোনা। কানাইয়ের বাড়ী মোটামুটি হয়ে গেছে, এখন দরজা জানালা লাগান হচ্ছে, তোমরা এসে দেখলে খুশি হবে। নাতনী তিনটি সহ আমরা ভাল আছি। দীননাথ ও তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও।

বাবার চিঠি পেয়ে ও কানাইয়ের বাড়ী হয়ে গেছে জেনে শবুর শরীরের সব অবসাদ ভাব যেন মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল। এখনই একবার ছুটে গিয়ে বাড়ীটা দেখে আসতে ইচ্ছে করছে—শিল্পী কানাইয়ের বাড়ী তার নিজে হাতে আঁকা ছবির মতই সুন্দর দেখাচ্ছে কি না। গেটের দুপাশে নারকেল গাছ দুটো নিশ্চয়ই এখনো লাগান হয়নি।

এবার শবু কানাইয়ের চিঠি পড়তে আরম্ভ করল। কানাই লিখেছে—মেজদি, তোদের সকলের সাহায্যে বাড়ী তৈরী এক রকম শেষ হয়েছে, এখন দরজা জানালা লাগছে, পরে ইলেকট্রিকের লাইন লাগলেই সব কম্প্লীট হবে। প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার বন্ধক ও ধার দেনা হয়েছে। ভাবছি প্রথমে কয়েক বছর ভাড়া দিয়ে ভাড়া ও ডিসপেন্সারীর টাকায় ধার দেনাগুলো শোধ করে তারপর নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে উঠব।

একটা দুঃসংবাদ মেজদি। কয়েকদিন আগে আমি বাড়ী ছিলাম না, সঞ্জয় এসে ঝুলোঝুলি করে কাকলীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে জামাইবাবুর গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়েছিল, দু মিনিটের মধ্যে শাহীর মোড়ে এক ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে নিজেও আঘাত পেয়েছে গাড়ীটাও চুরমার করে ফেলেছে নিজে নিজেই শ দুয়েক টাকা খরচ করে কোন রকমে গাড়ীটাকে চালু করে ফেরৎ দিয়ে গেছে। জামাইবাবুকে বলিস যেন দুঃখ না করে, আমি একটু সুবিধে পেলেই যা যা বদলানো দরকার বদলে গাড়ীটাকে ঠিক করে ফেলব।

মন্তু এখানে এসে আর স্কুলে ভর্ত্তি হয়নি, সে নাকি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আবার শুনছি নাকি ওদের নামে ব্যাঙ্কে জমা টাকাগুলো উঠিয়ে বোম্বেতে গিয়ে বিজনেস করবে। আমি আমার কর্ত্তব্য করে যাচ্ছি।

বেশ আনন্দ সহকারে চিঠি পড়তে গিয়ে মাঝের অংশে এসে আবার শবুর মন খারাপ হয়ে গেল। ওদের এত যত্নের আদরিনী সঞ্জয়ের হাতে পড়ে দু মিনিটের মধ্যে খোঁড়া হয়ে খুঁতো হয়ে গেল যা এই আট বছরে কোন দিন হয় নি। আর এটা ঘটেছে এমন একটি জায়গায় ঠিক যেখান থেকে

চব্বিশ বছর আগে শবু নতুন বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে বসে প্রথম বাপের বাড়ী ছেড়ে রওনা হয়েছিল। এই বছরই তাদের বিয়ের গাড়ু চুরি হল আর যে বাড়ীতে তাদের বিয়ে হয়েছিল তার সামনের রাস্তায় আদরিণী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শবুদের ভাগ্যেও কি কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে!

মনের দুঃখে শবুর বার বার শুধু মাকে মনে পড়ছে। মা চলে গেছে প্রায় চার বছর হল। একটি বছর সে শুধু মার জন্য কেঁদেছে। তারপরে কলকাতায় এসে থেকে নানা ঘটনায় ও ঘাত প্রতিঘাতে মাকে তেমন করে মনে করতে পারেনি।

অনেক দিন পরে বাক্স পেঁটরা ঘেঁটে মার পুরোনো চিঠিগুলো খুঁজে বের করে পড়তে লাগল—ছেচল্লিশখানা চিঠি পাওয়া গেল মাত্র। ইস্, মার কত চিঠি বারবার জায়গা বদলে হারিয়ে গেছে। এখন শবুর সামনে মার শেষ চিঠিখানি যাতে মা লিখেছেন—সামনে জামাইষষ্ঠী—তপু অমলের নতুন বিয়ে হয়েছে—ওদের জামাইষষ্ঠী পার দিতে হবে—আমার শরীর বিশেষ ভাল না।

শবু আর পড়তে পারে না, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। শরীরটা আবার অবসন্ন লাগছে।

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে দীননাথ বলল—'ডালহৌসী দিয়ে আসার সময় হঠাৎ গাড়ীর চাকা পিছলে পড়ে যেতে যেতে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।'

উদ্বিগ্ন শবু জিজ্ঞেস করল—'তোমার কোন চোট লাগেনি ত, গাড়ীটার?'

না, সে সব ঠিক আছে' বলে দীননাথ আজকের ডাকে আসা চিঠি পড়তে লাগল। চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে শেষে বলল—

'কানাইয়ের বাড়ী হয়ে গেছে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু সঞ্জয় যে মাত্র দু মিনিটের মধ্যে গাড়ীটাকে ভেঙে ফেলল। এখন যত মেরামত ও বদল করাই হোক সেই নিখুঁত গাড়ী আর হবেনা। আমার আদরিণী নম্বর টু খোঁড়া হয়ে গেল। আবার সেই শাহীর মোড়ে যার সামনের বাড়ীতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তোমার খুব মন খারাপ লাগছে, তাই না?'

শবু আর কি বলবে। দুঃখে তার মুখে কথা সরছে না।

কিছুক্ষণ ভেবে দীননাথ বলল—'একটা কথা ভাবছিলাম। মিঠি দিঠি বাঙালীর মেয়ে হয়ে মোটেই বাংলা লেখাপড়া শিখল না। নানান ঘটনায় তোমারও ভীষণ মন খারাপ বুঝতে পারছি। এক কাজ করা যাক, সামনেই

ত ওদের পরীক্ষা হয়ে যাবে, বাবা আর কানাইকে লিখে দি, ওরা এসে এখানকার বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হোক। তুমি ওদের দেখাশোনা করবে আমি স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসব, তুমি গিয়ে নিয়ে আসবে। ওদের বাংলা পড়াও হবে, তোমারও মন ভাল থাকবে।'

কথাটা শবুর মনের গোপনে ছিল, কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি। হলে ত ভালই হয়। কিন্তু মেয়ে দুটো যে বাবার অন্ধের যষ্টি। তাছাড়া শবুর এখন যা শরীরের অবস্থা তাতে সে কি পারবে ঘর সংসারের কাজ করে দু দুটো মেয়েকে সামলাতে? ওরাই কি মা বাবা দাদুকে ছেড়ে এসে থাকতে পারবে? কানাই কাকলী কি মেয়ে দুটোকে ছেড়ে থাকতে পারবে? 'মিষ্টি' মা কি একা বোধ করবে না দিদিদের অভাবে?

শবু মনে মনে হিসেব করে দেখল মঙ্গলা দেবীর চিঠিটা এসেছে মাত্র দিন দশেক আগে, প্রায় ঐ সময়ই আদরিণী দুর্ঘটনায় পড়েছে আর এদিকে ধীরে ধীরে এক অবসাদ এসে শবুকে ঘিরে ধরেছে। দেখা যাক, মিঠি দিঠি এলে নিশ্চয়ই একটা পরিবর্ত্তনের স্বাদ পাবে।

তবু মনে সংশয় নিয়ে শবু বলল -'আমরা কি পারব ওদের ঝক্কি সমলাতে?'

দীননাথ বলল—'ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকলে স্কুলে বন্ধুবান্ধব পেলে ভুলে থাকতে পারবে মনে হয়। আর ওরা এলে বাড়ীর পরিবেশটাই পাল্টে যাবে, তোমারও দেখবে ভাল লাগবে।'

দীননাথের কথায় শবু উৎসাহিত বোধ করল। প্রায় সব ব্যাপারেই ওদের চিন্তা ভাবনা অনেকটা এক ধারায় বয়। বলল—

'তাই কর, চিঠি লিখে দাও।'

দুজনে মিলে বাবা ও কানাইকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখে দিল। পরদিন চিঠি পোষ্টও হয়ে গেল। এমনি করেই ওরা সেরাতের অপ্রিয় প্রসঙ্গ ভুলে যেতে চাইছে। ফিরে পেতে চাইছে ওদের মনের মিলে সুখে শান্তিতে কাটানো আগের সেই দিনগুলি।

চার

শবুর এখন কি যেন হয়েছে, সব সময় দীননাথের কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করে। অফিসের সময় ছাড়া বাকি সময়টা। শোয়াটা অবশ্য আলাদা

বিছানাই বহাল আছে। তবে বিশেষ করে সন্ধ্যে থেকে রাতে শুতে যাবার আগ পর্য্যন্ত দীননাথের কাছে থাকতে না পারলে ভাল লাগেনা।

সন্ধ্যের পর দীননাথের বিশেষ তিন বন্ধু শশধর, সমীর ও নিকুঞ্জ বাবুরা প্রায়ই আসে, তারা অনেক সময় একসঙ্গে বসে টিভি দেখে। সিনেমার দিন বা চিত্রমালার দিন পাড়ার মেয়েদের ভিড়ে ঘর ভরে যায়। ভাল প্রোগ্রাম না থাকলে চারবন্ধু বাইরের ঘরে তাস খেলতে বসে। চাইলে শবু চা করে দেয়। না হলে শুধুই শুয়ে বসে থাকে, গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করে।

শশধর বাবু সবার বড়। খুব ভাল মানুষ, শবু প্রয়োজনে তার সঙ্গে দু চারটে কথাও বলে।

সমীরবাবু কনিষ্ঠতম, অত্যন্ত ভদ্র। বছর খানেক হল নতুন গাড়ী কিনেছে দীননাথ তাকে গাড়ী চালানো শিখিয়েছে।

নিকুঞ্জবাবুকে শবুর তেমন ভাল না লাগলেও দীননাথের সঙ্গে সবাই এক মতের লোক বলে তাকেও মন্দ লাগেনা। তবে এই বাড়ীর কাজের জন্য দীননাথ দুই দফায় মোট দু টন সিমেণ্ট পেয়েছিল। কাজ শেষ না হতেই দ্বিতীয় বারের সিমেণ্ট থেকে নিকুঞ্জবাবু ঝুলোঝুলি করে দশ বস্তা সিমেণ্ট নিয়ে গেল—দীননাথও অতটা লাগবে না ভেবে কেনা দামে দিয়ে দিল। পরে কম পড়াতে পাড়ার সুকুদের কাছ থেকে শবু নিজে গিয়ে কথা বলে কালো বাজারের দরে ছ' বস্তা সিমেণ্ট আনাবার ব্যবস্থা করেছে, নিকুঞ্জবাবুর কাছ থেকে দশ বস্তার মধ্যে মাত্র এক বস্তা ফিরিয়ে আনতে পারা গেছে। মাঝখান থেকে দীননাথকে শ খানেক টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে আর নিকুঞ্জবাবু মৌখিক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।

বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলতে খেলতে দীননাথ মাঝে মাঝে জল খেতে শোবার ঘরে আসে। শবু হয়ত শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে তখন, দীননাথ বলে—

'তোমার কপালে মশা বসে কামড়াচ্ছে, তাড়াচ্ছো না?'

'হ্যাঁ, কামড়াচ্ছে মনে হচ্ছে, দাও ত, মশাটা মেরে দাও ত।' শবু বই থেকে চোখ না তুলে বলে।

দীননাথ মশা মেরে বা তাড়িয়ে দিয়ে আবার তাস খেলতে চলে যায়। মশা কামড়ালে বুঝতে পারে ঠিকই কিন্তু সেটাকে তাড়াতেও শবুর যেন আলিস্যি লাগে।

আজকাল এক নতুন উপদ্রব হয়েছে। মোটা মত একটি লোক বৈকুণ্ঠবাবু

এসে তাস খেলার দলে ভিড়েছে। সবদিন সবাই আসেনা, কিন্তু মোটা লোকটির আসা বাঁধা। এসেই হাঁক দেবে—

'লাহিড়ীবাবু। একাই নাকি?'

শুনে শবুর পিত্তি জলে যায়। ওরা দুজন থাকে, একা হতে যাবে কেন?

অন্য কেউ আসেনি দেখে মোটকা বৈকুণ্ঠবাবু বলে—

'এই ত ক্যারাম বোর্ড আছে, আসুন এক হাত খেলা যাক।'

যে দিনই খেলে সে দিনই হারে। তবু আসে, হাঁক দেয়—'একাই নাকি' আর দীননাথকে টেনে খেলতে নামায়।

শবুর ভাল লাগেনা। অন্য কেউ না এলে যে একটু দুজনে বসে টিভি দেখবে বা গল্প করবে তা হতে দেবে না। তখন একা একা টিভি দেখতেও ভাল লাগেনা, গল্প করা ত হয়ই না।

শবু দীননাথকে বলে—'রোজ রোজ তুমি মোটকাটার সঙ্গে ক্যারাম খেল। আজ আমার সঙ্গে খেল।'

'খেলবে তুমি? এস খেলি'—বলে দীননাথ খুশি হয়ে শোবার ঘরে ক্যারাম পেতে নিয়ে বসে।

খেলতে খেলতে শবু জিজ্ঞেস করে 'মোটকাবন্ধু যদি আসে তবে কি করবে?'

দীননাথ বলে—'এলে বলে দেব, আজ আমরা দুজনে খেলছি, আপনার খেলা হবে না।'

বৈকুণ্ঠবাবু সত্যিই আসে আর দীননাথের জবাব শুনে চলে যায়। পরদিন আবার আসে। মোটকা-বন্ধু এসে ফিরে গেলে শবুর কষ্টই লাগে—আহা, বেচারা হয়ত শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট ভুলে থাকতে এখানে আসে! তাকে না ফেরালেই হত।

এদিকে তাদের খেলাও তেমন জমে না, শবু ত ভাল খেলতে পারে না। দীননাথ অনেক চেষ্টা করেও হারতে পারে না। এক তরফা খেলা ভাল লাগে না, তার চাইতে গল্প করা ভাল। আর সেই সুযোগে মোটকা এসে আবার জাঁকিয়ে বসে, ক্যারাম খেলা না হলেও বসে বসে শুধু টিভি দেখে।

শশধর বাবুরা এলে কোন কোন দিন লোড্ শেডিং এর সুযোগে রাজনীতির আলোচনা শুরু হয়। চীন-আমেরিকা দোস্তি ও চীন-রাশিয়ার মন কষাকষির ক্ষতিকর দিক কি কি, কিউবা, ভিয়েৎনাম শেষে ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার। এক বছর হল কেন্দ্রে জনতা সরকার হয়েছে, রাজ্যে ন'মাস হল ফ্রন্ট সরকার চালু হয়েছে।

দীননাথ জনতার উপর ভরসা রাখেনা, বলে—

'জনতা সরকার হয়ে শুধু কমিশনই বসছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছেনা। অন্যায় অবিচার যেমন ছিল তেমনই চলছে।' দীননাথের প্রোমোশনের জন্য দরখাস্তের সেই গতানুগতিক জবাব এসেছে—এত বছরের পুরোনো অবিচারের আশু প্রতিকার করা সম্ভব নয়। বিরক্ত হয়ে সে আবার নোটিশ দেবে ঠিক করেছে।

নিকুঞ্জবাবু বলে—'ফ্রন্ট সরকার তার কর্মচারী ও রাজ্যের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না করলে ফল ভাল হবে না।' তার স্বার্থ রাজ্য সরকারের সঙ্গে বাঁধা।

সমীরবাবু বলে—'হবে মশাই হবে, আপনি দেখি লাফ দিয়ে গাছে উঠতে চান। সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় যতদূর করা যায় ফ্রন্ট নিশ্চয়ই তা করবে। প্রথমেই জোর দেয়া হয়েছে বর্গাদারদের হাতে জমি তুলে দেবার কাজে। কৃষি প্রধান দেশে চাষীদের ভাগ্য ফেরান আর গ্রামের উন্নতি করাই হল প্রথম ও আসল কাজ। কৃষক বাঁচলে তবে শিল্প বাঁচবে, শ্রমিকও বাঁচবে।'

শশধরবাবু বলে—'ফ্রন্ট সরকার মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাথমিক শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে। দেখেন নি, আজকের কাগজে কি লিখেছে?'

যে যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কথা বলে, মোটের উপর এদের বিশেষ মতবিরোধ হয় না। মোটকা বন্ধু বৈকুণ্ঠবাবু উপস্থিত থাকলে সে কোন মন্তব্য করে না। তার মত হয়ত বা অন্যরকম, যদিও সে নিকুঞ্জবাবুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

শবু এ সব খবরই জানে, কোন ব্যাপারে তার দ্বিমতও নেই। অনেক খবর সে রাখে। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর, চার্লি চ্যাপলিন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য মারা গেছে। চীনের প্রবাদ পুরুষ মাওৎ সেতুং, প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেমে গিয়ে নতুন পথের সন্ধান চলছে—চারচক্রীর বিচার চলছে। ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ হো চি মিন আরো আগে গত হয়েছে—সায়গন পরে মুক্ত হয়েছে, তার নাম হয়েছে হো চি মিন নগরী। কিউবায় কাস্ত্রোর সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। সবার উপর সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়া যাকে হিটলার ধ্বংশ করতে পারে নি, লেনিন-ষ্ট্যালিনের সেই রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্রকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আমেরিকাকে সব বিষয়ে টেক্কা দিচ্ছে। লাওস, কম্বোডিয়া মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। বাড়ীর পাশে বাংলা দেশ অনেকদিন আগেই স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মুজিব আর বেঁচে নেই।

চারদিকে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেশেও কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। অবশ্য শবু জানে—এ-ই সব নয়। আরো বড় রকমের পরিবর্ত্তন দরকার। সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকার, সমান কাজে মেয়ে পুরুষের সমান মজুরী, পণপ্রথা বিরোধী আইন—অনেক কিছুই কাগজে পত্রে হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি দেশে দশ বছর মহিলা প্রধান মন্ত্রী থেকেও। এখনও মেয়েরা বিয়ের পরে নানা ভাবে নির্য্যাতীতা হয়। লোকে মেয়ে হয়েছে শুনলে এখনও মুখ বাঁকায়।

নারীপুরুষে মিলেই সংসার সমাজ পৃথিবী তবু নারীদের অবহেলার শিকার হতে হয়। অথচ প্রকৃতিগতভাবেই নারী পুরুষের ধ্যান করে শিবজ্ঞানে, পুরুষও পেতে চায় আপন সঙ্গিনী পার্বতীকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীই আসে নারীর শত্রু হয়ে চার চাকার রথে চড়ে—শাশুড়ী, ননদ, জা, কখনো বা স্বামীর উপপত্নী বা প্রেমিকা হয়ে। তারাই কখনো একা কখনো বা অন্যের সঙ্গে মিলে আসে এক একটি নারীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে। ফলে উপায় থাকে না আগুন, দড়ি, বিষ বা অতলজল কোন একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া।

শবুর চিন্তাসূত্র কেটে যায়, দীননাথ এসে ডাকে—'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, রাত নটা বাজে, আজ খাওয়া হবে না?'

এমনি করেই দিন কাটে। কোনদিন কেউ না এলে গল্প বা খেলা জমে দীননাথ ও শবুতে, আবার কোন দিন খেলার মাঝখানে দেরী করে বন্ধুরা এলে, শবুদের খেলা ভেঙে যায় মাঝ পথে। শবুর মন খারাপ হয়ে যায়—খেলা মাঝপথে ভেঙে যাওয়া খুব খারাপ।

পাঁচ

এমনি করেই শবুর জীবনের খেলাও বুঝি ভেঙে যেতে বসেছে। এসে গেল এক ভীষণ আতঙ্কের দিন।

ছুটির দিন। সকালেই এসেছে ভব। বাইরের ঘরে দীননাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে তার বাড়ী দেখতে চলে গেল। শবুর কানে দু চারটি কথা ভেসে এসেছে—'মা' 'গৃহপ্রবেশ' 'পুরুতঠাকুর।'

একটু পরে দীননাথ এসে বলল—'ভবর কোয়ার্টারে মা এসেছে, গৃহ

প্রবেশের কি সব দিনটিন ঠিক করবে, আমাকে নাকি দেখা করতে বলেছে। যাই, এ বেলাই ঘুরে আসি—খাবার আগে একটার মধ্যেই ফিরব' বলতে বলতে সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবারে আর চিঠি নয় তিনি স্বয়ং এসেছেন। কেন এসেছেন, কি করবেন, কোথায় থাকবেন ভাবতে ভাবতে শবুর মন আতঙ্কে ভরে উঠল। অবসন্ন দেহে অবশপ্রায় হাতে কোনরকমে রান্না শেষ করে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ভাবনায় যেন মাথার ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। ভব মাঝখানে একবার দেখা দিয়ে—'আমার অনেক কাজ, এখন আর চা খাব না' বলে চলে গেছে।

দীননাথ একটায় ফিরে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল—'আমার যাবার দরকার ছিলনা, মা সদলবলে বিকেলে এখানেই আসছে ভবর বাড়ী দেখতে আর পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে গৃহ প্রবেশের দিন ঠিক করতে। আমাকে শুধু শুধু দৌড় করাল ভব। তুমি আমাদের ভাত বেড়ে নাও আমি ততক্ষণ পুরুতকে একটা খবর দিয়ে আসি। এই ধর মিষ্টির ভাঁড়, কুটুমরা এলে ভদ্রতা করতে হবে ত!'

এক একটি কথা শবুর বুকে হাতুড়ির ঘা মারছে। প্রতিটি শব্দ যেন পৃথিবীর সব রূপ রস গন্ধ বর্ণ শুষে নিচ্ছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে—বুকের ভেতর মুচড়ে উঠছে—একটা কান্নার ঢেউ গলায় আটকে আছে।

দীননাথ এসে তাগাদা দিল—'এসো, এসো, খেতে বসা যাক, বেলা দেড়টা বেজে গেল। পুরুত আজ আসতে পারবে না বলল।'

মঙ্গলা দেবী এলেন বিকেলে। সারা দুপুর শবু বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করেছে, দুচোখের পাতা এক করতে পারে নি। শুয়ে শুয়ে মঙ্গলা দেবীর গলার আওয়াজেই বুঝতে পেরেছে—তিনি এসেছেন, তবে আগে এ বাড়ীতে না এসে প্রথমে নতুন বাড়ী দেখতে গেছেন, সঙ্গে মালতী আর তার ছেলে মেয়ে। প্রথম এসেই এবাড়ী ওবাড়ী—একটা কোন্দল পাকাবার চেষ্টা।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি এ বাড়ীতে এলেন। শবু দরজা খুলে দিলেও তাঁর ফিরে তাকাবার অবসর নেই, 'মোতি' 'মোতি' করে মালতীর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। শবু প্রণাম করতে 'অ' বলে মুখে একটা শব্দ করে শবুকে প্রায় ডিঙিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে মঙ্গলা দেবী হাঁক ছাড়লেন—

'কৈ রে, দীনু কৈ, আমার পুরুত ঠাকুর কোথায়, কখন আসবে?'

দীননাথ সংক্ষেপে জানাল—'সে আজ আসতে পারবে না, কাল সকালে আসবে বলেছে।'

মঙ্গলা দেবী বললেন—'তার জন্ত আমার বসে থাকার সময় নাই, কোয়ার্টারে আমার বিস্তর কাজ পড়ে আছে। ওসব চ্যাংড়া পুরুতের চেয়ে আমিই ভাল দিন ঠিক করতে পারি। তাকে শুধু কাজের দিনে সময় মত হাজির পেলেই হল।'

শবু ততক্ষণে ষ্টোভে চা বসিয়ে প্লেটে করে মিষ্টি এনে সবাইকে দিতে দিতে মঙ্গলা দেবীকে জিজ্ঞেস করল—'ভবর বাড়ী কেমন দেখলেন?'

'না বাপু, একদম ভাল না, একেবারে ঠিক কোয়ার্টারের মত, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এ বাড়ীর মত খোলা মেলা নয়।'

চায়ের জল ফুটে গেছে, শবু ছুটল রান্নাঘরে। এতক্ষণে ভব আবার এল। শবু রান্নাঘরেই তার হাতে মিষ্টির প্লেট তুলে দিতে ভব বলল—

'কি ব্যাপার, মিষ্টি!'

শবু বলল—'কত বছর ত শুধু তেতোই খাইয়েছি, এবার থেকে মিষ্টি। তোমরা যে আমার আপনজন, প্রতিবেশী। তোমার গৃহপ্রবেশের মিষ্টি আগাম খাইয়ে রাখলাম, পরে যদি আর সুযোগ না পাই। তা দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

ভব হেঁয়ালীতে জবাব দিল—'সবার যেমন যাচ্ছে, তেমন।'

মালতী চায়ের কাপ-প্লেট রাখতে এসেছিল, সে শুধু একটু মুখ বাঁকাল। শাশুড়ীর সামনে এর বেশী কিছু করার তার উপায় নাই, সে বুঝি এখন তাঁর সুনজরে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলা দেবী হাঁক ছাড়লেন—'কিরে ভবা চা খাওয়া হল? আসলি ত সন্ধ্যা গড়িয়ে, আর দেরি না করে এখন চল।'

পরে সবাইকে শুনিয়ে মঙ্গলা দেবী ঘোষণা করলেন—'ভবা, তোকে বলেছিলাম আমার জন্ত একটা ঘর করতে, তা করিসনি। তুই মিটমিটে শয়তান তোকে আমি চিনি না? আমিও দেওয়ানের বেটি—আমাকে তুই জব্দ করবি! ঐ যে স্বর্গের সিঁড়ি করবি বলে যে ঘরটা রাখছিস আমি সেই ঘরেই এসে থাকব আর সকলের জন্ত স্বর্গে বাতি দেব। আমি মরব না। এস বৌমা' বলে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি রওনা হলেন, পিছনে ছেলে কোলে মালতী, তার মেয়ে আর সব শেষে ভব। একবার মুখ ফিরিয়ে করুণ চোখে চেয়ে ভব বলল—'চলি বৌদি।'

শবু হতভম্বের মত সকলের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—তার সব বোধশক্তি বুঝি লোপ পেয়েছে।

সন্ধ্যা ডাকল—'মাসী, তুমি আমারে ক্যান থাকতে কইছিলা?'

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শবু রান্নাঘর থেকে অবশিষ্ট দুটি মিষ্টি ভাঁড় সুদ্ধ সন্ধ্যার হাতে তুলে দিল।

সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল—'মাসী, ঐ বুঝি তোমার শাশুড়ী? আমি আর একবার দেখছিলাম সেই যেবারে বাড়ীতে অনেক লোকজন আইছিল. খাওয়া দাওয়া হইছিল। আচ্ছা মাসী, তুমি ঐ শাশুড়ীর লগে ঘর করছ?'

শবু অন্যমনস্কভাবে বলল—'হ্যাঁ, শুধু আমিই করেছি, আর কোন জা করেনি।'

সন্ধ্যা যেন ভয়ে শিউরে উঠল, বলল—'বাপরে, কি যাইগা হাঁক ছাইড়া কথা কয়, কেমুন কইরা তাকায়। আমি হইলে ভয়েই মইরা যাইতাম। যাই মাসী, আন্ধার হইয়া গেছে।'

সন্ধ্যা দুদিন দেখেই ভয়ে মরছে আর শবু তার দুর্বল মন নিয়েও এখনো টিকে আছে। সাপ বা বাঘের সামনে পড়লে মানুষ যেমন ভয়ে তার সব বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে শবুরও আজ তেমনি অবশ অবসন্ন ভাব। এ অবস্থায় নারীমুক্তির কথা উপহাসের মত শোনায়।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার খবরের সময় শবু রান্নাঘরে গিয়ে আবার ষ্টোভ জেলে রাতের ভাত বসিয়ে ঘর থেকে বেরোতে সময় দেখে একটা প্রায় দুহাত লম্বা সাপ এঁকে বেঁকে দরজার নীচে শুয়ে আছে, অনেকটা যেন দরজার চৌকাঠ। অল্পের জন্য তার গায়ে পা দেয়নি।

দীননাথকে ডাকতে সে এসে সাপটাকে মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে এসে বলল--

'তুমি বাড়ী থেকে ব্যাঙ তাড়াতে দাও না, সেই ব্যাঙের লোভে বাড়ীতে সাপ ঢুকছে। আর একটু হলে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি!'

শবু বলল—'কাফ্ এর মেয়ে সাপে ছোঁয় না। তোমাকে যেন না কামড়ায়।' সকল অবস্থাতেই তার এক চিন্তা—স্বামীর যেন কোন বিপদ না হয়, তার শাঁখা সিঁদুর যেন অক্ষয় থাকে। তাছাড়া বাবা গিরিনবাবু বলেন—ব্যাঙ হল সব থেকে নিরীহ ও উপকারী জীব। তাই শবু কিছুতেই ব্যাঙ তাড়াতে দেবেনা। নিজের জন্য সে ভাবে না।

রাতে দুজনে খেতে বসে আবার মঙ্গলা দেবী প্রসঙ্গ উঠল। এবারে আর কোন মনকষাকষি নয়।

শবু বলল—'খুব ঘটা করে গৃহপ্রবেশ হবে মনে হচ্ছে। এ বাড়ীর সময় ত পুজো আর্চার নাম শোনা যায়নি।'

দীননাথ বলল—'এখন সবই হবে, ভাল ছেলের বাড়ী ত!'

শবু বলল—'যত পুজো হোক ঘটা হোক, এ ভিটেতে বাবা এসে তিনরাত বাস করে গেছেন এটাই আমার শ্বশুরের ভিটে, আমার স্বর্গ। তারপর গৃহ প্রবেশের পর কি হবে?'

দীননাথ বলল—'জানি না। শুনছি নাকি গৃহ প্রবেশের সঙ্গে তেরাত্তির বাসও হবে। আমার এ সবের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। সুবীর দিল্লী চলে গেছে, ননীবাবু মারা গেছে—না হলে বাসনা গ্রাম বা মাজদিয়ায় গিয়ে আমরা সে তিনদিন কাটিয়ে আসতে পারতাম। না হয় চল তিন দিনের জন্ম আমরা রিষড়া কোন্নগরে তপুদের বাড়ীতে থেকে আসি।'

শবুর কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও যেতে হবে না। বলল—'তপুরা এখন হয়ত হরিদ্বারে গেছে ফিরেছে কিনা জানা নেই। তিনদিন পার দিলে কি হবে, এখানে থাকবেন বলে গেলেন যে।'

দীননাথ অনিশ্চিতভাবে বলল—'সে হয়ত আরো পরে, এখনই নয়। দেখা যাক কি হয়।'

শবু বলল—'তার চেয়ে এক কাজ কর না? তুমিও দেখছি তিনদিনের জন্ম কোথাও পালাতে চাইছ। অফিসের অসম্মান এড়াতে আবার নোটিশ দিতে যাচ্ছ। আমার এখানকার স্থায়ী অপমান অপবাদ দুর্মুখ থেকে বাঁচবার পথ কি? আমি বলি কি, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—আমাকে বাঁচতে দাও। না. রাগের কথা নয়। আমি সেখানে গিয়ে বাবার সেবা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। তুমিও চাকরি যখন ছাড়বে, ওখানে গিয়ে থাকতে পার।'

দীননাথ বলল—'সেটা কি আমাদের উভয়ের পক্ষে সম্মানের হবে? বাবা কি চিরদিন থাকবেন? মিতুর চরিত্রের জন্ম তার যা অবস্থা হয়েছে, কানাইয়ের সংসারে তোমার সে অবস্থা হবে না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে? আর আমাদের এত সাধের বাড়ী ছেড়ে যাই-ই বা কি করে? তোমারই কি আমাকে ছেড়ে এই বাড়ী ছেড়ে থাকতে ভাল লাগবে?'

সেখানেই ত হয়েছে উভয়সঙ্কট। একদিকে স্বামী আর ভিটের টান আর একদিকে শাশুড়ীর আতঙ্ক বিদ্বেষ আর বিভীষিকা। শবু এখন কি করবে? দীননাথের উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চায় কিন্তু স্বামী তাকে কোন পথ দেখাতে পারছে না।

দীননাথ আবার বলল—'অত ভেবোনা, আগে গৃহপ্রবেশ ত হোক তারপর কি অবস্থা হয় দেখাই যাক না।'

কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। শবুর মন থেকে আতঙ্ক ও বিভীষিকা দূর না হয়ে আরো চেপে বসে। শরীরের অবশ অবসন্ন ভাব না কমে আরো বাড়তে থাকে।

ছয়

ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে দীননাথ অফিস থেকে ফিরে বলল—'আজ আমার প্রোমোশনের ব্যাপারে আলটিমেটাম্ দিয়ে এলাম. এটা এপ্রিল মাস—পয়লা মে থেকে তিন মাসের নোটিশ, পয়লা আগস্ট থেকে আমি মুক্ত মানুষ। পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড নিয়ে যা টাকা পাব, আর এই বাড়ীটা আছে—আমরা দুইজন বুড়ো বুড়ী হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেব। আমাদের নেই কোন পিছুটান। তুমি পাকাচুলে সিঁদুর পরবে। তারপর ইংরেজীর দু'হাজার সাল বা নিদেনপক্ষে বাংলার চৌদ্দশ সাল দেখে আমরা ধীরে ধীরে চোখ বুজব।'

দীননাথ যা বলছে তা শুনতে ভাল হতে পারে, কিন্তু অত সহজে শান্তিতে বা সুখে কি দিন কাটানো যাবে যেখানে শাশুড়ী ঠাকরুন পাশেই এসে ঘাঁটি গাড়বেন বলে মেদিনীপুর থেকে ভবর কোয়ার্টার পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছেন? শবুর জীবনে বুঝি অন্য কোন ভবিতব্য অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যের সময় মহী এল তার ধার নেয়া টাকার প্রথম মাসের কিস্তি দিতে। দীননাথ আর মহী ছাদে গিয়ে বসল। শবু মহীর চা নিয়ে ছাদে এল। এই সামান্য কটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতেও তার এখন কষ্ট হয়।

চা হাতে নিয়ে মহী বলল—'বৌদি, গাছে খুব আম ধরেছে দেখছি। আহ-হা, ওখানকার নারকেল গাছটা কোথায় গেল?'

শবু বলল—'নারকেল গাছটা মরে যাচ্ছিল, কেটে ফেলা হয়েছে।'

'ইস্, গতবারেও এসে দেখেছি কত নারকেল ধরে ছিল! কি করে মরল, আবার কি বাজ পড়েছিল?'

দীননাথ বলল—'কি জানি কিছু বোঝা গেল না।'

শবুর মনে হচ্ছে এবারে আম গাছে অসময়ে অঘ্রানেই মুকুল ধরা শুরু হয়েছিল, আবার নারকেল গাছটাও ফলন্ত অবস্থায় অকালে মরে গেল। এ দুটোর মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে?

মহী আবার আলাপ জমাতে চাইল—'বৌদি, কেমন আছেন বলুন।'

শবুর মনে হল মহী যেন আজ হঠাৎ বেশী সদয় তার উপরে। সেকি মা ভবর বাড়ীতে এসে থাকবেন বলে? মহী আজকাল খুব মাতৃভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক মাসে মেদিনীপুরে সোনার বাড়ীতে গিয়ে মাকে অনেক কিছু কিনে দিয়ে আসে, কিন্তু মার কাছে না খেয়ে হোটেলে খায়, হোটেলেই থাকে।

শবু বলল—'ভাল না। পার্থর বিয়ে হল, আপনি যান নি?'

মহী স্বভাবমত বলল—'কেন, ভাল না কেন? বেশী বেশী করে খাবেন শরীর ঠিক থাকবে, রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা যা পাবেন। আমি বনগাঁ থেকে কাঁচাগোল্লা এনে দেব, খাবেন। পার্থ বিয়ে করেছে সাহার মেয়েকে আমি যাব সেখানে? পার্থর শ্বশুর সেই সাহারপো আমার গলা জড়িয়ে বলবে—এই যে আমার দমদমের বেয়াই অমুক লাহিড়ী। কি আস্পর্দা! যাই, লোড্ শেডিং এর জন্য আজ আর টিভি দেখা হল না।'

এরপর অনেকক্ষণ ধরে শবু ও দীননাথ ছাদে বসে রইল, মাঝে মাঝে কথা বার্ত্তা বলছে। জলছাদ করে, নতুন ডিজাইনের রেলিং করে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। দীননাথ আবার ছাদের উপর মিস্ত্রীদের দিয়ে দুটো বসার আসন করিয়ে নিয়েছে। এখানে দুজনে বসে গল্প করতে শবুর খুব ভাল লাগে, এখন আবার সারাদিনের গরমের পর ফুর্ ফুরে দক্ষিণে হাওয়া দিচ্ছে। সেদিন বাইরে থেকে বাড়ীটা দেখেছিল—হলুদ বাড়ীর মাথায় লাল রেলিং এর মুকুট পরানো হয়েছে যেন, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আম আর পেয়ারা গাছ ছাড়া জাম, কাঁঠাল, ও একটা পেঁপে গাছ বড় হচ্ছে। নিমগাছটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে, এবারে অনেক কচি নিমপাতা পেড়ে ভেজে খেয়েছে চৈত্রমাস পড়ে থেকে; এখন গাছটা সবুজ পাতায় ছেয়ে আছে, ফুলও ধরেছে। টগর গাছে অনেক ফুল ধরেছে, গোলাপ গাছে একটা দুটো ফুল মাঝে মাঝে ফোটে। শিউলী গাছটা আরো একটু বড় হয়েছে—

সামনের শরতেও ফুল দেবে নিশ্চয়ই। চারপাশে বাড়ীঘরে পাড়া জমজমাট। কিন্তু নিজে থেকে গজিয়ে ওঠা তুলসী গাছটা শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে।

এই হল ওদের সাধের বাড়ী, সুখের বাড়ী, স্বপ্নের বাড়ী। শবুর শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ঘর, আপন গৃহকোণ। কত দিন এই বাড়ীতে সে শান্তিতে থাকতে পারবে জানে না। কারণ শিয়রে তার শাশুড়ী-আতঙ্ক, মহা বিভীষিকা।

দীননাথ ঠিক কথাই বলেছে। তাদের কোন পিছুটান নেই। দু দুবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়ে চলে গেছে, মাতৃত্বের যে স্বাদ শবুর অপূর্ণ রয়ে গেছে সে মনে হয় শাপে বর হয়েছে। মায়ার বন্ধন থাকলে বেশী কষ্ট হয়। এখন শবু যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত। অবস্থার গুণে তার সংসারের প্রতি আর কোন আকর্ষণ নেই। একমাত্র চিন্তা স্বামী দীননাথের জন্য।

বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকাটাও খুব সম্মানজনক হবে না মনে হয়। স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর—বড়মা বলেছিলেন, মা ঠাকুমার শিক্ষাও তাই। শবু যেন সব দিক থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

হঠাৎ আর একটি জিনিষের দিকে নজর পড়তে শবুর মন আরো খারাপ হয়ে গেল। দুবছর আগে এ বাড়ীতে ফিরে আসার তিন চারমাস পর থেকে দুটো চড়ুই পাখী পাশাপাশি দুটো কোটরে বাসা বেঁধেছিল রান্নাঘরের ছাদের নীচে। বেশ কিছুদিন হল সন্ধ্যের পর বা রাতে সে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। রাতে মহী চলে গেলে পরে ছাদ থেকে নেমে আসতে লাইটও এসে গেল তখন শবু ভাল করে লক্ষ্য করল—চড়ুই দুটো সত্যি আর আসে না, দুটো কোটরই শূন্য। ওরা নাকি সুখের ঘরে বাসা বাঁধে। এ বাড়ীর সুখ কি তবে যাবার মুখে? গত বছর লক্ষ্মী পুজোর সময় বাড়ীর গাছে এসে বসা পেঁচাটা মরে যাওয়া দিয়ে যার শুরু!

চারদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখে আর স্থির থাকতে পারে না। এক সময় সে দীননাথকে বলল—

'দেখ, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। চারদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

দীননাথ হাল্কা হেসে বলল—'কি কি কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার একটা ফর্দ যদি করা যায়…।'

শবু বাধা দিয়ে বলল—'হাসির কথা নয়। দেখ চড়ুই দুটো আর বাসায় আসছে না। সেদিন ঘরের ভিতর সাপ ঢুকল, বিয়ের গাড়ুটা আগেই চুরি হয়েছে, এবার শাহীর মোড়ে আদরিণী ভেঙে চুরমার হল। তুলসী গাছটা মরে

যাচ্ছে, নারকেল গাছটা ত মরে গেছে বলে কেটেই ফেলা হল। এদিকে কিছু কাল হল সারাদিন বাড়ীতে কাক ডাকার বিরাম নেই যেন।'

দীননাথ বলল—'সবেরই কার্য্য কারণ আছে। গরমকাল সন্ধ্যেবেলা সাপ বের হতেই পারে, বিশেষ করে যেখানে ব্যাঙের আনাগোনা আছে। চোরের কাজ চুরি করেছে, আনাড়ী হাতে পড়ে গাড়ী ভেঙেছে। তুলসী আর নারকেল গাছ মর'র পিছনেও কারণ আছে। আর কাকেরা তাদের স্বভাবেই কা কা করছে—সে ত শুধু আমাদের বাড়ীতে নয় আশপাশের সব বাড়ী নিয়েই সোর-গোল করছে। তবে চড়ুইয়ের ব্যাপারটা বলা মুস্কিল, বড়ই মেজাজী আর আয়েসী—বাবুই পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই…।'

শবু বলল—'সে যাই বল আমার কিন্তু ভাল লাগছে না, নিশ্চয়ই বড় একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবে।'…

কথা বার্তায় ছেদ পড়েছে অনেকক্ষণ, দুজনে যে যার আপন কাজ করছে। দীননাথ একসময় বলল—

'মেয়েরা মনের মত জিনিষ না পেলে কি যে করে তার ঠিক নেই।'

শবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—'তার মানে? হঠাৎ একথা বলছ কেন?'

দীননাথ বলল—'ঐ যে পাড়ার হরিদাসের ছেলের বৌ। সে নাকি নানা অসুখে ভোগে, শোবার ঘর থেকে বের হয় না। ডাক্তাররা নাকি বলে তার শরীরে কোন রোগ নেই। কি কারণ বোঝা যায় না। আবার দেখ দুলুর বৌ রত্না—তার অপছন্দের কোন কথা বললেই তার নাকি ফিট হয়।'

'এসব কথা আমাকে বলছ কেন?'

দীননাথ অপ্রস্তুতের মত বলল—'না, না, তোমাকে বলব কেন? তোমাকে বলিনি কিন্তু, তুমি আবার রাগ কোরো না। তোমার তো সেরকম কোন ব্যাপার নেই, তোমাকে বলতে যাব কেন? তোমার শরীরে ত কোন রোগ নেই।'

হয়ত হঠাৎ মনে হয়েছে তাই বলেছে, হয়ত এমনি এমনি বলেছে। হরিদাসের ছেলের বৌ এর কথা শবু জানে, রত্না ত প্রায় ঘরেরই লোক। এ নিয়ে দীননাথ ও শবুতে আগে বা এখনো আলোচনা হয়—বৌ দুটির ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ নেই। কেন যে কিছু মেয়ে এরকম হয় শবু নিজেই বুঝতে পারে না। শবুর মন দুর্ব্বল তবু সে কখনো কোন ব্যাপারে অস্বাভাবিক ব্যবহার করে নি, আর ফিট হওয়া—মা চলে যাবার মর্মান্তিক খবর যখন এল তখনও সে মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হারায়নি। শবুর এ সব রোগ

নেই, কোন রোগই নেই. বলতে গেলে সে নীরোগ—প্রাণশক্তি প্রচুর, শুধু মনের দিক থেকেই সে দুর্বল।

তবু দীননাথ হঠাৎ একথা বলল কেন সেইটাই আশ্চর্য্য!

সাত

অবশেষে এসে গেল শবুর জীবনে চরম আঘাতের দিনটি।

সেই পয়লা তারিখ থেকে আজ তিন দিন হল সন্ধ্যা কাজে আসছে না। এমনিতেই শবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। তার উপর সকালে একগাদা রাতের বাসন হাঁড়ি কড়াই পোড়া মাজা. রান্নাঘর ধোয়া মোছা, বাড়ী ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্না ও খাবার জল ভরা—রান্না খাওয়ার আগের প্রস্তুতির কাজই অনেক। দীননাথ এখন এক মাসের ছুটি নিয়েছে, তাই তাড়াহুড়ো নেই এই যা। শবু এখন জল ভরা ও বাসন মাজা নিয়ে ব্যস্ত।

আবার ভব এসেছে। দীননাথ সকালে বাজার যাবার আগে বাইরের ঘরে দিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলোচ্ছিল, ভব সেখানেই ঢুকে তার সঙ্গে দু চার কথা বলে নিজের বাড়ীর কাজ দেখতে চলে গেল। একটু পরে ভিতরে এসে দীননাথ বাজার থেকে কি কি আনতে হবে জেনে নিয়ে বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে গেল।

শবুর মনে খটকা লাগল, ভব এল, কি কথা হল সে ত দীননাথ বলে গেল না—অথচ এটাই তাদের রীতি; কেউ এলে গেলে কি কথা বার্তা হল একে অপরকে অবশ্যই জানায়। ভবর দু চারটে কথা শবুর কানে এসেছিল—মা, চিঠি, গৃহপ্রবেশ। দীননাথ কিছু বলে গেল না কেন?

একটু পরে ভব প্রায় দরজা থেকে উঁকিমারার মত করে—'বৌদি, আমি যাচ্ছি, একটু ব্যস্ত আছি, মিস্ত্রীদের একটা জরুরী কাজ বুঝিয়ে দিতে এসেছিলাম'—বলে ধুলো পায়েই বিদায় নিল। এ বাড়ীতে সে কেন এসেছিল তাও বলে গেলনা। অবশ্য ওরা অনেক ব্যাপারেই রিজার্ভ, নিজেদের প্রয়োজনে ছাড়া বাড়তি কথা বলে না।

কিন্তু দীননাথের ব্যাপারটাই যেন অন্যরকম লাগছে, এমন ত সে করে না! শবুর কাছে কিছু লুকোচ্ছে কি? মঙ্গলা দেবীর এখানে আসার কথা হচ্ছে, সেই থেকে দীননাথ কি তার কাছে পর হয়ে যাচ্ছে? তিন মাস

এলাহাবাদে থেকে মঙ্গলা দেবী বারো বছর ঘরকন্না করা সোনা ও গোপাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিলেন, আর তিনি এখানে এসে বসলে শবুদের দুই যুগের সংসার ভাঙতে তাঁর কদিন লাগবে ?

দুই যুগ ধরে শবু ছায়ার মত দীননাথের সঙ্গে রয়েছে, অসুখে সেবা করেছে, বারো বছর বিদেশে ছিল তার নিত্যসঙ্গিনী, এক বছর ধরে বদলির লড়াইতেও সে ছিল তার স্বামীর পাশে একান্তভাবেই। আজ হঠাৎ রাতারাতিই সে হয়ে যাবে পর তার স্বামীর কাছে, মাঝখানে গড়ে উঠবে গোপনীয়তার প্রাচীর ?

সত্যিই কি কোন চিঠি এসেছে ? এসে থাকলে ত সেটাকে পড়তে দেবার কথা। চিঠিটা কি পকেটে করে নিয়ে গেছে না বাইরের ঘরে রেখে গেছে ? একবার গিয়ে দেখবে নাকি ?

কৌতুহল অদম্য হয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে শবু এসে ঢুকল বাইরের ঘরে। ঐ ত মুন্সী প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের বাংলা অনুবাদের বইয়ের ভাঁজে এক টুকরো কাগজ দেখা যাচ্ছে। বইটা শবুর আদ্যোপান্ত পড়া, কমাস আগে দীননাথ ঐ বই একটা ষ্টল থেকে কিনে এনেছিল, যার প্রতিটি গল্প পড়ে শবু বারবার অভিভূত হয়েছে। তারই ভাঁজে ঐ টুকরো কাগজটা কিসের ?

শেষে আদিম মানবীর মত শবুও নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়ানোর মত বইয়ের ভাঁজ থেকে কাগজের টুকরোটা টেনে বার করল—ডেকে আনল তার চরম সর্বনাশ।

হ্যাঁ সত্যিই একখানা হাত চিঠি। মঙ্গলা দেবী লিখেছেন—দীনু, আগামী পঁচিশে এপ্রিল গৃহপ্রবেশের দিন স্থির করিয়াছি, পুরুত ঠাকুরকে সত্যনারায়ণ পূজা ও পাঁচালী পাঠের কথা বলিয়া রাখিবে এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণও জানাইবে, দুদিনের জন্য কাজের ঝি বহাল করিবে, যেমন করিয়াই হউক কাজটা তোমাকে সম্পন্ন করিতেই হইবে, আমি দুইদিন আগে অর্থাৎ তেইশে এপ্রিল ঐ স্থানে যাইব মনস্থির করিয়াছি···।

অর্থাৎ আর মোটে তিনটি সপ্তাহ, তার পরই তিনি আসছেন।

এক এক করে শবুর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ছবিগুলো। তখন তার মাত্র আঠারো বছর বয়স, সবে বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে। একান্নবর্তী সংসারের প্রয়োজনে সে স্বামীর সঙ্গে এসে উঠেছে বিটি রোডের বাসায়। অল্প দিনেই শুরু হয়ে গেল শাশুড়ীর নির্য্যাতন, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, কারণে অকারণে। শেষে সেই জুন মাসে স্বামী তাকে টেনে নিয়ে গেল রিফিউজী

কলোনীতে মঙ্গলা দেবীর মান ভাঙাতে, শবুকে টেনে নামাল চরম অসম্মানের মধ্যে।

তারপরে ভাইদের দোষে এবং সবার উপরে মার দোষে একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গেল, মেজদা বিশ্বনাথ মারা গেল মেজবৌদি বিধবা হল, দীননাথের টিবি হল, ভাঙা সংসার আংশিক জোড়া লাগল। এরপর দীননাথ একার চেষ্টায় জমি কিনল বাড়ী তৈরী শুরু করে বাবা কালীনাথকে আর সকলের সঙ্গে সেখানে নিয়ে তুলল। শবু মুখ বুজে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলেছে, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছে।

তিন দিনের মধ্যে মঙ্গলা দেবী তাঁর দেবতুল্য স্বামীকে সে বাড়ী থেকে উৎখাত করে মাতুলের ছেলে বল্টুকে এনে সেখানে ঢুকিয়েছেন, শেষে মাতুলের-ও শুরু হয়েছে স্থায়ী আনাগোনা। বাবা কালীনাথ সে সময় মারা গেলেন। তারপর থেকে মা আর মাতুলে মিলে যা নক্কারজনক কাণ্ডকারখানা শুরু করল —শবুকে প্রায় বিবস্ত্রা করে ছাড়ল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মঙ্গলা দেবী আত্মহত্যার নাটক সাজিয়ে শবুকে হাতকড়ি পরাতে চেয়েছিলেন। তখন ভব এবং শেফালীও কথার খোঁচায় শবুকে মনে মনে রক্তাক্ত করেছে।

মাত্র দু বছর আগে শবুরা বদলির জন্য ছুটি নিয়ে এসে বাড়ীতে বসলে মঙ্গলা দেবী আবার নিজমূর্তি ধরলেন। কিছুদিন অসহযোগ চালিয়ে এলাহাবাদে সোনার কাছে গিয়ে তিন মাসের মধ্যে তাকে পাগল বানিয়ে তিনি এসে উঠলেন শেফালীর শ্বশুর বাড়ীতে। দীননাথের চাকরিসঙ্কটের চরম মুহূর্তের দিন ভর-দুপুরে করবীকে সঙ্গে করে এসে জলস্পর্শও না করে শাপ শাপান্ত করে চলে গেলেন। করবী করে গেল প্রচণ্ড গলাবাজি। পরে লক্ষ্মী পুজোর (দেওয়ালী) আগ দিয়ে হাবলুকে সঙ্গে করে এসে না বলে ঘর থেকে লক্ষ্মী উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার প্রায় বছর খানেক পরে ব্রাহ্মণ ভোজন দানধ্যানের নাম করে কি সব পুজো হোম যজ্ঞি করে গেলেন।

আর সব শেষে হয়েছে এই ভবর বাড়ীটা। সে-জমি কেনার আগেই শবু বারণ করেছিল, কেউ কথা শোনেনি। সে-বাড়ী তৈরী করতেই প্রায় এক বছর ধরে শবুকে নানানভাবে জ্বালিয়েছে। আর যখন বাড়ী তৈরী প্রায় শেষ তখন শবুর শিয়রে শাশুড়ী এসে হানা দিচ্ছে। আর শাশুড়ী মানেই সঙ্গে সেই ভব, সেই করবী—এবং শেফালীও।

কিন্তু মাঝখানে দুটি যুগ পার হয়ে গেছে। প্রথম আট দশ বছর শবু যা পেরেছে আজ কি সে তা পারে? তখন তার বয়স কম ছিল, রক্তের

জোর ছিল, অভিজ্ঞতা কম ছিল। তখন সে অনেক কিছু বুঝত না, অনেক কিছু সহ্য করতে পারত। এখন সে রক্তের জোর নেই, অভিজ্ঞতা বেড়েছে। এ সংসারের প্রত্যেককে সে এক এক করে চিনেছে। ভব করবী মহী শেফালী —সবাই স্বার্থের সময় এক রূপ আর স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে তাদের অন্য মূর্তি। দুর্দিনের বছরে তারা কেউ ফিরেও তাকায় নি।

সবার উপরে আছেন মঙ্গলা দেবী। শবুর প্রতি প্রচণ্ড প্রতিহিংসা নিয়ে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তারই জন্য তিনি এ বাড়ীতে আসবেন না. শবুর কল্যের উপর ভবর বাড়ীতে বসে নতুন করে শুরু করবেন নির্য্যাতন নিত্য নতুন কায়দায়। শুধু হাতে মারলেই মারা হয়না, ভাতে মারার সুযোগ না থাকলেই বা কি, নতুন নতুন অস্ত্র শানাতে তাঁর মত পারদর্শিনী আর কে ?

মঙ্গলা দেবীর হাত থেকে বাঁচতেই শবু দীননাথের আশ্রয় চেয়েছে,—সে তার জীবন মরণের সাথী, তার ইহকাল পরকাল। সেই জুন মাসের ঘটনা আর ভবর জমি কেনার ব্যাপার ছাড়া দীননাথ তার অমর্য্যাদা করেনি। তাই সেই হোম যজ্ঞির পরে একবার আর ভবর বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে তাগাদা দিয়ে লেখা মঙ্গলা দেবীর চিঠি এলে আর একবার শবু দীননাথের কাছে আশ্রয় খুঁজেছে। প্রথম বারে সে ব্যাপারটাকে মোটে গুরুত্ব দেয় নি। দ্বিতীয়বারে ত রীতিমত রূঢ়, কর্কশ ব্যবহার করেছে। নিরুপায় শবুও পাল্টা দু কথা বলেছে, আবার বিবেকের দংশনে জ্বলে নিজে থেকেই মিটমাট করে নিয়েছে।

এখন দীননাথ পালাতে চাইছে—যেমন তার চাকরির অসম্মান থেকে তেমনি আসন্ন পরিবেশ থেকে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পালানো যাবে না, পালিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হয় না।

তার সঙ্গে আজকের এই নতুন সংযোজন। দীননাথ যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সেই জুন মাসের মত শবুকে ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর মুখে একা ছেড়ে দিতে চাইছে। দীননাথ ভেবেছে শবু নীরোগ সুতরাং সে টিকে থাকতে পারবে তার এই ভরা স্বাস্থ্য নিয়ে। কিন্তু সে ভাবতে পারে না যে শবু অমর নয়, বোঝেনি তার মজবুৎ দেহের আড়ালে শবুর মন কতখানি দুর্বল। সে তার নারীত্বের চরম প্রত্যাশা শিলংএর পথে বিসর্জন দিয়ে মনে প্রাণে কতখানি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে পুরুষ দীননাথ তা অনুভব করতে পারেনা।

একা শবু এতজনের সঙ্গে লড়বে কি করে ? দীননাথ, তার স্বামী, যে তাকে ভরসা আশ্রয় সহানুভূতি সান্ত্বনা দিতে পারত, যে তার জীবনের একমাত্র

অবলম্বন—সে-ই বিপদ আসার মুখেই দূরে সরে যাচ্ছে, উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠছে ব্যবধান! শবু এখন তবে কি করবে···

ভাবতে ভাবতে শবুর মাথাটা ভীষণভাবে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল—মাথার সবগুলি শিরা তন্ত্রী বুঝি ছিঁড়ে গেল। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে বিশেষ করে মাথার বাঁ দিক ও পিছন দিকটায়। হাত পা কাঁপছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যেতে যেতে শবু কোন রকমে পাশের চেয়ার ধরে দীননাথের বিছানায় বসে পড়ল। মুখ ফুটে চাপা আর্ত আওয়াজ বেরিয়ে এল—

'উঃ মা, মা গো, তুমি কোথায়?'

তাই ত এই বিপদের দিনে শবুর মা ছাড়া আর কে আছে? মা কতবার তাকে বলেছে—দীননাথ তোকে রক্ষা করবে, তা ছাড়া আমি ত আছিই, আপদে বিপদে তোকে বুক পেতে রক্ষা করব। কিন্তু মা যে আর এই পৃথিবীতে নেই। না থাক, মা যেখানে আছে সেখানে গিয়েই মার বুকে আশ্রয় নেবে, জুড়াবে তার সকল জ্বালা। শবু আকুলভাবে প্রার্থনা জানাল—

'মা, মা গো, এবার তুমি আমাকে কাছে ডেকে নাও। স্বামী পারল না, পারবে না—তুমি আমাকে এই অপমান আতঙ্ক আর বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচাও। সতী সীতার আকুল কান্নায় মা ধরণী দ্বিধা হয়ে তাকে কোলে ঠাঁই দিয়েছিল, তুমি আমার মা, তুমি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বারবার অপমানের অগ্নি পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচাও। আমার সংসারের সাধ আহ্লাদ ঘুচে গেছে, স্বামী সুস্থ নীরোগ শরীরে আছে—আমি যেন সতী মায়ের সতী মেয়ের মত তার কোলে মাথা রেখে হাসতে হাসতে তোমার কাছে যেতে পারি।'

মার কথা মনে পড়ে থেকে শবুর দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রুবন্যা নেমে এসেছে। দুঃখিনী শবুর জন্মদিনেও মাতা ধরিত্রী অঝোর ধারায় কেঁদেছিল। মার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তার মন এখন অনেকটা শান্ত হয়েছে। উপেক্ষিত, অনাদৃত, অপমানিত, আতঙ্কময় জীবন সে আর বয়ে বেড়াতে চায় না। এবার আসুক মধুর মরণ, চিরশান্তির মরণ, হোক ইচ্ছার মৃত্যু। শবুর আর কোন ইচ্ছা নাই, আকাঙ্খা নাই—তার চারদিক শূন্য, শুধুই অন্ধকার। ইচ্ছাহীন জীব জগতে নাই। ইচ্ছার যেখানে শেষ জীবনেরও সেখানে পরিসমাপ্তি।

···মনে হচ্ছে শবুর মা বুঝি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখে মুখে তার

গভীর উৎকণ্ঠার চিহ্ন। শবুকে বুকে জড়িয়ে মা কেঁদে বলছেন—মা আমার, এত ভাবিসনা, একটা কিছু উপায় হবেই—আর কিছু না হলে আমি ত আছিই। শবু মার বুকে মুখ রেখে শিশুর মত কাঁদছে।…

একসঙ্গে বহু কাক বুঝি বাড়ীটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তাদের চীৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। সব কটা একসঙ্গে কলরব করছে—

'কা-কা-কা-কা-কা …..'



সপ্তম পর্য্যায়

এক

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমা আঁচলের খুঁটে মুছতে মুছতে অবশ অবসন্ন দেহটাকে কোন রকমে টেনে তুলে কখন শবু এসে দৈনন্দিন কাজে লেগেছে তা সে জানে না। সেই সময় দীননাথও বাজার থেকে ফিরে পথে একবার নিকুঞ্জ বাবু আর একবার বোধন বোস ও তস্তীর স্বামী কাশীকান্তর সঙ্গে দেখা হয়ে কি কি কথা হয়েছিল বলে যাচ্ছে, শবুর কিছুই কানে যাচ্ছে না। শিথিল হাতে সে রান্নার যোগাড় করে চলেছে। অন্যদিন শবু নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে—বাজারে কার কার সঙ্গে দেখা হল? কে কি বলল? তুমি কি বললে? কখনো নিজেও দু চারটে মন্তব্য করে—আজ তার সে বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই।

তার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে দীননাথ চুপ করে গেল, কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করল। বাজার থেকে ফেরার মুখে সে হয়ত শবুকে বাইরের ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিল। তাই এখন একবার বাইরের ঘরটা ঘুরে এসে কৈফিয়তের স্বরে বলল—

'তখন ভব এসেছিল, চলে গেল নাকি?' এইটুকু ভূমিকা করে বলতে লাগল—'ভবর হাতে মা আবার চিঠি পাঠিয়েছে, যাবার সময় তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। পঁচিশে এপ্রিল না কবে যেন ওদের গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করেছে।...'

শবু নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে।

'আমাকে লিখেছে পুরুতকে খবর দিতে, ঝি বহাল করতে। সেবারে পুরুতকে আনতে বলে যা অপদস্থ হলাম'—দীননাথ আবার কিছুটা বলে থামল।

শবু নিরুত্তর।

'কেন যে এ সবের মধ্যে আমাদের জড়াতে চায় বুঝিনা। যাদের কাজ তারা বুঝুক, আমি কিছু করতে পারব না' দীননাথ তার মনের ভাব প্রকাশ করল।

শবুর দিক থেকে কোন সাড়া নেই।

একটু অপেক্ষা করে থেকে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'তুমি কিছু বলছ না যে ?'

এক ঘন্টা আগে কথাগুলোর যা মূল্য ছিল এক ঘণ্টার ব্যবধানে তা শবুর কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে। বলল—

'আমি আর কি বলব ?'

না, শবুর আর বলার কিছু নেই। অনেক বলেছে, আর বলার ইচ্ছে নেই, বলার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। জীবনে এমন এক একটা সময় আসে বা এমন ঘটনা ঘটে যখন আর কোন কথা বলার স্পৃহা থাকে না। আতঙ্কে আর অভিমানে শবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও তার মুখে বুঝি কথা সরবে না।

দীননাথ আবহাওয়া স্বাভাবিক করতে অনেক কথা বলে যেতে লাগল—শবু রইল আপন কাজে নীরব শ্রোতা হয়ে।

দুপুরে খেতে বসেও দুজনে অল্প দু চারটি কথা হল। সারা দুপুর বিছানায় শুয়ে শবুর এতটুকু ঘুম এলনা—গল্পের বইয়ের পৃষ্ঠায়ও যেন শুধুই হিজিবিজি আঁকা। থেকে থেকে মাথার ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথাটা টনটন করছে।

চৈত্রের ক্লান্ত দুপুর—চারদিক নিস্তব্ধ—কাকগুলো গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। রোদ্দুরে সব যেন ঝাঁ ঝাঁ, খাঁ খাঁ করছে। শবুর মনটাও শূন্যতায় ভরে আছে—কিছুই যেন আর ভাবতে পারছে না।

বিকেল হতে কাকগুলো আর একবার কলরব শুরু করল। শবু অভ্যেস মত বিকেলের কাজ সারল, চুল বাঁধল, মুখে হাতে পায়ে সাবান মাখল, সিঁদুর পরল, সন্ধ্যের পর টিভিও দেখল। তারপর এক সময় রাতে খেয়ে দেয়ে দুজনে করণীয় কাজগুলো সেরে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কথা হল খুব কমই।

আশ্চর্য্য! শবু ভেবেছিল গত অনেক রাতের মত সে রাতেও তার চোখে সহজে ঘুম আসবে না। কিন্তু মার কাছে মনের অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে তার মনে বুঝি এসেছে গভীর প্রশান্তি। শুতে শুতেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবার আগে শুনতে পেল দীননাথ যেন বহুদূর থেকে বলছে—

'চোর তাড়ানো মন্ত্র পড়েছ ? হাততালি বাজানো শুনতে পেলাম না ত···'

···আবার সে স্বপ্নের মধ্যে মাকে দেখতে পেল, মা শবুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলছে—উপায় একটা হবেই, নইলে আমি ত আছিই, কাঁদিস না মা।···

সকালে উঠে দরকারে দীননাথকে দু চারটে কথা বলতে গিয়ে শবু বুঝতে

পারল—সে ভালভাবে কথা বলতে পারছে না। দাঁতের মাড়ীতে না চোয়ালটায় কেমন অবশ অবশ ভাব লাগছে। অনেক কষ্টে দু চার কথা বলতে পারছে। দীননাথ বাজার করতে গেলে সে নিজে নিজে কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল, গানের কলি বা কবিতার কয়েকটা লাইন আওড়াবার চেষ্টা করল—কিন্তু কথা মনে এলেও মুখে আসতে চাইছে না, গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না।

এবার শবুর খুব ভয় ভয় করছে—তার কি মাসীমার মত কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? একদিকে শরীরের অবশ অবসন্ন ভাব তার উপর হঠাৎই এই কথা বলা বন্ধ হয়ে আসা—এমন হচ্ছে কেন? সে ত মার কাছে যাবে বলে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে—তার সঙ্গে এর কি যোগ? এবারে সরস্বতী পুজোয় দীননাথ বাগদেবীকে অবহেলা করেছে পাড়ার ছেলেদের পুজোর চাঁদা না দিয়ে এটা কি তারই অভিশাপ লাগল? ভয়ে শবুর বুক কাঁপছে, কান্না পাচ্ছে—।

বাজার থেকে দীননাথ ফিরতে শবু কেঁদে বলল—

'ওগো 'ব' (বর) শুনছো রে, আমি কথা বলতে পারছি না।'

অবাক হল দীননাথ—'কথা বলতে পারছ না! এই ত স্পষ্ট সব কথাগুলো বললে। কোথায় অসুবিধে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না···দাঁত···।'

দীননাথ বলল—'কিছুদিন আগে বললে হাঁ করতে পারছ না, দুদিন গরম নুন জলে গার্গল করে বললে—ঠিক হয়ে গেছে। সেবারে দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে দাঁত দেখাতে বললাম, দেখালে না। রান্না হয়ে গেলে চল, দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

হ্যাঁ, মাসখানেক আগে দীননাথ দাঁত তোলাতে গেছিল, শবুকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। সে সময় নিজের দাঁতে সামান্য ব্যথা কনকনি থাকলেও দেখায়নি। ভেবেছিল—শীতের শেষ এখন, পরে গরম পড়লে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন ত সেই ব্যথা কনকনানি নয়, কেমন যেন অন্যরকম কিছু। যাই হোক, দেখাই যাক দাঁতের ডাক্তার কি বলে।

রান্না শেষ হতে দুজনে চলল—দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার দেখে বলল—

'দুটো দাঁতের মাড়ীতে ইন্‌ফেক্‌শন হয়েছে, এই ওষুধগুলো তিনদিন খেয়ে তারপর আসুন, ঐ দুটো দাঁত তুলে দেব।'

দিন গেল, সন্ধ্যে হল, রাত এল—শবুর কিছুই ভাল লাগছে না—চা খাওয়া পান খাওয়ায় কোন আগ্রহ বোধ করছে না, অভ্যেসমত খাচ্ছে। খিদে

পাচ্ছে, খাচ্ছেও—কিন্তু খাবারে তেমন স্বাদ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না ডাক্তারখানায় মোটর বাইকের পিছনে বসে যেতে আসতেও ভীষণ ভয় করছিল—হয়ত চালের বস্তার মত ঝুপ করে পড়ে যাবে।

দিনে দিনে শবু যেন অচল হয়ে পড়ছে। কথা বলার কষ্ট, শরীরে অবশ অবসন্নভাব ত আছেই—আরো যেন কি হয়েছে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। শুধু দাঁতের ব্যাপার নয়, আরো বড় কিছু। কিন্তু কি সেটা?

কাল দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবার কথা আছে। কিন্তু তার কেমন অস্বস্তি লাগছে। সকালে দীননাথ বাজারে যাবার আগে শবু বলল—

'আমার ভাল লাগছে না, অন্য কিছু ···।'

দীননাথ চিন্তিতভাবে বলল—'কাল দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। তবে আজ চল বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ ডাক্তার চক্রবর্তীর চেম্বারে যাই।'

বেলা এগারোটা। রান্না সেরে শবু দীননাথের সঙ্গে ডাক্তার চক্রবর্তীর চেম্বারে চলেছে। চৈত্রের প্রখর রোদ, ছাতার আড়ালও মানছে না। শবু যেন হাঁটতে পারছে না, পথে একটা খালি রিক্সাও দেখা যাচ্ছে না। পথ সামান্য দূর, এর চাইতে আরো কতদূর সে আগে অনায়াসে হেঁটে গেছে। যেতে যেতে বলল—

'ডাক্তারবাবুকে তুমি বলবে।'

দীননাথ বলল—'ডাক্তাররা রোগীর মুখেই সব শুনতে চায়। তুমি যা পার বলবে বাকিটা ডাক্তারবাবু জেনে বুঝে নেবে।'

'আমি যে কথা বলতে পারছিনা।' শবু কাতর হয়ে বলল।

'সেই কথাই বোলো, আমিও সব বলব।'

কম্পাউণ্ডারের বাধা পেরিয়ে সামনে যেতে ডাক্তার চক্রবর্তী বলল—'আসুন লাহিড়ীদা, আসুন বৌদি'। অনেক বছরের পরিচিত ডাক্তার, হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

শবু রোগীর টুলে গিয়ে বসতে ডাক্তার হেসে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে বলুন বৌদি।'

'আমি কথা বলতে পারছিনা।'

'সে কি, দেখি? হাঁ করুন ত?' মুখের ভিতর টর্চের আলো ফেলে প্রেসার চেক করে, বেঞ্চে শুতে বলে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগল ডাক্তার

আর দীননাথ পাশে থেকে এ ক'দিনের রোগের বিবরণ বলে যেতে লাগল—পরীক্ষা শেষে ডাক্তার বলল—'প্রেসার নর্ম্যাল, হার্ট নর্ম্যাল—তবে দাঁতে কিছু ইন্‌ফেকশন আছে ঠিকই।'

দীননাথ বলল—'কাল দাঁত তোলানোর কথা আছে।'

ডাক্তার ব্যস্তভাবে বলল—'না না, এখন দাঁত তোলা থাক, আমি বললে তারপর। এই ওষুধগুলো ব্যবহার করুন—একটা ইঞ্জেকশন আছে একদিন পরপর—এখনই একটা নিয়ে যান।'

'ডাক্তারবাবু, আমি কথা বলতে পারছি না কেন?' শবু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কেঁদে ফেলল, তার দু চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

গভীর সহানুভূতিতে ডাক্তার শবুর কাঁধে হাত রেখে বলল—'আপনি কাঁদবেন না বৌদি, আমি ওষুধ লিখে দিলাম, ওষুধ পড়লে আপনি দু দিনে আবার আগের মত কথা বলতে পারবেন। মনে জোর রাখবেন, আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন।'

কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে ইঞ্জেকশন নিয়ে, একদিন পর পর বাড়ী গিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে আসবে তার ব্যবস্থা করে দীননাথ আর শবু ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। পথে নেমেই শবু বলল—

'রিক্সা কর।' ইঞ্জেকশন নিয়ে শরীরটা টনটন করছে, সে আর হাঁটতে পারছে না।

রিক্সায় করে বাড়ী ফিরতে দেখে প্রতিবেশিনী রায়-গিন্নী জিজ্ঞেস করল—দিদি, কোথায় গিয়েছিলেন?'

'ডাক্তারখানায়।'

দুই

মনে কি করে জোর রাখা যায় শবু জানে না। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম কি করে সম্ভব? তার উপর সন্ধ্যা আজ সাত দিন হল আসছে না। শবুকে সারা বাড়ীর কাজ করতে হয়, বাসন মাজতে হয়। কড়াইপোড়া কালি তুলতে দীননাথ এক দুদিন সাহায্য করেছে, অন্য কিছু কাজও সে করে দেয়—কিন্তু সে আর কতটুকু?

দীননাথ বলেছে—'কাল থেকে মাছ বা অন্য একটা তরকারী যা আমি পারি

না সেটুকু করে দিয়ে তুমি বিশ্রাম নিও, আমি ডাল ভাত ফুটিয়ে নেব। দুধ ত থাকছেই।'

সে যা হয় হবে, কিন্তু সন্ধ্যা যে আসছেনা, তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। মরীয়া হয়ে বিকেলে শবু পাশের বাড়ীর তন্বীকে ডাকল—

'তন্বীদি, শুনছেন—আমাকে একটা কাজের লোক ঠিক করে দেবেন?'

তন্বী বলল—'দেখি আমার কাজের লোককে বলে কাউকে দিতে পারে কিনা। আপনার কাজের মেয়েটি আসছে না বুঝি?'

'না, সাতদিন হল।'

চব্বিশ ঘণ্টা পরে এল সুশীলার মা। শবু দীননাথকে বলল—'তুমি ওর সঙ্গে কথা বল।'

'ওটা ত' তোমার ডিপার্টমেণ্ট, তুমিই বল'—দীননাথ হাল্কা চালে বলল।

'আমি যে কথা বলতে পারছিনা।'

'আচ্ছা তুমি আরম্ভ কর, যেখানে আটকাবে আমি পূরণ করে দেব।'

শবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির শেষ ধাপে বসল। সুশীলার মা জিজ্ঞেস করল—

'কি কাজ করতে হবে বল। কজন মানুষ, দুজন? বাসন মাজতে সব ঘর বারান্দা ঝাড়-পোঁছ করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

দীননাথ বলল—'মানুষ দুজন, কিন্তু তাই বলে বাড়ীতে লোক আসবে না তা ত হয় না।'

'আর কি কাজ বল।'

'ঐ · ঐ·· উনু···ন···'শবু বলতে চেষ্টা করল।

দীননাথ বলল—'উনুন পরিষ্কার করতে হবে, উনুন সাজাতে হবে।'

'উনুন পরিষ্কার করতে পারি, সাজাতে জানিনা, আমরা কাঠের উনুন জ্বালি। কত টাকা দেবে বল?'

শবু দীননাথের দিকে তাকাতে সে বলল—'সন্ধ্যা এই সব কাজই করত, কুড়ি টাকা দিতাম, তাই পাবে।'

'উনুন সা···জা···।' শবু বলতে চাইছিল, উনুন সাজাবে না তবে কুড়ি টাকা দেবে কেন—কিন্তু সবটা বলতে পারল না—মুখে আটকে গেল।

সুশীলার মা রাজী হয়ে সেই বিকেল থেকেই কাজে লেগে গেল। শবু এটা ওটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কোন কথাই পুরো বলতে পারল না।

কাজ সেরে যাবার আগে সুশীলার মা মন্তব্য করে গেল—

'একেবারে মাথায় ধইরেছে গো!'

শবুর রাগ ধরে গেল মন্তব্য শুনে। তবু কিছু বলা ঠিক হবে না, এই যে একবেলা কাজ করে দিয়ে গেল এইতেই অনেকটা হাল্‌কা লাগছে।

এমনি করে তিন দিন কেটে গেল। শবুর অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। তারই মধ্যে রান্নার দিক অর্ধেকটা সামলাতে হচ্ছে। কথা বলা প্রায় নামমাত্রে এসে ঠেকেছে। ডাক্তার চক্রবর্তীর ওষুধেও কোন কাজ হচ্ছে না।

এদিকে দীননাথ নতুন লাইব্রেরীর মেম্বার হয়েছে শবুকে গল্পের বই পড়াবে বলে। পুরোনো লাইব্রেরীটা একটু দূরে পড়ে, এটা নাকি অনেক কাছে। কিন্তু শবুর বইতে আর মন লাগেনা। তার উপরে দীননাথ আবার বই এনেছে —ব্যাখ্যা সহ উপনিষদের বাংলা অনুবাদ। দীননাথ বলেছে—

'এসব জিনিষ ত পড়া হয়নি কোনদিন, দেখা যাক কি আছে এতে। এস তুমিও শোন কি লিখেছে।'

শবুকে বাইরের ঘরে ডেকে নেয়, সব সময় শোবার ঘরে থাকলে শরীর মন নাকি ভাল থাকে না। কিন্তু বাইরের ঘরে বসলেই পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় ভবর নতুন বাড়ীটা, মনে পড়ে যায়—আর কদিন পরেই ঐ বাড়ীতে আসছেন মঙ্গলা দেবী। মনে জাগে আতঙ্ক, হাত পা আরো অবশ হয়ে আসে।

'উপনিষদ আমার মাথায় ঢুকছেনা, আমি ওঘরে চললাম' বলে শবু টল মল পায়ে উঠে যায়।

একদিন সকাল নটা নাগাদ দীননাথ বলল—'আমার একটু স্টেশনের দিকে যাওয়া দরকার, ভাবছি ঐ সঙ্গে ষষ্ঠীতলাও একবার ঘুরে আসি, বেলা তোমার নতুন ব্লাউজটা করে থাকলে নিয়ে আসব। গাড়ীতে যাব আসব, বড়জোর একঘন্টা। এ বেলা তুমি ভাতটা নামিয়ে নিতে পারবে ত?'

'হুঁ' বলে সম্মতি জানিয়ে, 'যাওন নাই আহ গিয়া' মন্ত্র পড়ে দীননাথকে রওনা করে দিল শবু। ভাতটা সে নামাল ঠিকই, কিন্তু ঘটিতে করে জল খেতে গিয়ে করে বসল এক বিষম কাণ্ড। কলসী থেকে ঘটিতে জল ভরে অভ্যাসমত উঁচু করে খেতে গিয়ে হাত থেকে জলভরা ঘটি মেঝেতে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, জল ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

আহ্-হা, এটা যে ওদের বিয়ের ঘটি। জল খাওয়া মাথায় উঠল, ভয়ে

বুক কাঁপছে শবুর—শেষে বিয়ের ঘটিটাও ভাঙল! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পুরোনো শোবার ঘরের দেওয়াল আলমারীতে সেটা রেখে দিল, দীননাথকে এখনই জানানো দরকার নেই। পরে ধীরে সুস্থে একদিন বললেই হবে। আলমারীর দরজাটা খুলে বন্ধ করতে গিয়ে তার বুক ফেটে কান্না এল। মাত্র দুমাস আগে তার হাতের টানে এর দরজার হাতল স্ক্রু সুদ্ধ উপড়ে এসেছিল, দীননাথ বলেছিল শবুর হাতে দশ অশ্বশক্তির জোর। আজ সেই শবু জলভরা ঘটি উঁচুতে তুলে ধরতে পারছে না! তার এ কী হল? তার চাইতে মরে যাওয়াই যে ভাল ছিল, আর তাই ত সে চেয়েছিল। শেষে কি হাত পা অবশ হয়ে না মরে, বিছানায় পড়ে থাকতে হবে! ভয়ে শরীর আরো অবসন্ন লাগছে।

দীননাথ ষষ্ঠীতলা থেকে ঘুরে এসে বলল—'বেলা তোমার ব্লাউজে হাতই দিতে পারেনি, সময় পায়নি। কাকীমাকে তোমার শরীর খারাপের কথা বললাম। সবাই আশ্চর্য্য, কথা বলতে পারছে না সে আবার কি অসুখ!'

ব্লাউজ নিয়ে শবুর চিন্তা নেই। কাকীমা যদি আসত তার ভাল লাগত। কিন্তু দীননাথ ত আসতে বলে আসেনি। পুটুটা ওষুধের বেচারামের কাজে এতদিন খুব আসত, পুরোনো ঘরে চৌকির নীচে তার পাঁচ সাত পেটি ওষুধ এখনও রাখা আছে, কিন্তু পুটুও অনেকদিন হল আসছে না।

বিকেলে সুশীলার মায়ের বদলে সুশীলা কাজে এসেছে। বয়স তার বারো তের মাত্র। একটু পরে সন্ধ্যা হঠাৎ এসে চুপচাপ মুখে আঁচল তুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় নিজের মনেই চলে গেল। সন্ধ্যার চোখ দুটো কেমন লাল দেখাচ্ছিল—আধপাগলা মেয়েটা পাগলই হয়ে গেল নাকি!

সন্ধ্যা চলে গেলে সুশীলা বলল—'দিদা, ঐ মেয়েটা তোমাদের বাড়ী কাজ কইরতো, না? ও ত আমাদের পাশের ঘরেই থাকে।' সুশীলার মা প্রায় সমবয়সী হলেও শবুকে মাসী বলে, তাইতেই সে সুশীলার দিদা। শবুর রাগ ধরে যায়—তন্বী. শোভার মত সুশীলার মাও কচি সাজতে চায়।

শবু কোন জবাব দিল না। সন্ধ্যার উপর তার রাগ ধরে গেছে। আপন ভোলা মেয়েটাকে তার ভাল লাগত, স্নেহ করত—আর সে-ই কিনা দশদিন কাজে এলনা, কোন খবরও দিল না! সাত আটদিন ধরে বাসন মেজে মেজে অসুস্থ শবুর হাত পা আরো অবশ হয়ে গেছে যেন, সব দোষ সন্ধ্যার।

দীননাথ বাড়ী ছিলনা, লাইব্রেরীতে গিয়েছিল বই পাল্টাতে—উপনিষদ কয়েক লাইন পড়ে হজম করতে পারেনি। সে বাড়ী ফিরলে শবু বলল—

'সন্ধ্যা এসেছিল।'

'কি বলল ?'

শবু অনেক চেষ্টা করে বলল—'কিছু বলেনি। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।'

দীননাথ কি যেন ভাবতে লাগল।

পরদিন সকালে কাজে এসে সুশীলা বলল—

'সন্ধ্যাদি বইলেছে সে আজ থেকে এখানে কাজ কইরবে, আমার কাজ কইরতে মানা কইরেছে। আমি কি তবে কাজ কইরবো, না চইলে যাবো ?'

শবু দীননাথের দিকে তাকাতে সে বলল—'না, তুই যেমন কাজ করছিস কর, সন্ধ্যা এলে দেখা যাবে'খন।'

বলতে বলতে সন্ধ্যা এসে হাজির। জুলজুল্ করে শবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

দীননাথ বলল—'তুমি এতদিন আসনি কেন ? মাসীর শরীর ভাল না। সুশীলারা কাজে লেগেছে, তুমি কী কাজ করবে ?'

সন্ধ্যা শবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাতে নথ খুঁটছে।

দীননাথ বলল—'সুশীলাদের ছাড়ব না। তুমি যদি রান্নার কাজ করতে চাও করতে পার। তার সঙ্গে বিছানা ঝাড়া পাতা মাসীর কাপড় চোপড় ধোয়া মেলা শুকিয়ে ঘরে তোলা এ সবও করতে হবে।'

সন্ধ্যার দুচোখে খুশির আভা দেখা গেল, বলল—'করমু।'

'কত নেবে ?'

'চল্লিশ ট্যাকা মাসে।'

'তবে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও।'

সন্ধ্যা মহা উৎসাহে রান্না ঘরে ঢুকে বলল—'যাও মাসী, তোমার শরীল খারাপ, শুইয়া থাক গিয়া। আমি সব রাঁধতে পারি, রাজবাড়ী গেরামের মানুষ ত। মায়ে কইছে আমার বয়স তিরিশ বছর হইছে, তাই না মাসী ? আমারে কিছু দেখাইয়া দিতে হইবো না।'

হেঁসেল হাতে পেয়ে সন্ধ্যা মহা খুশি। সুশীলাকে ডেকে ধমকে উঠল—'এই ছেমড়ী, কড়াইডা কেমুন মাজছস্ কালি উঠে নাই, যা ভাল কইরা ঘইস্যা মাইজ্যা নিয়া আয়। জানস্, মাসীর আমার এক গেরামে বাড়ী, আমরা নোংরা স্থাখতে পারি না।'

কি কি রান্না হবে দেখিয়ে দিয়ে শবু এসে নিজের বিছনায় শুয়ে পড়ল।

দীননাথ বলল —'সন্ধ্যাকে পাওয়া গেল ভালই হল। যতদিন তুমি সেরে না উঠছ, সেরে উঠলে পরেও, এখন থেকে সন্ধ্যাই রান্না করবে। কেমন, ভাল হল না? তুমি কতদিন দুঃখ করে বলতে—এ সংসারে এসে শুধু রেঁধেই যাচ্ছি, একদিনও কেউ রেঁধে খাওয়ালো না। এখন থেকে তোমাকে আর রান্না করতে হবে না।'

একটু সহানুভূতির কথায় শবুর মন বেদনায় ভরে উঠল। হ্যাঁ, সে চেয়েছিল মাঝে মাঝে রান্নার কাজে ছুটি, বিশ্রাম—যেমন অফিসে থাকে ছুটি। কিন্তু এতদিন সে তা পায়নি, বাড়ীতে যখন আরো অনেক লোক ছিল তখনও না। আর আজ যখন সে দেহে মনে অবশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখন এল সেই অবসর। এই কি সে চেয়েছিল? তার দু চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীননাথ তার মাথায় হাত রেখে বলল—'একি, তুমি কাঁদছ কেন? আমি ত ভাল কথাই বললাম।'

কেন যে কাঁদছে তা দীননাথ কি করে বুঝবে? অবশ অচল হয়ে সে বিছানায় শুয়ে থাকবে, অপরে এসে তার সংসার চালাবে এটা যে কত বড় দুঃখের সে কথা এক মেয়েমানুষই বোঝে। মেয়ে মানুষের হাতে যদি হেঁসেলই না রইল তবে আর তার কি রইল!

আঁচলে চোখ মুছে পাশ ফিরে শুতে শুতে শবু বলল—'না, কিছু না।'

সে যে চিরদিনের অভিমানী, মনের দিক থেকে বড়ই চাপা।

তিন

দুদিন হল সন্ধ্যা রান্নার কাজে লেগেছে। খুব মন দিয়ে গুছিয়ে সে কাজ করছে। এতখানি বয়স হয়েছে, এখনও তার নিজের সংসার হয়নি। তাই পরের সংসারের দায়িত্ব পেয়ে বেশ মন ঢেলে কাজ করছে। দেখে সন্ধ্যার প্রতি করুণায় শবুর মন ভরে ওঠে।

বিছানায় অধিকাংশ সময় শুয়ে শুয়ে সে সন্ধ্যাকে কাজ করতে দেখে আর তার বুকের ভিতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। নিজের সংসার থেকে সে যেন কতদূরে সরে যাচ্ছে। তার কিছু করার ক্ষমতা নেই—শুধুই দূর থেকে দেখে যাওয়া।

দীননাথ আবার বলল অন্তকথা। সন্ধ্যার হাতের রান্না খেয়ে সে বলল—

'মেয়েটার রান্নার হাত ভাল, ওর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ওকেই এ কাজে রাখা যাবে, কি বল?'

শবু এখন খাবারের ভালমন্দ স্বাদ বিশেষ বুঝতে পারে না। প্রচুর খিদে পায়—সন্ধ্যা যা রেঁধে দেয় তাই খায়। সন্ধ্যা কাপড় কেচে দেয়, চুল বেঁধে দেয়, দুবেলা এসে সব কাজ করে দিয়ে যায়। তার এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

তবু শবুর শরীর আরো অবশ অবসন্ন হয়ে পড়ছে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ওষুধই চলছে, তিনটি ইঞ্জেকশনও হয়ে গেছে কিন্তু কোন উপকার বোধ হচ্ছে না। দুপুরের পর থেকে শরীর ভীষণ অস্থির অস্থির লাগছে মাথায় ভীষণ এক যন্ত্রণা, হাত পা আরো অবশ লাগছে। বিকেলের দিকে সে যন্ত্রণায় ছট ফট করছে, মুখ দিয়ে উঃ আঃ শব্দ বেরিয়ে আসছে।

অবস্থা দেখে দীননাথ চিন্তিত হয়ে বলল—'ছ' দিন হল চক্রবর্ত্তীর ওষুধ চলছে কিছু ত কাজ হল না। ডাক্তার বোস নাকি বেশ নাম করা, দুলু তার কাছে ছাড়া চিকিৎসা করায়ই না। সন্ধ্যা থাকতে থাকতে আমি যাই তাকে একটা কল দিয়ে আসি। তোমাকে একা বাড়ীতে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সন্ধ্যা বাড়ীতে থাকতে ডাক্তার বোসকে কল দিয়ে এল। তবু পরে একটু রাত করে দু দুবার শবুকে একা বাড়ীতে রেখে দীননাথকে বাইরে যেতে হল —একবার দেরী দেখে গিয়ে ডাক্তারকে ধরে আনতে, আবার পরে তার ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে।

দুবারই শবু ভীষণ অস্বস্তিতে ছিল, একা থাকতে তার ভীষণ ভয় লাগছে, এক মুহূর্ত্ত দীননাথকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগছে না।

ডাক্তার বোস এসে শবুর পায়ের তলায় পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটার মত লাইন টেনেছে, প্রেসার মেপেছে, প্রশ্ন করেছে—সংসারে এমন কেউ আছে কি যাকে দেখে রোগিণীর ভয় বা আতঙ্ক জাগে?

দীননাথ ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছে—সংসারে ভালমন্দ সব রকম লোকই থাকে, এখানেও আছে।

এরপরে ডাক্তার আর কি বলেছে শবু জানে না। তবে ওদের কথা বার্ত্তায় সে বুঝতে পেরেছিল তার প্রায় অবশ হাত পায়ের তালু নাকি একটু ফুলেছে। শবু এখন হাতের তালুটা চোখের সামনে এনে দেখবার চেষ্টা করছে সত্যিই হাতের তেলো কতটা ফোলা লাগছে, বুঝতে চেষ্টা করছে এর সঙ্গে অবশ ভাবটার যোগাযোগ কতখানি।

দীননাথ ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসে শবুকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে—ভয়ের বা ঘাবড়াবার কিছু নেই। আবার তাকেই যেন বেশী চিন্তিত দেখাচ্ছে।

দুজনেই যখন ভাবনায় ডুবে আছে এমন সময় রাত করে এল পাড়ার মোহন রায়, কদিন পরে তার মেয়ের মুখে ভাত—দাদা বৌদি দুজনের নেমন্তন্ন।

দীননাথ বলল—'তোমার বৌদির শরীর ভাল নেই, দেখি কি হয়।'

মোহন চলে গেল। মোহনের বিয়েতেও তাদের দুজনের নেমন্তন্ন ছিল—দুজনেই গিয়েছিল; এবার শবু যেতে পারবে কিনা কে জানে।

যদিও বাড়ী প্রতি একজনের নেমন্তন্ন হওয়াটাই রেওয়াজ কিন্তু শবুদের ব্যাপার আলাদা। সেবার শিলংএ থাকতে একজন মাত্র প্রতিবেশী শবুদের বাসায় গিয়ে একদিনের জন্য অতিথি হয়েছিল—সে ছিল এই মোহন। তখন শবু পায়ে হেঁটে কত চড়াই উৎরাই পাড়ি দিয়েছে—মালকি লাবান বড়বাজার, লাইটুমখ্রা এমন কি ওকল্যাণ্ড থেকে উমপ্লিং পর্য্যন্তও পায়ে হেঁটে গেছে। এখন সে দুবাড়ী পরে মোহনের বাড়ীও যেতে পারবে না, আর বোধ হয় সে কোথাও যেতে পারবে না। বাড়ীর ছাদে ওঠাও এখন তার পক্ষে কষ্টকর।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'কেমন আছ, কিছু ভাল বোধ করছ কি?'

দীননাথ এখন রোজই একবার শবুর ভাল মন্দর খবর নেয়। শবু আর কি বলবে, শুধু মুখে একটুখানি ক্লিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে।

দীননাথ বলল—'মনে আছে ত আজ চৈত্র সংক্রান্তি—ছাতু সংক্রান্তি? সন্ধ্যাকে রুটি তৈরী করতে বারণ কোরো, আমি বাজার থেকে ছাতু নিয়ে আসব, আজ সকালে তাই খাওয়া।'

সুশীলা কাজে এলে দীননাথ বাজারে চলে গেল।

তাই ত, আজ সংক্রান্তি, কাল নববর্ষ। ভবর গৃহপ্রবেশ কবে যেন—ইংরেজীর পঁচিশ তারিখ—বৈশাখের তবে কত তারিখ হবে? গৃহপ্রবেশের দিন স্থির করে মঙ্গলা দেবীর চিঠিখানা কবে যেন এসেছিল—দিনদশেক হবে বোধ হয়—গৃহপ্রবেশেরও তবে ঐ রকমই বাকি। গত দশদিনে সুস্থ সবল শবু একটু একটু করে অবশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে—এক নিস্তেজ অবসন্নতা তাকে

গ্রাস করছে। আর দশদিন পরে তার কি হবে সে জানেনা। এখনই তার শরীরে কি হচ্ছে তাও সে জানে না।··· ·

বাজার নামিয়ে রেখে 'এই যে ছাতু এনেছি' বলে দীননাথ কলতলায় হাত মুখ ধুতে গেল।

হ্যাঁ, আজ চৈত্র সংক্রান্তি, ছাতু খেতে হয়। সুস্থ অবস্থায় শবুর এ সবে কোন ভুল হত না। সে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে দুটো বাটিতে কিছুটা ছাতু ভাগ করে ঠোঙার ছাতুটা সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের বাটিতে জল ঢেলে ছাতু মেখে খেতে আরম্ভ করল।

দীননাথ রান্নাঘরে এসে নিজের বাটি তুলে নিয়ে তাতে একটু জল ঢেলে বাইরের ঘরে গেল চামচ দিয়ে ছাতু মেশাতে মেশাতে। একটু পরেই সে ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল—

'একি করেছ তুমি, ছাতু যে নুনে বিষ, এ কি খাওয়া যায়? তুমি পারছ না, আমাকে বললেই হ'ত।'

শবু একবার ফ্যাল ফ্যাল করে দীননাথের মুখের দিকে চেয়ে 'উঁ' বলে নিজের বাটিতে জল ঢেলে এক চুমুকে সেটা শেষ করে ধীর অবসন্ন শরীরে ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল, তার বুঝি কোন বোধশক্তি নেই।

দীননাথ হয়ত এবার একটু অনুতপ্ত হল, বলল—'আমারটা ত নুনে বিষ, তুমিও কি নুনে বিষ এক বাটি ছাতু খেয়ে নিলে, কিছু বুঝতে পারলে না? হায় রে আমার কপাল!'

সন্ধ্যা বলল—'আমি দ্যাখলাম মাসী দুইডা বাটিতই এক মুঠা কইরা নুন মিশাইল, আমি বারণ করলাম শুনল না।'

শবুর বিছানার পাশে এসে তার মাথায় হাত রেখে দীননাথ বলল—'নুনে পোড়া ছাতু কি করে খেলে? তুমি বুঝতে পার নি? আমরা ত চিনি ও একটু নুন দিয়ে ছাতু খাই তুমি কি ভুলে গেলে?'—কণ্ঠে তার অনুশোচনা।

কি জানি কি খেয়েছে শবু। মনে ত হল সে চিনিই মিশিয়েছে, খেয়েও কিছু বুঝতে পারে নি। কোন দিন কোন কিছু আগে দীননাথ না খেলে সে খায় না, আজ সে কথাও তার মনে পড়েনি। আজ যেন তার সবই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

শবুর অসহায় ভাব দেখে অনুতপ্ত দীননাথ বলল—'থাকগে যা হয়েছে, তুমি শুয়ে একটু ঘুমোও। আমি তোমার দেয়া নুন ছাতুই খেয়ে দেখি তুমি কেমন ছাতু খেলে আজ।'

শবু ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্ত্তের মধ্যে। দীননাথ এসে ডাকল—'শুনছো, দশটা বেজে গেছে, স্নান করবে না? কাল পয়লা বৈশাখ—আজ তুমি মাথা ঘষবে না? কাল নববর্ষ, শুভদিন।'

হ্যাঁ, ঠিক ত, প্রতি বছর এই দিনে সে মাথায় সাবান দেয়। সাবান হাতে করে শবু ছোট রান্নাঘরে গেল, এখন ঐটাই তার স্নানের ঘর। সন্ধ্যা বালতিতে করে জল ও কাপড় জামা দিয়ে গেল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মাথায় ভাল করে সাবান লাগাতে পারছে না, সে কত ঘষছে একটুও ফেনা হচ্ছে না। ঘরটার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। দেরী দেখে সন্ধ্যা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল—

'মাসী, কই তুমি সাবান লাগাইছ কই? ভাও আমি মাথা ঘইষ্যা দিতাছি' বলে সে ভাল করে সাবান ঘষে মাথায় গায়ে জল ঢেলে স্নান করিয়ে দিল। পরে শবু জামা কাপড় পাল্টে সোজা এসে বিছানায় শুতে গেল—ভীষণ পরিশ্রান্ত লাগছে। সন্ধ্যা ছুটে এসে চিরুণী দিয়ে চুলের জট ছাড়িয়ে সিঁদুরের কৌটো এনে সামনে ধরল। সিঁদুর পরে একটু হেসে শবু বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল।

আবার দীননাথ এসে ডাকল—'চল খাবে না? বেলা একটা বাজল। আর একটু শুয়ে থাক না হয় আমি খাবার যোগাড় করে তোমাকে ডাকছি। ···আচ্ছা, জলের ঘটিটা কোথায় গেল?'

ভাল হল, এখনই মনে থাকতে থাকতে দীননাথকে ঘটির ব্যাপারটা জানানো দরকার। পরে যদি মনে না পড়ে—যা সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। দীননাথকে সঙ্গে করে পুরোনো শোবার ঘরের আলমারী খুলে ঘটি বের করে দেখাল শবু।

দীননাথ আশ্চর্য্য হয়ে বলল—'সে কি! এটা ভাঙল কি করে?'

শবু কোনরকমে বলল—'হাত থেকে পড়ে গেল।'

দীননাথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'যাক গে, আবার যখন বাপের বাড়ী যাবে তখন একটা এইরকম ঘটি কিনে নিলেই হবে। এ ঘটি আমাদের বিয়েতে দিয়েছিল না?'

দীননাথেরও তবে মনে আছে।

বিকেল হয়েছে, সুশীলা সন্ধ্যা কাজে আসতে শবু উঠে তাদের কাজ দেখতে যাচ্ছে। দীননাথ বলল—

'না, না, তোমার ওঠার দরকার নেই। আমি ত আছি। ওরা যা দরকার হবে এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কর্ত্রীঠাকরুনের মত শুধু হুকুম করবে।'

বেদনায় শবুর বুকের ভিতর টনটন করে উঠল। এত বছর হল বিয়ে হয়েছে, চিরকাল সবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছে, মুখ বুজে সব কাজ করেছে সবার হুকুম তামিল করেছে। কাউকে সে কোন দিন হুকুম করে নি, হুকুম করা জানে না হুকুম তামিল করতেই শুধু জানে। কোনদিন সে নিজেকে কর্ত্রীঠাকরুনের আসনে বসায় নি, কখনো নিজেকে ভাবেনি সে এবাড়ীর—'কর্ত্রী ঠাকরুন।'

দীননাথ পাগলের মত শবুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল- 'বল, বল কি বলছিলে? কর্ত্রীঠাকরুন। কি সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণ করলে। আবার বল, কি বলছিলে বল। আজ সারাদিনে তুমি মাত্র দুবার কথা বলেছ—'হাত থেকে পড়ে গেল' আর 'কর্ত্রীঠাকরুন।' আজ কতদিন হল তোমার মুখের কথা প্রায় শুনতেই পাই না, আমিই বলি শুধু। তোমার একটুখানি কথা শোনার জন্য আজ আমি কাঙাল হয়ে আছি। বল তুমি কি বলছিলে—কর্ত্রীঠাকরুন—কি সুন্দর করে তুমি বললে, আবার বল।'

কথা ও বেদনা শবুর বুকে বুঝি জমাট বেঁধে আছে, চেষ্টা করেও সে কিছু বলতে পারে না। সে ত মার কাছে তার অন্তিম প্রার্থনা জানিয়ে রেখেছে—এখন সে কি বলবে? অভিমানের সঙ্গে অনুরাগ মিশে শবু তার একমাত্র ভালবাসার মানুষটির হাত দুটি ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দীননাথ অসহায়ের মত বলতে লাগল—'তোমার এতদিন হল অসুখ করেছে, দু দুটো ডাক্তার দেখালাম, তাদের দেয়া ওষুধও চলছে, কিছুই ফল হচ্ছে না। কি অসুখ করেছে তাও তারা বলছে না, কোন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথাও বলছে না। আমি একা মানুষ কিছুই বুঝতে পারছিনা, পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। আমি এখন কি করি! তুমি একটু বল না গো, তোমার কী কষ্ট হচ্ছে, কোথায় কষ্ট হচ্ছে। তুমি কথা বললে যে আমি মনে জোর পাই। তুমি কথা বল, আমার সঙ্গে কথা বল…।'

কি বলবে শবু? তার যে কোথায় কষ্ট, কি কষ্ট তাই কি সে জানে? কথা বলতে কষ্টের শুরু থেকে বারবার সে যা করেছে, এখনও সেই রকম হাতের এক আঙুল দিয়ে মুখের ভিতরে মাড়ীটা একবার স্পর্শ করল। কী তার মনে হচ্ছে—ঐখানেই যত অসুবিধের মূল, না কি ঐখানে তার কোন

স্পর্শবোধ নেই—কী সে বুঝতে চাইল না বোঝাতে চাইল তা সে নিজেই জানেনা।

দীননাথের আকুলতায় ব্যথায় শবুর বুক ভেঙে যাচ্ছে, হারানো কথা এক সঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কণ্ঠ বাদ সাধছে। কথা বলতে না পারায় বেদনায় তার দু চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। গভীর ভালবাসায় স্বামীর হাত দুটি ধরে একটানা বলে উঠল—

'কত কথা·· কত কথা—কত কথা'—

দীননাথ বেদনায় গলে গিয়ে শবুর গালে গাল স্পর্শ করে বলতে লাগল—

'বলো, বলো আমার তোতা পাখী, কত কথা, কী কথা, কোন কথা?'

শবুর কথা হারিয়ে গেছে, স্বামীর আদরে গলে গিয়ে হেসে কেঁদে তোতা পাখীর মত আবার বলল—

'কত কথা···কত কথা···কত কথা'

তোতা পাখীর বুলি শুনে দীননাথ যেন কৃতার্থ, তবু ত শবু কথা বলেছে। এত বছর যারা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুখী কপোত কপোতীর মত কথা বলেছে গল্প করেছে তাদের একজন যদি নীরব হয়ে যায় সে যে কতখানি বেদনার, কী ভীষণ মর্মান্তিক! ভাষাহীনের বেদনা ভাষায় প্রকাশ হয়না।

চার

আসছে বৈশাখ, আসছে নববর্ষ। চৈত্র সংক্রান্তির রাত। আর ক ঘণ্টা পার হলেই আসবে পয়লা বৈশাখ। লোকে বলে শুভ বৈশাখ, শুভ নববর্ষ। নতুন বছরের কাছে কতজনের কত প্রত্যাশা। কেউ থাকে এই দিনটির অপেক্ষায়, কেউ ভাবে জীবনের পাতা থেকে আর একটি বছর খসে পড়ল। নতুন বছর শবুর জন্য কি নিয়ে অপেক্ষা করছে তা আগাম জানার উপায় নেই।

আপাততঃ রাতের খাওয়া সেরে দীননাথের পেতে দেয়া বিছানায় শবু ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। এখন আর সে দীননাথের বিছানা পেতে দিতে যায় না, পারে না। দীননাথ মশারী টাঙাবার ব্যবস্থা করছে।

. বাইরের গেটে কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। দীননাথ দেখতে গেল এই রাত দশটায় কে কড়া নাড়ছে। শবু ততক্ষণে শুতে শুতেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দীননাথের ডাকে তার তন্দ্রা ছুটে গেল, দীননাথ বলছে—

'শুনছ, এই দেখ কে এসেছে, পাটনায় গোকুলবাবুর ছেলে বিদ্যুৎ। পয়লা বৈশাখ আসবে লিখেছিল—আজ রাতেই এসে পড়েছে···।'

শবু চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার চোখ বুজল। হ্যাঁ চেনা চেনা লাগছে—বিদ্যুৎই ত।

বিদ্যুৎ বলল—'মাসী, বেশী রাত হয়ে গেল দেখে আমি হাওড়া ষ্টেশনেই খেয়ে এসেছি, আপনাকে আর খাবারের হাঙ্গামা করতে হবে না। শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ব। এই দেখুন মাসী, আপনার জন্য নতুন শাড়ী এনেছি, নতুন চাকরিতে ঢুকেছি দুর্গাপুরে, আপনাকে এটা তার প্রণামী। শাড়ীটা বোধ হয় ভাল হয়নি···আমি ত কোনদিন শাড়ী কিনিনি ··আপনার পছন্দ হবে কি না ··'স্বভাবভদ্র বিদ্যুৎ রীতিমত কুণ্ঠিত।

শবু একবার প্যাকেট থেকে অর্ধেক-বের-করা শাড়ীর দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

দীননাথ প্যাকেট থেকে শাড়ীটা বের করে ধরা গলায় বলতে লাগল—

'দেখ দেখ, বিদ্যুৎ কি সুন্দর লাল খোলের উপর বুটি দেওয়া দামী তাঁতের শাড়ী এনেছে তোমার জন্য। আমি তোমায় পয়লা বৈশাখের শাড়ী কিনতে পারি নি। কানাই তোমাকে শাড়ী কেনার জন্য টাকা দিয়েছিল। বলেছিলাম পয়লা বৈশাখের আগ দিয়ে আর কিছু টাকা মিলিয়ে ভাল শাড়ী কিনে দেব কিন্তু কেনাই হল না। কদিন ধরে তোমাকে নিয়ে দোকানে যাবার মত অবস্থা ছিল না। বিদ্যুৎ তোমার জন্য শাড়ী এনেছে—এটাই হবে তোমার পয়লা বৈশাখের শাড়ী। দেখ তুমি একবার কি সুন্দর শাড়ী এনেছে, দেখবে না, দেখ, দেখ···'তার কথায় যেন কান্নার সুর, কণ্ঠে করুণ মিনতি।

ক্লান্ত চোখ মেলে শবু তাকাল শাড়ীটার দিকে, হ্যাঁ সুন্দর শাড়ী—কিন্তু তার বুঝি আর পরা হবে না। অনেক কষ্টে তার মুখে কথা যোগাল, বলল—

'এখন আর কি হবে!' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শবু আবার চোখ বুজল।

বিদ্যুৎ বলল—'তা কেন মাসী, আপনি কালই এ শাড়ী পরতে পারবেন। মেসোর জন্যও এই যে এক পিস্ জামার কাপড় এনেছি।'

দীননাথ শবুর মাথায় হাত রেখে গভীর স্বরে বলল—'দেখ, বিদ্যুৎ কী ভাল ছেলে, তোমাকে কত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। নতুন চাকরি পেয়েছে, নববর্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তুমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলবে না? ও যে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছে। তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বল।'

হ্যাঁ, বিদ্যুৎ খুব ভাল ছেলে, ভদ্র, বিনয়ী। পাটনায় থাকতে সাত আট

বছর ধরে শবু তাকে ছোট থেকে একটু একটু করে বড় হতে দেখেছে, স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়তে দেখেছে, কত খেলা-গল্প হাসি-কান্নার স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শবুর বুকে স্মৃতির মালা কথায় পাহাড় জমা হয়ে আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। অদ্ভুত এক করুণ হাসি তার মুখে ফুটে উঠল, কণ্ঠে ফুটল তোতা পাখীর বাঁধা বুলি—

'কত কথা···কত কথা···কত কথা'

ঐ টুকু বলে সবাইকে কৃতার্থ করে শবু পাশ ফিরে শুল—অনেক কথা সে বলে ফেলেছে, এবার সে ঘুমোবে।

এতক্ষণে বুঝি বিদ্যুতের মনে খটকা লেগেছে, জিজ্ঞেস করল—'মেসো, মাসীর কি হয়েছে, মাসী ওরকম করছেন কেন, হাসছেন না, ভাল করে কথাও বলছেন না, কোন অসুখ···।'

শবু ততক্ষণে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

এসেছে নববর্ষের সকাল। আজও ভোরে পাখীদের কল-কাকলিতে মুখরিত হয়েছে চারিদিক। নবীন উষায় নবরবির রক্তিম আবির্ভাবে ঘোষিত হয়েছে নতুন দিনের আগমনবার্ত্তা। সূচনা হয়েছে বাংলা নববর্ষের।

এমনি কত নববর্ষ এসেছে, চলে গেছে শবুর জীবনে। সব দিনের সব কথা কি সঠিকভাবে মনে থাকে? মনে করতে গেলে অস্পষ্ট ছবির মালা চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়···শৈশবে নাচে গানে ভরা দিনগুলি, যৌবনের সেই হাসি আনন্দ, সব এসে একসময় মিশে গেছে সংসারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে। তবু এই মহূর্ত্তে তার মনে পডছে দুটি বিশেষ বছরের কথা······

সেই বছরেই সে আর বান্ধবী হীরা পৌঁছেছিল বয়ঃসন্ধিক্ষণে। নবযৌবনের উন্মেষের নবীন দিনগুলিতে তারা দুজনে মিলে আঁকত কত ছবি হাসি কথা ও নানা কল্পনায়। মনের আনন্দের প্রজাপতিরা রঙের পাখনা মেলে উড়ে উড়ে বেড়াত তাদের চারপাশে। তাদের ছুঁতে চাইলে ছোঁয়া যায় না, ধরতে গেলে দূরে চলে যায়। আর তারই এক বিকেলে বড কাকার জন্য চা করতে গিয়ে শাড়ীতে আগুন লেগে সে এক কাণ্ড হয়েছিল আর কি। তখন তার বয়স সবে চৌদ্দ।···

মধ্য যৌবনেও এসেছিল আর এক নববর্ষ। নতুন বছরের কাছে সে সময় শবু কী প্রার্থনা করেছিল আজ আর মনে নেই। তবে সেই বছরেরই মাঝামাঝি তাদের জীবনে নেমে এসেছিল দারুণ বিপর্যয়—ট্রেন দুর্ঘটনা, শিলং

এ পথের দুর্ঘটনায় তার মাতৃত্বের সত্তা না ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া।···

প্রান্ত-যৌবনের প্রায় সীমায় পৌঁছে অবশ অবসন্ন ভাষাহীন শবু আজ নববর্ষের সকালে অন্য কী প্রার্থনা জানাতে পারে? প্রার্থনা জানাবার মত মনের অবস্থাই কি তার আছে?···

নববর্ষের সকালে ঘুম ভাঙলে শবু শুয়ে শুয়ে উদাশ মনে ভেবে চলেছিল। একটু বেলা করে দীননাথ তার হাতে টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ধরিয়ে দিলে সে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এল। তারপর সন্ধ্যার হাতে বানানো জল-খাবার খেয়ে শবু আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। জানালার ধারে টগর গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। পাশে নতুন লাগানো আমের চারাটি জানালার মাথা সমান বেড়ে উঠেছে। একটু দূরে পেয়ারা গাছটিও নজরে পড়ছে। সেটিতে বছরে দুবার ফল হয়—একবার শীতে একবার বর্ষায়। এখন শীতের ফল শেষ হয়েছে। দুচারটি নতুন ফুলের কুঁড়ি দিয়ে আগামী বর্ষার প্রস্তুতি প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে।

বিদ্যুৎ ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে গভীর মমতা-ভরা দৃষ্টিতে মাসীর দিকে চেয়ে রইল। শবু একটু করুণ হেসে তার দিকে তাকাল। কারো মুখে কথা নেই।

বিদ্যুৎ ভারি ভদ্র ছেলে। মাসীর অসুখ করেছে, তাকে সঙ্গ দিতে সামনে এসে বসেছে—না বলা পর্য্যন্ত সে উঠে যাবে না। একভাবে এরকম দুজনে চেয়ে থাকতে শবুর অস্বস্তি লাগছে। অনেকটা সময় পরে সে চেষ্টা করে বলতে পারল—

'ঘুমোই'?

বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'হ্যাঁ মাসী, আপনি ঘুমোন। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে, আমি ওঘরে ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।'

বিদ্যুৎ ঘুমোতে চলে গেল, শবুও নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝখানে আর একবার দীননাথের ডাকে শবু ঘুম থেকে উঠে স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান করে এসেছে। সন্ধ্যা চুল আঁচড়ে হাতে সিঁদুরের কৌটো তুলে দিলে সিঁদুর পরে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার এখন সাধা ঘুম। কত রাতের না-ঘুমোনো-ঘুম যেন তার চোখে ভর করেছে। শুলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। কাকগুলো আবার ভীষণ কা কা করছে—তাতেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না।

আবার ঘুম ভাঙল দীননাথের ডাকে, বলছে··

'শুনছো, আমার স্নান হয়ে গেছে, বেলা একটা বাজে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি আমার স্নানের কাপড় ধুয়ে মেলে দিয়ে ততক্ষণে খাবার জায়গা করে নিচ্ছি।'—দীননাথ কলতলায় চলে গেল।

শবু বিছানা থেকে উঠে বসতে মনে হচ্ছে তার একখানা হাত বুঝি পুরোই অবশ লাগছে। পা নামিয়ে মেঝেতে দাঁড়াতে গিয়ে দেখছে একটা পা-ও অবশ লাগছে। একপাশ ফিরে শুয়ে থাকার জন্য ঝিঁ ঝিঁ ধরল কি? মাথার ভিতর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, শরীরটাকে ঠিক মত খাড়া রাখতে পারছে না। কোন রকমে এক পা টেনে টেনে শবু বাথরুমের দিকে এগিয়ে চলেছে, গায়ের কাপড়টাও ঠিকমত গোছাতে পারেনি, আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে।

কলতলায় একপাশ থেকে দীননাথ বলে উঠল—'ও কি, তুমি অমন করে হাঁটছ কেন? কাপড় ঠিক কর।'

আর কাপড় ঠিক করা, শবু ততক্ষণে বাথরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। চোখ মুখ ধুয়ে ফিরে দাঁড়াতে বাথরুমের ফাঁক ফোকর দিয়ে নজরে পড়ল ভবর বাড়ী—সেখানে দরজার সামনে যেন মঙ্গলা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন বিকট বিশাল মূর্ত্তি নিয়ে—শবুর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে হাত পা নেড়ে শাসাচ্ছেন—আর মাত্র দশদিন, তারপরই আমি আসছি।

মাথাটা ভীষণ ঘুরে উঠল—আর একটু হলেই পড়ে যেত। কিন্তু বাথরুমে পড়ে যাওয়া নাকি খুব খারাপ—মনের সব শক্তি একখানে করে শবু কোন-রকমে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

দীননাথ তখনও কলতলায় ছিল, শবুকে ঐরকম আলুথালু বেশে একপা টেনে টেনে এগোতে দেখে বলে উঠল—'আঁচল পায়ে বেধে যাবে যে আঁচল ঠিক করে নাও। দাঁড়াও আমি আসছি···।'

শবুকে তখন কে যেন পিছন থেকে তাড়া করেছে, তার দাঁড়াবার উপায় নেই। কারো আসার জন্য অপেক্ষাও সে করতে পারবে না—সে যেন ভাগ্য-তাড়িতের মত ছুটে চলেছে কোন এক চরম পরিণতির দিকে। পুরোনো শোবার ঘরে কাকে যেন শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে—বিদ্যুৎ, না? মা যখন মারা যায় সে সময় বিদ্যুৎও সেখানে ছিল। বিদ্যুৎ কি দেবদূত! মা কি বিদ্যুৎকে পাঠিয়েছে শবুকে নিয়ে যেতে···

··মা গো, এই ত আমি যাচ্ছি···এখুনি তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব··· তুমি আমাকে কোলে ঠাঁই দাও মা···

শবু আর এগোতে পারল না, দীননাথ তার কাছে ছুটে আসার আগেই,

লোহার গেট ঘোরানোর সামান্ত উচু নীচু খাঁজে অবশ অচল পা বেধে সামনে মুখ থুবড়ে দু হাতের উপর ভর দিয়ে পয়লা বৈশাখের ভর দুপুরে উঠোনে আছড়ে পড়ল। হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে তার মস্তিষ্ক বুঝি চুরমার হয়ে গেল। অকাল কাল-বৈশাখীর ঝড়ে যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।

কে বজ্র হানল, যার অনুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র কি? এমনি বজ্র একদিন পড়েছিল ফুলের মালার রূপ নিয়ে রানী ইন্দুমতীর উপরে—সতী ইন্দুমতী তার স্বামী রাজা অজের কোলে মাথা রেখে তার শাপের কাল পূর্ণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। রাজা অজ প্রিয়তমার বিরহে কেঁদে আকুল হয়েছিল —অল্পকাল পরে সেও ইহলোক ত্যাগ করেছিল। শবুর স্বামী দীননাথ কোথায়?···

পড়ে গিয়ে নিজেই গড়িয়ে চিৎ হয়ে হাত দুটো তুলে দেখল—না, তার এয়োতীর চিহ্ন হাতের শাঁখা জোড়া ভাঙেনি। পরমুহূর্তে উঠোনের উপরে মাঝ আকাশ সন্ত পার-হওয়া বৈশাখের প্রখর জলন্ত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে শবু জীবনে প্রথম জ্ঞান হারাল। ঘোর অন্ধকারে যেন ডুবে গেল চারদিক।

জ্ঞান ফিরে শুনল দীননাথের আকুল কণ্ঠ—'শুনছো, শ্রাবণী, শবু, এই যে আমি, তুমি আমার দিকে তাকাও।'

কিন্তু ওকি, আকাশে সেই বিকট মূর্ত্তিটা তার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছে! কি ভীষণ ভয়ঙ্কর তার চেহারা! ভয়ে আতঙ্কে আবার সে জ্ঞান হারাল।

আবার জ্ঞান ফিরে শবু দেখল এখন সে উঠোনের ছায়া অংশে শুয়ে আছে, দুখানি উদ্বেগভরা ব্যাকুল মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে—দীননাথ আর বিদ্যুৎ। দীননাথ বালতিতে করে জল এনে মগে ভরে মাথায় ঢালছে, ভিজে হাত দিয়ে শবুর মুখ চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাওয়া করছে।

লজ্জিত হল শবু, উঠে বসতে চাইল। দীননাথ বাধা দিল,—'না, না, এখনি উঠো না, আর একটু জিরিয়ে নাও।'···কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞেস করল—'শুনছো, এখন কেমন বোধ করছ?'

শবু চোখ বুজে শুয়ে ছিল, চোখ মেলে বোঝাল—ভাল আছে।

দীননাথ ও বিদ্যুৎ ধরাধরি করে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়াবার আগেই সে মেঝেতে গড়িয়ে শুয়ে পড়ল—মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে—ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ঘরের পাখাটা জোরে খুলে দিতে বেশ আরাম লাগছে—

মুহূর্তের মধ্যে শবু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পাশ ফিরে দেখতে পেল দীননাথ আর বিদ্যুৎ পাশে বসে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। তার ঘুম ভেঙেছে দেখে দীননাথ বলল—

'এখন একটু ভাল লাগছে কি? এখন খেতে পারবে?'

ছি ছি ছি, এখনও কারো খাওয়া হয়নি—বেলা কত বা হল। শবু উঠে বসার চেষ্টা করতে দীননাথ তাকে ধরে বসিয়ে দিল। পাশের চৌকিতে হেলান দিয়ে সে বসে রইল। দীননাথ আর বিদ্যুৎ দ্রুত হাতে তিনজনের খাবার শোবার ঘরে নিয়ে এল। শবুকে ভাত বেড়ে এগিয়ে দিতে সে ভাত মেখে মুখে তুলতে গেল। একি, হাতের আঙুলগুলো মুঠো করতে পারছে না কেন, হাতটা মুখ অবধি উঠাতেও পারছে না, যে কটি মাখাভাত হাতে করে মুখে তুলছিল তার সবই আঙুলের ফাঁক গলে থালায়—মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ভয়ে দুঃখে বেদনায় শবুর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। প্রথমে কথা বলার অসুবিধে, একটু একটু করে দেহে মনে অবসন্ন হয়ে পড়ার সঙ্গে কিছু আগে অনুভব করেছিল সে দুই পায়ে সমান ভর দিয়ে চলতে পারছে না, আর এখন নিজে হাতে খাবারও মুখে তুলতে পারছে না। এমনি সর্বাঙ্গ অবশ অসাড় হয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে! করুণ জলভরা চোখে অসহায়ের মত সে তাকাল দীননাথের দিকে…মনে হচ্ছে বেদনায় দীননাথের মুখখানা কালো হয়ে গেছে। পাশে বিদ্যুৎ হাতের গ্রাস মুখে তুলতে ভুলে গিয়ে ছলছল চোখে মাসীর দিকে তাকিয়ে আছে।

বেদনাভরা ধরা গলায় দীননাথ বলল—'খেতে পারছ না? আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি।' একসঙ্গে ভাত মেখে সে একবার শবুর মুখে তুলে দিচ্ছে আর একবার নিজে খাচ্ছে। কোনরকমে খাওয়া হলে বসে বসেই শবুর হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে দীননাথ আর বিদ্যুৎ দুজনে ধরে তুলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শবুর ঘুম আসতে একটুও দেরী হল না।

ঘুম ভেঙে শবু শুনতে পেল বিদ্যুৎ বলছে—'মেসো, আমি কি আজকের রাতটা থেকে যাব?'

দীননাথ বলল—'না, তোমার নতুন চাকরি, তুমি যাও। একটু পরে কম্পাউণ্ডার আসবে ওকে ইঞ্জেকশন দিতে—তাকে বলে দেব ডাক্তার চক্রবর্তী চেম্বারে এলেই যেন এখানে পাঠিয়ে দেয়। ষষ্ঠীতলায় কাকীমাদের আর সোদপুরে দাদা-বৌদিদের কাছে খবর পাঠানো দরকার - কিন্তু তুমি নতুন

লোক কারো বাড়ী চিনবে না। আমি পাড়ার লোকের সাহায্যে খবর পাঠাব। ওকে ফেলে আমি ত কোথাও যেতে পারব না। তুমি চলেই যাও—কাল তোমার অফিস আছে।'

বিদ্যুৎ বলল—'আমি নিজে থেকে যে ওষুধগুলো এনে দিলাম ওগুলো মাসীকে খাওয়াবেন, সবই টনিক।' পরে শবুর কাছে এসে সে জেগেছে দেখে বিদ্যুৎ বলল—'মাসী, এখানে এসে আপনাকে এমন অবস্থায় দেখব, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ভীষণ মন খারাপ লাগছে। আমি এখন যাচ্ছি, আশা করছি অল্পদিনের মধ্যে আপনি সুস্থ হয়ে নিজে হাতে চিঠি লিখবেন আমাকে। আসি মাসী'—বলতে বলতে বিদ্যুৎ কেঁদে ফেলল।

শবু করুণ হেসে অনেক কষ্টে শুধু বলল—'এসো।'

বিদ্যুৎ চলে গেল।

পাঁচ

রাত হয়েছে। দীননাথ শবুকে নিজে হাতে খাইয়ে দিয়ে ধরে ধরে বাথরুমে ঘুরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

এর মধ্যে সন্ধ্যের আগে কম্পাউণ্ডার ইঞ্জেকশন দিতে এসে সব শুনে বলে গেছে—ডাক্তারবাবু কলকাতায় একটা কনফারেন্সে গেছেন, কাল সকালে তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

দীননাথের বন্ধুরা অভ্যাসমত টিভি দেখতে এসে তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ শুনে ভীষণ দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে গেছে। দীননাথ তাদের উপর ভার দিয়েছে ষষ্ঠীতলা ও সোদপুরে খবর পৌঁছে দেবার।

সন্ধ্যা সুশীলাও বিকেলে কাজে এসে সব শুনে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে কিছুক্ষণ শবুকে দেখে চলে গেছে।

এখন সারা বাড়ীতে তারা মাত্র দুটি প্রাণী। দীননাথ শবুর বিছানায় মশারী টাঙিয়ে জিজ্ঞেস করল—'পান খাবে?'

শবু মাথা নেড়ে জানাল—না। পান খাওয়া চা খাওয়ার উপর তার আর কোন আগ্রহ নেই।

দীননাথ গেট দুটোতে তালা লাগিয়ে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বলল—'শুনছো, দরজা জানালা বন্ধ করেছি, খাটের নীচ দেখেছি, গেটের

তালা চাবি বন্ধ করেছি।'

এতদিন এ সব কাজ শবু নিজে করত, না হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারত না। আজকাল সে পারে না, দীননাথ করে এসে তাকে বললে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়।

সব শেষে দীননাথ বলল—'আজ থেকে আবার আমরা এক বিছানায় শোব। আর কোনদিন আমরা আলাদা বিছানায় শোব না।'

দীননাথ এসে পাশে শুয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, মাঝে মাঝে তার ডান হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল—মনটা তার হয়ত গভীর চিন্তার সাগরে ডুবে আছে। দুজনেই নীরব।

শবুর কণ্ঠ ত এখন প্রায় নীরব। কিন্তু দীননাথ এসে পাশে শোয়াতে তার মন সরব হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছে—গত বছরের মধ্যে তারা আলাদা বিছানায় শুতে শুরু করেছিল, এখন আর এক বছর আসার সময় হয়ে এল। গত দশ মাসে বিছানায় দূরত্ব তাদের মনের ব্যবধান কতখানি বাড়িয়ে তুলেছে। ছোট খাট তুচ্ছ মান অভিমান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী হতে পারে না শুধু এক বিছানায় শুলেই। রাতের অন্ধকারে যেভাবে নিজের মনকে অপরের কাছে মেলে ধরা যায়—দিনের আলোয় নিবিড় সান্নিধ্যেও তা সম্ভব হয় না।

কিন্তু ছোট খাটো ব্যাপারে ওদের কিছু হয়নি। হয়েছে বড় ঘটনায়, বিশেষ ব্যাপারে। যখন শবু আকুল কান্নায় মনেপ্রাণে চেয়েছে দীননাথ একবার তার কাছে এসে আদর করুক—তা সে করেনি। রাতের পর রাত শবু যখন ঘুমোতে পারে নি তখন সে আলাদা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে—রাতে ভাল ঘুম হয়েছে? না হলেই বা কি—কে তার খোঁজ রেখেছে? আজ যখন তার কণ্ঠ প্রায় নীরব, দেহ অবশ অবসন্ন, মন ভেঙে গেছে তখন দীননাথ বলছে—আর আমরা আলাদা বিছানায় শোব না।

এই সংসারের প্রয়োজনে শবু দশটা বছর নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তার মাতৃত্বের কথা ভাবার অবসর পায়নি। সময়কালে হলে যা হয়ত অনায়াসে হতে পারত—অসময়ে আর পথের দুর্ঘটনায় তার সে সাধ পথের ধুলোয় মিশে গেছে। সে দুঃখও সে তার স্বামীর সঙ্গে সমভাবে ভাগ করে নিয়েছে, সহ্য করেছে ভাগ্যে নেই ভেবে।

কিন্তু একের পর এক দীননাথ তার মনে আঘাত দিয়েছে—তার আত্মীয়

স্বজনদের সঙ্গে সে নাকি হেসে কথা বলে না, শবু নাকি তাকে মা ভাই বোনদের ত্যাগ করতে বলেছে আর সব শেষে গৃহপ্রবেশের চিঠিটা শবুর কাছে গোপন করতে চেয়ে সে একটু একটু করে আরো দূরে সরে গেছে।

এত সবের পরে আজ এসে পাশে শুলে আর কি হবে? শবু থাকবে না আর এই পৃথিবীতে। দারুণ অভিমানে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—

'তোমার কথা আমার মনে আছে।'

তার মুখের স্পষ্ট উচ্চারণে কথা কয়টি যেন দীননাথকে বিহ্বল করে তুলল, আদরে শবুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—

'কি বলছ তুমি? কি কথা তোমার মনে আছে? কি সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণ করলে। বল, আরো কথা বল। তোমার মুখের কথা শুনতে না পেলে আমার ভাল লাগেনা। কি কথা, কোন কথা তোমার মনে আছে বল।.'

কি করে বলবে? যত কথা সে ভাবছিল সব গুছিয়ে বলার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। চেষ্টা করেও সে আর কিছু বলতে পারছে না।

বারবার আদর করে জিজ্ঞেস করেও শবুর মুখ থেকে আর কিছু শুনতে না পেয়ে দীননাথ যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল। এতদিন ধরে শবুকে একটু একটু করে অবসন্ন হয়ে পড়তে দেখেও যা হয়নি. আজ দুপুরে তাকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাতে দেখে সে রীতিমত মুষড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ, সন্ধ্যা, সুশীলা কম্পাউণ্ডার, পাড়ার বন্ধুরা এতক্ষণ ছিল, আসা যাওয়া করেছে—এখন একা বাড়ীতে সে হয়ত বড় অসহায় বোধ করছে। তার উপর শবুর ঐ কথা কয়টি —তোমার কথা আমার মনে আছে—বুঝি তাকে ভাবনায় নতুন জগতে নিয়ে গেছে, মনে হয়ত অপরাধ বোধও জেগে থাকতে পারে।

গভীর মমতায় শবুকে জড়িয়ে ধরে দীননাথ হাউ হাউ করে কেঁদে বলতে লাগল—

'এ আমাদের কি হল শ্রাবণী! কেন বিনা মেঘে আমাদের মাথায় বাজ পড়ল? কি ভেবেছিলাম আর কি হল। যা কোনদিন ভাবিনি তাই হল! সুস্থ সবল তুমি—তোমার এ কি অসুখ করল—এমন অসুখ কোনদিন দেখিনি শুনিনি। আমাদের সাধের ঘর ছোট সংসার যে ভেঙে যেতে বসেছে।...তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? তাই কি আমার সঙ্গে কথা বল না?...আজ সাতদিন হল তোমার মুখ থেকে দু'একটির বেশী কথা শুনতে পাইনা। আমি যে আর পারছি না।...আমাকে তুমি যত খুশি শাস্তি দাও, শুধু তুমি ভাল

হয়ে ওঠো, তুমি আবার ভাল করে কথা বল।···তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার কান্নার বেগ বেড়ে চলেছে, শেষ দিকে শবুর গালে গাল ছুঁইয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছে।

দীননাথ আজ কাঁদছে, আজ তার চোখে জল। কাঁদছে গভীর বেদনায়, সামনে বুঝি তার ঘোর অনিশ্চিত দুর্যোগভরা ভবিষ্যৎ। সঙ্গে হয়ত আছে অনুতাপের জ্বালা, নিরুপায় অক্ষমতার গ্লানি। তার চোখের সামনে দাদা বিশ্বনাথ মারা গেছে, বাবা কালীনাথ মারা গেছেন, অফিসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বারবার ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, জীবনের একটি কুঁড়িকেও প্রস্ফুটিত হবার আগেই হারিয়েছে—তবু সে কখনো ভেঙে পড়েনি, হার মানেনি, মাথা উঁচু রেখেছে। সেবার মধুপুরে বাবা-মার কথা বলতে গিয়ে বলেছিল—আমি কেঁদে হাল্কা হতে পারিনা, আমার সব কান্না বুঝি তোলা আছে কোন এক কঠিনতম আঘাতের অপেক্ষায়। শবুর অসুখ কি তাকে সেই আঘাতের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে?

শবু কি তৃপ্ত? তার একটি ইচ্ছা আজ পূর্ণ হয়েছে। সে রাতে সে কেঁদে বলেছিল—আমার মূল্য তুমি বুঝলে না, শুধু আঘাতই দিলে—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদতে হবে, সে কান্না যদি দেখে যেতে না-ও পারি পরলোকে গিয়ে যেন দেখতে পাই।···মৃত্যু পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল না, তার আগেই দীননাথ কাঁদছে—আর কাঁদছে শবুর জন্যই। সে যে মনে প্রাণে সতী।

মনে হচ্ছে দীননাথ হৃদয়হীন নয়। শবুর জন্য মায়া মমতা ভালবাসা নিশ্চয়ই আছে, তাই তার এই কান্না। দুই যুগের বিবাহিত জীবনের কথা ভাবলে সেখানে আদর সোহাগ ভালবাসার পাল্লাই বেশী ভারি, জীবনের সেই ছবিটিই দীর্ঘতম। শুধু একটি ব্যাপারেই সে অসহায়—নিজের পায়ে যে কুড়ুল মেরে বসে আছে তাকে এখন আর দোষ না দিয়ে করুণা করাই উচিৎ।

ভাগ্যের হাতে বারবার মার খাওয়া এই একরোখা মানুষটির জন্য তার মন গভীর মমতায় ভরে উঠছে। শবু যদি না থাকে কে তাকে দেখবে? নিয়মিত সেবায় যত্নে এত বছর ধরে যাকে নীরোগ সুস্থ রেখেছে তার অসুখ হলে কে দেখবে? কার কাছে সে মনের কথা সুখ দুঃখের কথা বলবে, কি নিয়ে সে বাঁচবে?

এখন যে শবুর বাঁচতে ইচ্ছে করছে। তার আদরের 'ব' কে ছোট্ট অসহায় শিশুর মত আগলে রাখতে হলে যে তার বাঁচা দরকার। শবু আবার ভাল হয়ে উঠবে, স্বামীকে আগলে রাখবে, সারা বাড়ীময় ঘুরে বেড়াবে কাজ কাম করবে, ইচ্ছেমত ছাদে উঠবে হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে আম, পেয়ারা পাড়বে, স্বামীর সঙ্গে এখানে সেখানে বেড়াতে যাবে, মন্দির শহরে যাবে বাবাকে দেখবে, কানাই-কাকলী -তপু-অমলেরা এলে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবে, মিঠি দিঠি মিষ্টি পুতুল সবাইকে আদর যত্ন করবে।

কিন্তু তা কি আর হবে? ঘোর আতঙ্কে ও গভীর অভিমানে সে যে পরলোকে মার কোলে ফিরে যেতে চেয়েছে। স্বার্থপরের মত নিজের কষ্টের কথাই শুধু ভাবল, আর একজন যে তার অভাবে কেঁদে বুক ভাসাবে সংসার শূন্য দেখবে তার কথা ভাবল না!

মরতে সে চায় নি, নিজের মৃত্যু কামনা করার কথা ভাবতে হবে এমন ভাবনার কথাও তার মনে আসেনি কোনদিন। কিন্তু ঐ যে একখানি কি চিঠি এল। তারপরই গভীর আতঙ্কে তার জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল। পরলোকবাসিনী মায়ের কাছে যাবে বলে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে ফেলল। এখন ত আর ফেরার পথ নেই। সে এখন কি করবে?···

···মা, মা গো, তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমার কাছে তোমার, আর যার হাতে অগ্নিসাক্ষী করে তুলে দিয়েছিলে তার,—দুজনের আকর্ষণই যে সমান। ·আমি এখন কি করি?

কাঁদছে শবু, কাঁদছে দীননাথ। অন্ধকার রাতে শবু আর দীননাথ কান্নার বাসর সাজিয়েছে। শবু কাঁদছে কথা বলতে না পারার দুঃখে—দীননাথ কাঁদছে আত্মগ্লানীতে। একবার শবু দুর্বল হাতে দীননাথের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে—একবার দীননাথ মুছিয়ে দিচ্ছে শবুর চোখের জলের ধারা। দুজনের চোখের জলে বয়ে চলেছে অশ্রুনদী—যা হয়ত শেষে গিয়ে মিশবে অশ্রুসাগরে, অসীম কালসিন্ধুতে।

অবিরাম কান্নায় ভেসে গেল ওদের শুভ নববর্ষের রাত্রি, দোলের রাতে আবীর দিয়ে ওরা কেউ কাউকে প্রণাম প্রীতি জানাতে ভুলে গেছে, পয়লা বৈশাখে শবুর পরা হল না নববস্ত্র, করল না সে প্রণাম তার জীবন-স্বামীকে, নেয়া হল না তার আদর আর আশীর্বাদ। পয়লা বৈশাখ ওদের জীবনে দেখা দিয়েছে 'অশুভ বৈশাখ' রূপে, আজ থেকে ওদের জীবনে বুঝি স্থায়ী হল 'কান্নার বাসর।'

এবং আজ শুক্রবার। এই শুক্রবারের প্রভাব শবুর জীবনে যেন খুব বেশী। ওদের বিয়ে হয়েছিল শুক্রবারে। আবার মেজ ভাসুর বিশ্বনাথের মৃত্যু, বাবা কালীনাথের মৃত্যু, প্রথম শিলং রওনা হওয়ার দিন যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ট্রেন এক্সিডেন্টের ঘটনা ও সব শেষে মা পদ্মিনীদেবীর মৃত্যু—প্রত্যেকটি ঘটেছে শুক্রবারে। আজকের শুক্রবারও তাদের জীবনে চিহ্নিত হয়ে রইল 'অশুভ শুক্রবার' হিসেবে! অশুভ নববর্ষও!!



অষ্টম পর্য্যায়

এক

কথায় বলে—দুঃখের রজনী শেষ হয় না। তবু রাত পোহায়। শবুদেরও রাত পোহাল।

কাল সকালেও শবু নিজে নিজে যে কাজ করেছে আজ সকালে সে তাও পারছে না। অভ্যাসমত বিছানা থেকে নামবে ভাবল কিন্তু উঠে বসতেই পারল না। সব কিছু দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, ভাবতে পারছে—পারছে না কথা বলতে উঠে বসতে বা দাঁড়াতে। শবুর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

তাকে ওঠার চেষ্টা করতে দেখে দীননাথ কান্না-ভেজা গলায় বলল—'লক্ষীটি, তুমি নিজে নিজে উঠে বসতে বা নামতে যেও না, আমি আসছি।'

দীননাথ তাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল, মুখ চোখ হাত পা ধুইয়ে দিল, ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চায়ের বদলে টনিকের সঙ্গে বিদ্যুতের আনা হরলিক্স গুলে চামচে করে খাইয়ে দিল। তারপর সন্ধ্যা কাজে আসতে তার কাছে শবুকে জিম্মা করে দিয়ে বলল—'আমি এই ফাঁকে বাজারটা ঘুরে আসি, সেই সঙ্গে ডাক্তারের খোঁজও করে আসব।'

দীননাথ চলে গেল। সন্ধ্যা পাশে এসে জিজ্ঞেস করল—'মাসী, তুমি উইঠ্যা বসতে পার না?'

শবু করুণ দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। ভাল লাগেনা এমনিভাবে সকলের করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে। সন্ধ্যা একটু দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের কাজে মন দিল।

অবশ অবসন্ন দেহ নিয়ে শবু শুয়ে আছে। কিন্তু মন তার অবশ নয়—দেখতে শুনতে পাচ্ছে। উদাস মনে সে ভাবতে চেষ্টা করছে, কি করে কি হল? প্রথম প্রথম মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, পরে এক দু'দিন মুখ হাঁ করতে অসুবিধে, আর কদিন পরে একটু একটু করে কথা আটকে আসা। এখন ত কথা যেন মুখ থেকে বের করতেই পারে না—কোথায় যেন আটকে যায়। অন্তদিক থেকে এক গভীর অবসাদবোধ ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে যেন গ্রাস

করতে লাগল। হাত অবশ হয়ে এল, চলতে ফিরতে কাজ করতে অক্ষম, অপটু হয়ে পরতে লাগল, পরে বুঝতে পেরেছে পা দুটোও আর বশে নেই। ভয়ে মনে জোর এনে হাঁটা চলা কাজকাম করে হাত পায়ের অবশভাব কাটাবার চেষ্টা করেছে। উল্টে দিন দিন আরো অবশ হয়ে পড়েছে। মৃত্যুভয়ের চাইতেও বড় ভয় হাত পা অবশ হয়ে পড়ে থাকার আতঙ্কে তার মন আচ্ছন্ন হয়েছে। দু দুজন ডাক্তার দেখেছে, ওষুধ দিয়েছে কিন্তু কোন উপকার হয়নি। আর কাল দুপুরে সে ত অবশ পায়ে চলতে গিয়ে পড়েই গেল, নিজে হাতে আর খেতেও পারছে না।

এখন সে কি করবে? একটা হাত অপর হাত দিয়ে তুলে ধরতে চাইছে —কিন্তু সেটা যেন প্রচণ্ড ভারি, স্পর্শবোধ আছে কিনা বোঝা যায় না, ছেড়ে দিলে সে হাতখানি অসাড়ভাবে ঝুপ করে বিছানায় পড়ে যাচ্ছে। একখানি পায়েরও একই অবস্থা। চেষ্টা করে এপাশ ওপাশ ফিরতে পারছে কিন্তু অবশ হাতখানি পিঠের দিকে ঝুলে থাকছে, কিছুতে তাকে সামনে আনতে পারছে না। এরপর কী হবে? ভাবতে গিয়ে তার মন গভীর শূন্যতায় ডুবে গেল, দুচোখ বুজে হতাশভাবে সে মাকে আর মৃত্যুকে স্মরণ করতে চাইছে।

'ও দিদি, কাল নাকি আপনি পড়ে গেছলেন?'

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। চোখ মেলে দেখল প্রতিবেশিনী হারানীদি এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে। কখন সে চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছে শবু জানতেও পারেনি। বাইরের লোকের সাড়া পেয়ে রান্নাঘর থেকে এগিয়ে এসে সন্ধ্যা বলল—'মাসী কথা বলতে, উঠে বসতেও পারেনা।' সে আবার নিজের কাজে চলে গেল।

একেবারে বিছানা ঘেঁষে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হারানী বলতে লাগল—'ও দিদি, আমি হারানী চিনতে পারছেন? বলুন ত আমি কে? কথা বলুন ত?'

এমনভাবে বলছে যেন শবু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে না। আদিখ্যেতায় রাগ ধরে যাচ্ছে, ভাল লাগছে না।

এরপর হারানী যা করল তা কল্পনাও করা যায় না। সে শবুর গায়ে পিঠে হাত বুলোবার ভান করে এদিক ওদিক চেয়ে নোয়া শাঁখাসুদ্ধ তার হাত তুলে ধরে নিজের কপালে ঠেকাতে লাগল, তার সিঁথি ছুঁয়ে সে হাত নিজের সিঁথিতে ছোঁয়াল।

একি অবাক কাণ্ড—শবু কি মরে গেছে!

ঠিক সেই সময় দীননাথকে বাজার থেকে ফিরতে দেখে—'থাকুন, শুয়ে থাকুন, আমি এখন যাই'—বলতে বলতে হারানী তাড়াতাড়ি পালাল।

হারানীর কাণ্ডকারখানা বাইরের জানালা দিয়ে দীননাথও বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল। শবুকে জিজ্ঞেস করল—'হরিদাসের বৌ তোমার মুখের উপর ঝুঁকে কি করছিল?'

শবু কোন জবাব দিতে পারল না, শুধু তার দুই চোখের কোল বেয়ে টস্‌টস্ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

দীননাথ আদর করে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল—'কেঁদোনা লক্ষ্মীটি, এই সব অশিক্ষিত ছিন্‌জাতের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাস করা যায় না। ওদিকে ঘুষ, বাড়ী, টিভি—ভদ্রলোক সাজার কত চেষ্টা। যাক গে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যার কাছ থেকে জলখাবার এনে তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি। ডাক্তার এখনও চেম্বারে আসেনি, এলে পাঠিয়ে দিতে বলেছি।'

এই সময় অন্য তিন প্রতিবেশিনী তন্বী, রায়গিন্নী ও বাঁকা দাসের বৌ এসে ঘরে ঢুকল। তারা কেউ হারানীর মত কাণ্ড করল না, বরং জলখাবারের যোগাড় হচ্ছে দেখে মৌখিক কিছু সহানুভূতির কথা বলে ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিদায় নিল। শবু বেদনায় শুধু শুয়ে শুয়ে কাঁদল, কোন কথা বলতে পারল না।

ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেলা দশটা প্রায় বাজে দেখে দীননাথ বলল—

'ডাক্তার এখনও এলনা, তুমি কি এখন স্নান করবে?'

শবু অসহায়ের মত তাকাতে লাগল, কারো সাহায্য ছাড়া তার এখন স্নান করার উপায় নেই, সন্ধ্যার সাহায্যে স্নান করতে তার বড় লজ্জা। দীননাথও চিন্তিত।

এমন সময় ষষ্ঠীতলা থেকে কাকীমা এসে পড়তে দীননাথ মনে বল পেল, বলল—'এই ত কাকীমা এসেছেন, কাকীমাই যা করার করে দেবেন।'

কাকীমাকে দেখে শবু কেঁদে আকুল হল—নীরব কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল কটি কথা—

'কাকীমা, আমি কথা বলতে পারি না।'

বলতে পারল শুধু ঐ কটি কথাই, কিন্তু মন তার ডুকরে কেঁদে বলতে লাগল—দেখ কাকীমা, তোমাদের আদরের শবুর আজ কি অবস্থা, সে কথা

বলতে পারেনা, হাত পা অবশ, বসতে পারেনা, চলতে পারেনা—তোমাদের আজন্ম নীরোগ সব থেকে সুস্থ সবল মেয়ে শবু কেমন অবশ অচল হয়ে পড়েছে। —মা আর কাকীমা যে শবুর চোখে অভিন্ন।

বিছানার পাশে বসে শবুকে ছোট মেয়ের মত জড়িয়ে ধরে কাকীমাও চোখের জল আটকাতে পারলেন না। কেঁদে বললেন—

'দীননাথও সেদিন গিয়ে কথা বলার কষ্টের কথা বলেছিল তা যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারিনি। কাঁদিস না মা। ভাল হয়ে যাবি।'

দীননাথ সংক্ষেপে শবুর অবস্থার কথা কাকীমার কাছে বলতে গিয়ে বার-বার কেঁদে ভাসাল।

শুনছে আর শবু অঝোরে কাঁদছে। না, হলনা, এ ত কিছুই বলা হল না, আরো কত কথা বলার আছে—

—'কত কথা · কত কথা · কত কথা ··'

দীননাথ বলল—'ঐ শুনুন কাকীমা, ক'দিন হল তোতা পাখীর মত থেকে থেকে ঐ রকম বলছে। কি কথা বলতে চায়, কি কথা বোঝাতে চায়-আমি কি করে জানব, কি করে বুঝব! আমি এখন ওকে নিয়ে কি করি।' বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

বাইরে থেকে হৃদিনাথের গলা শোনা গেল—'দীনু আছিস নাকি রে।'

ভাসুরের গলা শুনে শবু কাপড় গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কাকীমা সব ঠিকঠাক করে দিলেন। হৃদিনাথ ঘরে ঢুকে দূর থেকে রোগিণীকে দেখে পাশের ঘরে গিয়ে দীননাথের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

এবার শবুকে স্নান করান দরকার। দীননাথ তাকে ধরে ধরে বাথরুমে স্নানের বেদীর উপর বসিয়ে দিয়ে এলে কাকীমা স্নান করাতে লাগলেন।

শবুর মনে হচ্ছে—সে যেন তার ছোট বেলায় ফিরে গেছে। কাকীমা নতুন বিয়ে হয়ে বাড়ীতে এসেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাকীমা ওদের তিন বোনের আদর যত্নের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তখন এমনি করে ঘষে মেজে তিন বোনকে স্নান করিয়ে দিতেন। কাকীমার কাছে লজ্জা করে না—কাকীমা ত মারই মত।

কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন—'শবু, স্নান করে আরাম পেলি?'

'হুঁ।'

'আমার সঙ্গে একটু কথা বলত, মা।'

শবু কেঁদে বলল—'আমি কথা বলতে পারি না।'

'থাক, কষ্ট হলে বলিস না। ডাক্তার ওষুধ দিলে ভাল হয়ে যাবি। দেখি জামাটা পরিয়ে দিই', বলে কাকীমা জামা পরিয়ে শাড়ীটা জড়িয়ে দিলেন। দীননাথের সাহায্যে ঘরে এনে তার চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরিয়ে দিতে শবু বলল—'আমি।'

সধবা মানুষ সধবার কপালে সিঁদুর ছোঁয়াতে হয়—শবু দুর্বল হাতে কাকীমাকে সিঁদুর পরাল।

তাকে বিছানায় শুইয়ে গালটা আদর করে টিপে দিয়ে কাকীমা বললেন—'কোন গুণে ঘাট নেই মা।'

শবুর মুখ শিশুর মত সরল হাসিতে ভরে উঠল, বলল—'ঘুমোই?'

কাকীমা বললেন—'হ্যাঁ ঘুমোও, অনেক পরিশ্রম হয়েছে ত এতক্ষণ।'

শবু নিশ্চিন্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। কি ঘুম, কি ঘুম! এখন সে মুহূর্ত্তেই ঘুমিয়ে পড়ে। কত রাতের না ঘুমোনো ঘুম যেন তার দু চোখে ভর করেছে।

ঘুম ভাঙলে দীননাথ বলল—'এখন খাবে ত? কাকীমা আছেন, কাকীমার হাতে খাও—কেমন? ছোট বেলায় নাকি কাকীমা তোমাদের খাইয়ে দিতেন, আজ তেমনি খাইয়ে দেবেন।'

কাকীমা খাবার নিয়ে এসে মেখে একদলা একদলা করে খাইয়ে দিতে লাগলেন—শবু শুয়ে শুয়ে খাচ্ছে আর তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। কাকীমা বারবার তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলছেন—

'কাঁদেনা মা, লক্ষ্মী মেয়ে, খাবার সময় কাঁদতে নেই।'

শবুর মনে পড়ছে ছোট বেলায় পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত সে শুধু দুধ খেয়ে থাকত। কাকীমা এসে তাকে ভাত খাওয়া ধরাল। কত রকম গল্প করে ভুলিয়ে তবে শবুকে ভাত-খাওয়া ধরিয়েছিল। ভাতের দলা মেখে মেখে বলত—এটা হাঁসের ডিম, এটা বকের ডিম, এটা ঘোড়ার ডিম।

শবুরা শুনে হাসত—ঘোড়ার আবার ডিম হয় না কি?

কাকীমা বলত—হয়, জান না বুঝি? কালে কালে কতই হল, পুলি পিঠের লেজ গজাল। তেমনি ঘোড়ারও ডিম হয়।

আবার ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ত—লেজঅলা পুলি পিঠে—ওরা কখনো দেখেনি।

কাকীমার মুখেই একটা ছড়া শুনেছিল। বনের ঘাসের মধ্যে বসেছিল এক ব্যাঙ। সেই বনেরই এক হাতি চলার পথে তাকে বুঝি ডিঙিয়েছে।

তখন ব্যাঙ বলে—'কুলো কানি মুলো দাঁতি, কে ডিঙোলি মোরে ?'
হাতি বলে—'চুপ করে থাক খেবড়া নাকী, মধ্যে রেখেছি তোরে।'

গল্পের ব্যাঙ হাতিরাও ছড়ায় কথা বলত, শুনে শবুরা খুব আমোদ পেত।

শবুর মুখে ভাতের দলা ঠুসতে ঠুসতে কাকীমা বলত—অত অল্প করে দলা মুখে নাও কেন, বড় করে হাঁ করতে পার না, অত বড় বড় দুটো গালের মধ্যে কি জায়গা নেই ? · মাত্র পাঁচ বছর বয়সের কথাও শবুর সব মনে আছে।

ভাবতে ভাবতে সে বড় করে মুখ হাঁ করল। কাকীমা বললেন—'অত বড় হাঁ করছিস কেন, এই নে এ টুকু মাছ মুখে নিলেই খাওয়া শেষ।'

কাকীমা কুলকুচি করিয়ে মুখ ধুইয়ে দিচ্ছেন আর শবুর মনে পড়ছে—তখন ছিল শুধু খেলা আর খেলা. খাওয়ার আগে খেলা, খাওয়ার পরে খেলা—স্কুলে যাওয়া, সেও যেন ছিল এক খেলা। কত রকমের খেলা—এক্কা দোক্কা, কুমীর কুমীর, কানামাছি, রুমাল-চোর, বালি দিয়ে ঘর বানানো, ঘর সাজানো, রান্না রান্না খেলা। একটু বড় হয়ে স্কিপিং, চোর চোর, খেলনার সংসার পাতা, বর বউ সাজা সারাদিন হত বাড়ীর উঠোনে না হয় বাড়ীর পাশের বালির ঢিবিতে কেবল খেলা। কি সব আনন্দের দিনই ছিল—এখন সত্যি-কারের বর বউ সাজতে গিয়েই যত দুঃখ যত বিড়ম্বনা। ভাবতে ভাবতে আবার চোখে জল নেমে আসে।

কাকীমা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'কাঁদিস না মা, আবার ভাল হয়ে নিজের হাতে খাবি।'

…শিশু যেন বায়না ধরেছে, বলছে—আমি নিজে নিজে খাব।

…কাকীমা বলছে—আর ক'দিন পরে বড় হয়ে তুমি নিজের হাতে খাবে।

…শবু যেন তার ফেলে আসা শৈশবে ফিরে গেছে—

কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন—'পান খাবি, শবু ?'

'না।' বলে আবার মনে পড়ল—সধবা মানুষ সাধলে না করতে নেই, বলল—'দাও।'

একটু পান চিবিয়েই ছিবড়ে বের করে দিল—পান খেতে আর ভাল লাগেনা।

কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন—'দীননাথ, তোমার ডাক্তারবাবু কখন আসবেন আমি ঘরের ঠাকুরের পুজো সেরে আসিনি, পুজো না সেরে খাওয়া যাবে না।'

দীননাথ বলল—'কি জানি, দুপুর গড়িয়ে গেল এখনও কেন আসছে না। আপনি তবে বাড়ী যান, অবস্থা ত সব দেখলেন, দেখি ডাক্তার এসে কি বলে।'

কাকীমা বললেন—'তোমাকে খাইয়ে দিয়ে তবে যাচ্ছি। শবু, তুই এখন ঘুমো, আমি একটু পরে চলে যাব, কাল সকালে পুটু বা বেলাকে পাঠাব ডাক্তার এসে কি বলে শুনে যাবে।'

কাকীমা চলে যাচ্ছে শুনে শবু কতক্ষণ কাঁদল, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। কোন কিছু বেশীক্ষণ সে আর ভাবতে পারে না।

ঘুম ভেঙে শবু দেখল বীণাবৌদি এসে পাশের চেয়ারে মুখখানা করুণ করে বসে আছে। তার ঘুম ভেঙেছে দেখে বীণা বলল —

'এই ত ঘুম ভেঙেছে। শ্রাবণী, ও শ্রাবণী, দেখ আমি এসেছি।'

মুখে এক ঝিলিক খুশির হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়ে শবুর চোখে নামল জল। কেঁদে অনেক চেষ্টায় বলল—

'দিদি, আপনাকে মিষ্টি খাওয়ানো হল না।'

বীণা আদর করে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলল—'বাট, বাট, সে কি কথা শ্রাবণী, তুমি ভাল হয়ে উঠে কত মিষ্টি খাওয়াবে, খাবে। কেঁদোনা'—বলে শবুর চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল। পরে জিজ্ঞেস করল—'শ্রাবণী, তোমার কী খারাপ লাগে, কোথায় অস্বস্তি বলত?'

একটু চুপ করে থেকে শবু গুণে গুণে কটি কথা বলল—'ভয় করে শাশুড়ী আমাকে বকবে।'

বীণা সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল—'কেউ তোমাকে বকবে না। চল, তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে।'

না, তার আর কোথাও যাওয়া হবে না, আর মঙ্গলা দেবীও কদিন পরেই আসছেন।

দীননাথ হরলিকস্ করে আনলে বীণা শবুকে চামচে করে খাইয়ে দিতে লাগল। সেই ফাঁকে দীননাথ এক চক্কর বাইরে ঘুরে এসে বলল—

'ডাক্তারকে কল দিয়েছি কাল বিকেলে, চব্বিশ ঘণ্টাতেও তার পাত্তা নেই। নিকুঞ্জবাবুর কথামত লাইনের ওপারের বড় ডাক্তার—চৌধুরীকে ডেকে আনতে লোক পাঠাতে বলে এলাম।

'জানো, এইমাত্র মোড়ের মাথায় অনাথবাবু, যে তার দুই মেয়ের বিয়ের জন্য বিশ পঁচিশ হাজার টাকার কথা বলেছিল, তার সঙ্গে দেখা হল। সেই দুই মেয়েরই বিয়ে ঠিক হয়েছে, আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। অত টাকা আমার ছিল না. যা ছিল দিলেও আজ অ

আমার অনেক টাকার দরকার।'

হ্যাঁ, শবু বলেছিল—নিজেদের বিপদ আপদের কথা ভাবতে হয়। দীননাথের কথা ভেবেই সে কথা বলেছিল, নিজের অসুখের কথা সে ভাবেনি।

বীণা বলল—'আমি এখন যাই শ্রাবণী। তোমার ভাসুর রিটায়ার করলে-ও কিছু রোজগারের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে, না হলে সংসার চলে না। বাড়ী খালি রেখে এসেছি।'

শবুর চোখে জল দেখা দিতে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একখানি হাত ধরে বীণা আবার বলল—

'কেঁদোনা বোনটি, তুমি আবার ভাল হয়ে উঠবে। আমি তোমার বড়, ঠাকুরপোর বিয়েতে আমিই গিয়ে তোমাকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলাম। তোমার এমন অসুখের কথা কোনদিন ভাবিনি। আমি চোখে ভাল দেখিনা, দাঁতগুলো এক এক করে যাচ্ছে, পেটে ব্যথা—তবু আমি চলছি ফিরছি। একমাত্র ছেলে পার্থ অমন একটা বিয়ে করে মনে দাগা দিয়ে পর হয়ে গেল। আমরা দুজন বুড়ো বুড়ী আছি—আমাদেরও দেখার লোক নেই। আসি শ্রাবণী, তুমি ভাল হয়ে ওঠো।'

বীণা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল—শবু জলভরা চোখে নীরবে চেয়ে রইল।

একটু পরে সন্ধ্যের মুখে শেফালী এল। জিজ্ঞেস করল—'সেজদা, শুনলাম বৌদির নাকি খুব অসুখ? কি করে এমন অসুখ হল? বৌদির প্রেসার কি খুব হাই?'

কাল দুপুরের ঘটনার পর থেকে দীননাথ কথায় কথায় শুধু কাঁদছে, একটু আগেও কেঁদে বড়বৌদিকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছে। শেফালীর প্রশ্ন শুনে শবু দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। এখন তার সেই কান্নার লেশমাত্র নেই। বরং সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে লাগল—

'শ্রাবণী বা আমার ওসব প্রেসারের ব্যারাম নেই—না 'লো' না 'হাই'। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, আমাদের কোন অসুখই হবার কথা নয়।

'ভবর জন্য ঐ জমি কিনিয়ে যে ভুল করেছি, পরে যখন সত্যিই বুঝলাম ঐ জমিটাই হতে চলেছে যত অশান্তির কেন্দ্রস্থল তখনও জমিতে ভিৎ গাঁথা হয়নি। আমি তোর মারফৎ আমার প্রস্তাব জানালাম ভবকে বল ঐ জমি আমাকে দিয়ে দিতে, আমি ওখানে বাবার নামে একটা প্রাইমারী স্কুল বসাব। তাতে হয়ত জমির বাজার দর হিসেবে খুব-লাভ হত না, কিন্তু আজকের মত একজন মানুষের জীবন সংশয়ও হত না।

'উত্তরে তুই জানালি—ও জমি কেন স্কুলের জন্য ছেড়ে দেবে? স্কুল করতে হয় তোর বাড়ীতে কর, নিজেদের জন্য উপরে ঘর তুলে নে।

'বাবার নামে স্কুল করা দূরে থাক—এখন সামনে আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে সেইটাই বড় কথা।'

দীননাথ থামল। শেফালী এতক্ষণ চুপ করে কথাগুলো শুনল, এবার দায় এড়াতে বলল—

'ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে ভাবিনি।'

কথাটা শবুও জানত—তার মারফৎই শেফালী জবাবটা দিয়েছিল দাদাকে জানাবার জন্য। এই মুহূর্তে শবুর চোখেও জল নেই। যে দাদা বুদ্ধি দিয়ে অর্থ দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে ও পড়াশুনা করিয়ে তিন বোন-ভাই শেফালী, ভব, সোনাকে মানুষ করল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল তার কি প্রতি-দানই এরা দিল; একটা সামান্য অনুরোধ, তাও প্রত্যাখ্যান করল! বৌদির প্রতি শেফালী কি কৃতজ্ঞতা দেখাল—যে ননদের বিয়েতে শবু তার গলার সোনার হার খুলে দিয়েছিল, দুহাজার টাকার খরচে ও দেনায় তারা কতদিন ডুবে ছিল—সেই ননদ এখন আবার মাতৃভক্ত হয়ে ভবর বাড়ীতে তাঁকে এনে অধিষ্ঠান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মামাতো বোন শীলা যেমন দশ হাজার টাকার বিনিময়ে মাত্র দেড় কাঠা জমি লিখে দিয়ে তার ভাইকে ঠকিয়েছে শবুর ধারণায় সেইটাই ছিল ভাই বোন সম্পর্কের সব থেকে খারাপ উদাহরণ। কিন্তু উপকারী দাদা বৌদির জীবনের শান্তি নষ্ট করতে ওরা যে ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, এখন মনে হচ্ছে এদের ব্যবহারটাই জঘন্যতম। অর্থের প্রতারনা ভোলা যায়, অন্তরের আঘাত শুকোয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হয়ত বিবেকের দংশনে কেঁদে শেফালী শবুর পাশে বসে তার একখানা হাত ধরে বলল—

'বৌদি, তোমার অসুখের কথা যে শুনবে সেই আশ্চর্য্য হবে। শুভঙ্করী ও আমার স্কুলের অন্য টীচাররা যখন শুনবে তোমার অসুখ করেছে—কেউ বিশ্বাসই করবে না। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বল, আমরা সবাই মিলে ভাল চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলবই।'

এখন শবু যা শোনে তাই ভাবে—তার নিজস্ব আলাদা কোন ভাবনা চিন্তা নেই। হ্যাঁ, শেফালীর স্কুলের টীচারদের, হেড্‌মিস্ট্রেস্ নমিতাদি ও আরো অনেককে সে চেনে, শুভঙ্করী আর তার মা এসে ত বছর দু-আড়াই শবুদের সঙ্গেই ছিল। তখন শেফালী শুভঙ্করী ও শবু তিন 'শ' তে মিলে সারাদিন হাসি

গল্প গান কথা নিয়ে কি আনন্দেই দিনগুলি কেটে যেত। এখন ওরা সবাই যে যার কাজ ও সংসার নিয়ে সুখে আছে মাঝখান থেকে শবু অকালে অচল হয়ে পিছিয়ে পড়ল, হয়ত একদিন সে একেবারেই থেমে যাবে।···

ভাবতে ভাবতে আবার শবুর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। না, কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছেনা—'কত কথা' বলে কৃতার্থও করতে পারছেনা শেফালীকে—চোখ দুটো বুজে থাকতে ইচ্ছে করছে।

শেফালী তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল—'কেঁদো না বৌদি, আমরা ত আছি। সেজদা, ডাক্তার কি বলছে?'

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলল—'চব্বিশ ঘন্টা হল ডাক্তারের দেখা নেই. লাইনের ওপারের চৌধুরীকে কল দিয়েছি, এখন তার জন্য অপেক্ষা করছি।'

শেফালী বলল—'আমি ডাক্তার কি বলে শুনে তবে যাব।'

দীননাথ বুঝি মালতীর ভাই বিষ্ণুকে খবর পাঠিয়েছিল, সেও এসে শুনে বলল—'হ্যাঁ, চৌধুরী এদিককার মধ্যে বড় ডাক্তার, আমার মাকেও দেখেছিল।'

বিষ্ণু ও শেফালী, রাত নটা পর্য্যন্ত বসে রইল ডাক্তারের আশায়। দীননাথের বন্ধুরা বা তাদের পাঠানো লোকেরা এসে এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে—

'ডাক্তার চৌধুরী কলকাতায় গেছে এক মেডিকেল কন্ফারেন্সে, এখনও ফেরেনি, আমাদের লোক সেখানে বসে আছে, ডাক্তারবাবু ফিরলেই যেমন করে হোক ধরে নিয়ে আসবে।

আর অপেক্ষা করতে না পেরে শেফালী আর বিষ্ণু এক সময় চলে গেল।

সেই ডাক্তার এল রাত দশটায়। দীননাথ শবুকে খাইয়ে দিয়ে সবে তার মুখ ধোয়াচ্ছে, শোবার ঘর এঁটো বাসনে ভর্ত্তি—এমন সময় বাইরে দীননাথের মোটকা বন্ধু বৈকুণ্ঠবাবু ডাক দিল—

'লাহিড়ীবাবু, ডাক্তার চৌধুরী এসেছেন, নিকুঞ্জ শুয়ে পড়েছে তাই আমিই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।'

বিপদকালে মানুষ চেনা যায়। অথচ এই মোটকার প্রতি শবু অপ্রসন্ন ছিল। তখন আবার লোড শেডিং চলছে।

ডাক্তারবাবু আধঘণ্টা ধরে শবুকে পরীক্ষা করল—পায়ের নীচে দাগ কেটে হাতুড়ি দিয়ে হাড় ঠুকে, অবশ হাত পা উঠিয়ে নামিয়ে, স্পর্শ শক্তি পরীক্ষা করে, টর্চের আলো ফেলে মুখের ভিতরটা, আবার চোখের পাতা উঠিয়ে

উঠিয়ে চোখের তারায় সরু টর্চের আলো ফেলে, প্রেসার মেপে—কতরকম ভাবে পরীক্ষা করল। কথা বলতে বললে 'না, না' ছাড়া সে কিছু বলতে পারল না।

বাইরের ঘরে বসে কথা বলে ডাক্তারবাবু ও মোটকাকে বিদায় দিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দীননাথ যখন পাশে এসে শুল তার অনেক আগেই শবু ঘুমিয়ে পড়েছিল। দীননাথ তার মাথায় হাত রাখতে তন্দ্রা ভেঙে গেল। দীননাথ যেন আরো ভেঙে পড়েছে, দু হাতে বারবার তাকে জড়িয়ে ধরে অব্যক্ত বেদনায় কাঁদছে। ডাক্তার কি বলে গেছে সে জানে না, স্বামীকে কাঁদতে দেখে সেও কাঁদছে। তার শরীর যেন আরো অবসন্ন।···

আবার ওরা সাজিয়েছে কান্নার বাসর। সারা বাড়ীতে ওরা মাত্র দুজন।

দুই

অবশ অবসন্ন শবুর আরো একটা রাত কেটে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে থেকে আর সব কাজই হচ্ছে, কিন্তু আজ দুদিন হল সেই বড় কাজের কথা ভাবাই যাচ্ছে না। কি করে এক ধাপ উঁচু সেষরে উঠবে, কেমন করে বসবে ভেবে পাচ্ছে না।

হরলিক্স খাইয়ে তাকে সন্ধ্যার জিম্মা করে দিয়ে দীননাথ বাজারে গেল। সন্ধ্যা কিছুক্ষণ তার সামনে চেয়ারে চুপচাপ বসে থেকে বলল—

'মাসী. তুমি শুইয়া থাক, আমি ততক্ষণ উনানে আঁচ দিই গিয়া।'

শবু শুয়ে শুয়ে অলস চোখ মেলে ঘরের চারদিক দেখছে। ঘরের মধ্যে টিভিটা বসান আছে কিন্তু গত দুদিন হল সেটা আর খোলাই হয়নি। পাড়ার টিভি দেখিয়েরা তার অসুখ শুনে অন্য বাড়ীতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

বাইরে ডাক্তার চক্রবর্তীর গলা শোনা গেল—'লাহিড়দা, পেসেন্ট কোথায়? কন্‌ফারেন্‌স ছিল, তাই কাল আসতে পারিনি।'

সন্ধ্যা দরজা খুলে ডাক্তারকে এগিয়ে নিয়ে আসতে আসতে বলল—

'মেসো বাজারে গেছে, মাসী এই ঘরে আছে।'

ডাক্তার এসে বিছানার পাশের চেয়ারটাতে বসে হেসে জিজ্ঞেস করল—'বৌদি, কেমন আছেন? কথা বলুন ত, হাঁ করুন, হাতটা তুলুন দেখি, পা-টা নাড়াতে পারেন? সকালে কি খেয়েছেন?'

শবু কথামত হাঁ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। ডাক্তারের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

নিয়মমত কয়েকটা পরীক্ষা করে বলল—

'আপনি ভাল হয়ে যাবেন, বৌদি। আমি ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধ লিখে দিচ্ছি। লাহিড়ীদা এলে পাঠিয়ে দেবেন। নড়া চড়া করবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

ডাক্তার চলে গেল—আজ আর সে বলতে পারল না—আপনি দুদিনের মধ্যে কথা বলতে পারবেন। বরং তার মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দেখা গেল।

শবু শুয়ে শুয়ে অলসভাবে ভাবছে, তার নিশ্চয়ই খুব খারাপ অসুখ করেছে। পরপর তিনজন ডাক্তার তাকে দেখল আর সবারই মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

রোগ ব্যারাম সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুবই কম—বই পুঁথি পড়ে যা কিছু জানে। বলতে গেলে সে জন্ম-নীরোগ, একবার মামুলি জল বসন্ত হওয়া, পাটনায় কদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর আর মন্দির শহরে একবার টাইফয়েড—বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে এইটুকুই তার পরিচয় অসুখের সঙ্গে।

দীননাথের নাকি টি বি হয়েছিল, মাত্র তিনমাস যাদবপুর হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছিল। তারপর থেকে এত বছর, মাঝখানে সে বার দুই টাইফয়েডে ভুগলেও, শবু সেবায় যত্নে তাকে সুস্থই রেখেছে। মেজো ভাসুর মাত্র দুদিনের অসুখে মারা গেল, শ্বশুর কালিনাথ পরিণত বয়সে চলে গেলেন—সে সব অভিজ্ঞতাও তার জীবনে ঘটেছে।

মা পদ্মিনীদেবীর অসুখের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটেছিল, দু দুবার অক্লান্ত সেবা-যত্নে সে মাকে সুস্থ করে তুলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য মাকে ধরে রাখতে পারেনি—সে সময় শবু ছিল মার থেকে বহুদূরে, আর সেই অবস্থাতেই তার মা চলে গেছে।

হ্যাঁ, আর একবার শবু ভুগেছিল শিলংয়ে থাকতে। সে ছিল নেহাৎই পথের দুর্ঘটনা—এবং সে দুর্ঘটনায় আর একটি জীবনের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। এবারের ব্যাপারটাও ত এক দুর্ঘটনা। এবার আর অঙ্কুর নয়—শবুর নিজেরই জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে।

কী অসুখ হয়েছে তার? আজকাল 'স্ট্রোকের' কথা খুব শোনা যায়—যার ফলে লোকে নাকি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় যেমন ঘটেছে ভবানীবাবু বা শান্তির স্বামীর বেলায়—আবার অনেকে নাকি হাত পা অবশ হয়ে ভুগতে থাকে। সে সবের মূলে শোনা যায় বুকে অসহ্য ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়। শবুর ত তেমন কিছু

বোধ হচ্ছে না। শুধু মাথার ভিতরে থেকে থেকে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়— কখনো আসে বোধশূন্য ভাব। তার সঙ্গে আছে হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া— কথা বলতে না পারা। এ কী অসুখ, কি করে এ রোগ ধরল, সে মার কাছে যেতে চেয়েছিল এর সঙ্গে তার কি…?

দীননাথ বাজার থেকে ফিরতে সন্ধ্যা বলল—

'মেসো, ডাক্তার আইছিল, তোমারে যাইতে কইয়া গেছে।'

'কোন ডাক্তার?'

'এই ত পাড়ায় থাকে, বাজারেত বসে' নাম না জানলেও পাড়ার ডাক্তার হিসেবে সন্ধ্যাও চেনে।

দীননাথ শবুকে জিজ্ঞেস করল—'ডাক্তার চক্রবর্তী এসেছিল? কি বলে গেল?' শবু শুধু তাকিয়ে রইল। শেষে দীননাথ আবার বলল—'চক্রবর্তী কেন ছত্রিশঘণ্টা পরে এল। ডাক্তার চৌধুরী কাল এসে দেখে গেছে, আজ আর চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে কি হবে?'

দীননাথ জলখাবার সাজিয়ে আনতে শবু একটু নড়েচড়ে খাবার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় বাড়ীতে একসঙ্গে অনেক লোক ঢুকল—তপু পুতুল, বেলা আর অমল।

খুশীতে আর কান্নায় শবু উদ্বেল হয়ে উঠল। তপু তাকে জড়িয়ে ধরে বলল —'মেজদি, তুই কেমন আছিস রে? তোর কি হয়েছে?' বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। শবুর চোখেও নেমেছে জলের ধারা—তার মুখে নেই ভাষা।

দীননাথ তার অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে আর কাঁদছে।

তপু আবার বলল—'কথা বলতে পারছিস না মেজদি? কথা বল, আমার সঙ্গে কথা বল। পুতুল এসেছে, ওর সঙ্গে গল্প কর।'

বেলাও কাঁদছে, পুতুল মুখটা করুণ করে মাসীর দিকে তাকিয়ে আছে, অমল হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শবুকে দেখছে।

আবার তপু বেলা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—'কথা বল মেজদি, আমাদের সঙ্গে তুই কথা বল।'

কথার পাহাড়ে শবুর বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু বেদনায় আবেগে তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না।

তপু কেঁদে বলতে লাগল—'এই ত সরস্বতী পুজোর মধ্যে এসে এখানে দুদিন থেকে গেলাম। ট্রেন এক্সিডেন্টের খবর নিতে আমাদের ওখানে ঘুরে

এলি। মাঝখানে শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে হরিদ্বার ঘুরে কিছুদিন আগে ফিরেছি তারপরে আর আসা হয়নি। এরই মধ্যে তোর এ কী হল মেজদি ?'

বেলাও কেঁদে বলল—'তারও পরে দোলের সন্ধ্যেয় মেজদি, তুই আমাদের বাড়ী গেলি, সত্যনারায়ণের পুজো দেখলি, পাঁচালি শুনলি, প্রসাদ খেয়ে গাড়ীতে চড়ে বাড়ী ফিরলি। এরই মধ্যে কি হয়ে গেল !...'

হ্যাঁ, শবুর সব মনে আছে। সরস্বতী পুজো, অঞ্জলি দেওয়া, ট্রেন এক্সিডেন্ট, দোল, সত্যনারায়ণের পুজো, পাঁচালি—সব কথা—সব—সব—

'কত কথা·· কত কথা···কত কথা ··।' তোতা পাখীর বুলি আউড়ে এবার শবু দুষ্টুমিভরা হাসি হাসছে—ভাবটা এইরকম—দেখ আমি কথা বলেছি।

তপু বেলা একসঙ্গে শবুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল—'এই ত কী সুন্দর কথা বলেছিস। কত স্পষ্ট শোনা গেল। বল, কি বলছিস বল। আরো কথা বল মেজদি। কেমন লাগছে বল ?'

না, শবু আর বলতে পারছে না, তার কথা বলা আরো কমে আসছে, শরীর আরো অবসন্ন। শুধু দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

পুতুল বলে উঠল—'মাত্তি কতা বললো'।

দীননাথ বলল—'মাঝে মাঝে ঐ তোতাপাখীর বুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলতে পারে না, আজ সকাল থেকে এই প্রথম কথা বলল। কেন কথা বলতে পারছে না, কেন এমন অবশ অবসন্ন হয়ে পড়ল একটু একটু করে, কিছুই বুঝতে পারছি না'—বলে সে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল।

শবু করুণ দৃষ্টিতে দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, স্বামীকে কাঁদতে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

তপু আবার বলল—'একটু কথা বলনারে মেজদি।'

শবু এবারে অনেক কষ্টে বলল—'পারি না যে।'

ঐ টুকু কথাতেই সবাই যেন কৃতার্থ হল।

অমল বলল—'আমরা ত কিছু জানতেই পারিনি। কাল রাতে গিয়ে বেলা যখন খবর দিল মেজদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুধু তখনই জানলুম। রাত হয়ে গেছিল তাই কাল আসতে পারিনি, আজ সকালে উঠেই চলে এলুম।'

এবার শবুর মাথায় বুঝি চিন্তা ঢুকেছে, সে রান্না ঘরের দিকে তাকাতে লাগল। তাই দেখে দীননাথ বলল—'সকলের রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে, তুমি চিন্তা কোরো না। সব জ্ঞানই আছে কিন্তু কিছুই বলতে বা করতে পারছে না। এ যে কতখানি কষ্টের···'কান্নায় তার গলা বুজে এল।

তপু বলল—'মেজদি, তোর ত জলখাবার খাওয়া হয়নি। নে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

সবার ছোট বোন তপু আজ তার মেজদিকে ছোট বোনের মত আদর করে খাইয়ে দিচ্ছে। শবু বুঝি এখন পুতুলের মত ছোট্ট শিশু।

পুতুল আবার বলল—'মাতি কাচ্চে।'

শবুর জল খাওয়া পর্ব চলছে, হন্তদন্ত হয়ে বেচারামের ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকল পুটু, বলল—

'কিরে মেজদি, তুই নাকি কথা বলতে পারছিস না? কথা বলত আমার সঙ্গে। বলত আমার হাতে কি?'

পুটুর কথাগুলো ধমকের মত শোনায়, ওর কথা বলার ধরনই ঐরকম।

শবু একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—'ও-ষু-ধ।'

'এই ত ঠিক বলেছিস'—পুটু যেন নিশ্চিন্ত হল।

না, না, শবু ওর ব্যাগের ওষুধের কথা বলেনি। সে বলতে চায়—পুরোনো শোবার ঘরে পুটু যে ওষুধের প্যাকেটগুলো রেখে গেছে তার থেকে এক বোতল কাশির ওষুধ সে আর দীননাথ মিলে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। ঐ ত তার খালি শিশি উঁচু তাকের উপরে রাখা আছে। কিন্তু শবু সে কথা বলতে পারলনা—আর ওরা কেউ বুঝতেও পারলনা।

তপু বলল—'নারে পুটু, মেজদি সত্যি কথা বলতে পারছে না। আমরা কতক্ষণ হল এসেছি, দুটো একটার বেশী কথা মেজদির মুখ থেকে শুনতে পাইনি।'

শুনে পুটুর মুখটা করুণ হয়ে গেল। এবার পুটুর জন্য শবুর কষ্ট লাগছে, ওকে আরো কয়েকটা কথা বলে কৃতার্থ করা দরকার।

'কত কথা ··কত কথা···কত কথা' বলে শবু মুখ টিপে হাসল।

বেলা বলল—'দেখ তপুদি, মেজদি হাসলে কেমন আহ্লাদি মেয়ের মত ঠোঁট দুটো একপাশে বেঁকে যাচ্ছে।'

এবার এসে ঘরে ঢুকল শেফালীর বর কাঞ্চন, ভব আর বিষ্ণু। কাঞ্চন আব্দারের ভঙ্গিতে বলতে লাগল—

'না সেজবৌদি, আপনাকে আমরা শুয়ে থাকতে দেব না। আপনাকে আবার ভাল হয়ে উঠতে হবে। পাটনায় সেই যে কি সুন্দর বড় বড় পাবতা মাছের ঝোল রেঁধে খাইয়েছিলেন সেই রকম রেঁধে খাওয়াতে হবে। ভাবছি

সামনের গরমের ছুটিতে শেফালী ও স্বর্ণাকে নিয়ে দিনসাতেকের জন্য এখানে এসে ঘাঁটি গাড়ব, আপনার হাতের রান্না খেতে হবে।'

শবুর মুখে ক্লিষ্ট হাসি দেখা দিল। পাবতা মাছ কি মশলা দিয়ে রান্না করতে হয় তা-ই মনে করতে পারছে না। কত মনে করতে চেষ্টা করছে কিন্তু মনে আসছে না। সকলের মুখের দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। কাঞ্চনের উৎসাহ দমে গেল।

পিছনে ভব দাঁড়িয়ে জুল জুল করে তাকাচ্ছে। কোন কথা বলছে না। তার মুখটা বেশ করুণ দেখাচ্ছে। বেচারা বড় যাঁতাকলে পড়ে গেছে। এক-দিকে তার বৌ মালতী চায় না শাশুড়ী এসে নতুন বাড়ীতে থাকে, আর এক-দিকে 'ভাল ছেলের' মুখোসপরা ভব পারছে না মা মঙ্গলাদেবীকে দূরে ঠেলে রাখতে। অত করুণ মুখ করে তাকালেও শবু ওকে করুণার চোখে দেখতে পারছে না, মনে হচ্ছে তার দৃষ্টিতে যেন একটা শয়তানী ভাব লুকিয়ে আছে। শবু দুচোখ বন্ধ করল।

তপু বলল—'নে মেজদি, আর একটুখানি আছে, খেয়ে নে, হাঁ কর।'

শবু মুখ ঘুরিয়ে নিল—ভব আর তার বাড়ীটার কথা মনে পড়ে খেতে ভাল লাগছে না।

দীননাথ বুঝল, বলল—'ওর আর খেতে ভাল লাগছে না, জল খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দে।' মুখ ধোয়া হলে দীননাথ বলল—'তোমার জল খাবার খাওয়া শেষ হল, এখন একটু ঘুমোবে ত? ঘুমোও। আমরা ততক্ষণ পুরোনো শোবার ঘরে বসে কথা বলি।'

একসঙ্গে এত লোকের আনাগোনায় শবুর অস্বস্তি লাগছে, তার চাইতে ঘুমিয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত।···

ঘুম ভেঙে শবু, কাঞ্চন ভব বিষ্ণুকে দেখতে পাচ্ছে না। বিছানার এক-পাশে টিভির উপর থেকে মাটির হাতিটা নামিয়ে নিয়ে পুতুল খেলা করছে। ঘুম ভেঙেছে দেখে দীননাথ বিছানার পাশে বসে শবুর মাথায় হাত বুলিয়ে তার অবশ হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে কান্না ভেজা গলায় বলল—

'শুনছো, কাল ডাক্তার বলে গেছে, আমরাও ভাবছি—চল, আমরা হাসপাতালে যাই।'

এই কথাই তবে দীননাথ কাল রাত থেকে ভাবছে। এত বছর ঘর করছে ত, শবু তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে সে কিছু ভাবছে। হাসপাতালে গিয়ে

কি হবে, সে যে আর কোনদিনই ভাল হয়ে উঠবে না, হাসপাতাল থেকে যদি আর না ফেরে? এই বাড়ী-ঘর ছেড়ে সে কোথাও যাবে না! ওদিকে তপু বেলা পুটু অমল আগ্রহভরা দৃষ্টিতে শবুর দিকে চেয়ে আছে।

প্রবল কান্নায় শবু বলে উঠল—'না ··না···না।' তার দুচোখে নেমে এল জলের ধারা।

দীননাথ তাকে আদর করে কেঁদে আবার বলল—

'হাসপাতালে গেলে তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবে। মনে আছে না, আমি হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে এসেছি। তুমিও ভাল হয়ে আসবে।'

তপু বলল—'শোন মেজদি, আমিও ত হাসপাতালে, নার্সিং হোমে ছিলাম, তুই রোজ আমাকে দেখতে যেতিস। মাকেও দুবার হাসপাতাল থেকে ভাল করে আনা হয়েছিল। তুইও ভাল হয়ে আসবি। আমরা গিয়ে গিয়ে তোকে দেখে আসব।'

পুটু বলল—'হাসপাতালে কোন ভয় নেই মেজদি, সেখানে ভাল চিকিৎসা হয়।'

দীননাথ আবার কেঁদে বলতে লাগল—'এখানে দেখ আমি একা মানুষ, তোমার বাথরুম পায়খানায় যেতে কষ্ট হয়, সেখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে, সব সময় ডাক্তার নার্স দেখাশোনা করবে। বিষ্ণুর মা যে হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে এসেছে সেই মিশন হাসপাতালেই আমরা যাব। আমি রোজ তোমাকে দেখে আসব, থাকতে দিলে তোমার কাছে থাকব। তোমাকে আমি ভাল করে নিয়ে আসবই, তুমি আবার এ বাড়ীতে ফিরে আসবে, সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াবে। লক্ষীটি, যাব্ব ত?'

সবাই মিলে এত করে বলছে, সে বাধা দেবে কি করে। কেন যে মিথ্যে চেষ্টা করা! একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীননাথের হাত দুটো শক্ত করে ধরে শবু চোখ বুজল। পরে ধীরে ধীরে বলল—

'আ-চ্ছা—।'

'তাহলে চল আমরা কালই হাসপাতালে যাই, কেমন?'

শবু চোখ মেলে দূরে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল।

দীননাথ আবার বলল—'কাল মঙ্গলা বা বৃহস্পতিবার নয়। কাল ৪ঠা বৈশাখ, সোমবার।'

হ্যাঁ, কোথাও যেতে হলে মঙ্গলা আর বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে যেতে হয়।

হাসপাতালে যাওয়া স্থির হয়ে থেকে শবুর মন ভীষণ উদাস লাগছে। কখন স্নান করল, কখন খেল, কখন ঘুমোল, কখন সন্ধ্যে হল কিছুতে আর মন লাগছে না। বাড়ীতে এত লোকজন সে দিকেও দৃষ্টি নেই। কেবলই মনে হচ্ছে এই সাধের বাড়ী ছেড়ে তাকে যেতে হবে, আর সে এখানে ফিরে আসবে না। কলতলায় যেতে আসতে নজরে পড়ছে এক দিকে কুমাদের বাড়ী অন্যদিকে তন্বীদের বাড়ী—কুমার মা, তন্বীর শাশুড়ী চলে গেছে। আর একদিকে দেখছে আমগাছে থোকা থোকা আম ধরে ঝুলে রয়েছে, গত বছরের মত এবারও কাঁঠাল গাছের গোড়ায় একটা উচ্ছে গাছ কয়েকটা শুকনো ডালপালা বেয়ে লতিয়ে উঠেছে, দু চারটে উচ্ছেও তাতে ধরেছে, সারা নিমগাছে কচি পাতায় সবুজের সমারোহ—ওদিকে তুলসী গাছটা মরে কাঠি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই সঙ্গে জীবনের ছবি আর মৃত্যুর ছায়া। শবুর জীবনও যেন এখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে।

বড় হতভাগিনী শবু! সংসার করতে এসে পেল না কিছুই—না সন্তান, না সুখ, না শান্তি। ভেবেছিল কিছু না পেলেও স্বামীর ভালবাসায় নিজেদের বাড়ীতে শান্তিতে থাকতে পারবে। তাও হতে দিল না। মঙ্গলা দেবী বিভীষিকার রূপ নিয়ে তার জীবনকে মাঝপথে থামিয়ে দিতে উদ্যত।

আজো রাতে শবু আর দীননাথ কান্নার বাসর সাজিয়েছে। শবুর মনে হচ্ছে—এই হয়ত তাদের জীবনের শেষ বাসর। আজ আর বাড়ীতে ওরা দুজনে একা নয়, তপু অমল পুতুল বেলা ওঘর সেঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়েছে। উঠোনের আলোটা জ্বলছে—নতুন লোক বাড়ীতে থাকলে ওটা সারারাত জ্বলে।

দীননাথ মশারীর নীচে এসে শবুর অবশ হাতখানা তুলে নিয়ে তাতে বারবার গভীর মমতায় চুমু খাচ্ছে, তার দুচোখে জলের ধারা। শবু দুর্বল হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেলে সে আরো কেঁদে আকুল হচ্ছে। শবুকে আদর করে কানের কাছে মুখ এনে বলছে—

'হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি বলে রাগ করছ, মনে দুঃখ পাচ্ছ? দেখো, হাসপাতাল থেকে তোমাকে আমি ভাল করে আনবই। তোমাকে আমি ফিরিয়ে আনবই।...'

কাঁদছে শবুও। তারই মধ্যে দীননাথকে যতটা সম্ভব শক্ত করে ধরে বুঝিয়ে দিতে চাইছে—সে রাগ করেনি, সে সম্পূর্ণরূপে তার 'ব' এর উপর নির্ভর করে। ভাগ্য তাকে যতই বিড়ম্বিত করুক, সুস্থ যে শবু এই বাড়ীময়

ঘুরত ফিরত কাজ করত সে আজ যতই অচল হোক—সে আজ তৃপ্ত, সে পেয়েছে স্বামীর ভালবাসা, স্বামী আজ তার জন্ম কাঁদছে। এর পর সে যদি হাসপাতাল থেকে না-ও ফেরে তবু দুঃখ নেই। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও স্বামীর অটুট ভালবাসা পাচ্ছে, সে ভাগ্যবতী।

রাত ভোর হতে শুরু হল যাত্রার প্রস্তুতি। শবুকে মুখ ধুইয়ে হরলিক্স ও সামান্য জলখাবার খাইয়ে তপু আর বেলা তার পোষাক পাল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই শবুর শাড়ী পছন্দ হচ্ছে না, অথচ মুখে বলতেও পারছে না কোন শাড়ীটা তার চাই। বাক্স থেকে একটা একটা করে শাড়ী এনে দেখাতে আগের বছর কানাইয়ের দেয়া পূজোর শাড়ীটা দেখে তার মুখে হাসি ফুটল। হ্যাঁ ঐটা সে পরবে। শাড়ী পরিয়ে, চুল বেঁধে, কপালে সিঁথিতে শাঁখা নোয়াতে সিঁদুর পরিয়ে তাকে প্রস্তুত করা হল।

ওদিকে পৌরসভার এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে রায় বাবুদের বাড়ীর সামনে, গলিতে গাড়ী ঢুকবে না। কি করে শবু অতটা পথ যাবে, সে ত হাঁটতে পারে না। হাতে ষ্ট্রেচার ঝুলিয়ে দুজন লোক ঢুকল। শবুর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—এমন ভাবে যাবার কথা সে কোনদিন ভাবেনি। পায়ে হেঁটে, মোটর বাইকে চেপে সে কত দূর দূর জায়গায় গেছে—এমন যাবার কথা যে কোনদিন কল্পনায়ও আসেনি। তার উপর বাড়ী ছেড়ে যেতেও তার প্রবল কান্না পাচ্ছে।

তপু তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল—'কাঁদিসনা মেজদি, আমরা বাড়ীতে আছি।'

ষ্ট্রেচারে শুয়ে শবু ঘর থেকে উঠোনে এল, উপরে খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। গেটের বাইরে বেশ ভিড় মনে হচ্ছে, লজ্জায় সে চোখ বুজল। তবু নারীসুলভ অনুভূতিতে বুঝতে পারছে—গেটের বাইরে, পথের দুপাশে ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে আছে কচি, তার দিদি বৌদিরা, মনোহর বাবুর স্ত্রী ও বোন, বাঙাল বৌ, হারানীদি রায়গিন্নী দাস গিন্নীদের বাড়ীর সবাই—এমন কি সব বাড়ীর কর্তাব্যক্তি ও ছেলেরাও।

ষ্ট্রেচার সুদ্ধ গাড়ীর মধ্যে শুইয়ে দিলে তবে শবু একবার চোখ খুলল। এ্যাম্বুলেন্সের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল পায়ে পায়ে পুতুল কোলে তপু, বেলা, অমল, সন্ধ্যা আর সুশীলা এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ীর কাছে। দীননাথ আর বিষ্ণু গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করলে গাড়ী চলতে লাগল। একটু পরে

ছবার গাড়ী থামিয়ে গাড়ীতে উঠল ভব আর পুটু। গাড়ীর কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাঁপাতলা-নিমপুরের আকাশ গাছপালা। ঐ মাঠের ও-পাশে একটা বাড়ী পরে মামীমাদের বাড়ী। গাড়ী এগিয়ে চলেছে—দীননাথ তাকে ধরে পাশে বসে থেকে বলে যাচ্ছে—

'এই পাশে শীলাদের বাড়ী, এবার এয়ারোড্রোম, এবার গাড়ী চলছে ভি আই পি রোড দিয়ে।'…

শবু সব চেনে—শীলাদের বাড়ী, শিলং থেকে গৌহাটিতে এসে তারা প্লেনে করে দমদমে নেমেছিল হাতে ছিল হাতল ভাঙা দড়ি দিয়ে বাঁধা বালতি ব্যাগ, ভি আই পি রোড দিয়ে কত বার গেছে সুরমা আর সুধীরবাবুদের কোয়ার্টারে। …গাড়ীর ঝাঁকুনি বন্ধ হয়ে গেছে, দীননাথের হাতে একটা হাত রেখে শবু ঘুমিয়ে পড়ল।



নবম পর্য্যায়

এক

না, শবুকে এরা বাঁচতে দেবেনা। দীননাথের ভালবাসা ও কান্নায় এক সময় তার বাঁচতে ইচ্ছে হয়েছিল। ডাক্তার নার্স ও মাসীদের চিকিৎসা সেবা যত্নে সে একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে সংসারে মঙ্গলা দেবীর মত শাশুড়ী আর কুটিলার মত ননদ করবী আছে সেখানে শবুর মত বধূদের বাঁচার সুযোগ নেই। তার নাকি রাধার অংশে জন্ম—ছোটবেলায় মন্দির শহরে এক বৈষ্ণবী তাকে দেখে বলেছিল। কিংবা তার জন্মের সময় মাতাধরিত্রী আকুল কান্না কেঁদেছিল, তাই ধরিত্রী কন্যা সীতার ভাগ্যই যে তার জন্মলিপি। তা না হলে যখন সবাই বলছে—শবু প্রায় ভাল হয়ে গেছে—তখন আবার কেন সে অসুখের কোলে ঢলে পড়বে?

যতখানি চেতনা ও অনুভূতি নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল ধীরে ধীরে তাও এক গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে। তাই প্রথম দিকের ঘটনা তার বিশেষ মনে নেই। মাঝে মাঝে দেখেছে একখানি আলাদা ঘরে সে শুয়ে আছে, একজন করে মেয়েছেলে সব সময় তার কাছে থাকে। ডাক্তার সিস্টার নার্সরা এসে তাকে নিয়ে টানাটানি করে। এক সময় সারা ঘর লোকে ভর্ত্তি হয়ে যায়। তারা সবাই শবুর চেনা, আপনজন—দীননাথ, বড়বৌদি বীণা, ভাসুর হৃদিনাথ, সুপর্ণা, সুরমা—কমল, তপু অমল, অমলের বিয়ে-পাগল বন্ধু দেবনাথ, কাকীমা পুটু বেলা, এলা—রমেন বিষ্ণু, ভব, শেফালী কাঞ্চন, দিদির ছেলে বাবুল, মেজননদ করবী আর ননদাই তাদের দু একটি ছেলে ও ঢুলু। শবু মাঝে মাঝে সবাইকে দেখে কেঁদেছে আবার অর্ধচেতনায় ডুবে গেছে। দীননাথ আকুল হয়ে বলেছে—

'দেখ, কত লোক তোমাকে দেখতে এসেছে, তোমাকে সবাই কত ভালবাসে।'

সে সব কথা শবুর কানে গেলেও তার অর্ধচেতন মনে সাড়া জাগাতে পারে নি।

এরই মধ্যে কবে যেন কানাই এসেছিল। ঘরে ঢুকেই সে শবুকে জড়িয়ে

ধরে 'মেজদিয়ে' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, শবুর চোখেও নেমেছিল অশ্রু-বন্যা।

কানাই যেন বলছিল - মেজদি, তোর অসুখ টেলিগ্রাম পেয়েই বাবা বলল, কানাই তুই এখনই শবুকে দেখতে চলে যা, একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওর দেখাশোনা করবি তারপর এসে আমাকে সব খবর দিবি। শবু আর একটু ভাল হলে এখানে নিয়ে আসার কথা বলে আসবি আমি ভাল ওষুধ দিয়ে ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলব···।

শুনতে শুনতে সে প্রবল কান্নায় ভেসে গেছে, বাবার সুন্দর চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

কানাই আরো বলেছে— মেজদি, আমাদের নতুন বাড়ী হয়েছে, তুই দেখতে যাবি না ?

শবু কিছুই বলতে পারেনি, শুধু মাঝে মাঝে 'কত কথা···কত কথা···কত কথা' বলে তার কথা না বলতে পারার ব্যথা জানিয়েছে।

দীননাথ কেঁদে কানাইকে বলেছে—ওর মুখের ভাষা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, এখন আছে শুধু এই তোতা পাখীর মত বাঁধা বুলি।

কানাই থাকতেই হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে এসেছিল সোনা। সেও এসে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলেছিল, শবুর অবশ হাতখানি ধরে সে যেন কত কথা বলেছিল—বৌদি, তোমার অসুখ আমি ভাবতেই পারিনা, জানতেও পারিনি · রাত করে বাড়ীতে পৌঁছে 'বৌদি বৌদি' বলে ডাকছি, দেখি কানাই দরজা খুলে দিল · সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না, সকাল হতেই তোমাকে দেখতে এসেছি ··বৌদি, তোমাকে ভাল হয়ে উঠতেই হবে, মেজদাকে বলেছি কেবিনে রেখে চিকিৎসা করাতে, টাকার জন্য চিন্তা নেই কোয়ার্টারে গিয়ে দাদাকে বলছি—বৌদির অসুখ, এখন ওসব গৃহপ্রবেশের উৎসব বন্ধ কর···মাকে আজ বিকেলেই মেদিনীপুরে নিয়ে যাচ্ছি, আমার ছেলেমেয়ের পড়াশুনা শেষ হতে দেরী আছে, ছ সাত বছরের আগে মার মেদিনীপুর থেকে আসাই চলবে না···।

শবু শুধু শুনে গেছে আর কেঁদেছে—মনে হয়েছে সোনা-ই কেবল তার বেদনা বুঝতে পেরেছে।

সোনা সেই একবারই এসে চলে গেছে। কিন্তু কানাই আরো কতদিন ধরে আসা যাওয়া করেছে। ধীরে ধীরে ডাক্তারদের চিকিৎসায় আর জীবনদায়ী ওষুধের গুণে শবু একটু একটু করে অর্ধচেতন জগৎ থেকে চেতনার

রাজ্যে ফিরে আসতে শুরু করেছে। হাতে পায়ে সুড়সুড়ি দিলে সেখানে অনুভূতির স্পন্দন দেখা দিয়েছে। চোখে ফিরে এসেছে দৃষ্টি—মুখ দিয়ে বেরিয়েছে দু একটি কথা—'কানাই', 'বাবা'।

শবুকে কথা বলতে দেখে কানাই হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে বলেছে—বল মেজদি, আরো কথা বল।

এলার বর রমেন বলেছে মেজদি এবার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন, আমার বোনকেও এই জীবনদায়ী ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোনই উন্নতি হচ্ছে না।

শবুর অবস্থার উন্নতি দেখে সবার মুখে হাসি ফুটেছে—শবুও হেসে সকলকে আপ্যায়িত করেছে।

সেই সময় দীননাথ একদিন বলেছে—দেখ, কানাই সাতদিন হল এসেছে, তুমি ত এখন অনেকটা ভাল, কানাই এবার ফিরে যাক—আমরা ত আছিই। ওখানে একা একা বাবার কত কষ্ট হচ্ছে সব দিক সামলাতে, তা ছাড়া তোমার জন্যও তিনি কত দুশ্চিন্তায় আছেন, কানাই গিয়ে সব বললে তবে সব জানবেন।

শবু হেসে কেঁদে কানাইকে বিদায় দিয়েছে। যাবার সময় কানাই শবুর হাত ধরে হ্যাণ্ডশেক্ করেছে, শবুও তার হাতে একটু চাপ দিয়েছে। শবুর হাতে কতটা জোর ফিরেছে সেটা বুঝতেই ওরা সবাই তার সঙ্গে হাত মিলায়—সেই নিয়ম এখনও চলছে।

—আসছিরে মেজদি, তুই তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ, তারপর ডাক্তারবাবুরা বললে জামাইবাবু তোকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে—আসি, কেমন?—বলে ছলছল চোখে কানাই বিদায় নিয়েছে।

শবু কানাইয়ের যাবার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অবশ হাতটা একটু তুলে নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে ভাল আছে। তারপর কানাই, বাবা আর সকলের কথা মনে করে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে।

সেই কান্নাই শবুর আরো তীব্র হয়েছিল যখন সেবাতেই সিষ্টার নার্স ও মাসীতে মিলে তাকে একটা চাকা-অলা টেবিলে শুইয়ে অন্য একটা মস্ত বড় ঘরে একগাদা রোগিণীদের মধ্যে একপাশে একটা খাটে শুইয়ে দিল। শবুর মনে হয়েছিল—সে বুঝি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। দীননাথ বলত—এখানে আমাদের কি সুন্দর ঘর হয়েছে। তবে কেন তাকে একঘর রুগীর মধ্যে এনে ফেলল?

রাতের মাসী উষা বলেছে—সোনা বোন আমার, কাঁদেনা। এতদিন কেবিনের ঘরে একা একা ছিলে, এখানে ওয়ার্ডে এত মানুষ দেখে তোমার মন ভাল থাকবে। আমি কাল দাদাবাবুকে তোমার এখানে নিয়ে আসব।

সোনা যে বলে গিয়েছিল—বৌদিকে কেবিনেই রাখা হবে। তবু কেন এখানে নিয়ে এল! যাবার আগে দীননাথ ত কিছু বলে যায় নি। তীব্র অভিমানে শবুর কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতেই রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার সকালে উঠেও তার কান্না পেয়েছে।

দীননাথ সেই সকালেও এসেছে, এসে শবুকে কাঁদতে দেখে বলেছে—শোনো, তুমি কেঁদনা লক্ষীটি। তোমাকে যে কাল রাতেই ঐ ঘর থেকে নিয়ে আসবে জানতাম না। বিষ্ণুর কথামত আমি বলে রেখেছিলাম, তুমি একটু ভাল হলে অন্য বেডএ দিতে। ওরা রাতেই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এই বেডটা বেশ ভাল দেখছি, পাশেই দক্ষিণের জানালা। আর দেখ, এটা ত কেবিন নয়, ঘরে অন্য অনেক রুগী আছে—এখন থেকে আমাকে আর সকালে আসতে দেবে না। এরপর থেকে আমি শুধু বিকেলে আসব। তুমি প্রথম এই বেডে এসেছ তাই আমাকে মাত্র দুমিনিটের জন্য আসতে দিয়েছে। এখন আসি কেমন? আবার বিকেলে আসব।

বলে দীননাথ শবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেছে। শবু ছলছল চোখে তার যাবার পথের দিকে চেয়ে থেকেছে। এতদিন তবে দিনে দুবার করে আসত, এখন থেকে সারাদিনে রাতে মাত্র একবার দেখা হবে! বিষ্ণুটাই যত নষ্টের মূল। আবার এও মনে হয়েছে—আহা, রোজ কতদূর থেকে দুবার করে আসতে যেতে মানুষটার কত কষ্ট হয়েছে, এই বরং ভাল হল। শবুর আর কি, সে ত সারাদিন শুধু শুয়েই আছে।

নতুন বেড এ এসে শবুর অবস্থার আরো উন্নতি হয়েছে। হাসপাতালের ব্যাপার তার অনেকটা জানা হয়ে গেছে। একজন কালো বেঁটেপানা ডাক্তার আসে, তাকে সবাই বলে সাহেব। একজন ছোট ডাক্তারও দুতিনবার করে আসে—ডাক্তার নন্দী। সিষ্টার আসে, নার্স আসে। শবুকে দিনরাত দেখা-শোনা করে যে দুজন তাদের বলে মাসী—রাতের মাসীর নাম উষা—প্রায় কাকীমার বয়সী, দিনের বেলায় কাছে থাকে কল্পনা, তার বয়স বেশী নয়। শবুর উষা মাসীকে খুব ভাল লাগে, ঠিক কাকীমার মত যত্ন করে সকালে স্নান করিয়ে দেয়, রাতের খাবার খাইয়ে দেয়, পাশে বেঞ্চ পেতে শুয়ে থাকে।

শবুর অবস্থার উন্নতি দেখে সাহেব বলেছে—মাঝে মাঝে উঠিয়ে বিছানায়

বসিয়ে দেবে, ঘরের মধ্যে ধরে ধরে রোজ একটু একটু করে হাঁটাবে। শবুকে বলেছে—হাত উপরে তুলুন ত, নামান। পা নাড়ান দেখি। এই ত ঠিক আছে। আপনি শিগগিরই ভাল হয়ে যাবেন। সাহেব আশ্বাস দিয়ে চলে গেছে।

রোগিণী যত ভাল হয়ে উঠেছে, আত্মীয়স্বজনদের আসা যাওয়া তত কমে গেছে। ব্যতিক্রম একমাত্র দীননাথ। শবু হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে থেকে আগে নাকি সকালে বিকেলে দুবার আর ওয়ার্ডে আসার পর দিনে একবার সে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আসছে যাচ্ছে। ঝড় জল রোদ দুরত্ব কিছুই তার নিয়মিত আসা যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

শবুর দেহ যেমন একটু একটু করে ভাল হয়েছে, কথা বলার পরিমাণও অল্প অল্প করে বেড়েছে। উঠে বসা, নিজে হাতে কিছু কিছু খাওয়া, উষা কল্পনার সাহায্যে বাথরুমে যাওয়া আসা শুরু করেছে। খুশি হয়েছে দীননাথ। তেমনি আবার একটু একটু করে শবুর মাথায় নানান চিন্তা ভিড় করতে শুরু করেছে।

মোটামুটি কথা বলা আরম্ভ করে প্রথম সুযোগে দীননাথকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে—ওদের গৃহপ্রবেশ হয়ে গেছে ?

দীননাথ তাড়াতাড়ি জবাব দিয়েছে—না, না, গৃহপ্রবেশ হবে কি করে ? তোমার অসুখ, এখন ওসব কিছু হবে না। সোনা মাকে মেদিনীপুরে নিয়ে গেছে—ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ সাত বছর ওখানেই থাকবে। সোনা এসেছিল—তোমার মনে আছে না ?

আবছা আবছা মনে আছে। গৃহপ্রবেশ পর্ব তবে এখনও মাথার উপর ঝুলছে! যাকগে—শবুর মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকেছে। জিজ্ঞেস করেছে—কানাইও ত এসেছিল, কোথায় থাকত, সন্ধ্যা ঠিকমত রান্না করে দিচ্ছে ত ?

দীননাথ বলেছে—কানাইয়ের আসা তোমার ভাল মনে থাকার কথা, তখন তুমি একটু একটু করে সেরে উঠছ। কানাই সাতদিন ছিল—সে পর্য্যন্ত তপু অমলরাও আমাদের বাড়ীতে ছিল। কানাই চলে গেলে তপুরা তাদের বাসায় চলে গেছে। সন্ধ্যা ঠিকমতই আসছে, রান্না করে দিচ্ছে।

আবার চিন্তা। জিজ্ঞেস করেছে—'ব' রে, বাড়ীতে একা একা তোমার ভয় করে ?

—না, প্রথম প্রথম একটু কেমন কেমন লাগত, এখন আর লাগে না।

সেই যে দুটো দরজায় নিজে নিজে ছিটকিনি লাগিয়েছিলাম, অনেক সময় যে বাড়ী খালি থাকে. তবু কোন দুশ্চিন্তা হয় না।

—হ্যাঁ, নিজেদের বাড়ী ত, ভয় করবে কেন?—শবুও নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছে।

দীননাথ আরো বলেছে· তাছাড়া প্রতিবেশীরা সবাই আমাদের বাড়ীর প্রতি নজর রাখে। রোজ আমার কাছে তোমার কথা জানতে চায়।

হ্যাঁ, প্রতিবেশিনী রায়গিন্নী, বাঁকা দাসের বৌ, তন্বীদি, রুচির বৌদি দিদিরা, বাঙালবৌ, সবাই খুব ভাল।—আচ্ছা, তুমি টিভি দেখ ত?

দীননাথ বলেছে—রোজ এখান থেকে ফিরতে ফিরতে টিভির প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যায়। তার উপর তোমার অসুখ—আমার ভাল লাগে না—তুমি ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে এস তখন আমরা দুজনে টিভি দেখব।

সব শুনে শবু খুশি হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। দীননাথ বাড়ী থেকে গোলাপ ফুল, পাকা আম নিয়ে এলে সে সবাইকে দেখিয়েছে—এই দেখ আমাদের বাড়ীর গাছের ফুল, আম। যারা শবুকে দেখতে এসেছে—তাদেরকে আম বিলিয়েছে, যেদিন কেউ আসেনি উষা আর কল্পনাকে দিয়েছে তারাও খুশি হয়েছে। শবু উঠে বসা থেকে দীননাথ রোজ তার চশমা নিয়ে আসে, সে দু ঘণ্টা চশমা ব্যবহার করে ফিরিয়ে দেয় আবার পরদিন দীননাথ নিয়ে আসে। না, শবু এখনো পড়াশুনা কিছু করে না।

হঠাৎ একদিন দীননাথ প্রশ্ন করেছে—আচ্ছা, সে রাতে যে তুমি বলেছিলে 'তোমার কথা আমার মনে আছে।' কি কথা?

আবছা আবছা শবুর মনে পড়েছে। হ্যাঁ, অনেক দুঃখেই তার মুখ দিয়ে ওরকম কিছু কথা বেরিয়েছিল। কিন্তু এখন ত সে ভাল হয়ে উঠছে, কি দরকার সেই পুরোনো কথা ঘেঁটে—জীবনটাকে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যায় সেই চেষ্টাই করা ভাল। মনের ভাব গোপন করে সে বলেছে—কি জানি, কি বলেছিলাম, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

দীননাথও সঙ্গে সঙ্গে—ঠিক আছে ঠিক আছে, মনে না পড়লে মনে করার চেষ্টা কোরোনা—বলে পুরোনো অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিয়েছে।

—জানো, আমার মনটা ভীষণ দুর্বল। শবু আবার কিছু বলতে চেয়েছে।

দীননাথ বাধা দিয়েছে—থাক ও কথা। তুমি কোন কিছু চিন্তা কোরো না। আমরা আমাদের মত থাকব, অন্যকথা চিন্তা করার কি দরকার?

দুই

সব থেকে আনন্দের দিন এসেছিল এক রবিবারে। রবিবার ছাড়া হাসপাতালে নাকি শিশুদের ঢুকতে দেয়না। সেদিন একসঙ্গে এসেছিল অনেক লোক—দীননাথ এসেছে সবার আগে, তারপর এসেছে বেলা পুটু ও বাবুলের সঙ্গে কাকলী মিঠি দিঠি মিষ্টি, তপু অমল পুতুল। কাকলী মিঠি দিঠি মিষ্টিমাকে দেখে শবু হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেছে—ওমা, কাকলী, তোরা কবে এলি? কানাই আসেনি?

আনন্দে সে বারবার মিঠি দিঠি মিষ্টি আর পুতুলকে জড়িয়ে ধরেছে।

কাকলী বলেছে—আমার সেই পেট ব্যথাটায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, তাই বাবুলের সঙ্গে এসেছি পে ক্লিনিকে বড় ডাক্তার দিয়ে দেখাতে।

—সেটা আবার কোথায়?—শবু জিজ্ঞেস করেছে।

দীননাথ বলেছে—এই ত কাছেই ভবানীপুরে।

শবু বলেছে—ভাল করেছিস, কলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছে, আমার মত রুগীকেও দেখ কেমন ভাল করে তুলেছে।

মিঠি বলেছে—মা ডাক্তার দেখিয়ে বোনকে নিয়ে বাবুলদার সঙ্গে চলে যাবে—আমরা দুজনে গরমের ছুটি শেষ হলে যাব।

শবু জিজ্ঞেস করেছে—বাবা—তোদের দাদু কেমন আছে রে?

দিঠি মাঝখান থেকে বলেছে—কোন দাদু? ওপরের দাদু না ওবাড়ীর দাদু?—তার মুখের কথা এখন পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু আঙুল চোবা বন্ধ হয়নি।

মিঠি তাকে থামিয়ে দিয়েছে—মেজপিসের বাবা হল ওপরের দাদু। দাদু ভাল আছে মেজপিস্। তোমাকে যেতে বলেছে।

শবুর মনে পড়েছে কয়েক বছর আগে মিঠির অসুখের কথা। শবুরা তখন মাসখানেকের ছুটিতে পাটনা থেকে কলকাতায় এসেছে। হঠাৎ খবর পেল কানাইও এসেছে কলকাতায়, উঠেছে ষষ্ঠীতলায়। সেখানে গিয়ে দেখল মিঠির একটি হাত আর পা অবশ হয়ে আছে। একদিন খাট থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় নাকি আঘাত পেয়েছিল, তার পর থেকে ওই অবশভাব। কলকাতায় এনেছে স্পেশালিষ্ট দিয়ে দেখাতে। শবু আদর করে মিঠিকে কোলে তুলে নিয়েছিল, জিজ্ঞেস করছিল মিঠিকে—কি তার কষ্ট হয়। কি

আশ্চর্য্য ! ঠিক সেই সময় মিঠি তার অবশ হাতটা একটু নেড়েছিল। তারপর একটু একটু করে তার হাত পা স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেয়েছিল। সবাই বলেছিল—মিঠি তার পিসিমার কোলে উঠে রোগমুক্ত হল স্পেশ্যালিষ্ট দেখাবার আগেই।…শবুর নিজের হাত পা যখন একটু একটু করে অবশ হয়ে আসছিল তখন সে ভেবেছে, যদি মা থাকত তবে মা-র স্পর্শে সে ভাল হতে পারত। কিন্তু তার যে মা নেই। তবু ডাক্তার আর ওষুধে অসাধ্যসাধন করেছে। এখন সে ভাল হয়ে উঠছে…।

—হ্যাঁ যাব, বাবাকে দেখব। মিঠির কথায় খুশি হয়ে শবু বলেছে।

পুতুল বলে উঠেছে—আমাদেল বালী (বাড়ী) ?

—হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ীও যাব।

-কীসে করে যাবে ? তুমি কি মোটর বাইকে চড়তে পারবে ?—মিঠি জানতে চেয়েছে।

—যাব বলেছি, যাব। কীসে করে যাব তা দিয়ে কি দরকার ? প্রশ্নটা শবুর যেন পছন্দ হয় নি।

দীননাথ বলেছে—মোটর বাইকের পাশে নৌকোর মত লাগায় দেখেছিস, সেইরকম একটা লাগিয়ে নেব। তাতে শোয়ার মত করে আরামে বসে যেতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে শবু বলেছে—শুনলি ত ? নৌকোয় বসে বসে যাব।

মিঠির কাছে ধমক খেয়ে দিঠি এতক্ষণ চুপ করে আঙুল চুষছিল এবারে সে আবার সরব হয়েছে—মেজপিসি, তোমার সেই আলু-পচাটা দেখি ?

শবুর কোমরে একটি আঁচিল আছে—দেখতে ছোটখাট আলুর মত—আবার নরম তুলতুল করে। ছোট বেলায় দুবোনে দেখে ওটার নাম দিয়েছিল আলু-পচা।

একবার চারপাশ দেখে নিয়ে শবু সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাপড় একটু টেনে নামিয়ে আঁচিল বের করে দেখিয়েছে। মিঠি দিঠি পুতুল তাতে হাত বুলিয়ে মজা পেয়েছে। কাকলীর কোলে বসে মিষ্টি বলে উঠেছে—এ কি ? অর্থাৎ কি দেখাচ্ছে ?

মিঠি দিঠি বলেছে- আলু পচা রে বোন, আলু পচা।—কি বুঝে মিষ্টি ফিক করে একগাল হেসে মার কোলে মুখ লুকিয়েছে।

ততক্ষণে শবুকে দেখতে আরো লোক এসেছে—শেফালী কাঞ্চন, সুরমা কমল, সুপর্ণা, করবীর ছেলে বাসু, সব শেষে এলো রমেন। সেদিন শবুর

বিছানার পাশে যেন আনন্দের মেলা বসে গিয়েছিল। সবাই শবুর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ প্রকাশ করেছে। শবুও খুশিতে ভরপুর হয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলেছে, হেসেছে।

এক সময় তার মনে হয়েছে—সবাইকে আরো খুশি করা দরকার। তাই তেমন দরকার না থাকলেও বলেছে—বাথরুমে যাব।

বেলা—নিজে নিজেই যাবি ?

—না, কল্পনা।

পুটু কল্পনাকে ডেকে এনেছে। দীননাথ প্রথম যেদিন চশমা এনেছিল সেই সঙ্গে শবুর স্যাণ্ডেলজোড়াও এনে রেখেছিল। শবু স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে কল্পনার পাশে পাশে হেঁটে গিয়ে ঘরের দরজা দিয়ে বেরোবার মুখে ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে গর্বের হাসি হেসে চলে গেছে, আবার একটু পরে তেমনি গর্বের হাসিতে মুখ ভরিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে এসেছে। আনন্দ-মেলা খুশিতে কলরব করে উঠেছে।

দীননাথ বলেছে—আমি ওকে রোজ দেখছি কিন্তু আজই প্রথম হাঁটতে দেখলাম।

কাকলী—ফিরে গিয়ে বাবাকে বলতে হবে, মেজদি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন।

পুটু—তুই কামাল দেখালি মেজদি।

তপু—মেজদিরে, তোকে আবার হাঁটতে দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে। বলে আনন্দে কেঁদে ফেলেছে।

অমল—সেদিন যেমন দেখে গেলুম আজ তার থেকে অনেক ফ্রেস দেখাচ্ছে মেজদিকে।

কাঞ্চন—এ কদিন সবাইকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, এখন আমরা নিশ্চিন্ত বৌদি।

শেফালী—বৌদির হার্ট খুব ভাল, জীবনী-শক্তি প্রচুর।

এলা—শ্বশুর বাড়ীতে এসে এক এক করে এখন তিন তিনটি রুগীর সেবা করি আমি। কাউকে দেখলাম না এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে।

সুপর্ণা—কাকী, এবারে ডাক্তারকে বলব তোমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিতে।

শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এসে দুলু সব শুনে বলেছে—মা শুনলে খুব খুশি হবে। মা হার্টের রুগী, চারতলা পাঁচতলা করা সম্ভব নয় বলে আসতে চাইলেও আনতে পারি না। শিগগিরই ত ছাড়া পাবেন বৌদি, মাকে একেবারে

চাঁপাতলার বাড়ীতে গিয়েই দেখা করিয়ে আনব।

বাড়ী থেকে দীননাথ কয়েকটা আম এনেছিল শবু সেগুলো কাকলীকে দিয়েছে—সে ত আর রোজ আসবে না। শবুর আলমারী ফলে আর মিষ্টিতে ভরে উঠেছিল—আঙুর বেদানা আপেল মৌসম্বী সন্দেশ দানাদার রসগোল্লা—শবু দুহাতে সেগুলো স বাইকে বিলিয়েছে মনের আনন্দে।

সময় হয়ে যাবার ঘণ্টা পড়তে সবাই একে একে শবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে রওনা হয়েছে ছোটদের উৎসাহই এ ব্যাপারে বেশী, তারা এক এক জনে তিনবার চারবার করে তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছে।

সব শেষে দীননাথ হেসে হ্যাণ্ডশেক করে হাতের জোর পরীক্ষা করে বিদায় নিয়েছে—দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছে—শবুও বিছানায় বসে হাত তুলে নেড়ে বিদায় জানিয়েছে। দুজনের মুখেই ছিল খুশির হাসি—শবু আজ উঠেছে দেখে দীননাথ খুশি, শবু হেসেছে কৃতজ্ঞতায়—তার 'ব' তাকে ভাল করে তুলেছে।

আবার বিছানায় শুয়ে শবুর মনে হয়েছে—সেদিনটা তার খুব ভাল গেছে, ডাক্তার হয়ত খুব শিগগিরই তাকে বাড়ী যেতে দেবে।

বড় ওয়ার্ডে বলে দুজন সাহেব আসে, একজন শবুদের সাহেব—আর একজন বেশ লম্বা চওড়া ফর্সা, সাহেবের মত সাহেব, অন্য কয়েকজন রুগীর কাছে যায়- নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

সেই আনন্দের দিনের পরদিনই এসেছিল দুই সাহেব একসঙ্গে। শবুদের সাহেব শবুর বিছানার কাছে এসে হেসে বলেছে—আপনি ত এখন বেশ ভাল হয়ে উঠেছেন, এবারে আপনাকে ছেড়ে দেব। কবে বাড়ী যাবেন বলুন?

শবু বলেছে—বিষ্যুদবারে যাব না।

আর একটু হেসে সাহেব বলেছে—বেশ ত, তবে বুধবারে বা শুক্রবারে যাবেন। দেখি হাত দুটো মাথার উপর তুলুন ত, একটু হাঁটুন ত। এখন ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, তাই না? বলে ফর্সা সাহেবের দিকে তাকিয়েছে।

ফর্সা সাহেব বলেছে—নিশ্চয়ই।

—ঠিক আছে। দু তিন দিনের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেব।—বলে সাহেবরা চলে গেছে।

খুশিতে শবুর মন ভরে উঠেছে। কল্পনা বলেছে—মাসী ত কদিনের মধ্যেই চলে যাবে।

শবু বলেছে—যাবই ত।

সে ত চিরদিন হাসপাতালে থাকবে বলে আসেনি। সে তখন বাড়ী ফেরার জন্ম উন্মুখ হয়ে উঠেছে, ওদের কত কষ্টের তৈরী বাড়ী, শবুর সাধের গৃহকোণ। বিকেলে দীননাথ আসতেই তাকে সুখবরটি শুনিয়েছে—জানো, সাহেব বলেছে আমাকে ছেড়ে দেবে।

—তাই নাকি? কবে?—দীননাথ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

—দু তিন দিনের মধ্যেই। আমি বলেছি বিষ্যুদবারে যাব না। ঐ দিন ত কোথাও যেতে নেই, তাই না?

দীননাথ আদর করে তার নাক টিপে দিয়ে বলেছে—বোকা, পাগলী কোথাকার! সে ত বাড়ী থেকে বের হবার সময়। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরবে তাতে বিষ্যুদবার হলেই বা ক্ষতি কি?

—কি জানি, আমার মনে হল তাই বলেছি।

—বেশ করেছ। তা বাড়ীতে তোমার কোন অসুবিধে বোধ হবে না ত?

—না, অসুবিধে কিসের? তবে পায়খানা যে একটু উঁচু। তা হোক, আমি একটা উপায় ভেবে রেখেছি।

—সে যা হয় দেখা যাবে, আমি ত আছিই। দীননাথ ভরসা দিয়েছে।

তিন

এমনি ভাবে শবু যখন আনন্দের সাগরে ভাসছিল, বাড়ী যাবে বলে মনে খুশির প্রস্তুতি শুরু করেছিল ঠিক সেই সময়ই ঘটেছে ছন্দপতন।

একটু পরেই এসেছে করবী। তাকে রেখে দীননাথ নীচে গেছে ওষুধ আর ফল কিনতে।

করবী হেসে জিজ্ঞেস করেছে—বৌদি, বাসুর কাছে শুনলাম কাল নাকি তুমি খুব হাঁটা চলা করেছ?

শবু খুশি হয়ে হেসে বলেছে—হ্যাঁ, সাহেব বলেছে দু তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।

—বেশ বেশ, তোমার জন্ম আমাদের যা চিন্তা। জানো বৌদি, আমারও মাঝে মাঝে খুব দুর্বল লাগে।

শবু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছে—তাই নাকি ছোড়দি? ডাক্তার দেখাবেন, ওষুধ খাবেন। ওষুধ না খেয়ে খেয়েই ত আমার অসুখ করল। ঐ ভব শেফালীরা সব সময় মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খায়, ওদের অসুখ করে না।

ভবকে আসতে দেখেই শবু শেষের কথাগুলো বলেছে। ভব বলেছে—সে ত হ'ল, তুমি নাকি আজকাল ওয়াকিং রেস দিচ্ছ?

করবী বলেছে—শুধু হাঁটা কিরে ভব, ডাক্তার নাকি বলেছে দু তিন দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

—বেশ বেশ।—বলে ভব দাঁত বের করে হেসেছে।

এ পর্যান্তও সব ঠিক ছিল। রোগমুক্তির খুশিতে বাড়ী ফিরে যাবার কল্পনায় আনন্দে সব থেকে অপছন্দের দুই ননদ দেওরের সঙ্গে সে হেসে কথা বার্ত্তা বলছিল। তখনো সে জানেনা এর পরেই কি ঘটতে যাচ্ছে।

হঠাৎ করবী বলেছে—বৌদি ত ভাল হয়ে বাড়ী যাচ্ছে। ভব, এবার তোর গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করে মাকে সেখানে নিয়ে আয়। মেদিনীপুরে মার মন টিকছে না।

করবীর ঐ কথাটাই শবুর বুকে শেল হানল যেন। তারপর থেকেই তার মাথার ভিতরে ভীষণ, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। তারপর কখন দীননাথ ওষুধ নিয়ে ফিরেছে, আর কি কি কথা হয়েছে কখন ভব করবী চলে গেছে, দীননাথ শবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে রাতে ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে দেখা করে কবে তাকে ছাড়বে জেনে যাবে বলে গেছে—সে শুধু অন্যমনস্কভাবে দেখেছে আর শুনে গেছে।

বারবার মনে হচ্ছে তাকে এরা বাঁচতে দেবে না। শান্তিতে থাকতে দেবে না, বাঁচতেও দেবে না। আবার সেই মঙ্গলা দেবী, আবার সেই বিভীষিকা—আতঙ্ক! সোনা বলে গিয়েছিল বটে মা পাঁচ সাত বছর মেদিনী-পুরেই থাকবে। কিন্তু করবীর মত শুভানুধ্যায়ীরা থাকতে, আর কেউ না থাকলেও দুর্দান্ত প্রকৃতির, স্বাধীনচেতা মা মঙ্গলাদেবী যখন স্বয়ং শবুর রক্তপান করতে, তার বুকের উপর নৃত্য করতে নিজেই আসার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন তাঁকে ঠেকাবে সোনা এমন সাধ্য তার আছে?

শবুর এতটা বয়স হয়েছে, এত বছর হল বিয়ে হয়েছে—আজও জানেনা সে কোন দোষে দোষী। দোষের মধ্যে সে সুন্দরী, কথা কম বলে, সে-সময়ের বিচারে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, বাবা মা গরিব ছিল মেয়ের বিয়েতে সামান্য গয়না আর প্রণামী ছাড়া কিছু দিতে পারেনি, আর দীননাথ তাকে ভালবাসে

—বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরে। সব থেকে বড় দোষ সে মুখে মুখে তর্ক করেনা। মঙ্গলা দেবীর কাছে কোন বৌ-ই ভাল নয়, কিন্তু সব থেকে বেশী আক্রোশ তাঁর শবুর উপরই তাই তিনি শবুর বুকের উপর এসে বসতে চান।

করবীরা আছে শুধু ইন্ধন যোগাতে। এরা হাসপাতালে এসে দরদ দেখাচ্ছে কেন, জিইয়ে রেখে শবুকে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারবে বলে? সে কি সাধ করে সেই অগ্নিকুণ্ডে পা বাড়াবে—জেনে শুনে গিয়ে পড়বে সেই নরককুণ্ডে?

সে ত আগেই মরে যেতে চেয়েছিল। মৃত্যুর পথে অনেকটা এগিয়েও গিয়েছিল। তাকে হাসপাতালে এনে একটু ভাল করে তুলে আদরে আর ভালবাসায় দীননাথ তার মনে বাঁচার সাধ জাগিয়েছে। দরকার নেই বাঁচার, দরকার নেই বাড়ী ফেরার—হাসপাতালে এখানেই তার জীবন শেষ হয়ে যাক। স্বামী সংসারের সাধ তার ঘুচে গেছে, জীবনে অনেক সুখ ভোগ করেছে—আর জীবনের হাতছানি ভাল লাগে না।

শবু চলে যাবে তার মা পদ্মিনীদেবীর কাছে, ফিরে যাবে আপন মায়ের কোলে এয়োতীর সব চিহ্ন অঙ্গে নিয়ে জীবনের মাঝপথে। সে যে সতী মায়ের সতী মেয়ে। আর এক মা, তার শাশুড়ীঠাকরুন, মঙ্গলাদেবী থাকুন তাঁর সকল বিদ্বেষ, আক্রোশ ও প্রতিহিংসা নিয়ে। রাজত্ব করুন চার ছেলের চারখানি বাড়ী নিয়ে। বেঁচে থাকুন তিনি শতায়ু হয়ে। কিন্তু কোথাও তিনি সুখ পাবেন না, সবখানেই জ্বালবেন অশান্তির আগুন। ছেলেদের কাছে টিকতে না পেরে যদি যান মেয়েদের সংসারে সেখানেও দুদিনে ঘুচে যাবে মা-মেয়ের মধুর সম্পর্ক।' যদিও এমনটি শবু চায় না, কিন্তু সে না চাইলেও এ হবেই, হতে বাধ্য। এই পৃথিবী ছেড়ে গেলেও দূর থেকে এমন সব ছবিই হয়ত সে দেখবে।

··· যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, হাত পা আবার অবশ অবসন্ন হয়ে আসছে, কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। দাঁতের মাড়ীতে আবার সেই কেমন অনুভূতিহীন অনুভূতি। একটু একটু করে শবু চেতনার রাজ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।···

কেমন একটা ভাবলেশহীন অবসন্নতা আবার শবুকে ঘিরে ধরছে। মাসীর সঙ্গে বাথরুমে যেতে কষ্ট হচ্ছে, নিজে হাতে খেতেও পারছে না। সাহেব এক সময় এসে রুটিন মত জিজ্ঞেস করল—

'কেমন আছেন ? শুয়ে আছেন কেন ?'

শবু একবার 'উঁ' বলে অন্যদিকে চেয়ে রইল। সাহেব তেমন লক্ষ্য না করে পাশের বেড এর দিকে চলে গেল। শবু যেন আর নিজের বশে নেই।

বিকেলে একসময় দীননাথ এল, বলতে লাগল—

'কাল রাতে ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তোমার কথাই ঠিক। বলেছে দু এক দিনের মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেবে।'

কথাগুলো যেন তার বোধগম্য হচ্ছেনা এমনভাবে সে দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উদ্বিগ্ন দীননাথ জিজ্ঞেস করল—

'কিছু বলছ না যে ? শুয়েই বা আছ কেন ? দেখি আমার সঙ্গে একটু হ্যাণ্ডশেক করত।'

শবু হাতে চাপ দিতে চেষ্টা করল, তেমন বোধ হয় পারল না। তার চোখে আবার আগের মত জল নেমে এল, কেঁদে বলল—

'আমার ভাল লাগছে না…'।

'কি ভাল লাগছে না, কেমন লাগছে বল ?

শবু আর কিছু বলতে পারছে না। তার কথা আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

দীননাথ করুণ মুখে পাশে বসে শবুর গায়ে মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে, আলমারী থেকে বার করে মৌসম্বী আঙুর বেদানা খাওয়াল, দোকান থেকে আনা মিষ্টিও খেতে দিল। শবু আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে শুয়ে রইল আর মাঝে মাঝে করুণ চোখে দীননাথের করুণ মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

সময় ফুরোতে দীননাথ শবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে—'ডাক্তার নন্দী আজ রাতে আবার আমাকে দেখা করতে বলেছে,' তুমি ভাল হয়ে থাক, আমি আবার কাল বিকেলে আসব' বলে ছল ছল চোখে বিদায় নিল।

শবু কিছু বলতে পারল না, দীননাথের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যের পর ডাক্তার নন্দী এসে একবার ঘুরে গেল, বলে গেল—'স্তার বলেছেন. কাল আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে।' শবু কিছুই বলতে পারল না।

কি ভাবে রাত কেটে গেল। সকালে উষা এক সময় ধরে শবুকে উঠিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিতে সে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে—দেখছে না কিছুই।

'কেমন আছেন ?' প্রশ্ন শুনে শবু মুখ ফেরাল—একসঙ্গে ছোট ডাক্তার নন্দী আর দীননাথ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। নন্দী বলল—'কি হল. কেমন

আছেন ? কথা বলুন ত ? বাড়ী যাবেন না, বাড়ী ? আপনার বাড়ী কোথায় ? বাড়ী কোথায় বলুন ?'

শবু উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে থেকে শুধু একবার 'উঁ' বলে জানালার বাইরে আবার তাকিয়ে রইল—প্রশ্নের অর্থগুলোই যেন তার বোধগম্য হলনা, সঙ্গে যে দীননাথ এসেছে সে কথাও তার মনে রইল না।

ডাক্তার শবুকে শুইয়ে দিতে বলে দীননাথকে 'আসুন আমার সঙ্গে' বলে বেরিয়ে গেল। উষার সাহায্যে শবুকে শুইয়ে দিয়ে তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে 'আসছি আমি, আবার বিকেলে আসব' বলে দীননাথ চলে গেলে শবুর দীননাথের কথা মনে পড়ল। আবার তার চোখে নামল জল।

দুপুরে এল সাহেবরা সঙ্গে অন্য ডাক্তার সিষ্টার নার্স। সাহেব জিজ্ঞেস করল—

'কি হল আপনার ? কথা বলুন ত ? হাত উপরে তুলুন দেখি ?' শবু নিশ্চল।—'সেদিন বলছিলেন বাড়ী যাবেন, কোথায় বাড়ী ? বাড়ীতে কী আছে ? বাড়ী যাবার কথায় শরীর খারাপ হল কেন ?'

সবই অর্থহীন লাগছে শবুর।

সাহেব—'সে কি ! রিল্যাপ্স করল !' বলতে বলতে চলে গেল।

শবুও আবার ধীরে ধীরে চেতনার রাজ্য থেকে হারিয়ে গেল। শুধু চোখে দেখছে, খাইয়ে দিলে খাচ্ছে।

আবার কদিন বাদে শবু একটু একটু করে চেতনার রাজ্যে ফিরে আসছে। ওয়ার্ডের পরিবেশটা চিনতে পারছে; দিনের শেষে দীননাথের উদ্বিগ্ন করুণ মুখখানা দেখতে পাচ্ছে।

একটু সুস্থ হয়ে শবুর মনে হচ্ছে মাঝখানে সে বুঝি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। উষা কল্পনার কথা থেকে বুঝতে পেরেছে তিন চারদিন সে অর্ধচেতন অবস্থায় কাটিয়েছে—চলেছে ওষুধ ইঞ্জেকশন আর সব। একটু একটু করে আবার সে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, হাতে পায়ে সাড়া জেগেছে, মুখে এসেছে ভাষা।

দীননাথ একদিন এসে প্রথমেই হ্যাণ্ডশেক করে অবস্থা বুঝে বলল—

'এই ত তোমার হাতে আবার জোর ফিরে এসেছে। একটু কথা বল আমার সঙ্গে। উঠে বসবে ?'

'হুঁ' বলে শবু একটু হাসল।

দীননাথ তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল—

'এই ত তুমি আবার ভাল হয়ে উঠেছ। কথা বল আমার সঙ্গে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে শবু জিজ্ঞেস করল—

'এই ক'দিন আমার কি হয়েছিল বল ত ?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে বল ত ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। মনে হচ্ছে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলাম কিম্বা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

চার

দিনে দিনে আবার শবু ভাল হয়ে উঠছে, কথা বলছে সামান্য হাঁটা চলাও করছে। কোনদিন মনে পড়ে যাচ্ছে, কাকলীরা এসেছিল, তারা কোথায় ? দীননাথকে জিজ্ঞেস করতে সে বলেছে—দুদিন স্পেশ্যালিষ্টকে দেখিয়ে ব্যবস্থা পত্র ও ওষুধ নিয়ে কাকলী আর মিষ্টি বাবুলের সঙ্গে মন্দির শহরে চলে গেছে।

'আর মিঠি দিঠি ?'

'ওরা এখন তপুদের কাছে আছে।'

পুটু এসেছিল, সে বলল—'আমি একদিন ওদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব।'

শবু ভাবনায় পড়ল—'ভীষণ গরম, দেখিস ওদের লু লাগেনা যেন।' পাটনায় থাকতে দীননাথের তিনবার লু লেগেছিল। লু লেগে মানুষ নাকি মারাও যায়। অসুস্থ অবস্থাতেও সকলের জন্য তার যত চিন্তা।

'ওসব তোদের খোট্টাদের দেশে লাগে বুঝলি মেজদি। এটা কলকাতা। পুটু কথাটাকে উড়িয়ে দিল।

দীননাথ বলল—'কলকাতাতেও সর্দিগর্মি লাগে, সেও একরকম লু লাগা।'

শবু বলল—'শুনলি ত, আমাকে একেবারে মুখ্যু ভাবিস না।'

যাবার সময় ওরা হ্যাণ্ডশেক করে হাতের জোর পরীক্ষা করে চলে গেছে।

শবু কেন মুখ্যু হতে যাবে ? মুখ্যু ঐ কল্পনাটা। প্রথমে ভেবেছিল—হাসপাতালে কাজ করে, খুব বুঝি জ্ঞানীগুণী হবে। কিন্তু তা নয়, একেবারেই মুখ্যু। শবু এখন আবার নিজেই খেতে পারে। কল্পনা একটু ফলের রস বা হরলিকস করে দেয় আর বিকেলে শবুকে চুল বেঁধে সিঁদুর পরিয়ে সাজিয়ে দেয়—আর কোন কাজ করে না।

সারাদিন অন্য মাসীদের সঙ্গে বসে বসে পরের আলোচনা করে। শুনতে পায় সে অন্য মাসীদের শবুর সম্বন্ধে বলছে—এই যে মাসী কদিন খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ছিল এটাই খুব খারাপ···চশমা চোখে দিলে মাসীকে পুতলীবাই বা ফুলন দেবীর মত লাগে···সেদিন মাসীর এক ভাসুর এসেছিল তার মাথার চুল অর্ধেক পাকা, কিন্তু সে নাকি দেওর হয়। মেসোরও অনেক চুল পাকা, মাসী মেসোর বেশ বয়স হয়েছে তবে···।

শবুর রাগ ধরে যায় ব্যক্তিগত আলোচনা শুনে। চুল পাকলেই যেন বুড়ো হয়, কতলোকের অল্প বয়সে চুল পেকে যায়। কিছু জানে না—একেবারেই মুখ্যু !

হ্যাঁ, মহী একদিন এসেছিল। লাজুক মানুষ হঠাৎ স্মার্ট হয়ে খুব গল্প করতে লেগেছিল—সেদিন ছাদে বসে আপনাকে বলছিলাম না বৌদি, বেশী বেশী করে খেতে ? মাছ, মাংস, আণ্ডা, রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা খুব করে খাবেন, দেখবেন দুদিনে শরীর ভাল হয়ে যাবে। শরীর ঠিক রাখতে হলে আগে চাই খাওয়া···

বিয়ে-না-করা খাওয়া-পাগল মহী হঠাৎ আর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে—'আমি একটু আসছি'—বলে সেই যে গেল আর আসেনি। এমনভাবে কথা বলছিল যেন শবুদের খাদ্যের অভাব ঘটেছিল, তাই তার এই অসুখ।

দীননাথ পরে বলেছিল—মহী মাঝে মাঝে হাসপাতালে আসে, নীচেই আমাদের কাছে সব খবর নিয়ে চলে যায়। ওয়ার্ডে এই একবারই এল।

একদিন দীননাথ এসে বলল—

'এই দেখ, কানাই চিঠি লিখেছে, পড়বে না ?'

সঙ্গে সঙ্গে শবু চোখে চশমা লাগিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। কানাই লিখেছে—

কাকলীর কাছে জানলাম মেজদি এখন বেশ হাঁটা চলা করছে, কথা বলছে। জেনে খুব ভাল লাগছে, বাবাও শুনে ভারি খুশি হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে মেজদিকে এখানে নিয়ে আসবেন। আশা করছি মিঠিদের স্কুলের ছুটি শেষ হবার আগে ওদেরকে নিয়ে আপনারা একসঙ্গে আসতে পারবেন।···

চিঠি পড়ে শবু জিজ্ঞেস করল—'নিয়ে যাবেনা আমাকে বাবার কাছে ?'

'নিশ্চয়ই, ডাক্তাররা যেদিন বলবে সেদিনই নিয়ে যাব। তোমার শরীর ত দুর্বল, আমরা তাই ফার্স্ট ক্লাশে যাব। কিন্তু বাড়ীতে কাকে রেখে যাওয়া

যায় ?' দীননাথ চিন্তায় পড়ে গেছে।

শবু একটু ভেবে বলল—'সুরমা-কমলরা থাকবে আমাদের বাড়ীতে।'

'হ্যাঁ ঠিক। ওরা দরকার হলে এক দুমাস এসে থাকতে পারে।'

শবুর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আশৈশব পরিচিত মন্দির শহরের কত ছবি, কত স্মৃতি—মনে জেগেছে আশা, বাবাকে দেখবে, বাবার ওষুধ খেয়ে সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠবে।

মানুষ ত কত আশাই করে!

আবার একদিন সাহেব এসে বলল—'এখন ত বেশ ভাল আছেন। আর কদিন দেখে আপনাকে ছেড়ে দেব।'

বিকেলে সে কথা দীননাথকে বলতে সে বলল—

'সে ত খুব ভাল কথা। তোমার কেমন মনে হচ্ছে?'

'এমনিতে ত ভালই। কিন্তু দাঁতটা যে ভাল হল না। তুমি একটু সাহেবকে বোলো তো।'

দীননাথ বলল—'আমার সঙ্গে ত সাহেবের দেখা হয় না। তার জন্য সকালে আসতে হয়। তুমি ত কথা বলতে পার, তুমি ডাক্তারকে কি কি অসুবিধে হচ্ছে সব বোলো।'

'বলব? রেগে যাবে না ত?'

'না, রাগবে কেন?'

'এরা সাহেবকে দেখে সবাই যা ভয় পায়। আমাকে যদি বকে?'

'সে ওদের কাছে সাহেব, তোমার কাছে শুধুই ডাক্তার। দেখো, কিছু বলবে না।'

'ঠিক আছে, বলব তাহলে, কেমন?'

'হ্যাঁ, বোলো।'…

পরদিন সাহেব এসে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করতেই বলে ফেলল—

'আমার দাঁত।' বলেই শবু ভাবছে এই বুঝি সাহেব ধমকে উঠবে। উল্টে সাহেব হেসে বলল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। দাঁত কি বলছিলেন?'

'দাঁতের এখানটায় কেমন যেন লাগে।'

'আর কি অসুবিধে হয়?'

একটু ভেবে শবু বলল—'মাথার ভিতর মাঝে মাঝে কেমন লাগে, যেন সব ভুলে যাই। কথা বলতে বেধে বেধে যায়।'

'ছোটবেলা থেকেই কি কথা বলতে বাধতো?'

'এক সঙ্গে বেশী কথা বলতে বাধতো।'

সাহেব বলল—'অন্য সব অসুবিধের ব্যাপারে ওষুধ চলছে। তবে দাঁতের ব্যাপারটা···ডাঃ নন্দী, একবার দাঁতের ডিপার্টমেন্টে চেক্ আপ করিয়ে নাও। দরকার হলে দাঁত তুলিয়ে নেবে।···ঠিক আছে, আমরা দেখছি।'

বলে শবুর দিকে তাকিয়ে হেসে সাহেব অন্য রুগী দেখতে এগিয়ে গেল।

খানিক বাদে একজন নার্স এসে বলে গেল—'কাল সকালে আপনার দাঁত দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে।'

বিকেলে দীননাথ আসতেই শবু বলল—

'জানো, আমি সাহেবকে সব বলেছি। কাল আমার দাঁত দেখাতে নিয়ে যাবে।'

'তুমি ত মস্ত কাজ করেছ দেখছি।'

গর্বে শবু গা মাথা দুলিয়ে বলল—'হুঁ, হুঁ, সবাইকে বাজিয়ে নিয়েছি।' নিজের বাহাদুরীতে সে নিজেই মুগ্ধ।

দীননাথ আরো একটু বাহবা দিয়ে বলল—'বাহাদুর 'ব' এর বাহাদুর বৌ। এই ত কত সহজে কাজটা হয়ে গেল। আমার ভীরু পাখীটা ভয়েই মরে।'

চিরকাল ভয় করে করেই ত আজ তার এই অবস্থা। সত্যি ত, একটু সাহস থাকলেই অনেক কিছু হয়। কিন্তু···একটু ভেবে শবু বলল—'আমার মন বড় দুর্বল।'

'সব সময় দুর্বল দুর্বল ভেবো না ত, তাতে শরীর মন আরো দুর্বল হবে।'

পাঁচ

এই দাঁত তোলা নিয়েই শবুর হাসপাতাল বাসের মেয়াদ সপ্তাহখানেক বেড়ে গেল। পরদিন কথামত দাঁতের ডাক্তার শবুর দাঁত পরীক্ষা করে বলে দিয়েছে—দুটো দাঁত তোলা হবে পরের মঙ্গলবারে।

এরমধ্যে রবিবারে এসেছিল তপু আর বেলা। দুজনেই অনেকদিন আগে তৈরী করতে দেয়া ব্লাউজ দুটো সেলাই করে এনেছে। শবু খুশি হয়ে বলেছে—ব্লাউজ সেলাই করে এনেছিস? দে আমাকে পরিয়ে দে। আজ সোমবার বা শুক্রবার নয়ত? ঐ দুদিন নতুন জিনিষ পরতে নেই।

দুটো ব্লাউজই পর পর গায়ে দিয়ে দেখেছে, ওরাও খুশি হয়ে বলেছে—হ্যাঁ দুটোই গায়ে বেশ ফিট্ করেছে।

হঠাৎই তার মন উদাস হয়ে গেছে—যে সময় ব্লাউজ দুটো করতে দেয়া হয়েছিল তখন করে দিলে সে গায়ে দিয়ে বেড়াতে যেতে পারত, এখন কি আর বেড়াতে যাওয়া হবে? তবু ছোট বোনেরা এত আগ্রহ আর যত্ন করে তৈরী করে এনেছে, ওকথা বলে তাদের মনে দুঃখ দিয়ে কি হবে। শবু অন্য কথা তুলেছে—

—জানিস, আমার দাঁত তোলা হয়েছে।

—কই, দেখি?—ওপু বেলা দুজনই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

দীননাথ শুধরে দিয়েছে—হয়েছে না, দাঁত তোলা হবে। সামনের মঙ্গলবারে।

শবু লজ্জিত হয়ে বলেছে—ঐ দেখ, ভুল হয়ে গেল। হয়েছে না, হবে।

আজকাল তার এরকম দু চার কথা ভুল হয়ে যায়। চিরুণীর কথা বলতে 'চশমা' বলে, জল চাইতে 'গামছা' চেয়ে বসে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শবু প্রস্তুত হয়ে বসে আছে এমন সময় সিস্টার এসে বলে গেছে—আজ দাঁত তোলা হবে না।

কথাটা ঠিক তার মাথায় ঢোকেনি। তবে কি দাঁত তোলা হয়ে গেছে? কখন তুলল? এমনি সব সাত পাঁচ ভাবছিল এমন সময় কল্পনা কোথা থেকে টহল দিয়ে এসে বলেছে—

—মাসী, মেসো এসেছে, দেখবে এসো।

বাজে কথা, মেসো এলে ত আগে তার কাছে আসবে, কল্পনা খবর দেবে তবে সে জানবে? শবু মুখ ঘুরিয়ে বসে থেকেছে।…

কল্পনা আবার বলেছে—বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার সঙ্গে ভিতরের বারান্দায় এসে নীচের আঙিনায় তাকিয়ে দেখ, দেখতে পাবে।

তবে কি শবুর দাঁত তোলা হয়ে গেছে খবর পেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছে? প্রবল আগ্রহে কল্পনার সাহায্য ছাড়াই শবু ভিতরের বারান্দায় গিয়ে রেলিংএ ঝুঁকে পড়েছে—সত্যিই ত দীননাথ দাঁড় করানো মোটর বাইকের উপর বসে কার যেন প্রতীক্ষা করছে। আনন্দে অধীর হয়ে শবু হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে বলেছে—

—এই যে, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ?

দীননাথও নীচে থেকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলেছে, শবু

কিছুই শুনতে পায় নি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই সিষ্টার জিজ্ঞেস করেছে—কি হয়েছে?

শবু নীচে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছে—ঐ ত, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

কল্পনা সিষ্টারকে বলেছে—নীচে মেসো এসেছে, তাই মাসীকে দেখাচ্ছিলাম।

বোধ হয় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বলে সিষ্টার নিজের কাজে চলে গেছে।

শবুর মন সে কথা মানতে রাজী হয় নি। সে রেলিংএর উপর ঝুঁকে পড়ে পাগলের মত হেসে কেঁদে বারবার জিজ্ঞেস করেছে—তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ? কিন্তু চারতলা থেকে একতলা তারা কেউ কারো কথা শুনতে পায়নি।

শেষে কল্পনা যখন বলেছে—মেসো এখন আসতে পারবে না, বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সিষ্টার বকবে। তখন ক্ষুণ্ণ মনে শবু বিছানায় ফিরে এসেছে। দু চোখ ফেটে তার জল গড়িয়ে পড়েছে—এত কাছে এসেছে মানুষটা অথচ তার একটা কথাও শোনার উপায় নেই। কিন্তু মোটর বাইক নিয়ে এসেছে—সে ত এখন ওতে চড়তে পারবে না, নৌকো লাগান হয়নি যে।

দাঁত তোলার দিন সকালে দীননাথ যে আসবে বলেছিল সে তা ভুলে গেছে।

বিকেল হতে দীননাথ এসেছে, জিজ্ঞেস করেছে,—তখন তুমি কি বলছিলে উপর থেকে?

—তখন তুমি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলে? আমার দাঁত তোলা ত হয়ে গেছে।

—না দাঁত তোলা হয়নি। দেখি—ঐ ত তোমার সবগুলো দাঁতই আছে। দাঁত তুললে তুমি বুঝতে পারতে।

—কি জানি। তবে সিষ্টার কি যেন বলে গেল।

—আমার সঙ্গে ডাক্তার নন্দীর দেখা হয়েছিল। বলেছে, দাঁত তোলার আগে যে ওষুধ খাওয়াতে হয় সেটা খাওয়ায় নি ওদের ভুলে। সেই ওষুধ আজ থেকে খাওয়াবে তারপর শনিবারে তোমার দাঁত তুলবে। আজ তোমার দাঁত তুলবে বলে সকালে এসেছিলাম।

এতক্ষণে সে বুঝেছে তার দাঁত তোলা হয়নি। হঠাৎ মনে পড়তে সে জিজ্ঞেস করেছে—তুমি সকালে বিকেলে দুবার এলে আজ ?

দীননাথ বলেছে—না, আমি দুপুরে এখানকার ক্যান্টিনেই খেয়ে আউট-ডোরের বেঞ্চে শুয়ে কাটিয়েছি।

আহা, মানুষটার কত হচ্ছে! বেদনায় শবুর বুকের ভিতর টনটন করে উঠেছে। দীননাথের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছে। কনুইএর হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, লম্বা মানুষটাকে ভীষণ রোগা দেখাচ্ছে। আদর করে জিজ্ঞেস করেছে—হ'্যা, তোমার দুর্বল লাগে ?

—না, ঠিক আছে। তুমি ভাল হয়ে বাড়ী চল, তখন আমার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিও, কেমন ?

—আচ্ছা, বাবার কাছ থেকে পয়লা বৈশাখের চিঠি আসেনি ?—শবু জানতে চেয়েছে।

—না, তার আগেই হয়ত তোমার অসুখের খবর পেয়ে গেছেন।

হ্যাঁ, বাবা ডাক্তারখানা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সময়মত চিঠি লেখা হয়না। মা থাকলে ঠিক পয়লা বৈশাখেই চিঠি লিখত।—আচ্ছা আমি কতদিন হল হাস-পাতালে আছি বল ত ?

দীননাথ বলেছে—কত আর হবে, দুসপ্তাহ মত।

শবুর বিশ্বাস হয়নি। সেদিন কল্পনারা বলাবলি করছিল জ্যৈষ্ঠমাস পড়ে গেছে, আর সে পড়ে গিয়েছিল সে ত পয়লা বৈশাখ। দীননাথের মুখ দেখেও মনে হয়েছে সে ঠিক কথা ইচ্ছে করেই বলছে না।·· যাক গে।

আরো তিনদিন পরে দাঁত তোলা। ফর্সা সাহেব এসে শবুর সাহেবকে বলেছে—একি, একে এখনও রেখেছেন কেন, ছেড়ে দিন। রুগী ত ভাল হয়ে গেছে।

শবু বলেছে—আমি দাঁত না তুলে যাব না। হেসে শবুর ডাক্তার বলেছে—হ্যাঁ, গোটা দুই দাঁত তোলার কথা আছে, সেটা হয়ে গেলেই ছেড়ে দেব।

ডাক্তারদের কথামত কল্পনা রোজ একবার করে শবুকে বারান্দা দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত হেঁটে বেড়িয়ে নিয়ে আসে। একদিন শবু বলেছে—আমি আগে যে ঘরে ছিলাম সেখানে নিয়ে চল।

কল্পনা বলেছে—সেখানে যেতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হবে, তুমি পারবে না মাসী।

আগের ঘরটা শবুর আর দেখা হয়নি।

সেদিন বর্মা সাহেবকে যে কথা বলেছে সেকথা দীননাথকে বলতে সে বলেছে—বাঃ, এই ত তোমার সাহস কত বেড়ে গেছে। হাতের জোরও বেড়েছে। বাবা, কানাইকে চিঠি লিখবে না? দেখি কেমন লিখতে পার।

বলে দীননাথ তার পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে এগিয়ে দিয়েছে। সেও কাগজ কলম বাগিয়ে ধরে বাংলা ইংরেজীতে গোটা গোটা অক্ষরে নিজের নাম, বাবা, কানাই, মিঠি দিঠি মিষ্টি সবার নাম লিখেছে। শেষ দিকে তার লেখাটা যেন কেমন জড়িয়ে গেছে।

দীননাথ বলেছে—থাক, থাক, আজ অনেক লেখাপড়া হয়েছে, আবার কাল হবে। বলে সে আদর করে শবুর গাল টিপে দিয়েছে।

দীননাথ হ্যাণ্ডশেক করে চলে যেতে শবুর মাথায় হাজারো চিন্তা ভিড় করেছে। ঠিক করেছে কাল সে এলে তাকে অনেক প্রশ্ন করবে। নিশ্চয়ই তার টাকা পয়সার টানাটানি পড়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে তার সই লাগে, সেজন্যই হয়ত হাতের লেখা পরীক্ষা করছিল।

—আচ্ছা, তুমি কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?—পরদিন দীননাথ আসতেই শবু জিজ্ঞেস করেছে।

—না, ছাড়িনি ত, শুধু নোটিশ দেয়া আছে। আমি এখন ছুটিতে আছি।

—মাইনে পাচ্ছ কি?

—হ্যাঁ, এখনো পাচ্ছি। সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

—আচ্ছা, আমার কী অসুখ করেছে?

—তোমার চিন্তামণি অসুখ করেছে। তুমি ওসব চিন্তা ছাড়, কোনরকম চিন্তা কোরো না।

—না, ঠাট্টা নয়, সত্যি করে বলো না।

—ডাক্তাররা আজকাল অসুখের নাম বলে নাকি? জিজ্ঞেস করলে বলে অসুখের নাম বললে বুঝবেন? আপনি কি ডাক্তার?

—তা না হয় হ'ল। আচ্ছা, আমার জন্য তোমার অনেক টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে তাই না? কানাই, ছোড়দা কেউ তোমাকে টাকা দেয়নি? কত খরচ হল বল ত?

—খরচের জন্য ভেবো না। কানাই মহীতুজনেই কিছু কিছু দিয়েছে। না চাইতে শেফালী সোনা এক হাজার করে টাকা দিয়েছে, ভবও পাঁচশ দিয়েছে। অমল একদিন দু'শ টাকা দিয়েছিল, ফেরৎ দিতে গেলে নেয় নি। টাকার কোন অভাব হচ্ছে না। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আবার সব হবে।

মানুষের জীবন আগে।…আজ একটু লেখাপড়া হবে না?

—আজ থাক, আজ অনেক কথাবার্তা হল ত। কেমন?

শবু মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছে। দীননাথ হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেছে।

একদিন দীননাথের সঙ্গে তার বন্ধু সমীরবাবুও এসেছে, বিছানার পাশে এসে জিজ্ঞেস করেছে—বৌদি, কেমন আছেন?

—'ভাল আছি' বলতে গিয়ে শবুর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

সমীর দরদী স্বরে বলেছে—কাঁদবেন না বৌদি, আপনি ত ভাল হয়ে গেছেন।

না, শবু সেজন্য কাঁদেনি। তার মনে পড়ে গেছে বাড়ীর কথা, পাড়া প্রতিবেশীর কথা। কবে যে নিজেদের ঘরে ফিরবে।

দীননাথ বলেছে—সমীরবাবু আর আমি আজ মোটর বাইকের ট্যাক্স দিতে এসেছিলাম, আমরা এক সঙ্গেই ফিরব।

অবশেষে দাঁত তোলা হল। ঠেলা চেয়ারে বসে লিফটে করে নীচে নেমেই দীননাথকে দেখতে পেয়ে শবুর মুখে হাসি ফুটেছে। চেয়ারটা কিছুদূর ঠেলে নিয়ে আবার কিছুটা হাঁটতে হয়েছে—সে সময় দীননাথ পাশে থেকেছে। দাঁতের ডাক্তার প্রথমে মাড়ীতে ইঞ্জেকশন দিয়ে কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে পরে দাঁত তুলে দিয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দীননাথকে আবার দেখতে পেয়ে মুখে তুলো নিয়েই খুশিতে শবু বলে চলেছে—'কি সুন্দর দাঁত তুলে দিল, আমার একটুও ব্যথা লাগেনি। কটা দাঁত তুলল বুঝতেই পারলাম না।'

দীননাথ বলল—'দুটো দাঁত তুলেছে, আমি পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম।'

—'তাই নাকি, আমি দেখিনি। ভেবেছিলাম খুব ব্যথা লাগবে, একটুও লাগেনি।'

দীননাথ বলল—'মুখে তুলো নিয়ে বেশী কথা বোলো না, মাড়ী দিয়ে রক্ত পড়বে।'

তবু খুশিতে শবুর কথা ফুরোতে চায় না। শেষে লিফট উপরে উঠতে লাগলে দীননাথ যখন নীচে দাঁড়িয়ে বলল—'আমি আবার বিকেলে আসব' তখন তার কথা বলা থামল।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নার্স বলে গেল—

'আজ আপনার শুধু ঠাণ্ডা লিকুইড খাওয়া, কাল খাবেন গলা-ভাত।'

বিকেলে আবার দীননাথ আসতে শবু জিজ্ঞেস করল—'আমার দাঁত রেখে দিয়েছ?'

'কেন ?'

'ওমা, তোলা দাঁত যে গঙ্গায় বা সমুদ্রে ফেলতে হয়। সেবারে পাটনায় ডাঃ চ্যাঙের দোকানে যার যত দাঁত তোলা হয়েছিল সেগুলো পাটনার গঙ্গাতে ফেলা হয়েছিল না ? তোমার কিছু মনে থাকে না।'

দীননাথ একটু ভেবে বলল—'ডাক্তাররা সে কথা নিশ্চয়ই জানে। রোজ যত দাঁত তোলে বালতি ভর্ত্তি করে এখানকার গঙ্গায় ফেলে আসে নিশ্চয়।'

তা হলেই হল, শবু নিশ্চিন্ত। জিজ্ঞেস করল—

'আজো ত সকালে এসেছ, কোথায় খেলে ?'

'এখানকার ক্যান্টিনে। তুমি ওরকম করে কথা বলছ কেন ?'

'মনে হচ্ছে দাঁতের মাড়ীতে ব্লটিং লাগিয়ে রেখেছে।'

'কই দেখি' বলে আস্তে করে মুখে চামচ ঢুকিয়ে দুই দলা তুলো বের করে এনে দীননাথ বলল—'এই দেখ তোমার ব্লটিং পেপার। তুমি তুলো মুখে করেই আজ খাওয়া দাওয়া করেছ নাকি ?'

কি জানি, তা হবে, তাইত এতক্ষণ মুখের ভিতর কেমন কেমন লাগছিল।

'তোমাকে নিশ্চয়ই আজ ভাত খেতে দেয়নি। নাও হরলিকস খাও' বলে দীননাথ হরলিকস, মৌসম্বীর রস, বেদানার রস খাইয়ে শেষে দুটো রসগোল্লা খেতে দিয়ে বলল—'রসগোল্লা খেলে কিছু অসুবিধে হবে না।'

শবু মনের আনন্দে খেতে খেতে বলল—

'আর কদিন পরে ত আমি বাড়ী যাব ? আমাকে কিন্তু রোজ দুটো করে রসগোল্লা খেতে দেবে, কেমন ?'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

শবু এখন বাড়ী যাবার জন্য মনে প্রাণে ব্যাকুল।

ছয়

এবারে সত্যিই সে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে যাবে। শবুর সাহেব এসে হেসে জিজ্ঞেস করেছে—

'কেমন আছেন ? আপনার দাঁত তোলা ত হয়ে গেছে। আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত ?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

'কেন, কথা বলতে কোন অসুবিধে হচ্ছে কি ?'

'না।'

'কটা দাঁত তুলেছে ?'

'দুটো।'

'হাত দুটো মাথার উপরে তুলুন ত। হয়েছে। এবারে আমার সঙ্গে হাঁটুন ত।'

শবু চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে ওয়ার্ড থেকে বারান্দা পর্য্যন্ত ঘুরে এল।

'এই ত সব ঠিক আছে। কাল পরশুই আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনার বাড়ী কোথায় ?'

'চাঁপা-নিমপুর।'

'চাঁপা আবার নিম—মস্তবড় নাম ত ?' সাহেব হেসে ঠাট্টা করল। 'বাড়ীতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন। আপনি নাকি বাপের বাড়ী যাবেন বলেছেন ? বাপের বাড়ী কোথায় ? সেখানে কে কে আছেন ?'

'মন্দির শহরে। বাবা আছে, ভাই, ভাইবৌ ভাইঝিরা আছে।'

'বেশ, বেশ, বাপের বাড়ীও যাবেন, তবে এখনই নয়, পরে—আমরা যখন বলব।'

সাহেব চলে যেতে শবু আনন্দে অধীর হয়ে উঠল দীননাথকে খবরটা জানাতে। কিন্তু আসার সময় আর আসতেই চাইছে না। সময় হল, ওয়ার্ডে লোকজন এসে ভরে গেল অথচ দীননাথের দেখা নেই।

বেশ কিছুটা পরে হন্তদন্ত হয়ে দীননাথ কাছে আসতে শবু অভিমানে কেঁদে ফেলল—

'আজ সাহেব আমাকে বলল কাল পরশু ছেড়ে দেবে, সেই খবরটা তোমাকে দেব বলে কখন থেকে বসে আছি আর তুমি এত দেরী করে এলে !'

আদর করে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে দীননাথ বলল—'কাঁদেনা লক্ষীটি, কাঁদলে শরীর খারাপ হবে। তুমি বাড়ী গিয়ে টিভি দেখবে ত, তাই ষ্টেবি-লাইজারটা আগে থেকে সারাতে দিয়েছিলাম। সেটা নিতে গিয়েই পথে দেরী হয়ে গেল। না হলে ত দেখেছ আমি কোনদিন এক মিনিটও দেরী করে আসিনি। সাহেব ছেড়ে দেবে বলেছে ? আমিও আজ রাতে ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে দেখা করে জেনে নেব কবে তোমাকে ছাড়বে। আর বললেই আমার আদরিণীকে বাড়ী নিয়ে যাব।'

শবু লজ্জিতভাবে চোখ মুছে বলল—'আচ্ছা, আমি বাপের বাড়ী যেতে চাই সাহেব জানল কি করে?'

'আমি একদিন ডাক্তার নন্দীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে-ই হয়তো বলেছে।'

শবু একটু চুপ করে থেকে বলল—'ব' রে, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি কথা?'

'আমাকে কিছু টাকা দেবে? আমি উষাকে দেব।'

'দিও। উষা, কল্পনা—যাকে যা দিতে চাও।'

শবু বাইরে জানালার দিকে মুখ করে বসে কথা বলছিল, পিছনে ওয়ার্ড ভর্তি লোক! একটু আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—

'আমাদের কথা কেউ শুনছে না ত? কল্পনা পিছনে কোথাও নেই ত?'

'না, কেউ শুনছে না।'

শবু বলল—'কল্পনাটা পাজী, আমাকে নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে। আমি শুধু উষাকে দেব, উষা কি সুন্দর আমার যত্ন করে।'

'উষাকেই তবে দিও। কত দেবে?'

'তোমার অনেক খরচ পত্তর হয়ে গেল। বেশী বলব না, পাঁচ টাকা।'

'তাই দিও। যেদিন তোমাকে ছাড়বে তার আগের দিন তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেব, রাতে উষাকে দিয়ে দিও। কিন্তু কল্পনা যদি দেখতে পায়?'

'না, সে জানতেই পারবে না। টাকাটা আমি কোল আঁচলে বেঁধে রেখে দেব, কল্পনা চলে গেলে রাতে উষাকে দেব।'

এদিক থেকেও শবু মনে মনে নিশ্চিন্ত হল।

পুটু অমল ভব শেফালী সুরমা এলা রমেন এর মধ্যে এসে এসে খবর জেনে গেছে—শবু শিগগিরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছে। সুরমাকে সে বলে রেখেছে—আমরা বাপের বাড়ীতে গেলে তোরা এসে আমাদের বাড়ীতে থাকবি। সুরমা রাজী হয়েছে।

আজ দীননাথ আসার একটু পরেই সুপর্ণা এসেছে। এসেই জিজ্ঞেস করল—

'সেজকাকী, তোমাকে নাকি কাল ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ তো।' বলতে গিয়ে শবু আহ্লাদে গদগদ।

'দেখি, তোমার হাতের জোর কেমন আছে। আচ্ছা, এবার একটু হেঁটে দেখাও ত।'

'তোকে দেখাতে যাব কেন? আমি সাহেবকে হেঁটে দেখিয়েছি।'

'আমাকে দেখাও. না হলে ডাক্তারকে বলব, তোমাকে আরো কদিন রেখে দেবে।'

'তুমি চুপ করবে?'

'তবে হেঁটে দেখাও।'

'ওকে চুপ করতে বলত।' শবু যেন ছেলেমানুষ, একমাত্র আপনজন দীননাথের কাছে নালিশ জানাল।

দীননাথ বলল—'তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।'

না, বাড়ী যাবার ব্যাপারে ঠাট্টা ভাল লাগেনা। কবে থেকে বাড়ী যাবার জন্য তার মন আঁকুপাঁকু করছে।

দীননাথ একটা পাঁচ টাকার নোট দিলে শবু এদিক ওদিক চেয়ে কোল আঁচলে বেঁধে নিল, যাতে উষাকে দেবে।

অনেক আশা নিরাশায় দুলে শবু এবার সত্যি সত্যিই বাড়ী ফিরছে।

অবশ অবসন্ন দেহ, অর্ধচেতন মন নিয়ে সে হাসপাতালে এসেছিল। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে সে আজ মোটামুটি ভাল হয়ে বাড়ী ফিরবে। তার জীবনী শক্তি, না আয়ু কিম্বা জীবনদায়ী ওষুধ কার গুণে এমন অসাধ্য সাধন হল তা বলা যায়। যে কারণেই হোক সে চলতে ফিরতে সক্ষম হয়েই বাড়ী ফিরছে এটাই সত্যি। কতখানি সে ভাল হয়েছে, কতটা সুস্থ হয়েছে তা সে নিজেই জানেনা। সে শুধু বাড়ী ফেরার আনন্দে আবেগে আকুল।

আনন্দের আতিশয্যে উষাকে সে পাঁচ টাকার সঙ্গে একখানি পরার শাড়ীও দিয়েছে। কল্পনার দুর্ব্যবহার ভুলে তাকেও একখানি শাড়ী দিয়ে দিয়েছে—আহা, যাই বলুক না, কতদিন সেবা করেছে। বেশী টাকা চেয়ে রাখলে তাকেও কিছু দেয়া যেত। সে এখন কথা বলতে পারে, হাঁটা চলা করে, বুদ্ধি বিচার বিবেচনা চিন্তা ভাবনা সবই করতে পারে—সুতরাং তার খুশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। সবার উপরে আছে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার আনন্দ আবেগ।

…এল সেই বিকেল। কল্পনা তাকে সাজিয়ে দিতে লেগেছে। এমন

সময় বেলাকে ওয়ার্ডে ঢুকতে দেখে শবু বলে উঠল—

'ওমা বেলা, আজ আবার তুই এলি কেন? আমি ত আজ বাড়ী যাচ্ছি।'

বেলা বলল—'আমি ত তোকে বাড়ী নিয়ে যেতেই এসেছি। কাল জামাইবাবু আমাকে বলে গেছে—কাল তোর মেজদিকে ছেড়ে যেবে তুই আগে গিয়ে ওকে সাজিয়ে দিস।'

'তা বেশ করেছিস। দে, সাজিয়ে দে।'

কল্পনা বেলা দুজনে মিলে শবুকে সাজিয়ে অন্য সব জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়েছে একটি ব্যাগে। দীননাথ ছুটির কাগজ পত্তর নিয়ে এসে শবুর দিকে চেয়ে হেসে বলল—

'বাঃ, তুমি ত একেবারে রেডি। চল এবারে আমরা বাড়ী যাই।'

হ্যাঁ, বাড়ী ফেরা। শবু মনের আনন্দে মাথার উপরে দুহাত তুলে নাড়াতে নাড়াতে উপস্থিত নার্স ও রোগিণীদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল—

'আমি চললাম, আমি চললাম, আর আসব না।'

বলতে বলতে বেলা ও কল্পনার সঙ্গে হেঁটে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীননাথ সিস্টারের কাছ থেকে পরে কি কি করতে হবে জেনে এসে কল্পনাকে পাওনা টাকা মিটিয়ে দিলে সে চলে গেল। তিনজনে নীচে নেমে লম্বা করিডোর পায়ে হেঁটে পার হল। দীননাথ ট্যাক্সি ডাকতে গেল, বেলা আর শবু পাশের একটি বেঞ্চে বসল।

মনে হচ্ছে পাশের ঐ ঘরে উঁচু বিছানাটাতে প্রথমদিন তাকে এনে শুইয়েছিল। সেদিন সে এসেছিল স্ট্রেচারে শুয়ে—আজ সে ফিরে চলেছে পায়ে হেঁটে। এবার শবু দীননাথ আর বেলার একটা করে হাত ধরে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে ফুটপাথ দিয়ে কিছুটা হেঁটে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসল।

উঃ, আজ সে কত হেঁটেছে! মনে হচ্ছে পথের সব লোক তার দিকে চেয়ে আছে। সবাই দেখেছে—শবু হাঁটছে। লজ্জায় সে কারো দিকে চাইতে পারছে না—শুধু লজ্জা নয়, গর্বও।

গাড়ীতে চলতে চলতে দীননাথ বলল—'আজ আর কাল তিন তিনটি ঘটনা ঘটেছে। জলের চৌবাচ্চায় একটা কাকের বাচ্চা মরে ভাসছিল, একটা উড়ন্ত চড়ুই সিলিং পাখায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে মরে গেল। আর কাল সুপর্ণাকে নিয়ে মোটর বাইকে যেতে গাড়ীর আলো জ্বালতে গিয়ে চাবিটা ভেঙে গেল।'

একসঙ্গে তিন তিনটি দুর্ঘটনা—অন্য সময় হলে শবু চিন্তায় পড়ে যেত।

কিন্তু আজ সে অনেকদিন পরে বাড়ী ফেরার আনন্দে বিভোর। তবু মনে হচ্ছে—সে চড়ুই পাখীটা মদ্দা না মাদী ছিল? থাকগে, কি হবে জেনে…।

বাড়ীর কাছে রায়বাবুদের সামনের রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াতে পাড়া যেন ভেঙে পড়ল। সেদিন যারা তাকে স্ট্রেচারে শুয়ে যেতে দেখেছিল আজ তারাই দেখছে শবু নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ীতে ফিরছে। রায়গিন্নী আর দাস গিন্নীর উদ্দেশ্যে শবু হাত নেড়ে বলল—

'আমি আবার যাব।'

বেলা পাশ থেকে বলল—'যাব কিরে? বল 'আবার এলাম।'

'সব কথাতেই ভুল ধরা! যাওয়া মানেই ত আসা।'

শবুর জীবনে এখন যাওয়া আসা একই কথা।



দশম পর্য্যায়

এক

আঃ, কতদিন পরে শবু আবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এল। মনে মনে সে প্রচণ্ড খুশি। একদিন যখন সে স্ট্রেচারে শুয়ে রওনা হয়েছিল তখন কি ভাবতে পেরেছিল আবার সে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরবে ?

দীননাথ যতক্ষণ গেটের তালা খুলছিল ততক্ষণে সন্ধ্যা ছুটতে ছুটতে এসে বলল—

'এই ত মাসী ভাল হইয়া আইছে। আমি কইছিলাম না মাসী ভাল হইয়া আইবোই।'

শবু হেসে একবার তার দিকে তাকাল। এতক্ষণ পথ চলার ক্লান্তিতে এখন তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। তবু মনের উৎসাহে আগে অন্য সব ঘর ঘুরে দেখে কলতলা থেকে হাত পা ধুয়ে এসে বড় শোবার ঘরটাতে ঢুকল। একি, বিছানাটা ওখানে কেন ?

দীননাথ বলল—'তুমি যাতে বিছানাতে বসেই ড্রেসিং আলমারী, আয়না ব্যবহার করতে পার আবার শুয়ে শুয়ে টিভিও দেখতে পার তার জন্য আজই সকালে চৌকিটা ওখানে সরিয়ে পেতেছি।'

তা বেশ হয়েছে। শবু সটান রিছানায় শুয়ে পড়ে বলল—'আমি একটু ঘুমোই ?'

বেলা বলল—'মেজদি, তুই ঘুমো, আমি এখন বাড়ী যাই ? কাল মিঠি দিঠিকে নিয়ে আবার আসব।'

'আচ্ছা' বলে শবু তপুদের পুরোনো হয়ে যাওয়া বিয়ের নাইলনের মশারীটা দীননাথ টাঙিয়ে দিতে দিতে নিজেদের বাড়ীতে নিজের বিছানায় গভীর সুখে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে একটু টিভিও দেখল। শোবার ঘরেই চেয়ার টেবিল টানাটানি করে দীননাথ খাবার সাজালে চেয়ারে বসে একসঙ্গে রাতের খাওয়া সেরে নিল। দীননাথ তাকে নিজে হাতে খেতে দেখে বলল—'অনেকদিন পরে তোমাকে নিজে হাতে খেতে দেখে কি যে ভাল লাগছে।'

শবু শুধু একটু সলজ্জ হাসল। তারও যে খুব ভাল লাগছে।

রাতে আবার তারা দুজনে এক বিছানায় শুয়েছে। দীননাথ আদর করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কথা বলে চলল।···দিন পনরো রোজ একটা করে ইঞ্জেকশন ও অন্য ওষুধ চলবে। পরে ডাক্তাররা বললে শবুকে নিয়ে মন্দির শহরে যাবে, সুরমারা বাড়ীতে থাকবে। এক দুমাস বাপের বাড়ীতে থেকে শরীরটা আরো ভাল হলে তারা ফিরে আসবে। চাকরি ছাড়লেও কোন অসুবিধে নেই, পেনসন গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের টাকায় নিশ্চিন্তেই চলে যাবে। প্রয়োজনে বাড়ীর ওপাশের অংশ আলাদা করে ভাড়া দেয়া হবে। সন্ধ্যা. বা তার বিয়ে হয়ে গেলে অন্য রাঁধুনী, বাড়ীতে রান্না করবে। সে নিজে সব সময় শবুর কাছাকাছি থাকবে। শরীর আরো ভাল হলে দুজনে দিল্লী হরিদ্বার বেড়িয়ে আসবে।

সব শেষে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে এসে তোমার ভাল লাগছে না? আনন্দ হচ্ছে না?'

শবুও গভীর তৃপ্তিতে স্বামীর বুকে মাথা রেখে আদর করে বলল—

'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে। তোমার শরীর কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে।'

'তুমি এসেছ আর ভাবনা কি? তোমার শরীর যত ভাল হবে আমার শরীরও ভাল হবে'—দীননাথ তাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল।

আদরে সোহাগে শবু বুঝি ভেসে যাবে, আনন্দও হচ্ছে। আবার সাবধান-ও হতে হয়—শরীর ত ভাল নয়, যদি খারাপ কিছু হয়।

মনে হচ্ছে দুঃখের রজনী শেষ হয়েছে—কান্নার বাসরের বদলে আবার বসেছে কি সুখের বাসর?

সকাল থেকেই এক এক করে কত লোক আসতে যেতে লাগল। প্রথমে এলেন মামীমা, দুলু তাঁকে শবুর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য দিন পনরো আগে ভুলুর কাছে রেখে গেছে। দুলু আজ শিয়ালদায় সকালে অফিসের গাড়ী নিয়ে মার জন্য অপেক্ষা করবে তাই মামীমা বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। শবুকে মোটামুটি সুস্থ দেখে খুশি হয়ে তিনি বলে গেলেন—'শ্রাবণী, তোমার অসুখ শুনে থেকে আমার কিছু ভাল লাগেনা। তোমাকে দেখতে আসতে চাইলে দুলু বলে—না, তোমার হার্টের অসুখ, হাই প্রেসার, তোমার হাস-পাতালে যাওয়া হবে না; তুমি বাড়ীতে গিয়ে দেখবে। এখানে তোমাকে দেখে মনে একটু শান্তি পেলাম। মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সম্পূর্ণ

সুস্থ হয়ে ওঠ। আসি এখন, কেমন? যদি বেঁচে থাকি আবার আমাদের দেখা হবে।'

বহুদিনের সুখ দুঃখের সাথী অতি মরমী মামীশাশুড়ীর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে শবু বলল—

'আসুন মামীমা। সাবধানে থাকবেন।'

এদিকে তার মন বলছে—এই হয়ত তাদের শেষ দেখা!

একটু বেলা হতে এল দিদি জবা—সোজা একেবারে উত্তরবঙ্গ থেকে। তার ছেলে ভোলার বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই ভাই বোনদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

শবুকে একভাবে বিছানায় শুয়ে-বসে থাকতে দেখে ও সব শুনে জবা বলল—

'শ্রাবণীর এত বড় অসুখ গেল, কেউ আমাকে একটা খবর দিলনা!'

দীননাথ বলল—'কে খবর দেবে? আমাদের খবর কে নেয় তার নেই ঠিক। ঐ যে হাবলুটা এতদিন এখানে থেকে লেখাপড়া করে গেল সে-ই কি একটা খবর নিয়েছে?' দীননাথ সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ।

জবা কোন জবাব দিতে পারল না। শেষে দুপুরে খেয়ে উঠে ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে—'পারলে শ্রাবণীকে নিয়ে ভোলার বিয়েতে যাস দীনু'—বলে জবা অন্য ভাই বোনদের বাড়ী চলে গেল।

দীননাথ বলে দিল—'এখন বাড়ী থেকে বাইরে যাওয়াই অসম্ভব, অতদূরে বিয়েতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

শবুর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করেনি। এখন কোথাও যাবার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া সেই বুঁচীর ঘটনার জন্য এমনিতেই দীননাথ হয়ত যেত না—মানুষটা যা একরোখা।

দুপুরের একটু পরে মিঠি দিঠিকে সঙ্গে করে এল বেলা। শবুর মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

দীননাথ বলল—'আজ ভাল দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা। তুমি আজ বিদ্যুতের দেয়া নতুন শাড়ীটা পর। বেলা, তোর মেজদিকে এই নতুন শাড়ীটা পরিয়ে দে।'

শবুও খুশি হয়ে বেলাকে বলল—'তার সঙ্গে তোর তৈরী ব্লাউজটাও পরিয়ে দে, বেশ ম্যাচ করবে।'

নতুন শাড়ী ব্লাউজ পরে বাইরের ঘরে চেয়ারে এসে বসল। বেলা মিঠি দিঠি শবুকে ঘিরে গল্প করতে লাগল।

বেলা বলল—'শাড়ীটা ত লাল খোলের উপরে, তোকে যেন বিয়ের কনেটির মত দেখাচ্ছে।'

শবু শুধু একটু হাসল। মিঠি বলল—'মেজ্‌পিস্‌, তুমি ত এখন বেশ হেঁটে বেড়াতে পার, তাই না?'

'হ্যাঁ পারি ত, এই দেখ, আয় আমার সঙ্গে' বলে সে সবাইকে নিয়ে বাড়ীর সব কটা ঘর এক চক্কর ঘুরে এসে আবার চেয়ারে বসল। মুখে তার খুশির হাসি।

দিঠি বলল—'মেজ পিস্‌, তুমি ছাদে উঠতে পার?'

শবুর মুখটা করুণ হয়ে গেল, বলল—'না রে, ওটা এখনো পারিনা।'

মিঠি তাড়াতাড়ি বলল—'এখন না পারলেও পরে পারবে, না মেজ্‌পিস্‌?'

আবার একদঙ্গল লোক এল—ভব, মালতী দুই ছেলে মেয়ে, মালতীর মা বোন এক পিসী। তারা কিছুক্ষণ শবুর সঙ্গে কথা বলে ভবর বাড়ী দেখতে গেল।

এল শেফালী, বলল—'এই ত বৌদি বেশ উঠে বসে আছ। ঝর্ণাকে নিয়ে আসব ভেবেছিলাম, দেখে কি খুশি হত। কিন্তু আজ ওদের নাচের পরীক্ষা তাই আসতে পারল না।'

শবু সকলের সঙ্গে যতটা সম্ভব হেসে কথা বলল, বসে বসেই বিকেলের জল খাবার খেল। আর সবাইও খেল।

সন্ধ্যের আগ দিয়ে বেলা বলল—'এবারে আমরা যাইরে, মেজদি। কাল বা পরশু মিঠি দিঠি বাবুলের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাবে।'

শবুর মন খারাপ হয়ে গেল। মিঠি বলল—

'এবারে কলকাতায় এসে তোমাদের বাড়ী থাকা হলনা, পরের বার এসে থাকব। তুমি দুঃখ কোরোনা মেজ্‌পিস্‌।'

শবু ওদের একটু আদর করে বলল—'গিয়ে বাবাকে, কানাইকে আমার কথা বলিস।'

দিঠি বলল—'বলব, তুমিও ভাল হয়ে আসবে, দাদু বলে দিয়েছে।'

শেফালী বলল—'আমিও এখন যাই, বৌদি।'

শবু উঠে সবার সঙ্গে বাইরের বারান্দা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। যত দূর ওদেরকে দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

অনেকক্ষণ ধরে বসে কথা বলে পরিশ্রান্ত শবু শোবার ঘরে এসে কোন রকমে নতুন শাড়ী পালটে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল—

'বাব্বাঃ, কত মানুষ এসেছিল! আমি কি এত লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

দীননাথ সব সময় কাছে কাছেই ছিল, বলল—'যে টুকু পারবে বলবে, না পারলে বলবে না।'

একটু হেসে শবু ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

'তোমার লক্ষীর কৌটোটা দেখেছ?' পরদিন সকালে জলখাবার খাওয়া হলে দীননাথ শবুকে জিজ্ঞেস করল।

'কোথায়?'

'এই ত আলমারীর মধ্যে' বলে দীননাথ কৌটোটা বের করল।

না শবু আলমারী খোলেনি, ওসবে আর কোন আগ্রহ সে বোধ করে না। চুল বাঁধতে সিঁদুর পরাতে সন্ধ্যা বা বেলা আলমারী খোলে বন্ধ করে। দীননাথ কৌটোটা তার হাতে তুলে দিতে সে সেটা খুলে ফেলল। ওমা, ক-ত টাকা পয়সা! বিছানার উপর কৌটোটা উবুড় করে সে টাকা পয়সা আলাদা করে গুণতে লাগল…

দীননাথ ততক্ষণ বলছে—'তুমি যতদিন হাসপাতালে ছিলে রোজ রাতে বাড়ী ফিরে খুচরো টাকা পয়সা কিছু কিছু তোমার হয়ে ওখানে জমা করতাম। ভাল করিনি? কত হল?'

শবু সব গুণে শেষ করতে পারছে না, বলল—

'একটাকা, পঞ্চাশ পয়সাগুলো মিলে বুঝি ছত্রিশ টাকা মত হচ্ছে। খুচরো পয়সা যে কত আছে…'

'তুমি গুণতে থাক, আমি একটু আসছি।'

শবু গুণতে গুণতে হয়রান হয়ে শুয়ে পড়ল। না আর গুণতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে যেন গুণতে ভুলে গেছে। একসময় ক্লান্ত হয়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, পাশে বিছানার উপর টাকা পয়সা ছড়ানো পড়ে রইল। এখন আর এ সবের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ হচ্ছে না। শাড়ী বাড়ী গাড়ী গয়না টাকা পয়সা কোন কিছুই আর তার মনকে নাড়া দেয়না। হাসপাতালে তাকে প্রায় নিরাভরণ হয়ে থাকতে হয়েছিল, শুধু তপুর দেয়া রূপো বাঁধানো পলা জোড়া, নোয়া আর শাঁখা ছাড়া। কাল নতুন শাড়ী পরাবার সময় বেলা এক এক করে গয়নাগুলো তাকে পরিয়ে দিয়েছিল। তাতেও মনে তার বিশেষ আনন্দ জাগেনি। এইটুকু দেখেই সে সন্তুষ্ট হয়েছে যে তার অসুখের

জন্য সেগুলো বিক্রি-বন্ধক হয়নি।

শবু হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। দীননাথ আবার ঘরে এসে বলল—

'ওকি, টাকা পয়সা সব ছড়িয়ে রেখে শুয়ে পড়েছ যে? গোণা হয়ে গেছে? ওগুলো তুলে রাখবে না?'

'গুণতে পারছিনা। তুমি তুলে রাখ' বলে শবু একবার দীননাথের মুখের দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

'ঠিক আছে, আমি তুলে রাখছি। পরে তুমি আর একটু ভাল হয়ে গুণে দেখো, আবার নতুন করে পয়সা জমিয়ো।' দীননাথের কথাগুলো বেদনায় করুণ শোনাল।

একটি একটি করে দিন যাচ্ছে, রাত আসছে, আবার দিন হচ্ছে।

প্রতিবেশিনী ভন্বী, হারানী, রায়গিন্নী, দাসগিন্নী, মনোহরবাবুর বৌ ও বোন, বাঙাল বৌ সবাই এসে এসে শবু হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে ফেরার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে গেছে। সোদপুর থেকে বড়বৌদি, ষষ্ঠীতলা থেকে কাকা কাকীমা এসে তার অবস্থার উন্নতিতে খুশি হয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে।

শনিবারে এসেছে তপু অমল পুতুল। অমল জানাল—'তাপসীরা এখানে একসপ্তাহ থাকবে মেজদি, আপনার দেখাশোনা করবে।'

শবু অমল-পুতুলের আদর যত্নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে দীননাথ বলল-

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, যা করার তপু আর সন্ধ্যা মিলে করে নেবে।'

হ্যাঁ, তার ত কিছু করার ক্ষমতা নেই, শুধু শুয়ে বসে দেখে যাওয়া।

তপুরা আসাতে শনি রবি দুদিন টিভিতে সিনেমা দেখা হল। পাড়ার সিনেমা দেখিয়ে মেয়েরাও অনেকদিন পরে শবুদের বাড়ীতে টিভি দেখতে এসেছে। ছোটরা টিভি দেখা ছেড়ে বারবার বড় বড় চোখ করে শবুকেই দেখতে লেগেছে। তারাও যে শবুকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে দেখেছে।

আর শবু? সে সবটা সিনেমা একটানা দেখতে পারেনি। খানিক চেয়ারে বসে, পরে বিছানায় শুয়ে, কিছুটা ঘুমিয়ে কিছুটা জেগে—কিছু দেখেছে কিছু দেখেনি।

অমল সোমবারে তপুদের রেখে একা চলে গেছে। দুদিন পরেই হঠাৎ তপু বলল—

'কাল আমার মামী-শাশুড়ীদের আসার কথা আছে, আজই আমার বাড়ী যাওয়া দরকার।'

দীননাথ আপত্তি করল—'অমল এক সপ্তাহ থাকার কথা বলে গেল, আমার কথা থাকলে কি আর সে কথা বলত না ?'

'বোধ হয় ভুলে গেছে'—তপু যাবার কথাটা আঁকড়ে রইল।

শবুর মনে হচ্ছে, দিনরাত বাড়ীতে রুগী নিয়ে থাকতে তপুর ভাল লাগছে না। ওদিকে অমল একা একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছে সেজন্যও তার চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সন্ধ্যা রান্না করছে, সুশীলা অন্যসব কাজ করছে—তপুর বিশেষ কিছু করার নেই। সেদিন সময় কাটাতে সে শবুদের গীটারটা নিয়ে বাজাতে বসেছিল। একসময় তপু বলেছে—

'নে মেজদি, তুইও একটু বাজা গীটার।'

গীটার কোলে নিয়ে শবু ভাবল, 'ফুল বলে' গানটা বাজাবে, এক লাইন বাজালও ফিরে বাজাতে গিয়ে 'পুরানো সেই দিনের কথা' এক লাইন বাজিয়ে ফেলল।

'নাঃ, তুই বাজা' বলে তপুকে গীটারটা ফিরিয়ে দিয়েছে। সত্যি, পুরানো সব দিনগুলির কথা তার মনের ভিতর যেন হাহাকার করে ফেরে সব সময়।

তপু বসে বসে কিছুক্ষণ 'এ মণিহার' গানটা বাজাবার চেষ্টা করেছে—পাটনায় গীটারের মাষ্টার ওকে ঐ গানটাই প্রথমে বাজাতে শিখিয়েছিল। অনেকদিন অভ্যাস নেই—সেও ভুলে বসে আছে।

শবুর ত কথাই নেই, সে ত মাষ্টারের কাছে শেখেনি, মা চলে গেলে গানের মধ্যে দিয়ে সে মার কাছে পৌঁছতে চেয়েছে, স্বরলিপি দেখে শুধু টুং-টাং-ই শিখেছিল। গলায় তার সুর নেই, তাই যন্ত্রের মাধ্যমে মনের সুর মার কাছে পৌঁছে দিত চেয়েছে।

তপুর বোধ হয় অমলের জন্য মন খারাপ লাগছে। সেই ভেবে শবু বলল—

'যেতে চাইছে যেতে দাও, মামী-শাশুড়ী যদি আসে ?'

তপু বলল—'যেতে চাইছি বলে রাগ করলি মেজদি ?'

'রাগ করব কেন, যেতেই ত বলছি।'

যেতে বলল—ঠিকই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সেরে পুতুলকে সাজিয়ে নিয়ে যখন তপু এসে বলল—

'আসিরে মেজদি।'

শবুর দুচোখ বেয়ে বাঁধ ভাঙা বন্যা নেমে এল—ছোট বোনটি কাছে ছিল, সেও চলে যাচ্ছে…।

এত কান্না দেখে তপু ঘাবড়ে গেল, বলল—'কাঁদছিস কেন মেজদি, আমি তবে না যাই ?'

'না, না, তোরা আয়'। মনে যত দুঃখই হোক সে অবিবেচক নয়।

'আমরা আবার আসব' বলে সান্ত্বনা দিয়ে তপুরা রওনা হল।

শবুকে একা ফেলে দীননাথ তাদের এগিয়ে দিতে যেতে পারল না। শবুর আজ এমনই অবস্থা, সে যেন দিন দিন সকলের বোঝা হয়ে উঠছে। শোবার ঘরের কোণের জানালা দিয়ে জলভরা চোখে ওদের যাবার পথের দিকে সে চেয়ে রইল, তারপর কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

সত্যি যেন শবু দিন দিন সকলের বোঝা হয়ে উঠছে। একটি ফুটন্ত গোলাপ ফুল ডাল সহ কেটে এনে ফুলদানীর জলে অর্ধেক ডুবিয়ে রাখলে দিন দিন যেমন নেতিয়ে পড়ে, শেষে একদিন তার পাপড়িগুলো ঝরে যায় তেমনি শবুও একটু একটু করে আবার অবশ অবসন্ন হয়ে পড়ছে। তার প্রাণের উৎস বুঝি শুকিয়ে গেছে, একদিন সেও বাসি ফুলের মত ঝরে যাবে। হাসপাতালে গিয়ে প্রথম দফায় সে যেমন ভাল হয়ে উঠছিল, দ্বিতীয়বার রোগের আক্রমণের পর সে আর তেমন ভাল বোধ করছে না। ভবর বাড়ী-গৃহপ্রবেশ-মঙ্গলাদেবী এসব মনে পড়ে থেকে আবার খারাপের দিকেই যাচ্ছে। পরিবেশটাই যেন প্রতিকূল।

এদিকে ওষুধ ইঞ্জেকশন সবই চলছে তবু সে ভাল থাকতে পারছে না বাড়ী এসে থেকে সে মোটামুটি নিজে নিজে বাথরুমে যাওয়া, স্নান করা—করত, সন্ধ্যা বা তপু শুধু কাছে কাছে থাকত। তপুরা চলে যাবার পর সে যেন তাও পারছে না; সন্ধ্যার সাহায্য নিতেও মন চায় না। ফলে সে সবের দায়িত্ব এসে পড়েছে দীননাথের উপর।

সকালে উঠে দীননাথ তাকে বাথরুম থেকে ঘুরিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে নিয়ে আসে। এক গ্লাস হরলিকস করে একটু একটু করে খাইয়ে দেয়। সন্ধ্যা কাজে এলে এক ছুটে গিয়ে বাজারটা সেরে আসে। সন্ধ্যা জলখাবার করলে নিয়ে এসে খাইয়ে দেয়। দশটার সময় ধরে ধরে আবার বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তাকে স্নান করার বাঁধানো বেদীতে বসায়।

আর তখনই প্রচণ্ড কান্না পায় শবুর। কি অকর্মণ্যই সে হয়ে পড়েছে! একজন পুরুষ মানুষ, হলই বা সে তার স্বামী, তাকে সাবান মাখাচ্ছে স্নান করাচ্ছে, গা মুছিয়ে দিয়ে অপটু হাতে সায়া ব্লাউজ পরাচ্ছে! বুক ফেটে শবুর কান্না আসে।

দীননাথ আদর করে বলে—'কেঁদোনা লক্ষীটি। আমাকে লজ্জা কোরোনা।'

একি শুধুই লজ্জা পাবার কান্না? এ যে নিজের অক্ষমতার বেদনার অশ্রু।

শাড়ীও সে শবুকে পরিয়ে দিতে যায় কিন্তু ঠিকমত পারে না। কোন রকমে শোবার ঘরে ফিরে এলে সন্ধ্যা সব ঠিকঠাক করে দেয়। তারপর চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরিয়ে দিলে স্নানের কসরতে পরিশ্রান্ত শবু বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার দুপুরে ঘুম ভাঙলে খাবার এনে খেতে দেয়। কিছুদিন নিজে হাতে খেয়ে, পরে ভাত মাখতে অসুবিধে হয় বলে দীননাথ মেখে দিলে বড় চামচে করে খেত, এখন তাও ঠিকমত পারছে না। দীননাথ একই থালায় ভাত মেখে একবার শবুকে খাওয়ায়, একবার নিজে খায়। বিকেলে সন্ধ্যা চুল বেঁধে দেয়। সন্ধ্যে হতে নির্জন বাড়ীতে ওরা শুধু দুজন। শবুর অসুখ, দীননাথের বন্ধুরা এসে আর বসে না—শুধু খবরাখবর নিয়ে চলে যায়।

তখন একা বাড়ীতে মশারীর ভিতর শবু শুয়ে থাকে, আর দীননাথ পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কারেন্ট থাকলে টিভিটা চলতে থাকে—শবু কখনো দেখে কখনো ঘুমোয়। খুব নীচু পর্দায় টিভি বেজে চলে যাতে শবুর কোন অসুবিধে না হয়। সারা দিনে রাতে দীননাথের ঐ টুকুই যা আকর্ষণ।

তাও যেদিন লোড শেডিং হয় সেদিন আরো দুরবস্থা। খুব প্রয়োজনে বা চেষ্টায় দু চারটির বেশী কথা শবু বলতে পারে না। অনেক সময় দীননাথ একা একাই তার সঙ্গে কথা বলে যায়। অন্ধকার ঘরে ল্যাম্প জেলে মশারীর মধ্যে বসে তাকে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে—না হলে শবু যে গরমে ঘেমে নেয়ে ওঠে।

সে অবস্থায় রাতে খাওয়া দাওয়াও এক দুর্ঘট ব্যাপার। অন্ধকারে মশায় ছেঁকে ধরে, শবু গায়ের মশাটাও তাড়াতে পারে না। সেজন্য মশারীর ভিতর বিছানায় উপর কাগজ পেতে খাবার ব্যবস্থা হয়। শবু শুয়ে শুয়ে খায়। খেয়ে খুব তৃপ্তি পায়। যতবারই খাওয়া হয় দীননাথ জিজ্ঞেস করে—

'তোমার পেট ভরেছে ? নাছু ভরেছে ? খেতে কেমন লাগল ?'

'খু-ব ভাল' বলে সে ঠোঁট দুটো আদুরে মেয়ের মত একপাশে বাঁকিয়ে মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তোলে। দেখে দীননাথও খুশি হয়। সকালে বা বিকেলে জল খাবারের সঙ্গে থাকে দুটো রসগোল্লা শবুর জন্য। রসগোল্লা খেতে বা রাতে দুধভাত, প্রথম এক রাত বাড়ীর গাছের আম সেটা ফুরিয়ে গেলে বাজারের ল্যাংড়া আম বা মর্তমান কলা দিয়ে মেখে খাইয়ে দিলে শবুর মুখ খুশিতে ভরে ওঠে। খেতে তার খুব ভাল লাগে কোন কিছুতে অরুচি নেই। ডাক্তারও কিছু খেতে নিষেধ করেনি।

এরপর আবার বাথরুমে গিয়ে মুখ ধোয়া। দীননাথ হাতে করে তার মুখে জল তুলে দিয়ে বলে—

'কুলকুচি করে পুচ করে ফেল। সেই যে বাসনা গ্রামে সুবীরের বোন-পো নাইতে গিয়ে যেমন করছিল—ওয়ান, টু, থ্রী,—পুৎ…।'

পুৎ করা ত শবুও জানে। মুখ ধোয়া হতে দীননাথ বলে—'এবার চল, পুৎ করা হয়ে গেছে।'

শবু কিছুটা জল লুকিয়ে মুখে রেখে দিয়েছে—এবারে শেষটুকু পুৎ করে চারদিকে ছড়িয়ে দিল, কেমন বেশ মজা হল, মুখে জল রেখেছিল দীননাথ জানতেই পারে নি।

প্রথম দিন অসতর্ক দীননাথের জামাকাপড় কিছুটা ভিজে গেছে। আচমকা গায়ে জল পড়তে বিরক্ত হয়ে সে বলেছে—

'এ কি কাণ্ড! ভারি পাজী ত!'

বেদনায় শবুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠতেই দীননাথ তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়েছে—

'পাজী না, পাজী না—দুষ্টু। দুষ্টু, দুষ্টু।'

এবার শিশুর মত সরল হাসিতে শবুর মুখ ভরে উঠেছে। সুবীরবাবুর বোন-পোকে সেদিন সবাই দুষ্টুই বলেছিল, পাজী বলেনি ত। শবুও যে এখন সেই ছেলেটির মত দুষ্টু শিশু হয়েছে। তাই রোজই সে দীননাথের সঙ্গে দুষ্টুমির খেলা খেলে। দীননাথ সাবধান হয়ে গেছে—ছিটোনো জল গায়ে পড়তে না দিয়ে হেসে বলে—

'দুষ্টু, আবার দুষ্টুমী হচ্ছে ?'

সত্যি, শবু যেন তার শৈশবে ফিরে গেছে। সব সময় তার খেলার সাথী চাই। আর সে সাথী হল তার স্বামী দীননাথ। ছোটবেলায় শবুরা বর-বৌ

পাতানো খেলা খেলত। দীননাথ তার খেলা ঘরের বর, খেলার সাথী। সব সময় তাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। একটু চোখের আড়াল হলে ভাল লাগেনা, ডাকে তার খেলার সাথীকে—

'কই রে, কোথায় গেলি রে?'

সঙ্গে সঙ্গে দীননাথ ছুটে আসে, বলে—'এই ত আমি, বল, কি বলছ বল?'

শবুর কথা বলার ক্ষমতা আবার কমে গেছে। শুধু হঠাৎ হঠাৎ এমনি দু চারটে কথা বলে ফেলে। দীননাথ কাছে এলে তার দুটি হাত ধরে বেদনা-ভরা করুণ দৃষ্টি মেলে নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বুক ফেটে বেরিয়ে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস। তার খেলনার ঘর সংসার বুঝি ভেঙে যেতে বসেছে। এ খেলাও একদিন ভেঙে যাবে।

অব্যক্ত বেদনায় মুখখানা করুণ করে দীননাথ পাশে বসে শবুর মাথায় গভীর মমতায় হাত বুলায়। এ অবস্থায় কি করণীয় তা সে বুঝতে পারেনা।

বাড়ীতে আর কেউ নেই, বুদ্ধি পরামর্শ দেবার কেউ নেই। আজকাল কেউ আর খোঁজ খবর করতে বড় একটা আসে না। সবাই জানে শবু ভাল হয়ে বাড়ী ফিরেছে—ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

দিশেহারা দীননাথ ডাক্তার চক্রবর্তীকে ডেকে এনে অনুরোধ করেছে—রোজ হাফ ডোজ করে ইঞ্জেকশনে রোগিণী আবার অবশ হয়ে পড়ছে, ওটাকে ফুল-ডোজ দিতে বলুন কম্পাউণ্ডারকে।

ডাক্তার এক সপ্তাহের জন্য অগত্যা ফুল-ডোজ দিতে রাজী হয়েও বলেছে—এসব ষ্টেরয়েড বেশী না দেওয়াই ভাল, পরিবর্তে অন্য ওষুধ দেওয়া দরকার, আর কিছু ফিজিও-থেরাপী এক্সারসাইজ দরকার।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে ফুল ডোজ শুরু হয়েছে, তার কথামত হাতের মুঠোয় রাবারের বল শক্ত করা বা পেপার ওয়েট কিম্বা ভারী তালা হাতে ওঠানো নামানোর কসরৎ করার চেষ্টা চলছে। না, শবু পারেনা হাত দিয়ে কিছু করতে। কয়েকবার চেষ্টা করেই তাতে সে ইতি দিয়েছে।

তবে ইঞ্জেকশনের ডোজ বাড়ানোতে আবার শবু একটু একটু সচল হচ্ছে, উঠে বসছে, নিজে হাতে খেতেও পারছে।

এসেছে আষাঢ় মাস। মাঝে মধ্যেই দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। একদিন দুপুরে খেয়ে উঠতেই জোর ঘণ্টা দুই বৃষ্টি হয়ে আশপাশের পথ ঘাট

ডুবে গেল, শেষে সব কটা ঘরেও জল ঢুকে গেল। একটু পরে জল নামা শুরু হতে দীননাথ একা একা ঘর থেকে জল ছেঁচে বের করতে লেগে গেল। কি ভীষণ পরিশ্রমের কাজ, শবু জানে। কিন্তু সে অচল দেহ নিয়ে শুয়ে শুয়ে দেখে গেল, এতটুকু সাহায্য করতে পারল না। ঘরে প্রথম জল ঢুকতে দেখে দীননাথ যখন বলেছে—দেখ সারা ঘর জলে ভর্ত্তি হয়ে গেল—তখন শবু বিপন্ন মুখে 'ওমা, তাই নাকি' বলা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। সে কিছুক্ষণ ঘুমোলো আবার কিছুক্ষণ করুণ চোখে দীননাথকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখল। তারই মধ্যে বিকেলে এসে কম্পাউণ্ডার ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল।

শবু একটু সচল হতে সন্ধ্যা পরপর তিন দিন কামাই করল। তখন দীননাথকে দেখে কে? তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো ছাড়াও যা হোক কিছু রান্না করা, কাপড় চোপড় ধোয়া এমনকি বিকেলে তার চুল আঁচড়ে বিনুনী গেঁথে (কোনরকমে তিন গুছির বিনুনী) কপালে সিঁথিতে শাঁখাতে সিঁদুর পরানো পর্য্যন্ত সব সে-ই করে চলল। অন্য কাজ যেমন তেমন শবুকে শাড়ী পরানো আর তার অতবড় চুলের গোছ, যার জন্য দীননাথ এককালে আদর করে তাকে বলত 'কেশবতী কন্যা', বাগ মানানো সে কিছুতেই পারে না।

তিনদিন পরে আবার সন্ধ্যা আসতে আরম্ভ করেছে। সুশীলা বা তার বোন কমলার কিন্তু কোনদিন কামাই নেই এই যা রক্ষে।

একদিন একটু রাত করে এল পুটু, পুরোনো শোবার ঘরটায় রাখা তার ওষুধের পেটিগুলো কাল সকালে সে নিয়ে যাবে।

দীননাথ পুটুকে বলল—'এত রাত করে আর কেন বাড়ী যাবি, এখানেই দুটি খেয়ে শুয়ে থাক।' একটা রাতের জন্য হলেও একজন মানুষকে কাছে পেয়ে সে তাকে ছাড়তে চায়নি এমনি অসহায় অবস্থা এখন দীননাথের।

পুটু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে ধমকের সুরে বলল—'মেজদি, তুই ত ভাল হয়ে গেছিস, সব সময় শুয়ে আছিস কেন, উঠে বসবিতো মাঝে মাঝে।'

শবু সে কথায় না গিয়ে টিভি দেখিয়ে দিয়ে বলল—'তোর বন্ধু এসেছিল।'

'কে বন্ধু?'

দীননাথ বলল—'বাঃ ভাল কথা বলেছে। দেখ, ওর ঠিক মনে আছে। আমাদের টিভি সারানোর লোক সিংহ-রায় সেদিন এসে টিভি ঠিক করে দিয়ে গেছে। কয়েকবার আসা যাওয়াতে পরিচয় হয়ে গেছে—ওকে জিজ্ঞেস করেছিল 'বৌদি শুয়ে আছেন কেন?' সে ত অসুখের কথা জানেনা। হঠাৎ

আমাকে সিংহরায় বলল—প্রভাত মৈত্রকে একদিন আপনার সঙ্গে দেখেছিলাম। আমরা একসঙ্গে বি কে সি কলেজে পড়েছি, সে আপনাদের কে হয়?'

পুটু বলল—'সিংহরায়ের সঙ্গে একবছর পড়েছি, তারপর নকশাল আমলে মন্দির শহরে পালিয়ে গেলাম, আর পড়াশুনা হল না। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ভাল কথা, শীলাদি শীতলজামাইবাবুর খবর কি? তারা মেজদিকে দেখতে আসেনি?'

শবু আবার বলে উঠল—'শিখাও পড়ে গেছে।'

দীননাথ বলল—'ঐ দেখ, সে কথাও ওর মনে আছে। খবর পেয়ে শীলা তার তুই জাকে নিয়ে একদিন এসেছিল। শীতলের তুটি চোখই নাকি গেছে। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ, ওদের মেয়ে শিখা, যার ছমাস আগে বিয়ে হয়েছিল সেও নাকি ঠিক পয়লা বৈশাখেই শ্বশুর বাড়ীতে বাথরুমে পড়ে গেছিল। তারপর তিন সপ্তাহ ধরে ডাক্তার অপারেশন, ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত এসব করে বাড়ী ফিরেছে, এখনও ভাল করে চলা ফেরা করতে পারে না। ওর পেটে নাকি একটি বাচ্চা ছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। তার ভবিষ্যৎ যে কি হবে জানা নেই।'

রাত হয়ে গেছে। দীননাথ শোবার ঘরে খাবার যোগাড় করে নিল। পুটুকে মেঝেতে খেতে দিয়ে শবুকে চেয়ার টেবিলে খেতে দিল। শবু এখন আবার কোনরকমে নিজে নিজেই খায়।

খেতে খেতে পুটু বলল—'জামাইবাবু, আমাকে তুটো মাছ দিয়েছেন কেন?'

'বেশী আছে দিলাম, খেয়ে নে।'

পুটু শবুকে বলল—'দেখ মেজদি, নিজে একটা মাছ নিয়ে জামাইবাবু আমাকে তুটো মাছ দিয়েছে কেন?'

'আমি ত দিইনি। তোকে দিয়েছে, তুই খা।' খাওয়া নিয়ে আবার ছেলেমানুষী কেন, খেতে দিয়েছে খেয়ে নিলেই হয়। শবুকে যা দেয় সব খেয়ে নেয়।

পরদিন সকালে উঠে পুটু ওষুধের পেটিগুলো নিয়ে চলে গেল। পরে সময় পেলে আবার আসবে।

তিন

আবার এক শনিবারে এল তপুর.। অমল এসেই বলল—

'সেবারে তাপসীরা তিন চারদিন থেকেই চলে গেল। আমি জানতুম মামীরা ঐদিন আসছেন না। এবারে ওরা এক সপ্তাহ থাকবে।'

আজ আবার টিভিতে সিনেমা আছে। তপুরা আসাতে শবুর বেশ ভাল লাগছে। সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে সময় হলে শোবার ঘরে এসে সিনেমা দেখতে বসল।

কোথায় সিনেমা! দুই কুস্তিগীরের কুস্তি না ঘুসোঘুসি দেখাচ্ছে ত দেখাচ্ছেই। একজন আর একজনের মাথা এমনভাবে মেঝেতে ঠুকে দিল যে দেখে শবুর মাথাটাই ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, বলল—

'আমি শোব।'

তপু বলল—'সিনেমা দেখবিনা মেজদি?'

'থাক সিনেমা' বলে দীননাথের সাহায্যে বিছানায় উঠে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

অমল বলল—'এবারে টিভিতে আবার পরিষ্কার ছবি আসছে।'

হোক পরিষ্কার, শবু আর মারামারী মাথা ঠোকাঠুকি দেখতে পারেনা। প্রায় পুরো সিনেমাটাই তার ঘুমিয়ে কেটে গেল।

পরদিন সকালে জলখাবার খাওয়া হলে তপু জিজ্ঞেস করল—

'মেজদি, কাল কি সুন্দর হিন্দী সিনেমা হল, তুই দেখলি না? আজ ত বাংলা সিনেমা, আজ কি বইরে?'

শবু দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরিয়ে হঠাৎ বেসুরো গলায় গান ধরল—

'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায়···।'

তপু খুশি হয়ে বলে উঠল—'বাঃ বা মেজদি ভাল হয়ে গেছে, মেজদি গান গাইছে। গা মেজদি, আমিও তোর সঙ্গে গাইছি' বলে সুরেলা গলায় ঐ গানটিই গেয়ে উঠল—'আমি যে গান গেয়েছিলেম, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়··· এই কথাটি···।' খালি গলায় তপু ভালই গায়।

পাশের ঘর থেকে দীননাথ ছুটে এসে বলল—'এত গান থাকতে তুমি এই গানটি গাইছ কেন?'

না, শবু আর গাইছে না ত, ঐ এক দু'লাইন আউড়ে সে চুপ করে গেছে। কিন্তু তার সারা মুখে দুষ্টুমীভরা একটি হাসি ছড়িয়ে আছে। দীননাথ বেদনায় মুখখানা করুণ করে আবার পাশের ঘরে চলে গেল। তপু তখনো গেয়ে চলেছে—

'জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়—এই কথাটি মনে রেখো···।'

সন্ধ্যের পর টিভিতে সিনেমা আরম্ভ হতে শবু কালকের মতই কখনো ঘুমোচ্ছে কখনো শুয়ে শুয়ে সিনেমা দেখছে। এক সময় তপু তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল—

'দেখ মেজদি, তুই সকালবেলা যে গান গাইছিলি সিনেমাতে সেই গানটাই হচ্ছে। তুই কি আগেই জানতিস না কি রে?'

শবু টিভির দিকে চোখ মেলে চাইল—মুখে ফুটে উঠল আবার সেই দুষ্টুমী ভরা হাসি।

রাতে এক বিছানায় শুয়ে দীননাথ ধরা গলায় বলল—'সকালে তোমার মুখে ঐ গান শুনে আমার যা মন খারাপ লাগছিল। ওটা যে আজকের সিনেমার গান সে কথা বল নি ত?'

শবু দীননাথের আকুলতায় খুশি হয়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল—মুখে তার তখনও দুষ্টু হাসি। আজকের সিনেমায় যে ঐ গানটি আছে সে ত কাল অনুষ্ঠান পরিচিতি শুনেই সে জানত, সিনেমাটা তার আগে দেখা। সব কিছু তার মনে থাকে।

কিন্তু সে কি সিনেমার গানটিই গেয়েছিল নাকি তার জীবনের গান শুনিয়েছিল তা সে নিজেই জানে না।

১

তপুদের রেখে অমল চলে গেছে। আবার শবুর শরীর একটু একটু করে অবসন্ন হয়ে পড়ছে—ডাক্তারের কথামত ইঞ্জেকশনের ডোজ আবার কমানো হয়েছে।

তপু এক সময় বলল—'আয় মেজদি, আমরা একটু ক্যারাম খেলি।' বলে বিছানায় ক্যারাম পেতে নিয়ে বসল।

শবু চেষ্টা করেও স্ট্রাইকারে টোকা দিতে পারল না। কয়েকবার চেষ্টা করে—'নাঃ, হবে না' বলে ক্যারামের পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাত্র দু তিন মাস আগে সে দীননাথের সঙ্গে ক্যারাম খেলেছে, বলেছে—রোজ রোজ মোটকার সঙ্গে ক্যারাম খেলছ, আজ আমার সঙ্গে খেলতে হবে। আজ সেই

শবু খুটিতে টোকা দিতেও পারছে না।

পুতুল ক্যারাম খেলার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিতে তপু ক্যারাম বোর্ড মেঝেতে নামিয়ে পুতুলকে বসিয়ে দিয়ে বলল—

'জামাইবাবু, আপনাদের ফটো এলবামটা কোথায়?'

দীননাথ ছোটো এলবাম বের করে দিল। তপু বড় এলবামটা খুলে ধরে বলল—

'আয় মেজদি, আমরা ছবি দেখি।'

শবুদের বিয়ের পরে দীননাথ অনেক ফটো তুলেছিল, এমন কি পাটনা থেকে মোটরে দিল্লী যাবার সময়ও সে ফটো তুলেছে, তারপর থেকে তার ফটো তোলায় ইতি পড়েছে। এলবামের অর্ধেক ছবিতেই শবু আছে আর সিকি ভাগ বুঝি তপুর ছোটবেলাকার—সে যে আদরের ছোটবোন আর দীননাথের স্নেহের ছোটশালী।

বড় এলবামের প্রথম তিনটি পৃষ্ঠায় ঠাকুমা, বাবা, মার এনলার্জ করা ছবি তার পরের পৃষ্ঠায় একটি গ্রুপ ছবি—বাবা মা ঠাকুমা তপু কানাই মিতু শ্রীলা এলা আর শবু—তপু তখন নেহাৎই তিন চার বছরের শিশু, শবুর সম্ভ সম্ভ বিয়ে হয়েছে। নন্দু নেই সে ছবিতে—তখনই সে অসুস্থ।

এই পর্য্যন্ত এসে শবু কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠল। তপু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—

'কাঁদছিস কেন মেজদি? ভাবলাম বাবা মার ছবি দেখে তোর ভাল লাগবে। থাক তবে, এলবাম তুলে রাখি তাহলে।'

শবুর কান্না আরো বেড়ে গেল। কত আশা নিয়ে সে নতুন জীবন শুরু করেছিল, আজ সে কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে! ছোট বোন আদর করে বারবার তাকে সান্ত্বনা দিলেও তার আকুল কান্না থামতে চায় না।

তপুরা আছে, সেই সুযোগে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর লেখা রিপোর্ট নিয়ে দীননাথ গেছে মিশন হাসপাতালে শবুর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তার পরামর্শ নিতে। শবুকে বলে গেছে—তপু তোমাকে জলখাবার খাইয়ে দেবে, দশটা এগারোটায় স্নান করাবে, আমি একটায় এসে তোমাকে খাইয়ে দেব।

দীননাথ মোটর বাইকে রওনা হয়ে গেছে—শবু আর 'যাওন নাই আহো পিয়া' মন্ত্রটাও পড়তে পারে না।

তপু জলখাবার খাইয়ে দিলে শবু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঘুম ভাঙতে তপু ডাকল—

'আয় মেজদি, তোকে স্নান করিয়ে দি।'

'না।'

'কেন কি হল? আমি তোকে যত্ন করে ভাল করে স্নান করিয়ে দেব।'

'নাঃ।'

সন্ধ্যা বলল—'চান করছেছ না কেন মাসী?'

শবু কোন জবাব দিল না। দীননাথের সাহায্য ছাড়া তার স্নান করতে ভাল লাগে না। যদিও সে সময় রোজই সে কাঁদে। এ দুটো মেয়েমানুষের উপর ভরসা কি, যদি ঠিকমত ধরে নিয়ে যেতে আসতে না পারে।

দীননাথ একটার আগে ফিরল ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিকের মত মুখ খানা কালো করে—রোগিণীকে না দেখে সাহেব অন্য ডাক্তারের রিপোর্টের উপর কোন মতামত দিতে রাজী হয়নি—রোগিণীর বর্তমান শরীরের অবস্থায় এতদূর যাওয়া আসা, তিন চার ঘণ্টা আউটডোরে বসিয়ে রাখা অসম্ভব হলেও তিনি নাচার।

'যাক গে, যা হয় পরে দেখা যাবে' বলে শবুকে জিজ্ঞেস করল—'তোমার স্নান করা হয়ে গেছে?'

শবু চুপ করে রইল। তপু বলল—'মেজদি কিছুতেই স্নান করল না, কয়েকবার বলতে বিরক্তই হল।'

শবু ভয়ে চোখ বুজল—এই বুঝি তেতে পুড়ে আসা ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষটা তাকে বকবে।

পরিবর্তে শান্ত কান্না-ভেজা গলায় দীননাথ বলল—'কি হ'ল, চান করনি কেন? একবেলার জন্য কাছে না থাকলে স্নান খাওয়া করবে না তুমি? এখন চান করবে?'

এবার চোখ মেলে একবার দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে শবু বলল—

'না, এখন খাওয়া।' দীননাথ একটার সময় খায়।

দীননাথ আদর করে তার নাক টিপে দিয়ে বলল—'সব জ্ঞানই আছে, আমার খাবার অসময় হতে দেবে না, একটা বাজে যে।' পরে বলল—'তপু, তোর স্নান হয়েছে?'

'আমি ত রোজ চৌবাচ্চার জলেই স্নান করে নিই।'

'কেন যে চৌবাচ্চার জলে স্নান করিস, ওটাতে কতদিনের বাসি জল থাকে। নে খাবার যোগাড় করে নে।' বলে দীননাথ সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুতে গেল।

পরদিন সকালে শবুর হাত পা আড়ো ঃ

পায়খানায় যেতে হল, দরজার পাল্লা ভেজিয়েবশ অবসন্ন লাগছে। কদিন পরে ঠুকে গেল, উঠতে গিয়ে উঠতে পারছে না, বসতে গিয়ে একটা হাঁটু মেঝেতে আগে একটা পা নামিয়ে বাইরে আসত তাও পার়ে বিশেষ উপায়ে দরজা খুলে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল, সেও অবস্থা বুঝে দরজা ঠেছে না। দীননাথ ধরে নিয়ে তুলতে পারছে না, অনেক কষ্টে তপুর সাহায্যে বাইরে নিল ঘরে ঢুকে তাকে টেনে স্থ এল। ভয়ে শবুর হাত পা কাঁপছে—যদি ওখানে আটকা পড়ে থাকত!

সকালের জল খাবারের সময় তপু জানাল, কাল রাতে তার ক জ্বর এসেছিল, এখনও গায়ে জ্বর লেগে আছে। থার্মোমীটার লাগাতে জ্বর উঠল ১০ ফ.৪।

তপু বলল—'জামাইবাবু, মেজদির শরীর খারাপ, তার উপর আমার চ জ্বর আপনি একা কজনকে সামলাবেন? আমরা বাড়ী চলে যাই।'

দুশ্চিন্তায় দীননাথের মুখ কালো হয়ে গেল।

তপু কি চৌবাচ্চার বাসি জলে স্নান করে ইচ্ছে করে জ্বর বাধাল? ন' দশদিনের জায়গায় পাঁচ দিনেই বাড়ী যাবার তাল তুলল? সে কি শবুর জন্য?

তা বোধ হয় নয়। সে একা দিনরাত পুতুলকে সামলাতে পারে না। অমল থাকলে 'মা-রে তুমি আমার কাছে এস' বললে পুতুল বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে থাকে, খেতেও বেশী দেরী করেনা। অমল না থাকলে একদিকে তপুর জেদ অন্যদিকে পুতুলের জেদ আর বায়না। ঠিক যেমন ছোটবেলায় তপু করত মার সঙ্গে। তপুটা কম জিদ্দি নয়—মা বলত।

এই সব ভাবতে ভাবতে শবু কখনো ঘুমোল, কখনো স্নান করল, দুপুরে দীননাথের হাতে খেল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে ঘুম ভাঙতে বাড়ীটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, শবু দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—

'ওরা কোথায়?'

দীননাথ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল—

'ওরা একটু আগে চলে গেল। জান ত তপুর জ্বর হয়েছিল, তাই চলে গেল। তোমাকে জাগায় নি ইচ্ছে করে, সেবারে যাবার সময় তুমি কত কেঁদেছিলে, কাঁদলে তোমার শরীর খারাপ হবে। তাই।'

চোখের সামনে দিয়ে না গেলেই কি কান্না আটকানো যায়? মায়ের পেটের ছোট বোনটা চলে গেল—মনে হচ্ছে আর বুঝি তার সঙ্গে দেখা হবে

না। শবুর চোখের জল আটকে রইল না।

দীননাথ অন্যদিকে তার মনযোগ আকর্ষণ করতে বলল—'কেঁদোনা লক্ষীটি। ঐ দেখ, তোমার বাথরুম ইত্যাদি কাজের জন্য কি রকম একটা টুল কিনে এনেছি। তলায় একটা বালতি বা গামলা বসিয়ে দিলে বাথরুম, বারান্দা এমন কি বিছানার পাশেও এটাচড্ বাথরুম হয়ে যাবে।'

বাঃ সত্যিই ত বাবার ব্যবহারের মত একটা কমোড, যখন যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়।

কোন কিছুতেই কিছুনা। শবু একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, কথা বলাও নামমাত্র। অনেক কিছুই ভুল হয়ে যাচ্ছে। একদিন দুপুরে খাবার সময় ত বলেই বসল—

'কাল রাত্তিরে আমাকে খেতে দিসনি?'

শুনে দীননাথ কেঁদে ফেলল—'না গো, তুমি কাল রাতে খেয়েছ, পটলের তরকারী ছিল, মাছের ঝোল, দুধের সঙ্গে ল্যাংড়া আম ছিল। তোমার মনে পড়ছে না?' বলে ব্যাকুলভাবে সে শবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ঠিকই ত, তার মনে আছে পটলের তরকারীর কথা, ল্যাংড়া আমের কথা দীননাথ আম দুধে ভাতে মেখে বড় চামচে করে খাইয়ে দিয়েছে। তবে কি স্নান করে এসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—ঠাকুমা খেয়ে উঠে বিকেলেই ভুলে যা চ্ছ, বলছে—আমাকে তোরা খেতে দিসনি ···।

শ‍্ কি তবে ঠাকুমা, মা-র খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে?

বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে দীননাথ বলল—'কানাইয়ের চিঠি এসেছে, পড়বে না?' বলে চিঠি আর চশমা শবুকে দিল।

চশমা চোখে চিঠিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'নাঃ ছোট ছোট লেখা।' চিঠিটা পাশে নামিয়ে রাখল। মা বাবা কানাইয়ের চিঠি এসেছে আর সেটা না পড়ে শবু পাশে ফেলে রেখেছে—ভাবাই যায় না।

বেদনাহত দীননাথ বলল—'পড়তে পারছ না? আমি পড়ে দিচ্ছি। কানাই লিখেছে,—মিঠি দিঠিরা নিরাপদে পৌঁচেছে, মেজদির শরীর কেমন আছে, বাবা মেজদির জন্য চিন্তায় আছে, মেজদিকে নিয়ে কবে আসতে পারবেন, সামনে রথ—আর মাসখানেকও বাকি নেই···।'

হ্যাঁ—বাবা, কানাই সবাই শবুর জন্য চিন্তা করছে। কি যেন লিখেছে—রথের বেশী দেরী নেই? চার বছর হতে চলল মা রথের আগ দিয়ে চলে

গেছে। মাকে ছেড়ে শবু কতদিন আর দূরে থাকবে?

'আচ্ছা, তোমার হাঁটুর পিছনে আর উরুতে লাল ফুস্কুড়ির মত কি হয়েছে তুমি দেখেছ?' পরদিন স্নান করাতে গিয়ে দীননাথ শবুকে জিজ্ঞেস করল।

শবু কিছু দেখেনি। দীননাথ আবার জিজ্ঞেস করল—'হাসপাতালে থাকতে এসব জায়গায় কিছু করেছিল কি, কোন ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছিল?'

শবু তাও জানে না। নিজের শরীরের দিকে সে চেয়েও দেখে না।

'আচ্ছা, তোমার হাসপাতালের কথা মনে আছে? কল্পনা, উষা—ওদের কথা?' দীননাথ যেন তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করছে।

'উষা খুব ভাল, আমি তাকে শাড়ী দিয়েছি, টাকা দিয়েছি।' সরল হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল।

'কত টাকা দিয়েছ?'

হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে শবু হেসে বলল—'পাঁচ টাকা দিয়েছি, পাঁচ টাকা।'

'তবে ত তোমার সবই মনে আছে। হাসপাতালে কিছু করে থাকলে প্রায় একমাস পরে তা দেখা যাবে কেন?' দীননাথের চিন্তা বেড়ে গেল। নতুন এ উপসর্গ দেখা দিয়েছে কেন?

চার

আবার ডাক্তার চক্রবর্তী এসেছে। দেখে বলল—'এগুলো ড্রাগ ইরাপশান মনে হচ্ছে, মলম লিখে দিচ্ছি, সেরে যাবে। তারপর বৌদি, কেমন আছেন? ওটা কি? টিভি? বৌদি বুঝি খুব টিভি দেখতে ভালবাসেন? দেখবেন, তবে বেশী দেখবেন না।...বৌদি লেখাপড়া কতদূর করেছেন?...আই এ পড়েছেন? বেশ।...কোন সালে পরীক্ষা দিয়েছেন?...ও, বিয়ে হয়ে গেল বলে পরীক্ষা দেন নি? আমিও ঐ বছর আই এস্ সি দিই—আপনি আর আমি তবে একই ব্যাচের, তাই না?'

শবু কোন কথা বলতে পারেনি। সবটাই ডাক্তার একতরফা বলে গেছে, দীননাথ মাঝে মাঝে দু একটা কথার যোগান দিয়েছে। পরীক্ষা, বিয়ে, এক ব্যাচ—শুনতে শুনতে শবু আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, তার চোখের জলের

স্রোত বুঝি নদীর স্রোতকেও হার মানায়। তার মনে একের পর এক সেদিনের ছবিগুলো ভেসে উঠছে। কান্নার বেগও বেড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার—'আহা, আপনি কাঁদছেন কেন বৌদি, আর কাঁদবেন না, কাঁদলে শরীর আরো খারাপ হবে। আমি আর ওসব কথা বলব না।'—বলে উঠে পড়ল।

দীননাথ ছলছল চোখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক্তার তাকে বলল—'লাহিড়ী দা, আপনিও ভেঙে পড়বেন না। দূরের স্পেশ্যালিষ্টকে দিয়ে দেখানো সম্ভব হল না, কাছের কাউকে দিয়ে দেখান। আমি হলাম জেনারেল প্র্যাক্টিশনার আর এটা হল স্পেশালিষ্টের যুগ। আমি কয়েকজনের নাম বলছি—ডাঃ চ্যাটার্জি, ডাঃ বোস, ডাঃ মিত্র—আপনি এদের কাউকে দিয়ে তাড়াতাড়ি দেখান।'

ডাক্তার চলে গেল। দীননাথ আর শবু দুজন দুজনের মুখের পানে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল—কারো মুখে নেই ভাষা।

ডাক্তারের মলম ব্যবহারের আগেই শবুর গায়ে যেমন নতুন নতুন ফুস্কুড়ি দেখা দিচ্ছে তেমনি কিছু পুরোনো ফুস্কুড়ি শুকিয়ে চামড়া উঠে যাচ্ছে। দীননাথ তাকে স্নান করাতে গিয়ে সেটা লক্ষ্য করে বলল—

'দেখ, দেখ, কয়েকটা ফুস্কুড়ি শুকিয়ে গিয়ে রসুনের খোসার মত চামড়া উঠে গেছে, কিন্তু কোথাও পুঁজ রক্ত বা ঘায়ের চিহ্নমাত্র নেই, কচি কলাপাতার মত সুন্দর মোলায়েম চামড়ার জায়গাগুলো ঢাকা পড়েছে। এগুলো ত ঘা নয়। তবে কী এগুলো?'

শবুর সেদিকে মন নেই, অন্যদিনের মত স্নান করতে বসে গায়ে জল ঢালতেই কাঁদল, আবার কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেই গড়িয়ে পাশ ফিরল, বলল—'বা—বা, বা—বা,—আর পারিনা!'

আজকাল একটুতেই সে ভীষণ পরিশ্রান্ত বোধ করে, এমন কি একটু সরে শুতে বললেই বলে—'বা—বা, বা—বা!' যেন সে এক আহ্লাদী মেয়ে, সরে বসতেও চায় না।

বিকেলে সন্ধ্যা কালে এসে এক ফাঁকে দীননাথ গিয়ে পাড়ার নব্য পাশ করা ডাক্তার অশ্বিনীকে ডেকে নিয়ে এল। সে সব শুনে বলল—

'কাল শুক্রবার সকালে ডাঃ চ্যাটার্জির আউটডোর ডিউটি আছে আর জি কর হাসপাতালে। আমি সঙ্গে গিয়ে সহজেই তাঁকে দিয়ে ভাল করে দেখাতে

পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি উনি অন্য রোগের স্পেশ্যালিষ্ট।'

'তা হোক, ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছে, ডাঃ চ্যাটার্জিকে দিয়েই দেখাই' দীননাথ বলল।

আর জি কর হাসপাতালের নাম শুনে শবু চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে দেখে সে আবার বলল—'না, না, ওখানে তোমাকে ভর্তি করব না, শুধু ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে চলে আসব।'

অতদূর কি শবু যাতায়াত করতে পারবে? সেদিন পরিচিত সেই দাঁতের ডাক্তারকে দীননাথ বাড়ীতে ডেকে এনেছিল। সেও বলে গেছে—বৌদি একটু ভাল হয়ে উঠলে আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন, আমি দাঁত দুটো বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। এখান থেকে এখানে ডাক্তারের চেম্বার তাই সে যেতে পারে না আর কতদূরে আর জি কর—কি করে যাবে? এদিকে মনে আছে—ঐ হাসপাতালেই মেজভাসুর বিশ্বনাথ মারা গেছিল।

তবু আর জি কর-এই যাওয়া হল। সন্ধ্যা এলে তাকে বাড়ীর জিম্মা করে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। দীননাথের সাহায্যে শবু পায়ে হেঁটে ট্যাক্সিতে উঠে বসল, অশ্বিনীও সঙ্গে চলল।

হাসপাতালে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি শবুকে ভাঙতে হল, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটতে হল। ডাঃ চ্যাটার্জির আসতে দেরী আছে দেখে ডাঃ দাসকে দিয়ে দেখাল অশ্বিনী। সেখানে আর এক হবুডাক্তার শবুকে দু একবার গায়ের ঘা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল 'মা, আপনার এগুলো কি হয়েছে? মশা কামড়েছে?'

প্রায় ছেলের বয়সী এক যুবকের মুখে মা ডাক শুনে তার বুকের ভিতর মুচড়ে উঠল। কিছু বলতে পারল না। দুচোখ জলে ভরে গেল।

ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠল—'স্যার, এটা ত 'পারপুরা' কেস মনে হচ্ছে।'

ডাঃ দাস চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—'তাই নাকি, আমি ভেবেছিলাম মশার কামড়। ব্লাড টেষ্ট করাও, ভর্তি করে নাও। পঞ্চাশটার উপর ষ্টেরয়েড দেয়া হয়েছে দেখছি, আশ্চর্য্য!'

শবু কাতর চোখে দীননাথের দিকে তাকাতে সে বলে উঠল—'আমরা এখন ভর্তি করানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি।'

অশ্বিনীও বলল—'হ্যাঁ স্যার, ব্লাড টেষ্ট করে তারপরে ভর্তি করাব।' ঘর থেকে বেরিয়ে সে বলল—'ডাঃ দাসও একজন স্পেশ্যালিষ্ট, আগে পারপুরার ফয়সালা হোক তারপর দরকারে ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে দেখানো যাবে।'

ওরা তার আসল রোগ ছেড়ে পায়রা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হল, আর ডাঃ চ্যাটার্জিকে না দেখিয়েই ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীর কাছে এসে আবার হাঁটা। ঘরে ঢুকেই শবু বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—'বা—বা, বা—বা'! আজ সে ভীষণই পরিশ্রান্ত। বেলা প্রায় এগারোটা।

স্নান করে খেয়ে ঘুমিয়ে উঠতে বিকেলে সন্ধ্যা এসে শবুর চুল বেঁধে সিঁদুর পরিয়ে অন্য কাজ সেরে চলে গেল। শবু যেন সকালের ধকলে আরো অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আবার রাতে খেয়ে দুজনে এক বিছানায় শুয়েছে।

নানান ঘটনায় ও আশঙ্কায় দীননাথের মন হয়ত বড়ই উদ্বিগ্ন। পাশে শুয়ে শবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার রকম দেখেই সে তার মনের বিক্ষিপ্ত ভাব বুঝতে পারছে। এক সময় দীননাথ শবুর হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার সরু আঙুলগুলো নিয়ে আদরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—

'এখন তোমার কেমন লাগছে গো? একটু ভাল লাগছে কি?'

শবু একটু ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

'কী করে ভাল থাকি?' রোগ জর্জর দেহে সে ভাল থাকে কি করে?

বেশ বুঝতে পারছে, উত্তর শুনে বেদনায় দীননাথের মুখ করুণ হয়ে উঠেছে। কি করবে শবু, সে যে সত্যিই ভাল নেই। যে রোগে ধরেছে তার থেকে আর মুক্তি নেই সেকথা সে অন্তর দিয়ে অনুভব করছে অথচ এরা কেউ তা বুঝতে পারছে না। তার যে বেঁচে থাকার কাল সীমিত হয়ে এসেছে ভাষাহারা শবু সেকথা গুছিয়ে বলতে পারে না। মাঝে মাঝে শুধু এমনি দু একটি কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে—'এখন আর কি হবে,' 'কী করে ভাল থাকি'? শরীরের অবস্থা শুধু মনই বুঝতে পারে, আর মনের কথাই মুখের ভাষায় প্রকাশ পায়।

দীননাথ একটু চুপ করে থেকে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগল—

'তোমার কি ভাল থাকতে মন চায় না? আমাকে কি তোমার ভাল লাগে না? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? নিজে থেকে তুমি আমাকে একটি কথাও বল না। আমাকে কি কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না?

'তোমার মনের কথা, তোমার উদ্বেগ আশঙ্কার কথা না বুঝে তোমার মনে কঠিন আঘাত দিয়েছি, তাই কি অভিমানে মুখের ভাষা তুমি হারিয়ে ফেলেছ? আমি নিরুপায় অসহায় হয়ে সেদিন যে কথা বলেছিলাম তার শাস্তিও ত কম পাচ্ছি না।

'একবার তুমি আমার কথা ভাব, মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বল। সাধ্য

মত চিকিৎসাপত্তর করাচ্ছি, যতটা পারি সেবা যত্নও করছি। তুমি যদি একটু মনে জোর না আন, নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দাও তবে কি করে তোমাকে ভাল করে তুলব? তোমার এই অবস্থা দেখে আমার যে কিছুই ভাল লাগেনা…।'

দীননাথ আবার কাঁদছে। কেঁদে চলেছে সেই পয়লা বৈশাখ থেকে।

হ্যাঁ, শবু অভিমান করেছিল বটে, মুখের ভাষাও তার প্রায় হারিয়ে গেছে। সে ত শুধু এই সংসারের জন্যই। আর পাঁচটা মেয়ের মত শবুও কত আশা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে শ্বশুরবাড়ী এসেছিল, বাবার একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একান্নবর্তী পরিবারকে জোড়া রাখতে। সেখানে একদিকে সে পেয়েছে স্বামীর ভালবাসা মায়া মমতা আর একদিকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শাশুড়ী ননদ দেওরদের সীমাহীন দুর্ব্যবহারে। শবু কিছুই ভোলেনা, ভুলতে পারে না।

সব সয়েও সে টিকে ছিল। কিন্তু জীবনের মধ্যাহ্ন প্রায় পার হয়ে এসে নতুন করে আতঙ্ক আর বিভীষিকা এগিয়ে আসছে দেখে সে তার স্বামীর কাছে চেয়েছিল আশ্রয়, পরিত্রাণের উপায়। সেখানে বিফল হয়ে তীব্র অভিমানেই মরে যেতে চেয়েছিল, মার কাছে যাবার জন্য প্রার্থনা করেছিল ইচ্ছা মৃত্যু বা মৃত্যুর ইচ্ছা। মনে হয় তার সেই প্রার্থনা মার কাছে পৌঁচেছে শবু একটু একটু করে মার কাছে এগিয়ে চলেছে।

এমন সময় গভীর অনুরাগে ভালবাসায় দুমাসের উপর অমানুষিক পরিশ্রমে সেবায় যত্নে স্বামী তার মনের ক্ষোভ অভিমান প্রায় সবটাই মুছে দিতে পেরেছে। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে যে। স্বামী তার ইহকাল পরকাল, তাকে প্রাণাধিক ভালবাসে। কিন্তু ইচ্ছে হলেও সে যে আর ফিরতে পারবে না, পারবে না গুছিয়ে কথা বলতে। কি কথা বলবে সে? সে যে বুঝতে পারছে, তার বেঁচে থাকার দিন সীমিত, নির্দিষ্ট। সেই কথা বলে স্বামীর মনে নতুন করে দুঃখ দিয়ে কি হবে?

শবুহীন দীননাথের জীবনে দুর্যোগের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা ও করুণায় শবুর মনের কথা গলায় আটকে আসে, বুক ভেঙে কান্না আসে।

শবুও কেঁদে দীননাথের চোখ মুছিয়ে দেয়। দীননাথ মোছায় শবুর চোখের জল। সুখের বাসর নয়, কান্নার বাসরই ওদের কাছে এখন একমাত্র সত্য। দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে, আর একটি কান্নার দিন এগিয়ে আসে।

পাঁচ

সকালের জলখাবারে হরলিকস, টোষ্ট, রসগোল্লা, আর শবুর প্রিয় মৌসম্বীর রসও ছিল। টোস্ট খেতে খেতে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল—জয়পুরে সেই সকালে একসঙ্গে চারটে টোস্ট ও ডবল ডিমের পোচ খেয়ে দীননাথের ভীষণ আমাশা ধরে গিয়েছিল। এরকম লম্বা সফরে বার হলেই খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে তার আমাশা ধরে যায়। কটা আমাশার ট্যাবলেট সঙ্গে রাখলে সব ল্যাঠা চুকে যায়, তা কিছুতেই রাখবে না। শবুর কিছু হয় না—তার পাক যন্ত্র হৃদযন্ত্র দুই-ই খুব ভাল। শুধু মনটাই ভীষণ দুর্বল।

দীননাথ তাকে খাইয়ে দিতে দিতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, আমরা অজন্তার গুহাগুলো সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, তোমার মনে আছে?'

'হুঁ-উ। কেন?'

'না, তাই বলছিলাম। আমরা কত দেশ দেখেছি, কত বেড়িয়েছি, তাই না?'

কি অদ্ভুত মনের মিল নিয়ে তারা দুটিতে সংসার পেতেছিল আর কেমন হঠাৎই তা ভেঙে যেতে বসেছে। এইমাত্র শবু জয়পুরের কথা ভাবছিল, আর দীননাথও বেড়াতে যাবার দিনগুলির কথা ভাবছে। হয়ত সে ভাবছে—শবু এককালে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে, কখনো পায়ে হেঁটে কত জায়গায় বেড়িয়েছে, পাহাড়ী পথে ওঠা নামা করেছে—আর আজ বাথরুমে যেতে গেলেও ধরে নিয়ে যেতে হয়।

সব তার মনে আছে। শুধু সংসারের যন্ত্রণাই নয়, আনন্দের দিনগুলোও তার সমানই মনে আছে। কত দেশ বেড়িয়েছে, কত জায়গা দেখেছে—দু চোখ ভরে সব দেখেছে। শিলং থেকে বোম্বাই, দিল্লী থেকে কন্যাকুমারী রামেশ্বর সেতুবন্ধ—পূব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, অনেকটাই সে দেখেছে। ভারতের চারটি প্রধান শহর কলকাতা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ দেখেছে। দেখেছে আরো কটি রাজধানী শহর—শিলং-গৌহাটি, পাটনা, ভুবনেশ্বর, জয়পুর, ত্রিবান্দ্রম। এছাড়া আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি, অজন্তা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুরের মত জায়গা। সবার উপর আছে তার জন্মস্থান বিখ্যাত মন্দির শহর। মোটর বাইকে চেপে কত দূর দূর পর্যন্ত গেছে—

রাজগীর নালন্দা, কোনারক, বর্ধমান, কাঁচড়াপাড়া-কল্যাণী। সেই শবু আজ অবশ অচল। সবই মনে আছে, কিন্তু এখন মনে হয় সব যেন স্বপ্ন।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দীননাথ বলল—

'তুমি ত এখন একটু ঘুমোবে, ঘুমোও। আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে বসে কানাইয়ের চিঠির উত্তরটা লিখে ফেলি।'

পাশের ঘরে বসে দীননাথ চিঠি লিখছে, এদিকে শবুর কিছুতেই ঘুম আসছে না। বাবা, কানাই আর সবার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তার শরীর ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, সারা শরীরে ভিতর থেকে বাইরে থেকে অসংখ্য সূচ বেঁধাবার মত অসহ্য জ্বালা। যন্ত্রণায় বার বার 'উঃ' 'আঃ' বলে সে কাতরাতে লাগল। এমন সময় দীননাথ কাছে থাকলেও হয়ত একটু ভাল লাগত।

দীননাথও একসময় চিঠি লেখা ফেলে ছুটে এল—'কি হল, তুমি অমন করছ কেন শরীর খারাপ লাগছে? কোথায় খারাপ লাগছে বলত?'

শবু দীননাথের হাত দুটো ধরে করুণ চোখে তার মুখের পানে চেয়ে রইল, যন্ত্রণায় শরীরে বার বার মোচড় দিচ্ছে অথচ মুখে কিছু বলতে পারছে না। দু চোখে নেমেছে জলের ধারা।

গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দীননাথ বলল—'হঠাৎ কেন এরকম হল? গা-টাও একটু গরম লাগছে। মুখটা লাল দেখাচ্ছে, সেখানেও ব্রণর মত সেই ফুস্কুড়ি দু চারটে উঠছে বলে মনে হচ্ছে।' থার্মোমীটার লাগিয়ে দেখে বলল—'একটু জ্বরও হয়েছে দেখছি-১০০। জ্বরের উপসর্গ ত এতদিন ছিলনা।'

সন্ধ্যা এসে জিজ্ঞেস করল—'মাসী, চান করবা না?'

দীননাথ বলল—'না, ওর একটু জ্বর হয়েছে। সন্ধ্যা, তুমি একটু ওর কাছে থাক, আমি কাউকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাই।'

সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করল—'মাসী, ভাত খাইবা তো? তোমার জন্য মাছের ঝোল রাঁইধা রাখছি।'

সে ভাত বুঝি আর শবুর খাওয়া হয় না। পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল—ডাক্তার বাড়ী ফিরে বিশ্রাম করে তিনটের সময় আসবে বলেছে।

দিশেহারা দীননাথ বলল—'তোমার গায়ে জ্বর, ভাত খাওয়া ঠিক হবে কি?'

শবু করুণ চোখে দীননাথের দিকে তাকাল—শেষে কি তার খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে?

দীননাথ তার করুণ দৃষ্টি দেখে বলল—'আচ্ছা, অল্প করে ছুটি ভাত, মাছ তরকারী খাও, সঙ্গে হরলিকস্‌ও করে দিচ্ছি। সন্ধ্যা, তুমি এখন যাও বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি এসো।'

সন্ধ্যা চলে গেল, দীননাথ শবুকে খাওয়াচ্ছে সেও খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে, এমন সময় এল আধপাগলা ভুলু।

দীননাথ বলল—'ঐ দেখ, ভুলু এসেছে, ওকে আমি খবর পাঠিয়েছিলাম, হাতের কাছে আর কেউ নেই ত? তোমার মনে আছে, ভুলু এখন রাইটার্সে চাকরি করে?'

হ্যাঁ, শবুর সব মনে আছে। মামীমা সেদিন বলে গেছেন—ভুলু চাকরি পেয়ে আমাকে একটা শাড়ী কিনে দিয়েছে।

দীননাথ বলল—'ভুলু, এত বেলা হয়ে গেল, তুই ত আর অফিস যাচ্ছিস না, কাছাকাছি থাকিস যদি দরকার হয়।'

'আমি হোটেল থেকে খেয়ে আসছি' বলল ভুলু।

দীননাথ বলল—'তোর বৌদির খাবার প্রায় সবটাই রয়ে গেছে, এখানেই খেয়ে নে।' বিপদে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত সে আধপাগলা ভুলুকে কাছছাড়া করতে চাইছে না।

ভুলু বলল—'হোটেলে খাবার কথা বলা আছে, আমি একঘণ্টার মধ্যেই খেয়ে আসছি।' সে চলে গেল।

প্রতীক্ষা করতে করতে ডাক্তার চক্রবর্তী এল সাড়ে তিনটে নাগাদ। কাল আর জি কর হাসপাতালে যাতায়াতের সব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বলল—

'রুগীকে সেখানে নিয়ে গেলেন অথচ ডাঃ চ্যাটার্জীকে দিয়ে না দেখিয়েই ফিরে এলেন! আমাকে তবে এখন ডেকেছেন কেন?'

পরে পাশের ঘরে দীননাথের সঙ্গে কিছু কথা বলে ডাক্তার চলে গেল।

দীননাথ শবুর বিছানার পাশে ফিরে এসে তার মাথায় হাত রেখে কেঁদে বলল—'শুনছো, চল আমরা হাসপাতালে যাই।'

'না, না'—শবু কেঁদে উঠল। এই আশঙ্কাই সে করছিল। কিন্তু কি হবে হাসপাতালে গিয়ে।

দীননাথ তার হাত ছুটি ধরে বোঝাতে লাগল—

'তোমার গায়ের ঘা সারছে না, আবার জ্বর হয়েছে—কি চিকিৎসা করতে হবে চক্রবর্তীও বলতে পারছে না। ঐ মিশন হাসপাতাল বা আর জি কর-এ

আমরা যাব না। পিজিতে যাব—সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে, ব্যবস্থাও ভাল। ওখানে গেলে তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবে।'

ভাল হয়ে ওঠার আশা শবু করে না। কিন্তু একা দীননাথের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পরিশ্রমও চোখে দেখা যায়না—একা সে কত করবে ?

'আজ কি বার ?'

দীননাথ শবুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—'আজ বিষ্যুদবার নয়। শনিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী বা পূর্ণিমা। যাবে ত ?'

কি আর বলবে শবু, আর যখন কোন উপায় নেই···। তার দু চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এক ঘণ্টার মধ্যে এম্বুলেন্স এসে গেল। সন্ধ্যা শবুর চুল বেঁধে, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুর পরিয়ে শাড়ী পরাতে গিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—

'মাসী ক্যান ভালা হইতাছে না, আবার ক্যান হাসপাতালে যাইতাছে ?'

ডাক্তার খেতে বারণ করেনি, দীননাথ শবুকে টোস্ট, রসগোল্লা, হরলিকস ফলের রস খাওয়াতে সময় বলল—'মন খারাপ কোরো না, তোমাকে আবার ভাল করে তুলব, বাড়ীতে নিয়ে আসব।'

শবু এখন স্রোতে গা ভাসিয়েছে, যা হবার তাই হবে।

কালও শবু বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়েছে, হেঁটে ফিরেছে। আর আজ সে আবার চলেছে ষ্ট্রেচারে শুয়ে। পিছনে পড়ে রইল তালাবন্ধ বাড়ী, অশ্রু চোখে সন্ধ্যা সুশীলা, গলিতে পাড়া প্রতিবেশীদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি--সঙ্গে চলল দীননাথ আর ভুলু—শবু চলেছে হাসপাতালে দ্বিতীয়বারের জন্য—আগের বার হাসপাতাল থেকে ফেরার ঠিক একমাস পরে।···



একাদশ পর্য্যায়

এক

এক শনিবারের বিকেল থেকে মাঝখানে সোম গিয়ে পরের সোমবার বিকেলে শবু হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরছে। মাঝে দশটা দিন কেটে গেছে। মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া শবু যেন আরো আধমরা হয়ে বাড়ী ফিরে চলেছে। অভিজ্ঞতা কিছু কম হল না, যদিও এখন তার অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তবু চোখ কান ও অনুভূতিগুলো যখন সজাগ তখন অনেক কিছুই সে দেখল শুনল অনুভব করল।

এমার্জেন্সীর ডাক্তার রোগিণীর কাগজ পত্তর দেখে ও পারপুরার কথা শুনে সহজেই ভর্ত্তি করে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ওয়ার্ডের ডাক্তার দীননাথকে ধমকাতে লাগল—এ ত স্কিন ডিজীজের পেসেন্ট, এ ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করেছেন কেন? পরে চুপি চুপি—আপনাদের পিছনে বড় কেউ আছে নাকি?

দীননাথ জানাল—পিছনে কেউ নেই, ডাক্তাররা পারপুরা সন্দেহ করছে।

ডাক্তার আবার ধমকে উঠল—পারপুরা কী বোঝেন? সে জিনিষ নয়। আগের সব ওষুধ, ইঞ্জেকশন বন্ধ, এই ওষুধগুলো কিনে দিয়ে যান।

এখানেও একজন সাহেব দু চারদিন এসেছে, ওয়ার্ডের ডাক্তার দুবেলা দেখেছে—কিন্তু চিকিৎসা বিশেষ কি হয়েছে শবু জানেনা। নার্সেরা এসেছে, নাড়ী টিপেছে, থার্মোমীটার লাগিয়েছে, ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে।

এখানেও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুই মাসী থেকেছে—দিনে জাবেদা, রাতে চামেলী। তারা যে একই সঙ্গে কজন রোগিণীকে দেখে শবু জানেনা। নিজের প্রয়োজনে সে তাদের সাহায্য খুব কমই পেয়েছে। দীননাথ একদিন বলেছিল কাছে কাছে থাকতে, পেসেন্টের হাত পা প্রায় অবশ, কথা বলতে পারে না। উত্তরে শুনতে হয়েছে—সব সময় কি কাছে কাছে থাকতে হবে নাকি, দুসরা কাম আছে না?

আর সেবা যত্ন? শুধু সায়া পরিয়ে পরনের শাড়ীটা দুভাঁজ করে আপাদ-কণ্ঠ ঢেকে খাঁচা বন্দী খাটে শুইয়ে রাখা, দিনে একবার ঘায়ের জায়গাগুলোতে মলম লাগিয়ে, সকালে বিকেলে এক গ্লাস করে হরলিকস করে দেয়া, খাবার

দিয়ে গেলে—'ঐ যে খাবার দিয়ে গেছে. খান, খান' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া, বেড প্যান চাইলে একটা পলিথিনের গামলা ধরিয়ে দিয়ে জমাদারনীর সঙ্গে ঝগড়া করা আর বিকেলে বাড়ীর লোক আসার আগ দিয়ে চুলে একটু চিরুণী লাগিয়ে উপর উপর সামান্য ফিটফাট করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না।

সে তুলনায় মিশন হাসপাতাল ছিল স্বর্গ। সেখানে কল্পনাকে তেমন ভাল লাগেনি। তবু কল্পনা উষাকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যেত, তারা স্নান করিয়ে দিত, কাপড় চোপড় পাল্টে ধুয়ে দিত, দুবেলা সাজিয়ে দিত, প্রয়োজনে চারবেলা খাইয়ে দিত, রাতে পাশে বেঞ্চ পেতে শুয়ে থাকত। এখানে শুধুই ফাঁকি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর হট্টগোল। দু দিনেই শবু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাউকে এমনকি দীননাথকেও সে কিছু জানাতে পারে নি ওদের ভয়ে ; এখানে ওদের বড় দাপট।

প্রথম দেড়দিন দুধ আর হরলিকস ছাড়া শবুকে কিছু খেতে দেয়নি। তার পর থেকে ভাত ও অন্য খাবার দিয়েছে। কিন্তু সে কি নিজে নিজে খেতে পারে ? 'খান, খান' বলে দিয়ে জাবেদা-চামেলী চলে গেছে। শবু উঠে বসতে পারে না, শুয়ে শুয়েই দুর্বল কাঁপা কাঁপা হাতে মুঠো করে খেতে গিয়ে যত না খেতে পেরেছে তার চাইতে ছড়িয়েছে বেশী। কি খেয়েছে কি না খেয়েছে সে কিছুই জানে না। দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। এদিকে মাথার আর শরীরে যন্ত্রণাগুলো প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে।

তারই মধ্যে দীননাথ এসেছে রোজ ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। খিদের যে শবু কাতর, আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে সে কথা তাকে বলতে পারে নি। তবু এখানে এসে থেকে রোজ বিকেলে কি মনে করে বাড়ী থেকে কিছু মাছ তরকারী, দোকান থেকে আঙুর বেদানা মৌসম্বী ও দুটো করে রসগোল্লা এনে দীননাথ তাকে আদর করে খাইয়েছে। ক্ষুধার্ত্ত শবু খুব তৃপ্তি করে খেয়েছে। তখন সব সময়ই তার পেটে খিদে। একদিন বিকেলে দীননাথ বলেছে—এই দেখ, আমাদের গাছে আবার গোলাপ ফুল ফুটেছে, তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। দীননাথ এলেই খেতে দেয়, সে আসতেই চোখ দুটো বুজে শবু মুখখানা হাঁ করে আছে পাখীর ছানার মত, গোলাপের কথা বুঝি তার কানেই যায়নি। দীননাথ আবার যখন বলেছে—পাগলি, এটা খাবার নয়, ফুল, তাকিয়ে দেখ একবার। তখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখেছে—

সত্যিই ফুল, গোলাপ ফুল।

দীননাথের আনা দুটো করে রসগোল্লা খেতে গিয়ে শবুর মনে পড়েছে—সে রোজ ভালমন্দ জিনিষ খাচ্ছে, দীননাথ খাচ্ছে না, চিন্তায় ভাবনায় পরিশ্রমে তার শরীরটাও ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। তখন এক দুদিন একটা রসগোল্লা খাবার পরই ভাঁড় সুদ্ধ দীননাথের হাতটা ঠেলে দিয়েছে—অর্থাৎ, ওটা তুমি খাও। দীননাথ খায়নি, আদর করে শবুকেই খাইয়েছে, খুব আপত্তি করলে আধখানা সে মুখে দিয়েছে। সেও ঐ দু এক দিনই, ক্ষুধার তাড়নায় শবু অধিকাংশ দিনই দীননাথের কথা ভাবতে ভুলে গেছে।

কথা সে খুব কমই বলেছে। প্রথম দিকে একদিন সুপর্ণাকে দূর থেকে আসতে দেখে হাত তুলে ডেকেছে—'এই যে, এই যে, এখানে।' শবু আবার হাসপাতালে এসেছে খবর পেয়ে এসেছে বড় ভাসুর হরিনাথ, সুপর্ণা, বেলা, পুটু, ভব ও শেফালী। কারো সঙ্গেই সে বিশেষ কথা বলতে পারেনি শুধু কেমন আছে জানতে চাইলে বলেছে—'ভাল না'। বারবার মনে হয়েছে দিদি কিন্তু আর তপুর কথা। তপু ত সেদিন জ্বর নিয়ে বাড়ী গেছে, তার জ্বর ছেড়েছে কিনা জানেনা। কিন্তু এত কাছে থেকে দিদি একবারো আসেনা কেন? পিজি থেকে বেহালা কতই বা দূর।

শেষ পর্য্যন্ত শবু বাড়ী ফেরার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। আগের দিন বিকেলে দীননাথ ও বেলা আসতে শবু বেডপ্যানের প্রয়োজন বোধ করেছিল। জাবেদাকে ডাকতে সে দূর থেকে বেডের নীচের গামলা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে—এখন দু ঘন্টা তার ছুটি। চারপাশে পর্দার কথা বলতে বলেছে—এখানে পর্দার রেওয়াজ নেই, কাপড় দিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে কাজ সারতে। সুতরাং হল ভর্ত্তি মেয়ে পুরুষের চোখের সামনে শবুকে চোখ বুজে কাজ সারতে হয়েছে। সবাই চলে গেলে জাবেদা এসে শবুকে শাসিয়েছে—বাড়ীর লোককে না দেখালেই চলছিল না, চেপে রাখতে পার না?

এ ত গেল প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু খিদের জ্বালায় শবু বুঝি পাগল হয়ে যাবে। শরীরে ক্ষমতা থাকলে সে উঠে পালিয়ে যেত যেদিকে দুচোখ যায়। কিন্তু তাকে যে খাঁচা দিয়ে বন্দী করে রেখেছে। তাই পরদিন শবু কেঁদে দীননাথকে বলেছে অনেক কষ্টে—

'আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।'

দীননাথ আদর করে তার চোখ মুছিয়ে বাড়ী থেকে আনা মাছ তরকারী

খাওয়াতে খাওয়াতে বলেছে—

'তুমি একটু ওঠা বসা কর, বাথরুমে যাওয়া আসা আরম্ভ কর, তাহলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। না হলে বাড়ীতে তোমার কত অসুবিধে হবে, আমিও কি একা একা পেরে উঠব? তাছাড়া ডাক্তাররা কি বলে সেটাও জানতে হবে।'

পরদিনই শবু প্রচণ্ড মনের জোরে এক কাণ্ড করে বসেছে। দীননাথ এসে খেতে দেবার আগেই সে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে খাটের রেলিং এ রাখা একখানি শাড়ী গায়ের উপর টেনে নিয়েছে। দীননাথ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছে—

'শাড়ী কি করবে, পরবে?'

'হুঁ'

বিপন্ন দীননাথ আবেদার খোঁজ না পেয়ে এক ঘর লোকের সামনে শবুর খালি গায়ের উপরই শাড়ীটা কোনরকমে আঁট করে জড়িয়ে দিয়েছে।

দীননাথ এসে খাঁচার একপাশের রেলিং খুলে দেয়। এবার শবু বিছানা থেকে পা নামিয়ে বলেছে—'চল।'

'কোথায় যাবে তুমি? কোথায় যাবে তুমি? বাড়ী যাবে?' দীননাথ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বুঝি কেঁদেই ফেলেছে।—'এখন ত বাড়ী যেতে দেবে না। বাথরুমে যাবে তুমি?'

'হুঁ'—এইবারে শবুর মনের কথা বলেছে।

দীননাথের সাহায্যে বিছানা থেকে নেমে, তার সঙ্গে টলমল পায়ে অনেকটা দূরে বাথরুম থেকে ঘুরে এল। সেখানে সে না পারল বসতে, না হল কিছু। তবু আবার বিছানায় শুয়ে সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এই ত সে বাথরুম পর্য্যন্ত হেঁটে ঘুরে এল, এবার তাকে বাড়ী নিয়ে চলুক।

দীননাথ তাকে খাইয়ে দিতে দিতে বলেছে—

'বাঃ, এই ত তুমি কতদূর হেঁটে এলে। কাল যে আমি হাঁটা চলার কথা বলেছিলাম, তাই কি হেঁটে দেখিয়ে দিলে? তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না? আমারও। আজ সন্ধ্যের পর ডাক্তারকে বলব তোমাকে ছেড়ে দিতে। যদি বলে তবে কালই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।'

শবুর শরীর রোগ-জর্জর, যন্ত্রণায় কাতর, এতটা হেঁটে এসে তার হাত পা কাঁপছে,—তবু অনেকদিন পরে তার মুখে দেখা দিয়েছে তৃপ্তির হাসি—সে

বাড়ী ফিরে যাবে, এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে।

দীননাথের বাবার মুখে জাবেদা এসে বলেছে—'আমি দূর থেকে দেখলাম দাদা কেমন বৌদিকে শাড়ী পরিয়ে দিল, বাথরুম থেকে ঘুরিয়ে আনল।'

কী পাজী, শুধু পাজী নয়, শয়তান! দেখেছে, অথচ একবার সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। দাঁত বের করে হেসে দিনের পাওনা টাকাটা গুণে নিয়েছে। এখানেই শবু শুয়ে শুয়ে দেখেছে, কেউ মারা গেলে তার বাড়ীর লোকজন এসে পৌঁছনোর আগেই তার পরনের কাপড়খানি ছাড়া সব কিছু লোপাট হয়ে যায়, এমন কি ওষুধ, বা চুল আঁচড়ানোর চিরুণীটা পর্যন্ত।

ঐ কথাটিই শবু মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। দীননাথ বলেছে—ডাক্তার বললে কালই বাড়ী নিয়ে যাব। অতএব আজ নিশ্চয়ই দীননাথ এসে তাকে বাড়ী নিয়ে যাবে।

বিকেল হতেই সে জাবেদাকে বলল—

'শাড়ী জামা পরব।'

'শাড়ী জামা পরার কি কাম?'

'আমাকে নিয়ে যাবে।'

'আজ তো ছাড়বে না, আজ এতোয়ার, দফতর বন্ধ।'

শবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে মুখে কথা এনে আবার বলল—

'যাবো বলছি।' বলে নিজেই জামা পরতে গিয়ে না পেরে কেঁদে আকুল হল।

শবুর দুরবস্থা ও কান্না দেখে পাষাণও গলে, জাবেদা যত পাজীই হোক মানুষ ত। দয়াপরবশ হয়ে শবুকে শাড়ী জামা পরিয়ে দিতে দিতে বলল—

'বহেন, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলছি।' আহা, শাড়ীটা পরে যদি শান্তি পায়…। শবুকে জামা কাপড় পরিয়ে দিয়ে অন্য কাজে সে গেল।…

ঐ ত দীননাথ আসছে, এবারে সে তাকে নিয়ে যাবে। প্রবল উৎসাহে শবু বিছানায় উঠে বসল…কিন্তু ওকি, দীননাথের হাতে গাড়ীর যন্ত্রপাতির ব্যাগ কেন! তবে ত সে মোটর বাইকে এসেছে, তার মানে আজ তাকে নিয়ে যাচ্ছে না—সঙ্গে সঙ্গে শবু 'ও মাগো' বলে গভীর হতাশায় বিছানায় এলিয়ে পড়ে প্রবল কান্নায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

তাড়াতাড়ি ব্যাগ নামিয়ে রেখে দীননাথ আদর করে শবুর চোখ মুছিয়ে কান্নাভরা গলায় বলতে লাগল—

'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? কেউ কি তোমাকে বকেছে?'

অভিমানে শবুর মুখ দিয়ে কথা বের হল না, শুধু কাঁদতে লাগল।

কোথা থেকে জাবেদা এসে বলল—'বহেন বাড়ী যাবার জন্ত আমাকে দিয়ে শাড়ী পরিয়ে নিল। আমি বললাম, আজ ছুটি হবে না, কাল হবে। আমার কথা বিশ্বাসই করল না।'

শবুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দীননাথ বলল—'তাই নাকি? সেই জন্ত শাড়ী জামা পরেছ? শোনো, কাল রাতে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেছে, আমরা পেসেণ্টকে ছেড়ে দেব, কাল রবিবার, অফিস বন্ধ, সোমবার বিকেলে আপনার পেসেণ্টকে নিয়ে যাবেন।'

'শুনলে বহেন, আমরা হাসপাতালে কাজ করি, আমরা জানি।' জাবেদা তার জ্ঞানের প্রমাণ দেখিয়ে চলে গেল।

দীননাথ বলতে লাগল—'তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না? আমারো আর এ জায়গা পছন্দ হচ্ছে না। কি করব, আজ যে রবিবার, ছুটির দিনে নাকি কাউকে ছাড়া হয়না। আর আজকের রাতটা, কাল বিকেলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। আজ বেলাকে বলে যাব, কাল এসে সে তোমাকে সাজিয়ে দেবে, আমি হাসপাতালের অফিস থেকে ছুটির কাগজপত্তর এনে তোমাকে নিয়ে যাব। আর কাঁদে না, লক্ষ্মীটি। এই দেখ আজ তোমার জন্ত দুটো মাছ, দুটো রসগোল্লা আরো কি এনেছি। নাও, খাও···। লক্ষ্মী সোনা ···।'

একটু একটু করে শবুর কান্না থামল, খেতেও লাগল। কি আর করা যাবে, আজ রবিবার পড়ে গেল যে। এ সব ব্যাপার ত সে জানে না। লাজুক হেসে সে দীননাথের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

অবশেষে আজ সোমবার বিকেলে শবু বাড়ী ফিরে চলেছে। কতটা সে ভাল হয়ে ফিরছে তার প্রমাণ—সে ওয়ার্ড থেকে হেঁটে বার হয়নি, হুইল চেয়ারে বসিয়ে তাকে ট্যাক্সি পর্যান্ত আনা হয়েছে। তবে এখানে এসে ইঞ্জেকশন দেওয়া বন্ধ হয়ে অন্ত ওষুধ চলছে—এটাই বড লাভ। রোজ গায়ে সূচ বেঁধালে যে কত কষ্ট লাগে - আজীবন নীরোগ শবুর জীবনে এইটাই সব থেকে কষ্টকর অধ্যায়।

হাসপাতাল থেকে বার হতে সময় জাবেদা চামেলী থেকে আরম্ভ করে জমাদারনী, ওয়ার্ড বয়, লিফট্‌ম্যান পর্যান্ত সবাই বকশিসের জন্ত ছেঁকে ধরেছিল।

হুইল চেয়ার ঠেলা ওয়ার্ড বয় মাত্র একটাকা বকশিস দেওয়াতে সেটা ট্যাক্সির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—

'ভিক্ষে দিচ্ছেন ? ও টাকা আপনিই রাখুন।'

দীননাথ রেগে জবাব দিল 'ভিক্ষে নয়ত কি ? সরকারী চাকরি করছ আবার বকশিস কেন ?'

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করেছে। এতক্ষণ শবু মুক্তির আনন্দে মশগুল ছিল, শরীরের যন্ত্রণার কথা ভুলে ছিল। দুর্বলতা কিনা জানেনা, তবে তার হাত দুটো আজকাল ভীষণ কাঁপে। এতদিন সব সময় প্রায় শুয়েই থাকত, এখন ট্যাক্সির গদিতে হেলান দিয়েও মনে হচ্ছে সে মাথা সোজা রাখতে পারছে না। ভীষণ ভারী বোধ হচ্ছে। যন্ত্রণাও হচ্ছে খুব, যেন ঝিনুক দিয়ে মাথার ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সারা শরীরে ভীষণ অস্বস্তিতে সে ছটফট করতে লাগল।

দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'তোমার বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ? আমার কোলে মাথা রেখে শোও।'

শুয়ে পড়ল শবু। পরমুহূর্তে সারা শরীর যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠতে সে উঠে বসল। একবার শুচ্ছে, একবার বসছে।

বেলা জিজ্ঞেস করল—'মেজদি, বাথরুম করবি ?'

বোধ হয় তাই ঠিক। বলল—'হুঁ'।

দীননাথ বলল—'ইস্, কি ভুলটাই হয়ে গেছে, যা সব বকশিস চাওয়ার বহর।...এই তো আমরা হ্যারিসন রোড ছাড়িয়ে এসেছি, আর পনরো বিশ মিনিটেই আমরা বাড়ী পৌঁছে যাব।'

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শবু এসে বাড়ীর কাছে ট্যাক্সি থেকে নামল। দীননাথের হাতে ভর করে সে ছুটে চলল বাড়ীর দিকে, রাস্তার দু ধারে ভিড় করে কারা দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে তাকাবার অবসর তার নেই।

দুই

বড় অসহায়ভাবে শবু তার শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। দীননাথ হয়ত ভাবছে তাকে ভাল করে তুলবে কিন্তু শবু বুঝতে পারছে তার দিন সীমিত হয়ে আসছে আর তাই সে বাড়ী ফেরার জন্ত ব্যাকুল হয়েছিল।

মাত্র দুদিন আগে প্রচণ্ড মনের জোরে শবু দীননাথকে হেঁটে দেখিয়েছে। কিন্তু এখন সে বসতেও পারছে না। বাড়ীর তালা খুলে তাকে জায়গামত নিয়ে এসে কমোডে বসিয়ে দিলে সে একটু একটু করে নীচে ঢলে পড়ে খালি মেঝেতে শুয়ে পড়ল। দীননাথ ও বেলা দুজনে তাকে তুলে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিল।

কিছু পরে বেলা বলল—'মেজদি, তুই আবার বাড়ী ফিরে এলি, তোর ভাল লাগছে ত? আমি বাড়ী যাই, কেমন? ওখানে আমার কয়েকটা ট্যুইশনি আছে।'

নিজের শরীরের যন্ত্রণা চেপে রেখে শবু বলল—'আয়।'

বেলা আদর করে মেজদির গায়ে হাত বুলিয়ে এক সময় ধীরে ধীরে চলে গেল।

শরীরের ভিতর নানা যন্ত্রণায় ও অস্বস্তিতে শবু কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। একটু পরে আবার সে উঠে বসার চেষ্টা করতে দীননাথ তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল—'তখন বাথরুম হয়নি, আবার যাবে?'

'হুঁ'।

আবার কমোডে বসিয়ে দিতে আবার সে গড়িয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টায় দীননাথ তাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'শুনছো, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বলত? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বল?'

শবু কিছু বলতে পারল না, শুধু দীননাথের একখানি হাত চেপে ধরে করুণ চোখে চেয়ে রইল—দু চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

দিশেহারা দীননাথ কি করবে বুঝতে না পেরে এক গ্লাস হরলিক্স তৈরী করে শবুকে একটু একটু করে খাইয়ে দিল। খেয়ে যেন তার শরীরে একটু শান্ত ভাব এল।

সেই সময় সন্ধ্যা এসে পৌঁছলে দীননাথ শবুকে বলল—'তুমি একটু সন্ধ্যার কাছে থাক, আমি ডাক্তারের কাছ থেকে তোমার যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ নিয়ে আসি।'

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে শবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'মাসী দেখি হাসপাতাল থিকা আরো কাহিল হইয়া আইছে।'

কাহিল বলে কাহিল! কতদিন পরে সে নিজেদের বাড়ীতে এসেছে কিন্তু একবারও কি সাধের বাড়ীখানির দিকে ফিরে তাকাতে পেরেছে? কীসের

যন্ত্রণায় যেন সারা শরীর অস্থির অস্থির লাগে। দুবার কমোডে বসতে গিয়ে সে বুঝেছে কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না, মাথা যেন অসম্ভব ভারি। দীননাথ আবার কিসের ওষুধ আনতে গেল…। বাড়ী ফেরার পথের ধকলে একটু একটু করে শবু ঘুমিয়ে পড়তে লাগল…।

অনেকদিন পরে রাতে শবু খুব তৃপ্তি করে খেল। এতদিন হাসপাতালে ওরা তাকে খাইয়ে দেয়নি। দীননাথ বিছানার পাশে টেবিল এনে খাবার সাজিয়ে নিলে সে নড়ে চড়ে কাছে এগিয়ে এল। নিজে হাতে আর খেতে পারে না, ভীষণ হাত কাঁপে, শরীরও খুব দুর্বল। দীননাথ খাবার মেখে খাইয়ে দিচ্ছে, নিজেও খাচ্ছে।

দীননাথ বলতে লাগল—'আবার তুমি বাড়ী ফিরে এসেছ, আমার খুব ভাল লাগছে। আগে যে রোজ তোমাকে ইঞ্জেকশন দিত, তোমার কত কষ্ট হত, এখন তার বদলে অন্য খাবার ওষুধ দিয়েছে। আমি সেবাযত্ন করে তোমাকে ভাল করে তুলব, পরে মন্দির শহরে নিয়ে যাব…।'

খাওয়া শেষে দুজনে আবার এক বিছানায় শুয়েছে। দীননাথ তাকে ভাল করে তুলবে বললেও তার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। আদর করে শবুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পরিশ্রান্ত দীননাথ ঘুমিয়ে পড়ল। শবুর কিন্তু মনে হচ্ছে না সে আবার ভাল হয়ে উঠবে। তবে অনেকদিন পর পেট ভরে খেতে পেয়েছে, শরীরের যন্ত্রণাও সাময়িকভাবে কম বোধ হচ্ছে। ধীরে ধীরে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। ঘুম চোখে শবু ভুলে গেছে সে বাড়ী ফিরে এসেছে। হাসপাতালে রাতের বেলায় চামেলী তার বিছানাতেই পায়ের কাছে বেডপ্যানের গামলা রেখে কোথাও গিয়ে শুয়ে থাকত। অভ্যাসমত শবু উঠে বসে পায়ের কাছে হাতড়ে বেডপ্যান খুঁজতে গিয়ে গায়ে হাত লেগে দীননাথের ঘুম ভেঙে গেল, জিজ্ঞেস করল—

'কি হল? কি করছ তুমি?'

'পান…পান…পান'

'পান, পান কি? ও বেডপ্যান? বেডপ্যান ত নেই, চল পাশের টুলে নিয়ে যাই।'

তক্ষণে শবুর মনে পড়েছে, আবার সে বাড়ীতে এসেছে। দীননাথ উঠে তাকে টুলে বসিয়ে এনে আবার শুইয়ে দিল, এবার আর সে ঢলে পড়ে গেল না। স্বস্তিতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই ভাল লাগে না। সকালে ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে টগর ফুলের ছোট গাছটা সবুজ পাতায় আর সাদা ফুলে সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক যেন একটা বড়সড় সাদা ফুলের তোড়া। আর একপাশে পেয়ারা গাছটায় টুনটুনি আর চড়ুই পাখীগুলো নাচানাচি করছে। জানালা দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে সামান্য বর্ষার মেঘ। অলস শূন্য দৃষ্টি মেলে শবু শুধু তাকিয়ে আছে।

দীননাথ জলখাবার খাইয়ে দিলে শবু একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিল এমন সময় একটু আগে পিছে করে এল ছোট কাকীমা আর অমল।

দীননাথ বলল—'এই দেখ কাকীমা এসেছেন। অমলও এসেছে। তোমার জন্য তুজনেই কত রসগোল্লা এনেছে দেখ। তুমি ত রসগোল্লা খেতে ভালবাস তাই না?'

শবু তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তুর্বল হাসল।

কাকীমা আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কেমন আছিসরে শবু?

'ভাল না, কাকীমা?'

'কেমন লাগে বল। এই ত তুই আবার বাড়ী ফিরে এসেছিস। ভাল হয়ে ওঠ, দীননাথ তোকে বট্‌ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবে।'

বাবার কথা মনে হতে শবুর চোখে জলের ধারা নামল। সে বুঝতে পারছে বাবার কাছে যাওয়া তার আর কোনদিনই হবে না, সে আর বাঁচবে না। কিন্তু বলতে পারল না, শুধু তুচোখে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীননাথ বলল—'তুঃখ পেলে কাঁদে, কথা খুবই কম বলে—তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা, অস্বস্তি। বারবার বেডপ্যানের খোঁজ করে।'

কাকীমা বললেন—'মনে হয় শরীর কষে গেছে, ডাবের জল খাইয়ে দেখ।'

অমল বেশীক্ষণ থাকতে পারল না, অফিসে যেতে হবে, পরে আসবে বলে চলে গেল। যাবার আগে তুটো ডাব কিনে রেখে গেল।

কাকীমা বললেন—'শবু চান করবি চল।'

'না, না'···সে উঠে বসতেই পারে না স্নান করবে কি করে? শেষে মাথা ধুইয়ে কাকীমা শবুকে খাইয়ে দিয়ে, দীননাথকে ভাত বেড়ে খাইয়ে যাবার সময় শবুকে বললেন—

'আসিরে শবু, আবার আসব, তুই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। আসি, কেমন?'

কেঁদে শবু কাকীমাকে বিদায় জানাল। সে অসুস্থ হয়ে থেকে আজই প্রথম দীননাথ বাড়া ভাত খেলো, শবুর ভাল লাগছে, কাকীমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

বিকেলে এল শেফালী। 'বৌদি, এখন কেমন আছ' জিজ্ঞেস করতে ক্লিষ্ট হেসে শবু জানাল 'ভাল না।' সত্যিই ত সে ভাল নেই।

শবুকে বিছানায় শুইয়ে মাথা ধোয়াতে হচ্ছে, টুলের বদলে বেডপ্যান হলে ভাল হয় শুনে শেফালী বলল—

'আমাদের বাড়ীতে প্লাষ্টিকের চাদর আর বেড প্যান আছে, কাল সকালে পাঠিয়ে দেব।'

দীননাথ বলল—'সন্ধ্যা এখনো আসে নি, তুই ওর চুলটা বেঁধে দে।'

চুলে চিরুণী লাগাতে গিয়ে শেফালী বলল—

'বৌদির মাথায় দেখছি বেশ কয়েকটা ঘা হয়েছে।'

দীননাথ এগিয়ে এসে দেখে বলল—'ইস্, আমি আগে লক্ষ্য করিনি, সেই জন্যই হয়ত স্নান করতে চাইছিল না। দেখিস যেন ব্যথা না লাগে। সারা গায়ের ঘা প্রায় শুকিয়ে গেলেও হাত পায়ের ডগায়, আঙুলে আর মুখে মাথায় কিছু রয়ে গেছে।'

খোঁপা বাঁধার জন্যও শবু একটু উঠে বসতে পারছে না। মাথাটা এপাশে ওপাশে ঢলে পড়ছে। দীননাথ একটু আধবসা অবস্থায় তাকে তুলে ধরলে শেফালী খোঁপা জড়িয়ে গার্ডার লাগিয়ে দিল।

আবার রাত এসেছে। দুজনে খেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শবু টুলে বসতে চায়, পাশে দীননাথ অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তাকে জাগাতে মন চাইছে না। নিজেই সন্তর্পণে উঠে মশারী তুলে বাইরে গিয়ে টুলে বসল, আবার বিছানায় ফিরে এসে মশারী গোঁজার চেষ্টা করতে দীননাথের পায়ে হাত ঠেকে তার ঘুম ভেঙে গেল।

অন্ধকারে হাতড়ে অবস্থিতিটা বুঝে নিয়ে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'ওখানে কি করছ?'

'এই ত, এই ত...' শবু আর কিছু বলতে পারল না।

দীননাথ উঠে আলো জেলে সব দেখে কেঁদে ফেলল—'কি কাণ্ড করেছ তুমি! একা একা অন্ধকারে উঠে বাইরে গেছ, আবার ফিরে এসেছ! যদি পড়ে যেতে কি সর্বনাশ হয়ে যেত! আমাকে ডাকলে না কেন? আর এমন

কোরো না লক্ষ্মীটি। আমাকে ডেকো, কেমন ?'

'হুঁ, হুঁ' বলে শবু দীননাথের সাহায্যে আবার শুয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভেঙেই গেল, মাঝখান থেকে সে ধরা পড়ে গেল। লজ্জায় সে চোখ বুজল।

সকালে আবার শেফালীই এল, বেডপ্যান ও পলিথিন শীট পৌঁছে দিতে। সে নটা চল্লিশের গাড়ী ধরবে, আবার পরে আসবে বলে চলে গেল। শেফালীর প্রতি শবু কৃতজ্ঞতা বোধ করছে, বেডপ্যানটা পাশে নিয়েই সে শুয়ে আছে, নীচে নামাতেই দিচ্ছে না।

তিন

এই পর্য্যন্তই বাইরের লোকজন আসা যাওয়া। এরপর থেকে বাড়ীতে তারা দুজন একা। সবারই যার যার ঘর সংসার কাজকাম আছে, কতদিন আর তারা বারবার শবুর খবর নিতে আসবে ?

এসেছে একখানি চিঠি, মন্দির শহর থেকে বাবা লিখেছেন। কানাইয়ের লেখা চিঠির মত সে চিঠিও শবু পড়তে পারল না। লেখাপড়ার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। নতুবা বাবার চিঠি সে পড়বে না এটা অভাবনীয় !

দীননাথ বারবার করে বলতে লাগল—

'এই দেখ বাবার চিঠি এসেছে। তুমি পড়বে না ? চিঠিতে বাবা শুধু তোমার কথাই লিখেছেন, পড়ে দেখ। পড়তে পারবে না ? আচ্ছা আমিই পড়ে শোনাচ্ছি।

'...শবুর শরীর এখন কেমন আছে ? আমার শরীর দুর্বল, তেমন হাঁটতে চলতে পারিনা, চোখে ভাল দেখতে পাইনা। শবুকে এখানে নিয়ে আসবে লিখেছ, এখানে ভাল ডাক্তার কোথায় ? ভাল ডাক্তার কোথায় ? তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ নিও।

'পুঃ—আমি আবার হাঁটা চলা করতে পারব, চোখেও দেখতে পাব, তোমরা চিন্তা কোরো না।...

'শুনলে ত বাবা তোমার জন্ত কত চিন্তা করে চিঠি দিয়েছেন ?'

শবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা জানালার দিকে ফিরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে রইল—কিছুই ভাল লাগেনা। বাবার চিঠিটা কেমন যেন অসংলগ্ন। একটা কথা দুবার লিখেছে—ভাল ডাক্তার কোথায় ? শবুর

ব্যাপারে বাবা বোধ হয় আর নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। শরীর যখন দুর্বল, চিঠি লিখতেও নিশ্চয় হাত কাঁপে। তবে আর সে কার ভরসায় মন্দির শহরে যাবে, কার এক পুরিয়া ওষুধে তার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে? এক সময় সে ভেবেছিল, মন্দির শহরে যাবে, বাবার ওষুধে আর শৈশবের স্মৃতিঘেরা শহরের সুন্দর পরিবেশে তার শরীর ভাল হয়ে যাবে। তা আর হবে না।

এতদিন অসুখ করেছে, বাবা নিজে হাতে কোন চিঠি লেখেন নি, আজই প্রথম। বাবার মন ত, তাই বোধ হয় শবুর অবস্থার কথা বুঝতে পারছেন, ব্যাকুল হয়ে নিজে হাতে চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিই হয়ত তার জীবনের শেষ পাথেয়—

…বাবা গো, তুমি দেখ, তোমার সব থেকে স্বাস্থ্যবতী চির-নীরোগ মেয়ে শবু আজ কেমন অবশ অচল হয়ে পড়ে আছে। যতদিন পেরেছি, তোমার একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বুকে নিয়ে সংসারের সেবা করেছি। এবার আমি মার কাছে যাব। এই পৃথিবীতে তুমি আছ, অন্য জগতে মা-ও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুমি দুঃখ কোরো না বাবা।……

ভাবতে ভাবতে শবুর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণায় তার শরীর মুচড়ে উঠল—ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে আর্ত আওয়াজ উঠল—

'উঃ মা গো, বাবা গো!'

দীননাথ গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ব্যাকুল হয়ে বলল—'কি হয়েছে, অমন করছ কেন? কোথায় কষ্ট হচ্ছে বল?'

শবু তার হাত দুটো ধরে দাঁতে দাঁত চেপে শরীরের যন্ত্রণাটাকে অগ্রাহ্য করে ছল ছল চোখে দীননাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বলতে পারল না।

আজকাল এরকম প্রায়ই হচ্ছে, যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে ছটফট করে ওঠে, মুখ দিয়ে আর্ত করুণ আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে 'মা গো' 'বাবা গো'। দীননাথ আরো অসহায়ের মত বিপন্ন ব্যাকুলভাবে তার সেবা করতে থাকে। কী যে করণীয় তাও সে জানেনা।

সকালে একবার বাজারে যাওয়া ছাড়া দীননাথের এখন বাইরে বার হওয়া একেবারে বন্ধ। দিনরাত সে শবুকে নিয়েই ব্যস্ত। তার বন্ধুরা সন্ধ্যের দিকে একবার করে এসে খবর নিয়ে চলে যায়।

শবু সব সময় বিছানায় শোয়া। কখন কি অবস্থায় থাকে তার ঠিক নেই। তাই ঘরের জানালার পর্দাগুলো তুলতে দেয় না—সবাই দেখবে সে শুয়ে আছে সে বড় লজ্জার। পর্দা ঘেরা ঘর অন্ধকার মত হয়, বর্ষাকাল, ফলে মশায় ছেঁকে ধরে। বাধ্য হয়ে তপুদের নাইলনের মশারীটা দুপুরের দুতিন ঘণ্টা ছাড়া সব সময়ই টাঙানো থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা সেই ঘরে শবু শুয়ে আছে আর দীননাথ তার দেখাশোনা করে চলেছে। দীননাথ তার সঙ্গে কথা বলে গল্প করে, সে নীরবে শোনে, কখনো অন্যমনস্ক থাকে।

একজন মানুষ ত সব সময় কথা বলতে পারে না। সে সময় শবু কখনো ঘুমোয়, কখনো শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক ভেঙে বেরিয়ে আসে। আবার কখনো তীব্র যন্ত্রণায় তার মুখ দিয়ে ক্ষীণ কাতর আর্তনাদ বার হয়ে আসে—

'বাবা গো'।…'উঃ মা গো'।

অসহায় বিহ্বল দীননাথ সব সময়ই তার পাশে পাশে আছে।

এই নিরানন্দ পরিবেশে শুধু খাবার সময়ই শবু একটু নড়ে চড়ে ওঠে। খেতে তার খুব ভাল লাগে—সকালে বিকেলে জলখাবার ছাড়াও দুপুরে ও রাতে টেবিলের উপর খাবার সাজাতে সাজাতে দীননাথ জিজ্ঞেস করে—

'এখন খাওয়া। খাবে ত?'

'অঁঃ'—খুশীতে শবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কি দিয়ে খাবে, মাছ দিয়ে?'

'অঁঃ'। ছোট শিশুর মত ছোট আওয়াজ তার কণ্ঠে।

'রসগোল্লা খাবে?'

'অঁঃ।'

'আম দিয়ে দুধভাত খাবে?'

'অঁঃ'।

'এসো, খাবে এসো।'

শবু শুয়ে শুয়েই নড়ে চড়ে খাবার টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। এমনি ধরনের কথোপকথন তাদের রোজ হয়, দু বেলাই হয়। দীননাথও একসঙ্গে খায়, বিছানায় পড়ে থাকা রোগী বলে তার কোন ঘেন্না আছে বলে মনে হয় না।

খাওয়া হয়ে গেলে মুখে জল দিয়ে কুলকুচি করতে বলে মুখের কাছে বাটি ধরলে শবু সামান্য কুলকুচি করে জলটুকু গিলে ফেলে—মুখ ধোয়াও হল জল

খাওয়াও হল। শুধু শেষবারটা বাটিতে ফেলে, না হলে এঁটো মুখ শুদ্ধ হয় না।

না, এখন আর সে দুষ্টমী করে বাইরে জল ফেলে না।

মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে দীননাথ জিজ্ঞেস করে—'খেতে কেমন লাগল? খেয়ে তৃপ্তি পেলে?'

খুশির হাসিতে শবুর ঠোঁট দুটো একপাশে বেঁকে যায়, চোখ দুটো টেনে কপালে তুলে বলে—

'ভাল, খু-উ-ব ভা-ল।'

এই খেতে খেতেও দু চারবার তীব্র যন্ত্রণায় তার শরীর অস্থির হয়ে ওঠে, খাওয়া বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে রাখে। মাত্র দশ পনরো সেকেণ্ড, যন্ত্রণাটা কমে আসে, আবার খেতে থাকে। খাওয়াটাও পুরোপুরি আনন্দের হয় না, শরীরেই যে সুখ নেই।

দীননাথের শোয়া বসা দাড়ি কামানো খবরের কাগজ পড়া সবই এখন এই শোবার ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সকালের খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে সন্ধ্যা কাজে এলে দীননাথ শবুকে বলে বাজারে গেল। কাগজটা বিছানার পাশে টেবিলের উপর রাখা আছে। অলসভাবে শবু হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিল।

কাগজে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত করে বড় বড় অক্ষরে কী সব লিখেছে। ভাল লাগেনা আর এ সব কচকচি। কাগজটা উল্টে রাখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল 'দূরদর্শন সমীপে' লেখাখানি। কাগজটা আবার চোখের সামনে টেনে আনল।···না ভাল লাগছে না। বিছানার উপরই কাগজ নামিয়ে রাখল। আগে এই লেখা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ত, এখন আর তাতে কোন উৎসাহ বোধ করছে না।

দীননাথ বাজার থেকে ফিরে টেবিলের কাগজটা বিছানায় রাখা দেখে যেন খুব উৎসাহিত বোধ করল। ভারী গোছানো মানুষ ত, এখানকার জিনিষ ওখানে গেলে বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে বলল—

'কাগজটা দেখছিলে বুঝি? দেখেছ, পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ফ্রন্টের কেমন জয়জয়কার হয়েছে। কেন্দ্র গেছে, রাজ্য গেছে, এখন পঞ্চায়েতগুলোও বাস্তু-ঘুঘুদের হাতছাড়া হল। এমন করেই হয়ত একদিন ধাপে ধাপে সমাজ-তন্ত্র আসবে দেশে। সব শোষণ অবিচার অত্যাচারের অবসান হবে···।'

গভীর আলস্যে শবু পাশ ফিরে চোখ বুজল। এখন আর এসব তার মাথায় ঢোকেনা। এককালে তারও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল। ভেবেছিল, দেশে পরিবর্ত্তন আসছে, সব অন্যায়ের বিচার হবে, অত্যাচার দূর হবে। কিন্তু এত সহজে হবার নয়, হলে দীননাথকে আবার চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিতে হত না।

আর শবুর মত বধূদের জীবনে? সেখানে শাশুড়ীতন্ত্র অনড়তন্ত্রের মত কায়েম হয়ে আছে, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, চলবে আরো কত যুগ ধরে। হয়ত একদিন তারও অবসান হবে, তবে সে কোন সুদূর ভবিষ্যতে। শাশুড়ী আতঙ্কে জর্জরিত মৃত্যু-পথযাত্রী শবুর কানে এখন এ সব পরিহাসের মত শোনায়। এ যুগেও কত সুরূপিনী শাশুড়ীর কোপে পড়ে কুরূপার ভাগ্য বরণ করে নিচ্ছে!

বর্ষাকাল, বৃষ্টি তেমন না হলেও, আকাশ মেঘে ভার হয়ে আছে। ভিজে কাপড় জামা সহজে শুকোচ্ছে না। বেডপ্যান ব্যবহার শুরু হয়ে থেকে দীননাথ নিজে হাতে শবুর কাপড় চোপড়ও ধুচ্ছে মেলে দিচ্ছে, সন্ধ্যাকে এ সব কাজ করতে বলা যায় না। তার উপর কাল রাতে নিজে নিজে বেডপ্যান ব্যবহার করতে গিয়ে শবু ছোটবেলার মত কাণ্ড করে ফেলেছে।

রাতে ঘুম ভেঙে উঠে দীননাথ তোষক চাদর পাল্টেছে, তাকে বলেছে—

'অন্ধকারে নিজে নিজে সব করতে গিয়ে করলে ত এক কাণ্ড? আমাকে ডাক না কেন? এখন থেকে আমাকে ডাকবে, কেমন, লক্ষীটি।'

আর লক্ষী! শবু ততক্ষণে লজ্জায় চোখ বুজেছে।

সকালে উঠে দীননাথ তোষক চাদর উপরে মেলে দিয়েছে, বাজার থেকে নক্সাছাপ প্লাষ্টিকের বড় চাদর এনে বিছানায় পেতেছে। শেফালীর দেয়া প্লাষ্টিক শীট ফাটাফুটো। মানুষটার ঝামেলার শেষ নেই, একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

দুপুরে খাবার আগে শবুর মাথা ধুইয়ে গা মুছে দিতে দিতে দুঃখে ক্ষোভে দীননাথ বলতে লাগল—

'আমাদের সুখ শান্তি আনন্দ সব গেছে। আমাদের বাড়ীতেও কেউ আর আসবে না, কতদিন আর আসবে? তুমি কথা বলতে পার না, এখন ওঠা বসাও বন্ধ। কত ডাক্তার ওষুধ, দু দুবার হাসপাতাল—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এই যে এখন মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মাগো বাবাগো বলছ, অস্থির

হয়ে উঠছ—আমি অসহায়ের মত শুধু দেখছি, কিছুই করতে পারছিনা। তোমার কষ্ট যে আর চোখে দেখা যায় না। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব···। আজ আমি প্রায় একা, নিঃসঙ্গ—পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। আমাদের এই বিপদের দিনে সবাই দূরে সরে আছে···।'

বেদনায় শবুর মুখ বিবর্ণ হল, বুকের ভিতর কান্নার আবেগ দলা পাকিয়ে উঠছে। দীননাথ কি তাকে বকছে? তার এই অবস্থার জন্য শবুকেই দায়ী করছে? গভীর অভিমানে তার চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। নীরব কণ্ঠ শবুর মনে নানা ভাবনায় ঝড় বয়ে চলল যেন—

দীননাথ আক্ষেপ করছে—তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। কেন নেই? সে যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রয়োজনে ও আকর্ষণে মন্দির শহরে শান্ত ও সুখের জীবন ফেলে স্বেচ্ছায় বদলি নিয়ে কলকাতায় এল, সঙ্গে শবুও। সেও শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদের বিরাট সংসারের বোঝা কাঁধে তুলে নিল, একমনে সেবা করে চলল সকলের। দীননাথ তার কষ্টের অর্থ দিয়ে, শক্তি সামর্থ দিয়ে দুই ছোট ভাইকে ওভারসীয়ারী পড়াল, ছোট বোনের বিয়ে দিল। তারা এখন কোথায় গেল? তারা কেন এসে তাদের উপকারী দাদা-বৌদির পাশে দাঁড়ায় না? শবু যে এত বছর নিঃস্বার্থ সেবা করে গেল তার প্রতিদানে কি পাচ্ছে? শেফালীর শ্বশুরবাড়ী ও চাকরি আছে। সোনা থাকে দূর এলাহাবাদে। কিন্তু ভব? সে কেন এই বিপদের দিনে এসে তার দাদার পাশে দাঁড়ায় না, বৌদি ভাল হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত তার সেবা যত্নে সাহায্য করে না? থাকেও সে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, কলকাতায়। সেবা দূরের কথা, তার বৌ মালতী শবুর এই কঠিন অসুখে একবার হাসপাতালে দেখতেও আসেনি। এদের সম্বন্ধেই দীননাথের কত আশা ছিল—বিপদে এই ভাইরা তাকে দেখবে, বাড়ীর পাশে জমি কিনিয়ে বলেছিল—একে অপরের সহায় হবে। কোথায় গেল সে সব? এই ভব নাকি এখন ইঞ্জিনীয়ার। দীননাথ যদি তাকে ওভারসীয়ারীতে না পড়াত তবে কোথায় থাকত তার এই ইঞ্জিনীয়ারী? মাত্র সেদিনও শবু প্রায় তিনমাস ধরে ভবর বাড়ী তৈরীর ঝামেলায় নাজেহাল হয়েছে। এ সবের প্রতিদানে কি পাচ্ছে তারা? শুধু দূর থেকে একবার পাঁচশ বা হাজার টাকা দিয়ে দায় সারলেই সব কর্ত্তব্য শেষ হল? এই জন্যই কি শবু বছরের পর বছর প্রাণপাত করে তাদের সেবা করে এসেছে?···

মানুষ বাঁচে আশায়, বাঁচে আনন্দে, বাঁচে অবলম্বন নিয়ে। তার জীবনে যদিও অবলম্বন একটা আছে, কিন্তু আশা বা আনন্দ আর নেই। বাঁচার

ইচ্ছাও তাই আর নেই। যে কদিন আছে, তার স্বামী ও একমাত্র অবলম্বন দীননাথের সঙ্গ ও সাহচর্যে কোনরকমে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু সেও একদিন তাকে কঠিন আঘাত দিয়েছে, একটু একটু করে দূরে সরে গেছে, আর আজ তার উপর বিরক্ত হচ্ছে। কি আর করা যাবে? যতদিন ভোগ পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন সে সকলের বোঝা হয়ে থাকবে। তারপর একদিন শবুর মা নেমে আসবে আকাশ থেকে, দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেবে অতি আদরের মেয়েকে -সেইদিন আসবে পরিপূর্ণ মুক্তি। দীননাথও তার দুর্বহ বোঝা থেকে মুক্তি পাবে।··

তার জীবনের বিয়াল্লিশটা বসন্ত ঝরে গেছে। প্রথম সতরোটা বছর বাপ মার কাছে আদরেই ছিল। এখনকার পঁচিশ বছরে সে কি পঁচিশটা দিনও অসুস্থ হয়ে তার স্বামীকে বিব্রত করেছে? তার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? দীননাথ নিজে সরাসরি দায়ী না হলেও নিমিত্ত ত বটেই। তার সঙ্গে বিয়ে হয়েই সে এই সংসারে এসেছিল। এখানে একটা দিনও কি সে শাশুড়ীর বাক্যবাণে চোখের জল না মিশিয়ে মুখের গ্রাস তুলতে পেরেছে? বারোমাস একান্নবর্ত্তী সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে কেউ কি তার মুখে তেষ্টার জলটাও তুলে ধরেছে? শুধু অপবাদ লাঞ্ছনা দুর্মুখ দুর্ব্যবহারে জীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ, দুর্বিসহ।·····

আজ আবার সেই আতঙ্ক শিয়রে এসে উপস্থিত দেখে শবু যখন তার স্বামীর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তখন প্রথমে পেয়েছে প্রত্যাখ্যান, পরে শুনেছে অসহায়ের বিলাপ। তাই ত শবু আজ চলে যেতে চায় তার মার কাছে। ওগো আর তুমি আমাকে বোকোনা, আমি মার কাছে চলে যাব—থাকো তুমি ·····

'তোমার মাকে নিয়ে ··।'

তীব্র অভিমানে কথাকটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ আগেই দীননাথ চুপ করে গিয়েছিল, হঠাৎ শবুর মুখ থেকে কটি কথা শুনতে পেয়ে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'কি বলছ তুমি? কার মাকে নিয়ে?'

'তোমার মাকে।' বলে শবু ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

দীননাথ পাগলের মত শবুর হাত দুটো ধরে বলতে লাগল—'বল 'তোমার মাকে নিয়ে' কি বলছিলে? মাকে নিয়ে কী?······মাকে এখানে নিয়ে আসার কথা বলছ? তোমার অসুখের মূলই ত তিনি। তার এখানে আসার

পথ বন্ধ। ওগো চিন্তামণি দেবী, তুমি আর ওসব চিন্তা কোরোনা। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, তুমি ছাড়া যে আমার জীবন অন্ধকার। আমার কথায় কি তুমি মনে দুঃখ পেয়েছ? সত্যি আমি অতি পাষণ্ড, তোমার শরীরের এই অবস্থায়ও তোমাকে কথা শুনিয়েছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। চিন্তায় ভাবনায় আমার মাথার ঠিক নেই।'

গভীর মনস্তাপে তার দু চোখ বেয়ে জল নেমে এল—দীননাথ কাঁদছে। তার কান্না দেখে শবুর দু চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগল। মানুষটার অসহায় কান্না শবুর বুকে বিষম বাজে। অতি আত্মবিশ্বাসী লোক যখন ভাগ্যের হাতে মার খায়, বিধ্বস্ত হয়, মনের সব দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে তখন তার বুঝি এই চেহারাই হয়।

অনেকক্ষণ কেঁদে শবুর চোখ মুছিয়ে দিয়ে দীননাথ দুপুরের খাবার যোগাড় করতে গেল। শবুর মাথায় তখন অন্য চিন্তা। কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে মানুষটা সেই কবে থেকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গেছে, চলছে আষাঢ় মাস—সামনে কবে যেন রথ।

হয় হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি করা না হয় বাড়ীতে সেবা যত্ন নাওয়ানো খাওয়ানো ওষুধ ডাক্তার—কী না করছে মানুষটা। এই মাত্র কি যেন বলছিল—তুমি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার। দিনরাত রুগীর সেবা করা, কমোড বেডপ্যান কাচাকুচি একটানা করতে করতে মনে তার বিরক্তি আসতেই পারে। দুটো কথা ক্ষোভে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। না, শবু আর দুঃখ করবে না, মানুষটা খারাপ নয়, সে যে শবুর জন্যই কাঁদছে, তার অভাবে চোখে অন্ধকার দেখবে।'

শবু যখন থাকবে না তখন কি হবে? এখনও যদি কেউ থাকত তাকে সাহায্য করার। কে থাকবে? মিতুরা যদি আবার আসে, এখানে থাকে তবে সবদিক থেকেই ভাল হয়। শবু না থাকলেও তারা এখানে থাকতে পারবে। বাবাও নিশ্চিন্ত হবে।

দীননাথ বলল—'খাবার রেডি, খাবে না? এসো।'

নড়ে চড়ে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে শবু বলল—

'মিতু।'

'মিতু! মিতু কি? তুমি ত শবু, আমি শবুকে খেতে ডাকছি। তোমার নাম ত শবু, শ্রাবণী, আমার সোনামণি, আমার আদরিণী।'

'না, না, মিতু ···।' শবু যা বলতে চায় সবটা বলতে পারে না।

একটু ভেবে দীননাথ বলল—'মিতুর কথা কী বলছ? ওদেরকে আবার এখানে আনতে চাও? মনে নেই সেবারে কী অশান্তি করে গেল, তোমাকে পর্য্যন্ত কথা শোনাল, আবার আইটা বাঁধার কথা শুনেছিলে তুমি বলেছিলে। আবারও সেই অশান্তি ডেকে আনব? দরকার নেই। আমি কি তোমার সেবাযত্ন ঠিকমত করছিনা? দেখো আমি তোমাকে ভাল করে তুলবই। তুমি আমার কাছে আছ, তুমিই থাকবে। নাও, এখন খেতে আরম্ভ কর, ওসব চিন্তা রেখে দাও।'

হয়ে গেল তার সমস্যা সমাধান করা। না, সে আর ভাববে না। স্বামীর উপর কোন অভিমানও রাখবে না। বাবা মা তাকে যার হাতে তুলে দিয়েছে সেই দীননাথের হাতে সব চিন্তার ভার তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। আর মান অভিমানের পালা নয়।

দিন গড়িয়ে আবার রাত আসছে। সুশীলা সন্ধ্যা কাজ করে দিয়ে চলে গেছে। শবু মশারীর ভিতর শুয়ে আছে, দীননাথ তার মাথার কাছে বসে ধীরে ধীরে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দূরের কোণে রাখা টিভিটা আস্তে আস্তে বাজছে, দীননাথ তার উপরে চোখ রেখেছে। সারাদিনে রাতে এখন ঐ টুকুই তার মনোরঞ্জন।

শবু আচ্ছন্নের মত শুয়ে আছে। কখনো ঘুমোচ্ছে, কখনো শরীরের তীব্র যন্ত্রণায় তার ঘুম ছুটে যাচ্ছে। যন্ত্রণা একটু কমলে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকছে। টিভি দেখায় সে আর উৎসাহ পায় না। শুয়ে শুয়ে সে তার রোগ যন্ত্রণার কথাই ভাবছে।

টিভির অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তন হল। এবারে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবে একজন বিশেষজ্ঞ। শবুও তার স্বাস্থ্য নিয়ে বিব্রত, শোনাই যাক তার অসুখ সম্বন্ধে কিছু বলে কিনা। সে একটু নড়ে চড়ে টিভির দিকে চোখ ফেরাল।

আলোচনা হচ্ছে শিরার ব্যথা ও তার উপর আসন বা ব্যায়ামের উপকারিতা নিয়ে। যদি···ঝুপ করে আলো নিভে লোডশেডিং এর অন্ধকারে চারদিক ডুবে গেল।

শবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। দীননাথ বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু কর্মীর মুণ্ডপাত করতে করতে উঠে গিয়ে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালল। তারপর তালপাখাটা হাতে করে মশারীর ভিতর ঢুকে শবুকে জোরে জোরে

হাওয়া করতে লাগল। বিরক্তির একেবারে একশেষ!

কতক্ষণ পরে আলো এল, টিভিটা চলতে আরম্ভ করল। শবু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, দীননাথ ডেকে বলল—

'শোনো, লাইট এসে গেছে, এই ফাঁকে আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। আবার কখন লাইট যায় ঠিক নেই।'

খাবার যোগাড় হতে হতে টিভির অনুষ্ঠানও শেষ হল, এখন ঘোষিকা আগামী কালের অনুষ্ঠানসূচী বলছে।

'এই ঘোষিকার নাম কি বলত?' দীননাথ শবুর কাছে জানতে চাইল।

টিভির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে শবু বলল—

'চৈতালী।'

'কি করে তুমি চেন বলত? আমার কাছে দীপালি, চৈতালী, শাশ্বতী সব একই রকম মনে হয়। আরে, কালকে একটা ভাল বাংলা সিনেমা আছে বললো। ওটা আমাদের দেখা হয়নি। দেখবে না?'

'হুঁ' বলে শবু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কি করে জানে না, তবে সে একবার যাকে দেখে তাকে কখনো ভোলে না। দীননাথ ঠিক তার উল্টো, চেনা মানুষকেও দুদিন পরে চিনতে পারে না। কিন্তু শবুর স্মৃতিতে সবই ধরা থাকে, এখনো আছে।

লাইট থাকাতে বেশ স্বস্তিতেই খাওয়া চলছে। দীননাথ ভাত মেখে দলা করে শবুকে খাইয়ে দিচ্ছে নিজেও খাচ্ছে। মাছের কাঁটা বেছে মুখে দিচ্ছে, সে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিচ্ছে। এবারে আম দিয়ে দুধ ভাত মেখে খাওয়া—চামচ আর বাটির আওয়াজেই শবু বুঝতে পারে। এই খাবারটা শবুর সব থেকে পছন্দের। দীননাথ বড় চামচে করে দুধ ভাত খাওয়ায়—না হলে দুধ পড়ে বিছানা নষ্ট হবে। শবু আরামে দু চোখ বুজে খাচ্ছে, আবার ঠোঁটে চামচের ছোঁয়া লাগতে পাখীর ছানার মত হাঁ করছে। হঠাৎ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, শরীরের যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে করুণ চোখে দীননাথের দিকে চাইল। যন্ত্রণা কমলে আবার তৃপ্তি করে খেতে লাগল। এ রকম সময় প্রত্যেকবারই দীননাথ অসহায়ভাবে তার গায়ে হাত বুলোতে থাকে, বেদনায় তার মুখখানি করুণ দেখায়। খাওয়া শেষ হল, জল খাইয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে দীননাথ বলল—

'নাদু ভরেছে? কেমন লাগল?'

'হুঁ-উ। খু-উ-ব ভা-ল।' শবু খুশিতে হেসে চোখ দুটো টেনে

কপালে ওঠাল।

'আমার সোনা খেতে খুব ভালবাসে' বলে দীননাথ আদর করে তার গালে চুমু খেল। হঠাৎ সে কাঙালের মত বলতে লাগল—'কতদিন তুমি আমাকে আদর করনি, একবার আমাকে একটু আদর কর। আমাকে একটা চুমু দেবে না? আমাকে একটা চুমু দাও…।' বলে একটা গাল তার মুখের কাছে নিয়ে গেল।

শবু পুচ্ করে তার গালে একটি চুমু খেয়ে হেসে লজ্জায় চোখ বুজল।

দীননাথ আনন্দে গলে গিয়ে পাগলের মত শবুর দু গাল চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—'কতদিন পরে তুমি আমাকে আদর করলে। আমার খু-উ-ব ভাল লাগছে। আমার আদরিণী লক্ষ্মী সোনা। আমার চাঁদু।'

একটি চুমু দিয়ে শবু আজ তার স্বামীকে কৃতার্থ করেছে, কতদিন পরে দু জনের মুখে ক্ষণিকের খুশির হাসি ফুটেছে।

চার

সকালে ঘুম ভেঙে থেকে শবুর মন খুবই বিষণ্ণ লাগছে। কেমন একটা সব হারাবার বেদনা তার শরীরের যন্ত্রণাকেও যেন ছাপিয়ে উঠছে। শূন্য উদাস চোখে শুধু চেয়ে আছে। দীননাথ তার চোখ মুখ ধুইয়ে হরলিকস করে এনে খাওয়াচ্ছে, শবু একদৃষ্টে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। সংসারে এই মানুষটিই তার সব চাইতে আপন, একমাত্র অবলম্বন।

একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—'কি দেখছ? কিছু বলবে?'

'কিছু না' বলে শবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সন্ধ্যা কাজে আসতে—'তুমি একটু শুয়ে থাক, সন্ধ্যা আছে, আমি বাজারটা ঘুরে আসি?' বলল দীননাথ।

'আচ্ছা' বলে শবু সায় দিলে দীননাথ থলে হাতে বাজারে গেল।

দীননাথ চোখের আড়াল হতে শবুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত সে কাছে না থাকলে ভাল লাগে না। যখন সে থাকবে না দীননাথেরও তখন নিশ্চয় এই রকম খারাপ লাগবে।

…হঠাৎ শবুর মনের পর্দায় একটি ছবি ভেসে উঠল। শূন্য বাড়ীতে একা

দীননাথ ঘুরে বেড়াচ্ছে, উদাস উদ্‌ভ্রান্ত। উস্কোখুস্কো চেহারা, নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই, শরীরের প্রতি যত্ন নেই। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব থেকেও কেউ নেই, সে বড় একা। একজন মানুষ সব সময় তার কাছে ছিল, পাশে পাশে থাকত কত কথা বলত,—সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু স্মৃতি বুকে নিয়ে কিসের অপেক্ষায় দিন গুণে চলেছে, সেই আপন মানুষটার স্মৃতিও একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। কোনদিন কেউ যে তার পাশে ছিল ভুলে যেতে বসেছে—আর সেই কথা মনে হতে বারবার অঝোর কান্নায় আকুল হয়ে উঠছে···

কেন এমন ছবি মনে এল? সেইদিন কি খুব কাছে এসে গেছে? না, না, ঐ ত দীননাথ বাজার থেকে ফিরছে, ঘরে তার আদরের শবু আছে, তার জন্য সে বাজার থেকে কত কি এনেছে।

জল খাবার খেতে খেতেও শবু কেবলই দীননাথের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দীননাথ বোধহয় অন্য কিছু চিন্তা করছে তাই বিশেষ লক্ষ্য করল না। খাওয়া হলে তার মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে দীননাথ বলল—

'দেখ, তোমার মুখের ঘা সব সেরে গেছে, এখন শুধু মাথায় কয়েকটা আর হাত পায়ের পাতা ও আঙুলের গুলো শুকিয়ে গেলে সব সেরে যাবে। কচি চামড়ায় তোমার মুখ কি সুন্দর কচি কচি দেখাচ্ছে, ঠিক যেমন ছিল আমাদের বিয়ের সময়, সুন্দর মিষ্টি লাবণ্যে ভরা।' আদর করে তার গালে নাকে চোখে ভুরুতে আলতোভাবে হাত বুলোতে বুলোতে আবার বলল—'আঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক পরীর মত—এই বুঝি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে—কী রূপ, কী দীপ্তি'···

বলতে বলতে ছোট আয়না এনে তার মুখের সামনে ধরে আবার বলল—'দেখ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার মুখখানা।'

শবু আয়নাটা এক হাতে ধরে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে পাশে নামিয়ে রাখল। বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কটি কথা—

'সোনার প্রতিমা বিসর্জন···!'

বেদনায় দীননাথের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, আদর করে মাথায় হাত রেখে বলল—

'অমন করে বোলো না গো, আমার বুক ভেঙে যায়। অমন করে বোলো না।'

শবুর চোখেও জল নেমে এল।

অনেকক্ষণ ধরে আদর করে দুজনে একটু শান্ত হলে দীননাথ বলল—

'তুমি এখন একটু ঘুমোও, আমি ততক্ষণ বাবাকে চিঠি লিখি, সে-ই যে বাবা তোমার জন্ত কত চিন্তা করে চিঠি দিয়েছিলেন, তোমার মনে আছে ত? তার উত্তরটা লেখা দরকার।'

শবু নীরবে পাশ ফিরে চোখ বুজল, দীননাথ পাশের ঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

না, শবুর চোখে ঘুম আসছে না। ওঘরে বসে দীননাথ বাবাকে চিঠি লিখছে। লিখুক চিঠি—এখন লেখাই ভাল। বাবা জানবেন কষ্টে হোক, যন্ত্রণা পেয়ে হোক তাঁর আদরের শবু বেঁচে আছে। শবুর চলে যাবার খবর যেন বাবা জানতে না পারেন—সহ্য করতে পারবেন না হয়ত।

সে খবর যদি বাবার কাছে যায়, সে চিঠি হোক বা টেলিগ্রাম, বাবা দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়বেন। সেবারে ষষ্ঠীতলায় মার শেষের টেলিগ্রামটা যখন এসেছিল তখন পিওনের গলায় 'টেলিগ্রাম' আওয়াজ শুনেই শবু বুঝে গিয়েছিল। বাবাও তেমনি টেবিলের উপর রাখা টেলিগ্রামটা দেখতে পেয়ে একবার তা হাতেও নেবেন না, পড়েও দেখবেন না। বুকফাটা কান্নায় বলে উঠবেন—

—ওটা কিসের টেলিগ্রাম রে, শবুর? যখন দেখছি শবুকে কেউ আমার কাছে নিয়ে আসতে পারছে না, আমি তার চিকিৎসার সুযোগ পেলাম না তখনই বুঝেছি শবুকে আর বাঁচানো যাবে না। ওরে কানাই, তোর নতুন বাড়ীটাও শবুর দেখা হল না।

—বলতে বলতে তিনি শিশুর মত কাঁদবেন।

কানাইও ডুকরে কাঁদবে ঠিক যেমন সে কেঁদেছিল মা চলে যাবার পর মেজদির গলা জড়িয়ে।

—বাবা আরো কেঁদে বলবেন—তোদের মা বলত এই বছরে ওর নাকি একটা ফাঁড়া আছে, আমি বিশ্বাস করিনি। আজ সে থাকলে তোদের মেজদিকে বুকের ভিতর আগলে রাখত, কিছুতেই সে শবুকে যেতে দিত না। যাক ভালই হল, মা তার আদরের মেয়েকে কাছে পেয়ে সুখে থাক, আমার কি !!

শুনে কানাইয়ের কান্না দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, সে যে বলত—মা, মেজদি তোমার পেল্লাদ মার্কা মেয়ে—আগুনে পুড়বে না, ট্রেন এ্যাক্সিডেন্টে কিছু

হবে না—কিছুতেই কিছু হবে না।

কাঁদবে কাকলী, কাঁদবে মিঠিদিঠি, সবাইকে কাঁদতে দেখে খেলা ভুলে কেঁদে উঠবে মিষ্টিমা ‥

কোন পেল্লাদই চিরদিন বাঁচে না, শবুও বাঁচবে না।

ঘুম আসছে না। হঠাৎই তার শরীর ভীষণ অস্থির অস্থির লাগছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর মুচড়ে উঠছে, মাথার পিছনটা কিসে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে, পেটের ভিতর সবকিছু কে যেন করাত দিয়ে কেটে লণ্ডভণ্ড করছে। এই সময় দীননাথ, তার স্বামী কোথায়? সে বুঝি পাশের ঘরে বসে বাবাকে চিঠি লিখছে। এ সময় সে যদি একটু কাছে থাকত, তার হাত দুটো আঁকড়ে ধরেও শবু হয়ত একটু স্বস্তি পেত—

'উঃ মাগো। উঃ বাবা গো।'

পাশের ঘর থেকে দীননাথ বলল—'এই ত চিঠি লেখা প্রায় হয়ে গেছে, আমি এক্ষুনি আসছি।'

শবু যন্ত্রণায় বারবার ছটফট করছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে 'মাগো, বাবাগো' দীননাথ বলছে 'এই আসছি, এক্ষুনি আসছি'। শেষে কোনরকমে চিঠিতে ইতি টেনে দীননাথ ছুটে এল—

'এই ত আমি এসেছি। কি হয়েছে, খারাপ লাগছে? কি খারাপ লাগছে বল।'

কোন কথা না বলে শবু তার হাত দুটি আঁকড়ে ধরল—যন্ত্রণায় তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীননাথ কেঁদে বলল—'তোমার কী কষ্ট হয় বলতে পার না, আমিও বুঝতে পারি না। কি করি আমি, বলত? বেড প্যান দেব?'

হয়ত তাই। শবু সম্মতি জানাল। বেডপ্যান এগিয়ে দিয়ে দীননাথ বলল—

'এখনও স্নানের সময় হয়নি। না হোক, এখনই মাথা ধুয়ে গা মুছিয়ে দিই, তাতে হয়ত একটু আরাম পাবে।'

ধোয়া মোছা করতে করতে একসময় সে বলল 'আচ্ছা, তোমার গায়ে এখানে কি সব লেগে রয়েছে, এগুলো কি ঘায়ের চটা? আমি ওঠাচ্ছি, ব্যথা লাগছে? ইস্, এ ত কতদিনের ময়লা গায়ে জমে আছে, হাসপাতালে ওরা ভাল করে গা মুছিয়েও দেয়নি মনে হচ্ছে।…দেখি, একটু এপাশ ফের।

হ্যাঁ এবারে ওপাশ। না না এপাশ নয়, ওপাশ।'

শবু এপাশ ওপাশ কিছু বুঝতে পারছে না, বারবার এক পাশেই গড়িয়ে পড়ছে।

শেষে দীননাথ একটু জোর করেই তাকে ওপাশ ফিরিয়ে দিয়ে চমকে বলে উঠল—

'একি এখানে রক্ত এল কোত্থেকে, কাঁচা রক্ত! কাল তোমার কাপড় ধুতে গিয়ে রক্তের দাগ দেখেছি, ভেবেছি অন্যকিছু, কিন্তু তা ত নয়। তুমি কিছু বুঝতে পারছ?'

না, শবু কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু পাশ ফেরাতে গিয়ে তার পায়ে ব্যথা দিয়েছে বলে ছলছল চোখে দীননাথের দিকে চেয়ে আছে।

বুঝতে পেরে মাথায় হাত রেখে দীননাথ বলল—'ব্যথা লেগেছে? আর অমন করব না, কেমন? কিন্তু এই রক্তটা কিসের জানা দরকার, ডাক্তার চক্রবর্তী কে ডেকে আনি, তুমি একটু সন্ধ্যার কাছে থাক কেমন?

সন্ধ্যা, একটু মাসীর কাছে থাক ত, আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি, মাসীর শরীরটা বোধহয় বেশী খারাপ লাগছে।' দীননাথ ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিটেই ফিরে এল দীননাথ। তার মুখখানা ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে এখনই সে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে গেল, ডাক্তার কোথায়?

একটু ইতস্তত করে দীননাথ শবুর হাতদুটি ধরে কোন রকমে কান্না আটকে বলল—

'ডাক্তার বলল হাসপাতালে নিয়ে যেতে, চল আমরা হাসপাতালে যাই?'

'না, না, না'—বুকভাঙা কান্নায় শবু ডুকরে কেঁদে উঠল। তার দু চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুনদী। দু দুবার সে হাসপাতালে গেল এল, তারা ত কিছুই করতে পারল না, কিছু করেও না শুধু ফেলে রেখে দেয়, খেতে না পারলে খাইয়েও দেয় না। এ বাড়ী ছেড়ে সে যাবে না, শেষে কি স্বামীর কাছে থাকা তার সেবা পাওয়াও তার ভাগ্যে জুটবে না?

শবুর চোখ মুছিয়ে আদর করে দীননাথ বলল—'কাঁদে না লক্ষীটি। তোমায় যে আবার শরীর খারাপ করল। ডাক্তার বলল হাসপাতালে ছাড়া এ অবস্থায় বাড়ীতে ভাল করে চিকিৎসা করা যায় না। চল, আমরা হাসপাতালে যাই। দুবার তোমাকে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি,

এবারও নিয়ে আসব।'

করুণ সুরে শবু টেনে টেনে কাঁদতে লাগল—'না···না···না···না···'।

দীননাথ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, সন্ধ্যার সামনেই ঝরঝর করে কেঁদে বলতে লাগল—

'তুমি অবুঝ হয়ো না গো। ডাক্তার এলই না, কোন ওষুধও লিখে দিল না, বারবার করে বলল—হাসপাতালে নিয়ে যান। তুমি রাজী না হলে আমি বিনা ডাক্তারে তোমাকে কি করে ভাল করে তুলব? বুদ্ধি পরামর্শ দিতে, সাহায্য করতে কেউ কাছে নেই। দিদি অবার আর এক মেয়ে কিছুদিন আগে এখানে বেড়াতে এসেছে, বৌদি তাকে এখানে থেকে একটু দেখাশোনা করতে বলেছিল সেও এখানে না এসে করবীদের বাড়ীতে থেকে ফুর্ত্তি করছে। আমি একা একা কি করি বলত? শেষটায় তেমন কিছু হলে আমি যে মাথা খুঁড়ে মরব···।'

অসহায় দীননাথ, অসহায় শবু—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! সত্যি যদি ডাক্তার জবাব দিয়ে থাকে তবে দীননাথ কি করবে? শবু বুঝতে পারছে এবার গেলে আর ফিরে আসবে না। আবার একা অবস্থায় দীননাথকে বিপদে ফেলেই বা কি হবে? সে যে কোনদিন তার স্বামীর কথার অবাধ্য হয়নি। তার ভাল মন্দর সব ভার যে এই মানুষেরই উপর।

শবু এতক্ষণ কান্নাভেজা চোখে দীননাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার সে দূরে দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ ফেরাল।

দীননাথ বলে উঠল—'আজ বিষ্যুদবার নয়, শনিবার। সেবারও আমরা শনিবারে গিয়ে ফিরে এসেছি, এবারও তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।'

না না, তা নয়। ঐ যে কি যেন বলে, কি যেন হবার কথা? ও হ্যাঁ—'রথ?'

'রথ কবে জিজ্ঞেস করছ? রথের এখনো তিনদিন বাকি।' বলে দীননাথ ব্যগ্রভাবে শবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তবে ত আর দেরী নেই। মা রথের দুদিন আগে গেছে, ঐ দিনটি যে শবুরও শুভদিন। হয়ত কালই সে তার স্বামী—ভালবাসার আদরের 'ব' কে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে চির বিদায় নেবে। বলবে না—'আসি', বলবে 'মার কাছে যাচ্ছি।' আর মাত্র একটি দিন, এখন তাকে টানাটানি না করলেই ভাল হয়। শরীরের মধ্যে যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে যেন, শবু বুঝতে পারছে। কিন্তু দীননাথেরও মনে একটা সান্ত্বনা থাকা দরকার।

শবু চলে গেলে অকুল সমুদ্রে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে যেন এটুকু ভেবে সান্ত্বনা পায়—শবুকে বাঁচাবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

শবু আর ভাবতে পারে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীর হাতে হাত রেখে সে চোখ বুজল—দীননাথ যা ভাল বোঝে তাই করুক।

দীননাথ তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—

'তা হলে হাসপাতালে যাওয়া ত? আমি এম্বুলেন্স ডাকতে লোক পাঠাই?'

শবু নীরব দৃষ্টি মেলে দীননাথের মুখের দিকে একবার চেয়ে আবার চোখ বুজল। চোখের দু কোল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

সামনে মনোহরবাবুর এক ছেলেকে পেয়ে দীননাথ তাকেই পাঠাল এম্বুলেন্স ডাকতে।

শুরু হয়ে গেল যাত্রার প্রস্তুতি। গা মোছানো আগেই প্রায় হয়ে গিয়েছিল, এবার মাথাটা ধুয়ে মুছিয়ে দীননাথ বলল—

'এখন ভাত খেতে দেয়া ঠিক হবে না, তুমি বরং একটু মাছ খাও।' বলে মাছ এনে কাঁটা বেছে একটু খাইয়ে দিয়ে সন্ধ্যাকে বলল—'সন্ধ্যা, তুমি কাঁটা বেছে মাসীকে মাছ খাইয়ে দাও। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে আসি এম্বুলেন্স কখন এসে পড়ে ঠিক নেই।'

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বেরিয়ে এসে আবার বলল 'ডাক্তার বলেছে তরল জিনিষ খাওয়াতে, সন্ধ্যা, আর মাছ খাইয়ো না।'

শবু করুণ চোখে তাকাল, সন্ধ্যাও বলল—

'আর একটুখানি বাকি, মেসো।'

'থাক, তুমি বরং এই ডাবের জলটুকু খাওয়াও' বলে নিজে দু তিন চামচ শবুকে খাইয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি ডাবের জল খেতে থাক, আমি ততক্ষণ এক গ্লাস হরলিকস তৈরী করে আনছি।'

ততক্ষণে পাড়ার সবাই জেনে গেছে শবু আবার হাসপাতালে যাচ্ছে। বাড়ীতে মেয়ে-বৌদের ভিড় ভেঙে পড়েছে। দীননাথ আলমারী থেকে পাটনায় মায় কিনে দেয়া সাজের ডালি বের করে দিয়ে বলল—

'সন্ধ্যা, তোমরা ওর চুলটুল বেঁধে সাজিয়ে দাও।'

সন্ধ্যা, কচির বৌদি ও দিদিরা শবুর চুল বেঁধে সিঁদুর আলতা পরিয়ে দিতে লাগল। গিন্নীবান্নীদের একজন বলল—

'লাহিড়ী মশাই, আপনি ততক্ষণ দুটি মুখে দিয়ে নিন।'

'না না, ওকে কিছু খেতে না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এখন আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।'

আর একজন বলল—'তাই বললে কি হয়, স্নান করে খালি পেটে যাবেন, আপনি যে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে ডাকল—

'মেসো, খাইবা আসো।'

সকলের চাপে পড়ে দীননাথ পাতে বসল। শবুকে তখনো সাজানো চলছে, সে শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দীননাথের খাওয়া দেখছে। সন্ধ্যা ভারি ভাল মেয়ে, সে কত করছে শবুদের জন্য। শুধু পয়সার জন্যই এত দরদ দিয়ে কেউ কাজ করে না। ভর দুপুরে মানুষটা না খেয়ে যাবে ঘরে রান্না খাবার ফেলে শবুই বা তা প্রাণে সইবে কি করে? দীননাথকে খেতে দেখে তার খুব ভাল লাগছে।

কাঁদতে কাঁদতে দীননাথ দু চার গ্রাস যা-ও-বা খাচ্ছিল পাড়ায় এম্বুলেন্স আসার শব্দ পেয়ে তাও ফেলে রেখে সে উঠে পড়ল, আর দেরী করা চলবে না।

শবুকে সিঁদুর আলতা পরানো হয়ে গেছিল। দীননাথ এবার কিছুক্ষণের জন্য ঘর খালি করে শবুর জামা কাপড় পাল্টে দিল। আদর করে চুমু খেয়ে বলল—

'চল এবার আমরা যাই?'

শবু দীননাথের একখানা হাত ধরে ছলছল চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আবার শবু চলেছে হাসপাতালে—পরপর তিনবার। এবার আত্মীয় স্বজন কেউ কাছে নেই, এমন কি আধপাগলা ভুলুটাকেও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পাড়ার লোকদের বলে দেয়া হল ভুলুকে যেন ডেকে বাড়ীটা একটু দেখতে বলে। পাড়ারই তিনটি ছেলে চলেছে সঙ্গে শবুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে।

নীরব অবশ অবসন্ন শবু আবার স্ট্রেচারে শুয়ে বাড়ীর বার হচ্ছে। এবার আর সে চোখ বুজে নেই, দু চোখ ভরে সে সাধের বাড়ীটাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে এই তার শেষ যাওয়া। মাত্র গত সোমবারে সে সকলের মনে আশা জাগিয়ে দ্বিতীয়বার হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরেছিল—ঠিক

পাঁচদিন পরেই আবার সে চলে যাচ্ছে, পিছনে পড়ে রইল তালাবন্ধ বাড়ী, বেদনায় অশ্রুসজল সন্ধ্যা ও প্রতিবেশিনীরা, উপরে আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। দুপুরের সূর্য মেঘে ঢাকা।

কাঁদছে দীননাথ। কাঁদছে শবুও। সে ভেবেছিল জীবনের শেষ কটা দিন নিজেদের বাড়ীতে স্বামীর কাছে কাটাতে পারবে। তা বুঝি আর হবে না।



দ্বাদশ পর্য্যায়

এক

শবুকে নিয়ে চলেছে যমে মানুষে টানাটানি। টানাটানি ঠিক নয়—মৃত্যুর দেবতাই শুধু তাকে টানছে, মানুষের তরফ থেকে বাধা অতি সামান্য। একমাত্র বাধা, শেফালীর ভাষায়, শবুর মজবুৎ হার্ট, যা নিয়ে সে জন্মেছিল—আর বাধা দীননাথের আকুল আগ্রহ, যার সঙ্গে বাবা-মা শবুর জীবনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। ডাক্তাররা যেটুকু করার অবশ্যই করবে, কিন্তু ডাক্তাররাও বোঝে শবুও বুঝতে পারছে—কোন ধন্বন্তরীই তাকে আর বাঁচাতে পারবে না। তবু চলেছে চেষ্টা।

পথে যেতে সি আই টি রোডের ধারে এম্বুলেন্স থামিয়ে দীননাথ ছুটে গিয়েছিল সুরমাদের বাড়ীতে—যদি অন্ততঃ একজন আত্মীয় স্বজনকেও সঙ্গে পায়। কিন্তু কমল গেছে অফিসে আর সুরমা গেছে নাকি ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখতে। একা গাড়ীতে ফিরে এসে দীননাথ শবুকে কেঁদে জানিয়েছে—

এই বিপদের সময় সুরমাকেও পেলাম না।

হাসপাতালে এমার্জেন্সীর সেই ডাক্তারই বোধ হয় শবু মৃত্যুপথযাত্রিণী বুঝে ভর্ত্তি করতে চায় নি, বলেছে বেড খালি নেই। তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনলে তার দুর্ভোগ অনেকটা কমত, অন্ততঃ নিজেদের বাড়ীতে শেষ সময় স্বামীকে কাছে পেত। হাসপাতালের নিয়ম কানুন আলাদা।

মরীয়া দীননাথ হাসপাতালের কর্মচারী পাড়ার নব্য ডাক্তার অশ্বিনীর এক আত্মীয়কে খুঁজে বার করে সব কথা বলতে সে দয়াপরবশ হয়ে ডাক্তারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করতে এসে শবুকে বারবার হাঁ করতে বলে সাড়া না পেয়ে জোর করে তার দু চোখের কোণ হাতের দু আঙুলে টিপে ধরল। যন্ত্রণায় শবুর মুখ হাঁ হল, কিন্তু ব্যথায় তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ডাক্তার সরে গেলে দীননাথ এগিয়ে এসে তার চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিল—'ডাক্তারটা পাজী, ওকে বকে দেব।'

শবু শান্ত হল।

আবার সেই ওয়ার্ড যেখানে জাবেদা চামেলীদের রাজত্ব। চাকাঅলা টেবিল থেকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই শবু বড় বড় চোখে পাশের স্প্রিং লাগানো উঁচু লোহার ষ্ট্যাণ্ডের দিকে তাকাতে লাগল।

দীননাথ আশ্বাস দিল—'রক্ত দেবে না—স্যালাইন গ্লুকোজ দিতে পারে কিম্বা হয়তো ওটা পাশের বেডের জন্য রেখেছে।'

দীননাথ ডাক্তারের প্রেস্কৃপশান মত ওষুধ আনতে গেল, আর আসেই না। শবুর মনে হচ্ছে দীননাথ হয়ত তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ঘরে লোকজন এসে ভর্তি হয়ে গেল তবু তার দেখা নেই। ব্যাকুল হয়ে সে তার দুর্বল শরীর নিয়েও বিছানায় উঠে বসল। ঐ ত দীননাথ হাতে ওষুধ পত্তর নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে আসছে।

'এই যে আমি, এই যে আমি এখানে'—প্রবল চেষ্টায় শবু দু হাত তুলে ডাকতে লাগল। জীবনে শেষবারের মত বুঝি সে ডাকল তার জীবন-স্বামীকে. বলল জীবনের শেষ কথা।

দীননাথ ওষুধ নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল—

'বাপরে, একটুক্ষণ না দেখে একেবারে উঠে বসেছ! এই ত তোমার জন্য কত ওষুধ এনেছি, ওষুধ পড়লেই তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে।'

সিষ্টার এসে হাতে স্থচ ফুটিয়ে নল লাগিয়ে দিয়ে গেল। ক্লান্তিতে ও নল লাগানোতে শবুর শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল—আচ্ছন্নের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছু পরিচিত গলার আওয়াজে তন্দ্রা ভেঙে গেল। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তপু বলল—'এই দেখ মেজদি, আমি এসেছি। এতদিন আমার জ্বর আর নানা ঝামেলায় আসতে পারিনি, তুই রাগ করিসনি ত? আজ সকালেই তোর জন্য মন ভীষণ খারাপ লাগল. ও-কে বলে দুপুরের পর এসে শুনি আজই তোকে আবার হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে ষষ্ঠীতলা হয়ে আমি এখানে ছুটে এসেছি। তোর কেমন লাগছেরে মেজদি?'

শবু কোন কথা বলতে পারল না, দু চোখ দিয়ে শুধু আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাঝখানে একবার এসে শবু হাসপাতালে থেকে গেছে, ওরা বোধ হয় খবরই পায় নি, বাড়ীতে ফিরে গেলে পর এক সকালে অমল এসে সব জেনে গিয়েছিল। আজই তার শরীরটা বিশেষ খারাপ হয়েছে সকাল থেকে আর তপুরও দূরে বসে মন খারাপ হয়েছে। মায়ের পেটের বোন ত—না, শবু রাগ করেনি।

এবার বেলা এগিয়ে এল—'মেজদি, দেখ আমিও এসেছি। আমরা ত কোন খবরই পাইনি। তপুদি কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বাড়ীতে এল, আর তক্ষুনি পুতুলকে মার কাছে রেখে আমরা রওনা হলাম।'

শবু বেলার দিকে তাকাল, বেলাও খুব ভাল মেয়ে, শবুর জন্য কম ছুটোছুটি করছে না।

পিছন থেকে উঁকি মারল ভব। দীননাথ বলল—'ভবও তপুর একটু পরেই আমাদের বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে সব শুনে হাসপাতালে এসেছে।'

শবু ভাল করে ভবর দিকে তাকাবার সুযোগ পেল না—হুড়মুড় করে সুরমা ছুটে এসে কেঁদে বলতে লাগল—'কাকীমা, তুমি আমাদের বাড়ীর সামনে থেকে ঘুরে এলে, আমার সঙ্গে দেখা হল না। আমি সিনেমায় যাইনি কাকীমা কাছেই এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরে কাজের মেয়েটার মুখে সব শুনে আমার কী আফশোষ, যেমন ছিলাম তেমন ছুটে এসেছি। কেমন আছ বল কাকীমা।'

শবুর মন ভরে গেছে। কে বলে তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই? এই ত দু চার ঘন্টার মধ্যে কতজন এসেছে তার খবর নিতে।

পরদিন রবিবার, এসেছে অনেক লোক। কাকীমা, পুটু, বেলা, তপু অমল, পুতুল, বাবুল, হৃদিনাথ, সুপর্ণা, সুরমা কমল, শেফালী-কাঞ্চন, মহী, ভব, বাসু, ডুলু, ভুলু। শবু সবার দিকে চেয়ে শুধু কাঁদল, কোন কথা বলতে পারল না। সারাদিনই সে আচ্ছন্নের মত বিছানায় শুয়ে আছে, হাতে সূচ বিঁধানোই আছে, কখনো নল লাগাচ্ছে কখনো খুলে দিচ্ছে সিষ্টাররা এসে। আত্মীয় স্বজন সবার মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

যাবার সময় কাকীমা বললেন—'কাল হবেনা. আমি আবার পরশু রথের দিন আসব। তুই ভাল হয়ে ওঠ মা।'

তপু বলল—'আমি কিছুদিন ষষ্ঠীতলা'য় থাকব, রোজ তোকে দেখতে আসব। আসি আজ, কেমন?'

আর সব শেষে গেছে দীননাথ। যাবার সময় শবুর মাথায় যত্নে হাত বুলিয়ে একটি হাত ধরে কেঁদে বলল—

'আসছি আমি, রাতে আমি এখানেই ছিলাম, পাশের ঘরে ছিলাম, তুমি যতদিন হাসপাতালে থাকবে ততদিন আমি থাকব। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না, শুধু সকালে দুঘন্টার জন্য গিয়ে বাড়ীতে ঝাঁটপাটের ব্যবস্থা করে

আশা ছাড়া। ভুলু রাতে আমাদের বাড়ীতে থাকছে। তুমি ভাল হয়ে থাক, আমি আবার কাল সকালে আসব।'

বলে শবুর চোখ মুছিয়ে দিয়ে নিজে চোখ মুছতে মুছতে শ্লথ পায়ে বারবার শবুর দিকে ফিরে চাইতে চাইতে এক সময় চোখের আড়াল হয়ে গেছে। দীননাথ চোখের আড়াল হতে শবুর চোখে দ্বিগুণ বেগে জল নেমেছে।

দীননাথ আজ আরো দুবার এসেছিল। একবার খুব ভোরে সিষ্টারের অনুমতি নিয়ে দু মিনিটের জন্য। যেন চোরের মত আসা। আবার এসেছিল দুপুরে—শবুর অন্য সব খাওয়া বন্ধ, তাই তার আর এক বোতল দুধ পৌঁছে দিতে। দুবারই সে বলে গেছে, রাতে সে এখানেই ছিল, এখানেই থাকবে।

কত কষ্টই হচ্ছে মানুষটার। কোথায় খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে ভাবতে গিয়ে শবুর বুকের ভিতর টনটন করে উঠেছে। আরো দু বার সে হাসপাতালে থেকেছে—কোনদিন ত হাসপাতালে থেকেছে বলেনি। এবার তবে কেন থাকছে?

কাকীমা কি যেন বলে গেল—পরশু রথ? তবে ত আজকেই সেই রাত, শবুর মায়ের কাছে যাবার শুভক্ষণ। আজো রাতে অনেকদিন বাদে আকাশে মেঘের ঘনঘটা, মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। মা কি তাকে নিতে এসেছে? শবু ত প্রস্তুত হয়েই আছে।

···যতবার শবু মার কথা ভাবতে যাচ্ছে ততবারই একটি মন্দিরের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মন্দিরের মধ্যে ঠিক মারই মত এক দেবীমূর্ত্তি বেদনা ও করুণাভরা চোখে যেন শবুর পানে চেয়ে আছে। একজন পূজারী তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কি যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে, শবু তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে ।

যতবার মাকে ডাকতে যাচ্ছে ততবারই ঐ একই ছবি সামনে ভেসে উঠছে। শেষে শবু 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। কে যেন এসে তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

এল আর এক সকাল। খুব ভোরে আবার এসেছে দীননাথ, বলল—

'এই দেখ, আমি এসেছি, শুনছো।' বলে আদর করে তার মাথায় হাত রাখল।

শবু পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তার জীবন সাথীর মুখের পানে চেয়ে রইল, এক হাত দিয়ে তার দুটি হাত ধরল। চোখে নামল জলের ধারা।

দীননাথ তার চোখ দুটি মুছিয়ে বলল—

'কাল রাতে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আমার তখন খুব ভয় করছিল। চার বছর আগে এমনি রাতে মা চলে গিয়েছিলেন। যদি তিনি তোমাকে নিয়ে যান …তাই আমি মার কাছে উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম তোমার জীবন ভিক্ষা চেয়ে। বৃষ্টি থামতে ওয়ার্ডে খবর নিয়ে জানলাম আমার আদরিণী ঘুমোচ্ছে। তখন একটু নিশ্চিন্ত হলাম। মা বোধ হয় আমার কথা শুনেছেন—তাই আজ সকালে তোমাকে আবার দেখতে পেলাম। রাতে অমলও আমার সঙ্গে ছিল।'

শবু চেষ্টা করেও কোন কথা বলতে পারল না, নীরবে দীননাথের মুখের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল।

চামেলী এসে বলল—'কাল রাতে 'মা, মা' বলে খুব কাঁদছিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল।'

সিস্টার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দীননাথকে বলে গেল—'আর দাঁড়াবেন না, চলে যান।'

'আসছি আমি, আবার দুপুরে আসব' বলে দীননাথ ছলছল চোখে চলে গেল।

শবুর তখন কাল রাতের কথা ধীরে ধীরে মনে পড়ল · এক দেবী মূর্তি, একজন পূজারী—সে কি তবে দীননাথ! একি স্বপ্ন না দুটি মনের মিলিত কল্পনা! অদ্ভুত তাদের মনের মিল—বিয়ের সময়ের সেই মন্ত্রপাঠ 'যদিদং হৃদয়ং মম ··' যেন সত্যি সার্থক হয়ে উঠেছিল। তেমনি মিল তাদের জীবনেও। দুর্বল শক্তি নিয়ে দীননাথ উপরওয়ালার সঙ্গে একা লড়াই করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শেষে চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে—আর দুর্বল মন নিয়ে একা শবু শাশুড়ী দেওর ননদের কাছে হেরে গিয়ে মায়ের কোলে শেষ আশ্রয় চেয়েছে। দীননাথ তবু জোর করে একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে—শবু এখন মায়ের পায়ে সমর্পিত প্রাণ।

দুই

ধীরে ধীরে শবুর চেতনা গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছে। শুধু মাঝে মাঝে মাথার পিছন দিকে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হয়। যে হাত সূচ বিঁধানো ও বাঁধা নেই সেই হাত দিয়ে মাথার পিছনটা স্পর্শ করতে চায় কিন্তু দুর্বল হাত

অতটা দূর পৌঁছায় না—কাঁপতে কাঁপতে অর্ধেকটা উঠে আবার নেমে আসে। চোখের পাতা দুটি ভারী হয়ে আসছে, চোখ তুলে চাইতে কষ্ট হয়। আছে শুধু শরীরে কিছুটা স্পর্শের অনুভূতি, সামান্য শ্রবণশক্তি, আর চোখের জল। দীননাথ যখন এসে বলে—সকালে এসেছি, দুপুরে এসেছি বা বিকেলে এসেছি তখন তা শুনতে পায়, হাত ধরলে গায়ে মাথায় হাত বুলালে পরিচিত স্পর্শে শরীরটা বারবার কেঁপে ওঠে, অতি কষ্টে চোখ দুটি মেলে একান্ত আপন-জনের দিকে তাকায়, চোখে নেমে আসে জল। কথা বলা সে কবে থেকেই বন্ধ।

কখন এসে গেছে রথের বিকেল। শবু আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। মনে হচ্ছে অনেক লোকজন এসেছে কিন্তু সে চোখ মেলে চাইতে পারছে না। এক সময় দীননাথ কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগল—

'তুমি একবার আমাদের দিকে তাকাবে না? দেখ আজ কত লোক এসেছে—কাকীমা, তপু, পুটু, দুলু, অমল, সুপর্ণা, কমল, শেফালী, কাঞ্চন—সবাই কত দূর দূর থেকে এসেছে, তুমি একবার দেখবে না?...'

বেদনায় শবুর বুক ভেঙে যাচ্ছে, সবাইকে সে দেখতে চায় কিন্তু পারছে না যে। অনেক কষ্টে চোখের ভারী হয়ে আসা পাতা দুটো অর্ধেক খুলে সামনে যেন অস্পষ্ট এক গ্রুপ ছবি দেখতে পাচ্ছে—হ্যাঁ এই ত কাকীমা, পাশে তপু আর মুখের খুব কাছে দীননাথ। তার চোখ দুটি বুজে এল, চোখের দুপাশ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার শবুকে কি ভীষণ ব্যথা দিল। কে ব্যথা দিল? একটু আগে সুপর্ণা কাকে যেন বলেছিল—

'আপনারা তিনদিন হল আমার কাকীমাকে বিনে চিকিৎসায় ফেলে রেখেছেন, কাকীমার কত কষ্ট হচ্ছে।'

উত্তর হয়েছে—'এ অবস্থায় যন্ত্রণা বোধ থাকে না। এই দেখুন।'

আর তখনই শবুর হাতে ভীষণ ব্যথা লেগেছে। যন্ত্রণায় শবুর শরীর কুঁকড়ে গেল, চোখের পাতা খুলে গেল, মনে হচ্ছে সেই ডাক্তার যে দু তিনবার করে আসে। পর মুহূর্তে চোখ দুটি আবার বুজে এল—শরীরের ব্যথায় চোখে নামল জল।

সুপর্ণা বলল—'ঐ ত কাকীমার ব্যথা লেগেছে, কাকীমা কাঁদছে।'

অপ্রস্তুত ডাক্তার তবু হার মানল না, বলল—

'যত জোরে হাতে চিমটি কেটেছি, আপনি হলে লাফিয়ে উঠতেন।

আপনারা দুজনের কার্ডে দশজন এসেই রোগীর অবস্থা খারাপ করে তোলেন— বিলেতে হলে একজনের বেশী…।' ডাক্তার বিলেত দেখিয়ে চলে গেল।

সকলের মধ্যে একটা অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল—শবু যেন এক গিনিপিগ। দীননাথ তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে ব্যথার জায়গায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—

'আবার তোমাকে ব্যথা দিল শুধু শুধু, আমি ওকে বকে দেব।' পরে স্বর্পণাকে বলল—'ডাক্তারদের সঙ্গে ঝগড়া করিসনা, এখন ওরাই যে আমাদের একমাত্র ভরসা।'

যাবার আগে কাকীমা ঠাকুরের নির্মাল্য ফুল শবুর মাথায় ঠেকিয়ে তার বালিশের নীচে রেখে মঙ্গল কামনা করে ধরা গলায় বললেন—'আসিরে শবু, ঠাকুর তোকে ভাল করে তুলুন।'

তপু বলল—'আসিরে মেজদি, আবার কাল আসব।'

শেষে দীননাথও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে একখানি হাত ধরে—'আবার কাল সকালে আসব' বলে চলে গেল এক সময়।

শবু কারো দিকে একবার তাকাতেও পারল না, শুধু প্রত্যেকের কথায় তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার নার্সরা শবুকে নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। গোটা তিন চার ইঞ্জেকশন দিল বোধ হয়। কিন্তু খুব একটা ব্যথা সে অনুভব করে নি। সেদিনও সকালে দীননাথ যখন এসে বলেছিল—

এই দেখ, আমি আবার সকালে এসেছি, আমার দিকে তাকাও।'

তখন অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটি একটু খুলতে পেরেছিল, যেন বহু দূর থেকে দেখেছিল তার অস্পষ্ট মুখখানি। তারপর থেকে শবুর চোখে বাইরের সব দৃশ্য মুছে গেছে। অবশিষ্ট আছে শরীরের সামান্য অনুভূতি।

ডাক্তাররা চলে গেলে দুপুরে আবার এসে দীননাথ বলেছে—

'আর ডাক্তাররা তোমাকে নতুন ওষুধ দিয়েছে, এবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে। তোমার জন্য ডাব আর দুধ রেখে গেলাম। ওরা তোমাকে খাইয়ে দেবে। খেয়ো, কেমন?'

শবু শুধু পরিচিত গলার স্বরে ও হাতের স্পর্শে চিনেছে, শরীরটা একটু থর থর করে কেঁপেছে। আর কোন সাড়া দিতে পারে নি।

কিন্তু ডাক্তাররা কত ইঞ্জেকশন দিচ্ছে! প্রথমে দুটো তিনটে, তারপর আরো বেশী, অসংখ্য—পায়ের দিকটা সূচ ফুটিয়েই চলেছে। আগের

ইনজেকশনে ত এত যন্ত্রণা ছিল না—কিন্তু এই সূচ ফুটানোতে এত জ্বালা ধরছে কেন?

উঃ, কেউ কি কাছে নেই! কারা তার গায়ে সূচ ফোটাচ্ছে কেউ কি দেখছে না! যন্ত্রণায় পা দুটো বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখন দীননাথ কোথায়, সে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় করত।

কতক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করার পর দীননাথ এল, মাথায় হাত বুলিয়ে একটি হাত ধরে বলল—

'আমি এসেছি, এখনই আরো অনেকে আসবে।'

যন্ত্রণায় অস্থির শবু দুর্বল হাত দিয়ে দীননাথের হাত আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে বলতে চাইল—কারা সূচ বিঁধিয়ে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে গো, তুমি আমাকে বাঁচাও—কিন্তু গলায় কোন আওয়াজই বের হল না। দীননাথও কিছু বুঝতে পারল না।

ততক্ষণে এক এক করে এল তপু বেলা সুপর্ণা সুরমা শেফালী অমল পুটু। সবাই শবুকে নড়াচড়া করতে দেখে, পা দুটো মাঝে মাঝে নাড়াতে দেখে বলাবলি করছে—নিশ্চয়ই নতুন ওষুধে তার দেহের অনুভূতিগুলো ফিরে আসছে।

না, না—শবু চীৎকার করে বলতে চাইল, কিন্তু তার কথা কেউ শুনতে পেল না, তার যন্ত্রণার কথা বুঝতে পারল না—এমন কি মায়ের পেটের বোন তপুও না।

সুপর্ণা বলল—'একভাবে শুয়ে শুয়ে বোধ হয় কাকীমার অস্বস্তি হচ্ছে। দেখি পা দুটো একটু ওপাশ করে দি···একি এত পিঁপড়ে কেন? ইস্ পিঁপড়েতে কাকীমাকে ছেঁকে ধরেছে, লাল লাল ছোট ছোট পিঁপড়ে। আয় ত সুরমা, পিঁপড়ে মার ত।'

সুপর্ণা সুরমা তপু বেলা সারা গায়ে ঢাকা দেওয়া শাড়ীর তলা দিয়ে হাত চালিয়ে পিঁপড়ে মেরে শেষ করতে লাগল। ছটফটানী কমে গিয়ে শবুও শান্ত হল একটু একটু করে।

আবার সবাই হাসপাতালের অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হল। জাবেদাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাদের পরবের জন্য কেনাকাটা করতে গেছে। রামপিয়ারী সর্দারনী এসে—'আহা, বহেনজীর বড় তকলিফ হয়েছে, আমারই আগে দেখা উচিৎ ছিল, একঘণ্টা পহেলেও পিঁপড়ে দেখিনি, মাফ কিজিয়ে পা' বলে পুটুর কিনে আনা গ্যামাক্সিন বিছানায় ও চারপাশে ছড়িয়ে চলে গেল। তার আফশোষ

কতখানি আন্তরিক আর কতখানি অভিনয় বোঝা গেল না।

সবাই বলতে লাগল—এ হাসপাতালে আনাই উচিৎ হয়নি।

দীননাথ কেঁদে বলতে লাগল—'এত বড় নামকরা হাসপাতাল, তার এই অবস্থা ভাবতেই পারিনি। মাত্র পাঁচদিন আগে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী গিয়েছিল, তখনকার চিকিৎসার কাগজপত্র সব এখানেই রয়ে গেছে তাই এখানে এনেছিলাম। না হলে গতবারেই এখানকার যে চেহারা দেখে গেছি, এখানে কিছুতেই আনতাম না। জ্যান্ত মানুষকে পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াচ্ছে।'

সুরমা বলল—'ইস্, পিঁপড়ের কামড়ের কি কম জ্বালা? শাশুড়ী ননদের বাক্যবাণ আর পিঁপড়ের কামড়ে মরা মানুষও নড়ে ওঠে।' সেত বীণারই মেয়ে—মায়ের শাশুড়ীর জ্বালা যন্ত্রণার কথাই সে বলতে চাইল যেন। কিন্তু বীণাদিকেও শবুর মত বারবার শাশুড়ী আতঙ্কে জর্জরিত হতে হয়নি।

শেফালী বলল - 'রামপিয়ারী পাকা অভিনেত্রী।'

সুপর্ণা বলল—'আজ সেই বিলেত দেখানো ডাক্তারকে পেলে তাকেই বিলেত দেখিয়ে ছাড়তাম।' শবুর একটা হাত ধরে সে বলল—'সব পিঁপড়ে মেরে দিয়েছি, আর তোমার কোন কষ্ট হবে না কাকীমা।'

সুপর্ণার হাতটা দুর্বল হাতে চেপে ধরে শবু তার মনের কৃতজ্ঞতা জানাল—সে না দেখলে শবু এই নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেত না।

টপু আর বেলা নীরবে শবুর গায়ে হাত বুলিয়ে আরাম ও সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

শেষে দীননাথ শবুর হাতখানি ধরে কেঁদে বলল—

'আমি কি অপদার্থ দেখ, তুমি আমার হাত চেপে ধরে পিঁপড়ের কামড়ের কথা বোঝাতে চাইলে, আমি বুঝতেই পারলাম না। আমি কোনদিনই তোমার আসল ব্যথা ঠিক সময় বুঝতে পারিনি, তাই আজ তোমার শরীরের এই অবস্থা। তোমার অপদার্থ স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর।'

দীননাথের বোধশক্তি কম—সরল অকপটে সে কথা স্বীকারও করে তার কাছে। শবুর এখন আর বলার কিছুই নেই শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া।

তিন

শবুর চোখের সামনে থেকে দিন রাতের প্রভেদ ঘুচে গেছে। দীননাথ যখন এসে বলেছে—আমি আবার এসেছি, এখন সকাল হয়েছে, বুঝতে পারছ —তখন তার শরীরটা সামান্য একটু কেঁপে কেঁপে উঠেছে। মনে পড়ে গেছে —কত বছর ধরে সকালে উঠে থেকে তার কাজের অন্ত থাকত না। দীননাথ খেয়ে অফিস রওনা হওয়া পর্য্যন্ত তার জলখাবার খাওয়া, তেষ্টার জল খাবার অবসর থাকত না। তারপরও কাজ আর কাজ দুপুরে খাওয়া পর্য্যন্ত। দুপুরে দুঘণ্টা বিশ্রাম, আবার কাজ—সারা বাড়ী জুড়ে তার কত কাজ, কত ঘোরা ফেরা। তারপরে হঠাৎই কবে থেকে যেন তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পাটও এখন প্রায় উঠে গেছে। সামান্য একটু হরলিক্স, দুধ, ডাবের জল এই সবই চলছিল কদিন ধরে। ডাক্তাররা এসে বলে গেল— ডাবের জল খাওয়াবে না, বুকে কফ জমবে। দীননাথ একটা করে ডাব রোজ দিয়ে যেত—সেটাও তবে খেতে দেবে না! শবুর খাবার ইচ্ছেও লোপ পেল। হয়ত তার আর খাবার ক্ষমতাই নেই। দুপুরে এসে দীননাথ কেঁদে বলে গেল—

'তোমার জন্ত ডাব দুধ এনেছিলাম, এরা বারণ করাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

দীননাথের দেয়া ডাবের জলটুকুও খেতে দেবে না! শবুও তবে খাবেনা। রোগী খাচ্ছে না দেখে স্তালাল ফিডিং শুরু হল।

বিকেলে দীননাথ এসে তার অবস্থা দেখে যেন ভেঙে পড়ল, মাথায় হাত রেখে কেঁদে বলতে লাগল—

'এই দেখ আমি এসেছি, এখন বিকেল হয়েছে। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?' বলে শবুর দুচোখের পাতা আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ধরল।

শবুর চোখের তারা দুটো তখন স্থির, দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। গলার স্বরে ও হাতের ছোঁয়ায় বুঝতে পারছে দীননাথের উপস্থিতি। মনের সামনে ভেসে উঠল একটি ছবি—সে বর্ত্তমান দীননাথের শ্রান্ত ক্লান্ত উদ্বিগ্ন চেহারা নয়,— প্রায় পঁচিশ বছর আগে দেখা মাথায় টোপর পরা বরবেশী, প্রতিশ্রুতিময় যুবক দীননাথ। এখনই শবু তার গলায় বরমাল্য দেবে। কিন্তু সে যে হাত দুটো

তুলতে পারছে না, বেঁধে রেখেছে। চোখের পাতাদুটি তার বুজে এল—যেন নববধুর মুদে আসা আঁখি। দীননাথের ছোঁয়ায় শবুর শরীর একটু কেঁপে উঠল—যেন বিয়ের পর স্বামীর প্রথম স্পর্শ।

পুটু অমল সুরমা কমল মহী ভব শেফালী কাঞ্চন এসেছে। তপু কেন যেন আসেনি, রোজ রোজ এসে হয়ত পরিশ্রান্ত।

হঠাৎ শবুর গলার কাছে একটা দলা পাকিয়ে উঠল। কাশি আসার মত গলাটা খুস খুস করল একটু। পরমুহূর্তে গলগল করে অনেকটা রস মুখে উঠে এসে ঠোঁটের দু কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। সুরমা ছুটে গিয়ে নার্সকে ডেকে আনতে সে ভিজে তুলো দিয়ে শবুর মুখখানি মুছে দিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে গেল। দীননাথ শবুর মাথার কাছে বসে তুলো ভিজিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে শবু নাকের বদলে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল। ঠোঁটে ভিজে তুলোর স্পর্শ পেয়ে শবুর জিভ বারবার ঠোঁট স্পর্শ করছে. জল তেষ্টা পেয়েছে ভেবে দীননাথ এক চামচ এক চামচ করে তার মুখে জল দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিল। তিন চামচ জল খেয়েই তার তৃষ্ণা মিটে গেল, সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল, প্রাণটা শীতল হল।

নার্সের সঙ্গে একজন ডাক্তার ছুটে এল। রোগীকে ভাল করে দেখে একটা প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন দিয়ে বলল--

'পেসেণ্টের অবস্থা সীরিয়াস, রাতে দুজন হাসপাতালে থাকবেন।'

দীননাথ কোনরকমে বলতে পারল—'আমরা ত কদিন হল সারা দিনরাতই হাসপাতালে আছি।'

'ঠিক আছে'—বলে ডাক্তার চলে গেল, আর দীননাথ মনের সব বল হারিয়ে শবুর মাথার কাছে বসে পড়ল।

উপস্থিত সবার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই বোধ হয় বুঝতে পারছে—এবার শবু শেষ যাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে।

গভীর মমতায় দীননাথ শবুর মাথায় হাত রাখল, তার মুখে এলনা ভাষা, পরে তার একখানি হাত ধরে নীরব ভাষায় কত কি যেন বলতে চাইল।

এ হাত শবুর বহু বছরের চেনা, স্পর্শেই সে বুঝতে পারে। কথা বলা, চোখে দেখার ক্ষমতা তার আর নেই। বোধশক্তি অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে—স্বামীর স্পর্শে হাত দুটো একটু একটু কাঁপতে লাগল, যেন সে বোঝাতে চাইল—সেও মনে মনে কত কথা বলছে। কত কথা তার বলার ছিল কিন্তু সেই কবে থেকে তার মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে।

ছটা বাজতে চলেছে। পুটু গিয়ে চামেলীকে ডেকে নিয়ে এল। দীননাথ কান্না জড়ানো গলায় তাকে বলল—

'ডাক্তার কি বলে গেছে শুনেছ বোধ হয়? তোমরা আজকের রাতটা এর কাছে কাছে থেকো। অন্ততঃ আজকের রাতটা—তোমাকে আমি হাত জোড় করে বলছি।'

চামেলী বলল—'আমাদেরকে বলতে লাগবে না। জাবেদা ছুটি নিয়েছে, তাই আমি আগে এসেছি। আমি আছি।'

দীননাথ বলল—'আমি দিন রাতই হাসপাতালে আছি। মাঝে মাঝে এসে বাইরে থেকে তোমার কাছে খবর নিয়ে যাব।'

ততক্ষণে আর সবাই বাইরে চলে গেছে। এবার দীননাথ বারবার শবুর গায়ে মাথায় চোখে মুখে হাত বুলিয়ে তার কাছে বিদায় চাইল। তার গলার স্বর যেন কান্নার নামান্তর। শবুর একটি হাত ধরে বলল—

'ওগো শুনছো, আমি এখন বাইরে যাচ্ছি। বাইরে গেলেও দূরে নয়, খুব কাছাকাছিই থাকব। সব সময় তোমার খবর নেব। ডাক্তাররা ওষুধ দিচ্ছে তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আমি তোমাকে আবার বাড়ী নিয়ে যাব, খাইয়ে দেব, তোমার সেবা করব—তোমায় ভাল করে তুলব। আসি এখন, কেমন? চামেলী আছে, এখন সে তোমার কাছে থাকবে। আমি আবার ভোর বেলায় এসে আমার লক্ষ্মী সোনা—আমার কর্ত্রীঠাকরুনকে দেখে যাব। আসি, কেমন?……'

বলতে বলতে কেঁদে দীননাথ বিদায় নিল। তার প্রতিটি কথায় শবুর শরীর বারবার কেঁপে উঠল, দুচোখে নামল জলের ধারা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, বলতে পারছে না—শুধু একটুখানি অনুভূতি জেগে আছে।

কি দীননাথ কি হয়ে গেছে! দেহে মনে—সব দিক থেকেই সে আজ অসহায়, পরাজিত, বিধ্বস্ত। তাই আজ সে আয়াকে হাত জোড় করে মিনতি জানাচ্ছে, অবহেলা, অযত্ন দেখেও কাউকে কিছু বলতে পারছে না। কথায় কথায় কাঁদে, যে যা বলে তাই শোনে।

বলে গেল, আবার সে শবুকে বাড়ী নিয়ে যাবে, নিজে হাতে খাওয়াবে, সেবাযত্ন করবে। কিন্তু আর হয়ত তা হবে না।

রাত গভীর হচ্ছে। ডাক্তার নার্সরা এসে কি যেন সব করে গেল। কিছুই আর শবুকে ফেরাতে পারবে না। সে একটু একটু করে মার কাছে এগিয়ে চলেছে।

মা ষষ্ঠীর কাছে মানত করে তিন কড়ির বিনিময়ে মা তার অল্পায়ু আদরের

মেয়ে, আপন প্রতিচ্ছবি শবুর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেছিল। তবু জীবনের প্রায় মধ্য পথে নেমে আসছে পূর্ণচ্ছেদ। অল্পায়ুকে সাম ন্ত দীর্ঘায়িত করা গেলেও বিধির বিধান খণ্ডণ করা যায়নি—দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগের হাত থেকে সে রক্ষা পায় নি। তাই এখন শবুর মা-ই এগিয়ে আসছে শবুকে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে।

মাকে এখনো দেখতে পাচ্ছে না। সামনে নিকষ কালো অন্ধকার। এত অন্ধকার যে তার ভয় করছে প্রাণপণে মাকে ডাকতে চেষ্টা করছে কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠেছে দমবন্ধ হয়ে আসছে।

মাঝরাতে আবার ডাক্তার নার্স আয়ারা শবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল—নাকে মুখে কি যেন লাগাল, মাথার কাছে একটা মেশিন চলার শব্দ। একটু স্বস্তি পেলে ঘুম এসে যাচ্ছে। এখন রাত না দিন? চারদিক নিস্তব্ধ—রাতই হবে হয়ত। কিছু পরে রাত শেষ হবে, ফুটবে ভোরের আলো। এই শিউলি-ফোটা ভোরেই শবু প্রথম দেখেছিল পৃথিবীর আলো, আবার এক ভোরে সে দেখতে পাবে তার মাকে। আরো কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে সেই উষালগ্নের জন্য।

অবশেষে এসেছে সেই বহু প্রতীক্ষিত উষাকাল। শেষ আষাঢ়ের বর্ষণ বিহীন এক সকাল। গাছে গাছে পাখীরা কলরব করে নতুন আর একটি দিনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বহু আগেই।

পৃথিবীর সব আলো শবুর চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে। খুলে গেছে এক নতুন আলোর জগতের দরজা। আলোর ঝর্ণা বেয়ে মা পদ্মিনী দেবী এসে দাঁড়িয়েছে শবুর সামনে, দুহাত বাড়িয়ে মা শবুকে ডাকছে। চারদিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

—মা, মাগো, আমি তোমার কাছে যাব। এখনই যাব, আর দেরী করব না। কিন্তু যাবার আগে কারো সঙ্গে যে দেখা হল না, ও যে বলে গেছে ভোর বেলাতেই আসবে, আমার গায়ে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেবে। ওকে প্রণাম জানাবার শক্তি আমার নেই, হাতের স্পর্শে চেয়ে নেব শেষ বিদায়।…

আলোয় ভরা মার মূর্ত্তিখানি একটু একটু করে মিলিয়ে গেল, যেন ঘন কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। অন্ধকার এসে ঘিরে ধরছে। শবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে বাতাস বুঝি ফুরিয়ে গেছে। প্রাণটা বেরিয়ে

যেতে চাইছে। মা আড়ালে চলে গেছে—দীননাথ এখনো এল না, সে যে তারই জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছে। শ্বাস নেবার চেষ্টায় তার নাক মুখ দিয়ে একটানা শব্দ হচ্ছে।

ঐ ত দীননাথ আসছে, দূর থেকেই তার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—

'কি বলছ তুমি, কি বলছ? এই ত আমি ভোর বেলাতেই এসেছি। বল, বল, কি বলছ, বল ·।'

না, শবু কিছু বলেনি, শুধু নিঃশ্বাসের কষ্ট সত্ত্বেও সে দীননাথের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সেই দীর্ঘায়িত শ্বাস নেয়াকেই হয়ত দীননাথ তার গলার স্বর মনে করেছে।

দীননাথ শবুর মাথায় হাত রাখল। মাথাটা শ্বাস নেবার কষ্টে বারবার কেঁপে উঠছে, সেই চেষ্টায় নাক দিয়ে থেকে থেকে বেরিয়ে আসছে যেন বাঁশীর করুণ সুর। এবার সে শবুর হাত দুটি ধরল—এখন শবুর হাতে কোন বাঁধন নেই। দীননাথের হাতের ছোঁয়া পেয়ে শবুর হাত দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল—তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

আর একটি কোমল হাত শবুর শরীর স্পর্শ করল। দীননাথ বলল—

'দেখ, তপুও এসেছে এই ভোর সকালে। তুমি একবার ওর দিকে তাকাও।'

পৃথিবীর কোন কিছুই আর শবু দেখতে পারে না, চোখের পাতা দুটি ভারী হয়ে চোখের সঙ্গে লেপটে গেছে। দু জনের ছোঁয়ায় শবুর শরীর আর একবার কেঁপে উঠল। অসুখ হয়ে থেকে কানাইকে দেখেছে, কাকলী মিঠি দিঠি মিষ্টি এসে দেখা করে গেছে, এখন শেষবারের মত কাছে এসেছে তপু আর দীননাথ। এবার শবু নিশ্চিন্তে মার কাছে যেতে পারে। শুধু দুঃখ রয়ে গেল—বাবার কাছে যাওয়া হলনা, একটি বারের জন্য বাবাকে দেখতে পেল না।

তপু বলল—'মেজদি, কাল আমি আসিনি বলে তুই রাগ করেছিস? দেখ আজ আমি ভোর বেলাতেই এসেছি। একবার তুই তাকা আমার দিকে।'

না, পারে না সে তাকাতে। পারে শুধু চোখের জল ফেলতে।

তপু কেঁদে জিজ্ঞেস করল—'জামাইবাবু, মেজদির নাক দিয়ে অমন করুণ সুর বের হচ্ছে কেন? আমি দূর থেকেই ঐ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।'

দীননাথ বেদনাভরা গলায় বলল—'আমিও দূর থেকে শুনে ভেবেছিলাম, ও বুঝি কিছু বলছে। কিন্তু এখন ত মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট।'

'মেজদির এই কষ্ট আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারছি না। আমি বাইরে যাই' —বলে শেষবারের মত মেজদির গায়ে একবার হাত বুলিয়ে তপু কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

দীননাথ শবুর হাত দুটি ধরে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন নার্স বলল—

'এখানে আর দাঁড়াবেন না। ভিতরে একজন ডাক্তারবাবু এসেছেন বাইরের লোক দেখলে ভীষণ রাগ করবে।'

দীননাথ বে-পরোয়া, বলল—'আসুক ডাক্তারবাবু, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।'

তখনও শবুর নাকে করুণ সুর বেজে চলেছে, মাথাটা শ্বাস নেবার চেষ্টায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একটু পরে ডাক্তারকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে দীননাথ ধরা গলায় বলল -

'ডাক্তারবাবু, একে একটু দেখুন।'

ডাক্তার বলল—'হ্যাঁ জানি, আমরা যা করার করেছি, যাতে বুকের জমা কফ্ সাক্‌শান করে বার করা হয়েছে।'

'কিন্তু এখন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এখনো কি অক্সিজেন দেবার সময় হয়নি? রোগীকে অক্সিজেন দেবেন না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, অক্সিজেন দেয়া দরকার। আমরা দেখছি, আপনি বাইরে যান। সিস্টার, পেসেন্টকে অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা করুন।...আমরা এখন অক্সিজেন দিচ্ছি, পরে বেলা নটা নাগাদ স্যার এসে দেখে যা বলবেন করা হবে।' ডাক্তার আর দাঁড়াল না।

সিস্টার চামেলী আর ওয়ার্ড বয়কে নিয়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনতে গেল।

দীননাথ গভীর মমতায় শবুর মাথায় হাত রেখে কেঁদে বলতে লাগল—

'তোমার এত কষ্ট হচ্ছে, এরা কেউ কিছু করছে না। অক্সিজেন দিলে তোমার কষ্ট কমবে, পরে সাহেব এসে তোমাকে দেখবে, ভাল ওষুধ দেবে, তুমি ভাল হয়ে উঠবে। আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না। আমার যে আর কোন উপায় নেই, এই অবস্থাতেও তোমার কাছে থাকতে পারছি না। ঐ সিস্টাররা অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে আসছে। আমি বাইরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মন সব সময় আমার আদরিণীর কাছেই পড়ে থাকবে। আসি আমি?'

মাথায় হাত বুলিয়ে হাত দুটি ধরে কেঁদে 'আসছি' বলে দীননাথ যখন বিদায় নিল, তখন শেষবারের মত শবুর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে জানিয়ে দিল—সে এখনও বেঁচে আছে। শবুও অন্তর থেকে তার জীবন সাথীর কাছে বিদায় চেয়ে নিয়েছে। এবার বাতাস ফুরিয়ে যাক, নিঃশ্বাস বন্ধ হোক কোন দুঃখ নেই। মাগো, এবার তুমি এসো।

আবার নাকে নল লাগাল। একটু পরে শবুর শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। এতক্ষণ কি বাতাস ফুরিয়ে গিয়েছিল! এখন আর অত কষ্ট হচ্ছে না। হারিয়ে যাওয়া চেতনা বুঝি একটু একটু করে ফিরে আসছে। শরীরটা অনেক হাল্কা লাগছে—ইচ্ছে করলে উঠে বেশ কিছুটা হেঁটে আসতে পারে। উঃ, কতদিন হল সে হাঁটে নি, শুধু শুয়েই আছে।

দীননাথের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে সে অনেক দূর যাবে। কোথায় যাবে—ষ্টেশনের দিকে, শীলাদের বাড়ীর দিকে? শীতকালে কতবার সে দেড় দুমাইল হেঁটে ওদের বাড়ী গেছে।...এখন পোস্ট অফিসের কাছাকাছি এসেই শবু আর চলতে পারছে না, শরীর অবসন্ন পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।—এবার ফিরে চল চাঁপাতলায় নিজেদের বাড়ীতে, আপন ঘরে।

আবার চারদিক আলো করে আলোর ঝর্ণা বেয়ে মা এসে দাঁড়িয়েছে শবুর সামনে। এবার সে যাবে মার কাছে, আর তার কোন পিছুটান নেই। একটু আগেই দীননাথ তার কাছে ছিল, পেয়েছে তার স্পর্শ, চোখের জলে বিদায় চেয়ে নিয়েছে। এখন তার স্বামীর জন্য দু চোখের কোলে জমিয়ে রেখেছে শেষ বিদায়ের বেদনার স্মৃতি দু ফোঁটা চোখের জল।

চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে শবু তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চার

...আবার দীননাথ আসবে, শবুর প্রাণহীন দেহখানির উপর কেঁদে লুটিয়ে পড়বে, শবুর কপালে মুখ ছুঁইয়ে এঁকে দেবে শেষ বিদায়ের আশীষ চুম্বন, তার তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়বে শবুর মাথায়। শবুও রেখে গেছে তার জন্য চোখের কোলে জমে থাকা দু ফোঁটা অশ্রু। কাঁদবে তপু অঝোর ধারায়।

এবার শবু ফিরে যাবে নিজের বাড়ীতে, আপন গৃহকোণে। সবাই মিলে

গাড়ী ডেকে আনবে—শবু নয়, তার দেহখানিকে গাড়িতে তুলবে। দীননাথ তার মাথাটি কোলে নিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকবে তার মুখের পানে, দুচোখে বইবে অবিরল অশ্রুধারা। আশপাশে কারো চোখই শুকনো থাকবে না। তপু, বেলা, পুটু, সুপর্ণা, সুরমা, অমল, কমল, কাঞ্চন সবাই কেঁদে ভাসাবে। খবর পেয়ে শ্বশুর বাড়ীর সব কাজ ফেলে ছুটে এসে এলাও সে কান্নায় যোগ দেবে।

এত কান্না দেখে মা আর স্থির থাকতে পারবে না। অতি আদরের মেয়েকে কোলে ফিরে পাবার আনন্দে আর শবুর জন্য সবাই কাঁদছে দেখে আবেগে মার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়বে। শবুর দেহ ঘিরে যারা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে বলবে—এ ক'দিন আকাশে মেঘ থাকলেও বৃষ্টি ছিল না, এখন যাত্রার মুহূর্তে বৃষ্টি পড়ছে। কেউ বলবে—এই সময় বৃষ্টি পড়া ভাল, এ হল পুষ্প বৃষ্টি।

ওরা জানে না, এ হল মা-র চোখের জল—মাতা বসুমতীও কাঁদছে—তাই এই ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টি ··

·বাড়ীতে ঢুকতেই শবুর প্রাণহীন দেহকে চোখের জলে বরণ করে নেবেন ছোট কাকীমা দীপ্তিরানী, মা-র আদরের ছোট জা দীপু।

··· সকলে মিলে শবুকে তার নিজের বিছানায় শোয়াবে। ততক্ষণে বাড়ী লোকে লোকারণ্য। দীননাথ ছুটে গিয়ে বাড়ীর কল খুলে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে এসে শবুর ঈষৎ খোলা মুখে ঢেলে দিয়ে বলবে—নাও জল খাও, বাড়ীর কলের জল, এই তোমার স্বর্গের মন্দাকিনীর ধারা, মর্ত্তের পবিত্র গঙ্গা।

·· সে জল শবুর তৃষ্ণার্ত গলা বেয়ে যেখানে প্রাণ থাকে সেখানে পৌঁছবে, তার সব তৃষ্ণা মিটে যাবে। চারদিকে কত কান্নাভরা মুখ শবুকে ঘিরে দাঁড়াবে।

দীননাথ বুক ফাটা কান্নায় হাহাকার করে বলবে, 'দেখুন—কাকীমা, দেখুন ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে। শরীরে রোগ যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই, এতটুকু বিকৃতি নেই, স্বাস্থ্যও যেমন ছিল তেমনি আছে। অথচ ভিতরে ভিতরে কি যে রোগ হল, কোন চিকিৎসাতেই কিছু হল না। শেষ দুবার হাসপাতালে পাঠাবার আগে ডাঃ চক্রবর্তী আমাকে বারবারই বলেছে—প্রথম থেকে আমার মনে হয়েছে পরে দেখছি স্পেশালিষ্টও ডাইগেনোসিস করেছে এটা হল সি. ডি. এ কেস্। এত কম বয়সে সাধারণত এ রোগ হয় না, হলেও এ রোগে কিছু করার নেই, বাঁচানোও যায় না, আপনি চেষ্টা করছেন করুন। আমার

মন তা মানতে চায়নি। তাই বারবার ওকে নিয়ে হাসপাতালে গেছি, শেষের সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমিও সেখানে পড়ে থেকেছি। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করেও আপনাদের মেয়েকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না। তিন মাস ধরে রোগের সঙ্গে কঠিন লড়াই করে কত কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। আমি পথের ভিখারী হয়ে গেলাম, আমার আপন বলতে আর কেউ রইল না। মনে হচ্ছে আমার উপর অভিমান করে চলে গেছে।'

··কাকীমাও কেঁদে বলতে থাকবেন 'হ্যাঁ, ঠিক তিন মাস। সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ, শুক্রবার—আর আজও আষাঢ়ের শেষদিন, শুক্রবার। রথের পর শুক্লা ষষ্ঠী। শবুর জন্মের পর দিদি মা ষষ্ঠীর কাছে ওকে গচ্ছিত রেখেছিল—এখন মা ষষ্ঠী তাঁর নিজের ধনকে নিয়ে গেলেন।···ওর মা, ঠাকুমা, বাবু, নন্দু সবাই রথকে আগু পিছু করে চলে গেছে। শবুও সেই রথের মধ্যেই গেল। শবু ছিল বড় অভিমানী, মনের দিক থেকে বড় দুর্বল—সে কথা প্রায়ই সে আমাদের বলত।···ও ছিল দিদির ছেলে মেয়েদের মধ্যে সব থেকে আদরের তাই ওর জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দিদি ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। আজ আষাঢ়ের শেষ—সামনেই ওর জন্মমাস শ্রাবণ—আর সাতদিন পরেই আসত ওর জন্মদিন—সে আর হল না।'

···কাকীমার কথাগুলো বিলাপের মত শোনাবে।

···বড়বৌদি বীণা এসে কেঁদে পড়বে—'ও শ্রাবণী, এ তুমি কি করলে? তোমার থেকে কত বড় আমি, আমাকে ফেলে তুমি চলে গেলে? আমি একা তবে ঐ শাশুড়ীর সঙ্গে লড়াই করব কি করে?···ও ঠাকুরপো, আমি শ্রাবণীকে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনে তুলেছিলাম কত সাধ আহ্লাদ করে—কোন সাধ না মিটতেই যে সে চলে গেল···।'

·দীননাথ বড়বৌদির গলা জড়িয়ে কেঁদে ভাসাবে—'বৌদি, আমার সাধের ঘর যে শূন্য হয়ে গেল। আমি কার সঙ্গে কথা বলব, কার সেবা করব, কাকে নাওয়াব খাওয়াব? শূন্য ঘর ভাঙা সংসার নিয়ে আমি কি করে বাঁচব? ও যেখানে গেছে—সকলের মত সেখানে আমার গতিও অবশ্যম্ভাবী। আমিও দেরী করব না।··আমার লক্ষ্মী চলে গেল, আমি এখন একেবারেই লক্ষ্মীছাড়া···দেখছেন বৌদি, ওর মুখখানা কি সুন্দর দেখাচ্ছে, মুখে কি সুন্দর একটুখানি হাসি লেগে আছে—যেন সুন্দর এক স্বপ্ন দেখছে ··।'

দীননাথ পাগলের মত কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে।

···এবার দীননাথের কান্না শবুর আত্মাকে অস্থির করে তুলবে। অসহায়

দীননাথের কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে সে তার মায়ের কোলে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তখন পর্য্যন্ত সে তাকে কোনদিন চোখের জল ফেলতে দেখেনি। অভিমানে বুঝতে পারেনি সে চলে গেলে দীননাথ সবদিক থেকেই কতখানি অসহায় হয়ে পড়বে। তার কান্না দেখে শবুর আত্মাও অশান্ত হয়ে উঠবে গভীর বেদনায়—সান্ত্বনা দিতে চাইবে দীননাথকে ·

···অমন করে কাঁদে না। এই ত কাল থেকে পড়ছে শ্রাবণ মাস, শবু—শ্রাবণীর জন্মমাস, শিউলি ফোটা শুরুর মাস। বাড়ীর শিউলি গাছে এখন থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করবে, সকালে ঝরে পড়বে। সে ফুল যেন সে যত্ন করে ঘরে তুলে আনে, শ্রাবণী আর শিউলিকে যেন এক করে দেখে। শিউলি ফুলের মধ্যেই সে শ্রাবণীকে ফিরে পাবে, তার গন্ধে মনে পড়বে শবুর কথা।

কদিন পরে আসবে শরৎ, রোজ সকালে মুঠো মুঠো অজস্র শিউলি ফুলে ছেয়ে যাবে শিউলিতলা। কয়েকটি ফুল ঝরে পড়বে পাশের তুলসী তলায়—ওগুলো সে যেন না তোলে—ওগুলো হবে ঈশ্বরের পায়ে শবুর শেষ প্রণামের লুটিয়ে পড়া অঞ্জলি।

·· চারদিকের ছড়ানো ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যেন সে বুক ভরে তার গন্ধ নেয়, অনুভব করে শবুর অস্তিত্ব—কোনদিন সে ছিল দীননাথের জীবন সাথী হয়ে। শবু এসেছিল এক বর্ষণ মুখর শিউলি ফোটা শ্রাবণ উষায়—চলে যাচ্ছে শেষ আষাঢ়ের নবসূর্য্য দেখে, শিউলিরা যেমন ঝরে পড়ে প্রথম রবির কিরণ-পাতে।

·· সকালের শিউলি বিকেলে শুকিয়ে যায়, শবুর জীবনও অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পৌঁছল না, মধ্যাহ্নে নেমে এল জীবন-সন্ধ্যা। শুকনো ফুলে বাসর সাজানো যায় না, শবুদের বাসরও আর কোনদিন সাজানো হবে না। তবু শিউলি গাছটির যেন সে যত্ন নেয়। সে যদি সতী হয়, তাদের ভালবাসা যদি খাঁটি হয় তবে এই শিউলি গাছেই ফুটবে শিউলি ফুল বারোমাস। শরতে অজস্র ফুল ছাড়াও অন্যমাসগুলিতেও প্রতিদিনই কিছু কিছু শিউলি ফুটবে। শিউলির মধ্যেই শবু বেঁচে থাকবে—রোজ সকালে গাছের দিকে চাইলে সে দেখতে পাবে শবুর হাসিমাখা মুখ, গন্ধে পাবে তার স্মৃতি সৌরভ। শবুও দেখবে তার জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-স্বামীকে—প্রতিদিন সকালে···।

শবুকে রাজরানী বা নববধূর বেশে সাজাচ্ছে তপু, বেলা, সুরমা। বিদ্যুতের দেওয়া পয়লা বৈশাখের সেই নতুন শাড়ী তাকে পরিয়ে দিল। চন্দন দিয়ে

তার মুখ সাজাতে গিয়ে ওদের চোখের জলে বারবার সে চন্দন ধুয়ে যাচ্ছে। কপালে দিয়েছে বড় করে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। রাঙা আলতায় ভরে দিল তার দুপায়ের তলা ও দুহাতের তালু। সব শেষে দীননাথ চোখের জলে তার গলায় পরাল ফুলের মালা যেমনটি পরিয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে বিয়ের রাতে। সেখনকার মুখের হাসি এখন কান্নার রূপ নিয়েছে।

কাঁদছে সবাই। এসেছে শেফালী ও শীলা। রায় ও ঘোষ গিন্নীরা থেকে আরম্ভ করে পাড়ার যত বৌ ঝি। খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক খিলি পান হাতে ছুটে এসেছে বাঙাল বৌ—

'সধবা সতীলক্ষ্মী কি মুখে পান না লইয়াই যাইব?' বলে সে পানের খিলি শবুর মুখে ছোঁয়াল।

সধবারা শবুকে নিয়ে সিঁদুরের হোলি খেলছে—যে আজ চলে যাচ্ছে সে যে মহাপুণ্যবতী, তার সিঁথিতে যে সিঁদুর পরাবে আজীবন সধবা থেকে তার হবে অক্ষয় স্বর্গবাস। তন্বী নেই অফিসে গেছে। তার শাশুড়ী মাসীমাও নেই এ জগতে, থাকলে বলতেন—আমার মা দুর্গা চলে গেল, সধবারা মা দুর্গারে সিঁদুর পরাইতাছে, আমরার বৌ এর সে ভাইগ্য নাই—আহা, কেমন রাজ-রানীর বেশে সাজাইছে অকালে সোনার প্রতিমা বিসর্জন হইয়া গেল।

খবর পেয়ে সন্ধ্যা এসে কেঁদে দাঁড়িয়েছে—যার সংসার সে আগলাচ্ছে সে সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। মাসীকে সে সত্যি ভালবাসে, প্রায় দু বছরের আসা যাওয়া। এসেছে সুশীলার মা, ছলছল চোখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে শবুকে দেখছে। মাত্র তিন মাস আগে সে কাজে লেগেছিল। তখনই শুরু হয়ে গেছে রোগের আক্রমণ, আর তিন মাস পরেই সব শেষ।

এবার শুরু হল শবুর শেষ যাত্রা, লক্ষ্য নির্দিষ্ট—শিবতলা মহাশ্মশান। পথে পথে কত যুক্তকর নমস্কার, মহিলাদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আক্ষেপ—

'আহা, কার কপাল পুড়ল গো! এমন রূপ যৌবন নিয়ে কার সংসার খালি করে চলে যাচ্ছে সতীলক্ষ্মী!'

বিকেলের পড়ন্ত রোদে যারা গঙ্গার ঘাটে এসেছে তাদের মুখেও এক কথা—

'আহা, মা যেন সাক্ষাৎ রাজরানী—মহাপুণ্যবতী, ভাগ্যবতী! এই বয়সে হাতে নোয়া শাঁখা নিয়ে, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পায়ে রাঙা আলতা লাল শাড়ী পরে আত্মীয় স্বজনদের কাঁদিয়ে চলে যাবার মত সুখ আর নেই। এমন সৌভাগ্য কজনের হয়?'

গঙ্গার ওপারে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য পাটে বসেছে। সেখানে রবির

কিরণে লাল মেঘে দিনের চিতা জ্বলছে। মাঝখানে নদীতে পড়েছে তার প্রতিচ্ছবি। দু একটি নৌকোর অলস আনাগোনা চলছে। দিনের শেষ খেয়া চলেছে ওপারে। এপারেও শবুর শেষ শয্যা প্রস্তুত।

তারপর। পুড়বে নারী উড়বে ছাই—তবে নারীর কলঙ্ক নাই। শাশুড়ীর দেওয়া মিথ্যা কলঙ্ক অপবাদ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে নিষ্কলঙ্ক শবু স্বামীকে পাশে রেখে এয়োতীর সব চিহ্ন নিয়ে শেষ শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। আগুনের মহাতেজে শবুর শরীর কণায় কণায় ভাগ হয়ে মাটির ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।

এক সময় বৃষ্টির জলে ধুয়ে কণাগুলো পড়বে গঙ্গার বুকে, ভেসে যাবে সাগরের পানে। সাগরে পৌঁছে ভেসে যাবে মন্দির শহরের কূলে। সেখানে বালুকণায় আর মাটিতে রেণুতে রেণুতে মিশে যাবে শবুর দেহের উপাদানগুলি —শবু ফিরে যাবে তার জন্মভূমির ধূলিতে। যে ধূলি থেকে যেখানকার জল বাতাসে শবুর দেহ গড়ে উঠেছিল—ফিরে যাবে সেখানে আবার নতুন করে জন্ম নিতে।

মাটির ধরণীতেই আছে সুখ দুঃখ হাসি কান্না ঈর্ষা প্রীতি যন্ত্রণা ভালবাসা। এ সব ছেড়ে স্বর্গের অবারিত নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাম্য নয়। এ জীবনে শবু হেরে গেছে—সামনের জীবনে যাতে হেরে যেতে না হয় সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তার সত্তা এখন অসংখ্য কণায় ছড়িয়ে পড়ে ভেসে যাবে সাগরের পানে। আত্মা যদি হয় এক চৌম্বক শক্তি, তবে তার আকর্ষণে এই কণাগুলিই আবার একত্র হয়ে গড়ে তুলবে সেই রূপ-লাবণ্যেভরা কমণীয় এক নতুন দেহ—ফিরে আসবে শ্রাবণী, ফিরে আসবে শবু—হয়ত অন্য নামে।



সমাপ্তি